নির্জনে খেলা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ১৯৬০

❑ প্রকাশক ❑
সমীরকুমার নাথ ❑ নাথ পাবলিশিং
৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড ❑ কলকাতা ৭০০০০৯

❑ অক্ষরবিন্যাস ❑
তনুশ্রী প্রিন্টার্স
২১বি রাধানাথ বোস লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬

❑ মুদ্রক ❑
অজন্তা প্রিন্টার্স
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯

এতে আছে

কান্তিময়ী কুলু

হিমালয়ের কান্তিময়ী কন্যাদের ভেতর কুলু অন্যতমা। কাশ্মীর, কিন্নর, কুলু, কাংড়া এই চার রূপবতী কন্যা পিতৃগৃহ আলো করে মত্ত হয়ে আছে আনন্দ-লীলায়। আমি আমার প্রথম যৌবনে নবীন সওদাগরের মত হাজির হয়েছিলাম ঐ নন্দনলোকের দ্বারে শুধুমাত্র চোখের কৌতূহল মেটাব বলে। কিন্তু ওদের দর্শনমাত্রেই আমি এক অদৃশ্য যাদুর সুতোয় জড়িয়ে পড়লাম। বার বার ফিরে এসেছি আমার কর্মস্থানে, কিন্তু কাজের মাঝেই টান পড়েছে সেই সম্মোহনী সুতোয়। আমি প্রেমিকার দুর্নিবার আকর্ষণের মত ছুটে গেছি তাদের মাঝখানে। সেদিনগুলো ছিল আমার চোখের-উৎসব আর মনের উত্তেজনায় ভরা। ধীরে ধীরে প্রেমিকা একদিন প্রেয়সী হল। সে খুলে দিল আমার প্রেরণার উৎস-মুখ। আমি অনেকগুলি উপন্যাস লিখলাম ঐ আশ্চর্য রূপের জগতগুলিকে স্মরণ করে। কন্যা-কাশ্মীর, কিন্নরী, কালের রাখাল, নির্জনে খেলা উপন্যাস চারখানি এই চার কন্যার কথাতেই ভরা।

নির্জনে খেলা উপন্যাসটিতে আমি নববধূর মত সলজ্জ কান্তিময়ী কুলুর অবগুণ্ঠন উন্মোচনে প্রয়াসী হয়েছি।

ঋতু-আবর্তনে কুলুর প্রসাধন-লীলা আমি দেখেছি দুচোখ ভরে। বাক্যহারা বিস্ময়ে নিশি পাওয়ার মত ঘুরে বেড়িয়েছি পাহাড়ী পথে চীর-পাইন বনের আলোছায়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে। কখনো ক্লান্ত হলে বসে পড়েছি পাহাড়ী ছইয়ের (ঝর্ণা) ধারে। নুড়িতে নাড়া দিয়ে এক সুখকর শব্দের সৃষ্টি করে নিচের দিকে নেমে চলেছে সে জলধারা। সামনে বিস্তৃত মানালীর উপত্যকা। ওপারে পাহাড়ের গায়ে সবুজ অরণ্যের সংসার। ঠিক তার পরেই পীরপাঞ্জালের শুভ্র শৈল-শিখর। একটি পাহাড়ী স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে উপত্যকার বুকের ওপর দিয়ে উপবীতের মত। বসন্ত উৎসবের আনন্দ কলরব কানে এসে বাজছে। আপেলের ডাল সাদা আর পিঙ্ক কুসুম স্তবকে ভরে উঠেছে। মনে হচ্ছে সুসজ্জিত বন-কন্যারা শাখাবাহু মেলে অচেনা পথচারীদের ডাকছে উৎসবের আনন্দে যোগ দিতে।

তউন্দি বা গরমকালে ছোট ছোট ফিকে সবুজ পেয়ারার মত ফল ধরে আপেলের ডালে। বইতে থাকে গরম হাওয়া। সে হাওয়ায় উড়ে বেড়ায় মিহি পাহাড়ী ধুলো। মধ্যদিনে মনে হয় পাতলা একটা কাপড়ের পর্দা চোখের সামনে দুলছে। পর্দার ওপারের ছবি অদৃশ্য হয়ে যায়।

বসন্ত থেকে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি অবধি গদ্দী পহালরা ভেড়ার পাল নিয়ে ভ্যালি ছেড়ে ওপরের পাহাড়ে উঠতে থাকে। সে এক সুদৃশ্য সমারোহপূর্ণ শোভাযাত্রা। কোন কোন পালে পাঁচ সাতশো ভেড়া বকরী দেখা যায়। লোমওয়ালা কুকুরগুলো ছুটে ছুটে ঘ্যাঁকঘোঁক করে লাইনগুলো সিধে রাখে। ওরা জোৎ (পাস) পেরিয়ে নতুন নতুন বুগিয়ালের (চারণভূমি) সন্ধানে চলতে থাকে।

গদ্দী মেষচারকদের পোশাক ভাবী মজার। ঘাড় থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত ঢাকা একটি চোল। পায়ে নাগরা। মাথায় কুলুর কাজ করা সাদা টোপি। আর বক্‌রীর লোমে তৈরী একটা কালো লম্বা ডোর (দড়ি) পাকে পাকে কোমরে জড়ানো। ঐ ডোর থেকে পয়সা রাখার বজ্‌লু (থলে) আর একটা কুলহারা (কুঠার) ঝুলছে। গরম আর বর্ষা কালটা বৃষ্টিবিহীন বরফ ছাওয়া পর্বতের কোলে কাটিয়ে ওরা আবার নামতে থাকবে শরতের শুরু থেকে ভ্যালির দিকে।

প্রচলিত প্রবাদে আছে, গদ্দানরা (গদ্দী রমণী) আরাধ্যদেবতা শিবকে ধূপ দিয়েছিল তাই খুশি হয়ে শিব তাদের দিলেন রূপ। গদ্দানদের চোখের দৃষ্টিতে নাকি ভানুমতীর খেলা আছে। তাই বিজ্ঞ মানুষরা সেদিকে তাকাতে বারণ করেন।

আমি কিন্তু বিভিন্ন গদ্দী পরিবারের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ করেছি। তথ্য সংগ্রহ করাই ছিল আমার মূল উদ্দেশ্য। আমি তাদের যাযাবর সংসারে নারী পুরুষ নির্বিশেষে যে আতিথ্য পেয়েছি তা ভোলার নয়। শিবের বরে গদ্দানরা যথার্থই রূপবতী হয়েছে। তাদের মুখের হাসি, চোখের অভিব্যক্তি সুন্দর কিন্তু চাহনিতে কোথাও কুহক-মায়ার ছায়া দেখিনি।

যারা ভুট্টা ক্ষেতে, ধান গমের ক্ষেতে কাজ করছে সে সব মেয়েরা ভারী হাসি-খুশি আর রসিকা। যারা গান গাইছে আর ধান রুইছে তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কোন যুবক যদি হেসে তাকায় অথবা কিছু মন্তব্য করে তাহলে ঐ মেয়ের দল খিলখিল করে হাসি ছড়াবে আর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতের জল ছিটিয়ে ভিজিয়ে দেবে তার পোশাক। বেচারী তখন পড়ি কি মরি করে পালাতে পথ পাবে না। ও যত ছুটবে, সারা মাঠের মেয়েরা কাজ ফেলে ওর চলার পথে জলতরঙ্গের মত হাসি ছড়াতে থাকবে।

যে সব মেয়েরা ভোরবেলা বনে কাঠ কুড়োতে যায় অথবা আপেল বাগানে আপেল তুলে ঝুড়ি ভর্তি করে তাদের মুখের দিকে তাকালেই মনে হয়, ভোরের সোনালী সূর্যের জলে স্নান সেরে দিনের কাজে নেমেছে দেবকন্যারা।

পাহাড়ী নারীপুরুষের রক্তে এখনও পবিত্রতা, সততা প্রবাহিত হচ্ছে। সমতলবাসীদের ধূর্ততা অথবা মালিন্য এখনও তাদের স্পর্শ করতে পারেনি।

এখানে প্রকৃতি আর মানুষ এমন অভিন্ন যোগে যুক্ত যে প্রকৃতিকে মানব-সংসারের একটি চরিত্র বলেই মনে হবে।

জুনের মাঝামাঝি থেকে বরসাৎ শুরু হয়। মেঘসজ্জায়, বিদ্যুৎচমকে সে এক দৃষ্টি-নন্দন সমারোহ। নালা, নালু, ছই, কুহল—ছোট বড় সব স্রোতস্বিনী জলের স্পর্শ পেয়ে উতরোলে ধাবিত হয় বিপাশার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য।

এখানেও মেঘসজ্জা হলে বকের পাঁতি শ্বেতপদ্মের গ্রন্থিহীন মালার মত ভেসে ভেসে যায়। একবার মেঘ-গর্জন হলে বহুক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে সে শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। এরই ভেতরে কিন্তু নির্ভীক পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা উপত্যকায় বহমান ছোট্ট নদী থেকে মৎস্য শিকার করে বেড়ায়। মোরি, পাল্‌লু, কুন্‌নি, গুলগুলি—আরও কত মিষ্টি মধুর সব মৎস্য-নামাবলী।

নীলে সোনায় মাখামাখি হলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে কুলু উপত্যকা। শরৎ পায় সোনার সিংহাসনের অধিকার। শুরু হয়ে যায় আপেল বাগিচায় কুলুর বিখ্যাত সোনালী আপেল তোলার কাজ। অক্টোবরে ঘরে ঘরে সদ্য ক্ষেত থেকে তোলা ভুট্টার সে কি শোভা। প্রতিটি ঘরের ছাদ আর বারান্দায় বিছিয়ে দেওয়া হয় সোনালী আর কমলা রঙের ভুট্টার দানা। এক ঝাঁক চিঁড়ি পাখি 'কুইক্ কুইক্' আওয়াজ তুলে ফর্‌ফর্‌ পাখা টেনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোনার দানাগুলো লুটে নেবার জন্যে।

এবার সেরা উৎসব দশেরা এসে যায়। কুলুর বিভিন্ন গাঁও থেকে বিপাশার কূলে ঢোল-ময়দানে এসে জড়ো হয় গ্রাম্য দেবতারা। প্রধানত নরসিং দেবতা। ঝকঝকে পেতলের মূর্তি। ভক্তের কাঁধে পালকি-বাহিত হয়ে দেবতারা এসে সম্মিলিত হন। কুলুর রাজা প্রথা মেনে পুরানো দিনের ঝলমলে পোশাক গায়ে চাপিয়ে এসে পৌঁছন মেলা-প্রাঙ্গণে। তিনি বিপাশার তীর অবধি টেনে নিয়ে যান রথ। শুরু হয়ে যায় উৎসব।

রাতে খোলা আকাশের নিচে বনের কোলে স্টেজ বেঁধে আসর বসে নাচ আর গানের। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসে শিল্পীরা সে উৎসবে যোগ দিতে। সেই সম্মিলিত, দ্বৈত আর একক নাচ না দেখলে কলাবতী কুলুকে পুরোপুরি জানা যাবে না। সে নাচ গন্ধর্বলোকেই বুঝি সম্ভব। বিপাশার কূলে, অরণ্যের কোলে সামান্য রঙের ছোঁয়ালাগা সাদা পোশাকে নারী আর পুরুষ যথার্থই গন্ধর্ব, গন্ধর্বী।

নাগ্‌গরে রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারীর পাশে দুটো ফারগাছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। পাহাড়ের নিচে উপত্যকা। নানা ধরনের সবুজ ক্ষেতের চৌকো চৌকো খোপ। মাঝখান দিয়ে মুক্তো গাঁথা চওড়া হারের মত বয়ে চলেছে বিপাশা। এখানে ওখানে সবুজ আর নীলে মেশা টিলা পাহাড়। প্রথম শীতের রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়েছে সারা কুলু উপত্যকায়। নীল নীল পাহাড়ের গায়ে উড়ছে সাদা মসলিনের মত কুয়াশার উত্তরীয়।

আমার চোখের সামনে পাশাপাশি দুটি নীলাভ পাহাড়। তাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে পীরপাঞ্জালের ঝকঝকে সাদা চূড়ো। কতক্ষণ তাকিয়ে আছি সেদিকে! এত শোভা, এত মহিমার মাঝখানেও মন আমার বিষণ্ণ। আমি আজ বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম বিশ্ববন্দিত রাশিয়ান শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখের শিল্পকর্মগুলি দেখব বলে। শিল্পী রোয়েরিখ ভারতবর্ষকে তাঁর দ্বিতীয় মাতৃভূমি বলে মনে করতেন। এখানে নাগ্‌গর পাহাড়ে বসে তিনি তাঁর জীবনের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ ছবি এঁকেছেন। এখানেই প্রকৃতির সীমাহীন রূপের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিনি অসীম আনন্দলোকে চিরপ্রস্থান করেন।

আজ কোন একটি উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। তাই আর্ট গ্যালারী বন্ধ। এতখানি পাহাড়ের ওপর উঠে এসে ইচ্ছা পূর্ণ হল না, তাই হতাশা।

দ্বাররক্ষী আমাকে এই খবরটুকু জানিয়েই স্থানান্তরে চলে গিয়েছে। আমি এখন ঘুরে ঘুরে শিল্পীর স্থান নির্বাচনের কথা ভাবছি। হঠাৎ মেয়েলি গলার একটা আওয়াজ পেয়ে ফিরে দাঁড়ালাম।

আসুন, আজ ছুটির দিন তাই বন্ধ ছিল। এতটা ওপরে উঠে এসে ফিরে যাবেন, দেখে যান।

টিপিক্যাল কুলুর পোশাক পরা এক তরুণী। গোল্ডেন আপেলের মত মুখ। লম্বা বিনুনী। শেষ প্রান্তে লাল একটা টাসেল ঝুমকোর মত ঝুলে আছে।

আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ওকে অনুসরণ করে আর্ট গ্যালারীতে ঢুকলাম। পাশ থেকে দেখলাম, ওর ছোট্ট কানের দুলটা টুলটুল করে নড়ছে।

তরুণী আমাকে যত্ন করে সবকটি ছবি দেখাল। ব্যাখ্যা করে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও বলে চলল।

দ্বিতীয় কোন দর্শক নেই, তাই তরুণীটি অনেকখানি সময় আমার জন্য ব্যয় করল। আর যেটা একেবারেই প্রত্যাশা করিনি তাও করে বসল। আমাকে ছবির সমঝদার ভেবে ও নিয়ে গেল ওর ছোট্ট কোয়ার্টারে। ওর নিজস্ব সংগ্রহ থেকে একটি ছবি টেনে বের করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, রোয়েরিখ সাহেবের এই ছবিটা দেখুন। এটি কিন্তু আমি ত্রিবান্দ্রম থেকে সংগ্রহ করে এনেছি।

প্রায় হালকা একটুখানি নীলাভ রঙের সঙ্গে সাদা মিশিয়ে মিশিয়ে আঁকা।

এক স্বপ্নময় পরিবেশে একখণ্ড শিলাসনে বসে আছেন ভাবুক এক সুদর্শন পুরুষ। স্বপ্নালু চোখের দৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত। দৃষ্টির সামনে হালকা কুয়াশার আস্তরণ। ঐ কুহেলিকার ভেতর থেকে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে শ্বেত প্রস্তরের সৌধরাজি।

নিচে লেখা আছে ঃ 'রামায়ণের জন্ম'।

আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে আদি কবি বাল্মীকি আর অযোধ্যা নগরীর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একসময়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। ধীরে ধীরে নিচের দিকে নামতে লাগলাম। বাঁক ঘোরার আগে একবার ফিরে তাকালাম পেছন দিকে। তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। হালকা একখণ্ড কুয়াশা মসলিনের ওড়নার মত দুলছে তার সামনে।

সারা কুলু উপত্যকা সেই মুহূর্তে আমার চোখের ওপর একটা স্বরলিপির পাতা মেলে ধরল। আমি মনে মনে গুনগুন করে সুর সাধতে লাগলাম। সেই সুরের ভেতর থেকে জেগে উঠল এক তরুণী। আমার 'নির্জনে খেলা' উপন্যাসের নায়িকা 'ঝিন্নি'।

নির্জনে খেলা

প্রথম পর্ব

ডিসেম্বরের গোড়াতেই নরসিংলালজীর সঙ্গে মানালী থেকে নেমে এলাম কুলুতে। চাচাজীর কোঠীতে এই আমার প্রথম আসা। সারা পথ উত্তুরে হাওয়ায় সাঁই সাঁই চাবুক মারছিল। সিডার আর পাইনের বন পেরিয়ে আসার সময় শুনতে পাচ্ছিলাম একটানা কান্নার আওয়াজ। বিপাশার তীর ঘেঁষে গাড়ি চলছিল। দুরন্ত পাহাড়ী মেয়েটা হঠাৎ কেমন শান্ত হয়ে গেছে। নীল শাড়িখানা জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে শুয়ে আড়মোড়া ভাঙছে।

সন্ধ্যার একটু আগেই চাচাজীর ডেরার সামনে এসে দাঁড়ালাম। শেষবেলার হলুদ আলোয় প্রথম চোখাচোখি ঝিন্নির সঙ্গে। আপেল বাগিচার বেড়ার ধারে সে দাঁড়িয়েছিল। এগিয়ে এসে আমার দিকে চেয়ে হাত তুলে নমস্কার করল। তারপর চাচাজীর হাত থেকে সব্জীর টোকরীটা নিয়ে কোঠীর দিকে দ্রুত পা চালিয়ে চলে গেল।

শীতের শান্ত সন্ধ্যা। পেছনের উঁচু পাহাড়টার ছায়া ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। কয়েকটা আপেল আর পাইন গাছের পাশ কাটিয়ে চাচাজীর পেছন পেছন এসে দাঁড়ালাম কোঠীর দাওয়ায়।

চাচা নরসিংলালজী খপ করে আমার একখানা হাত ধরে ঘরের ভেতর মহলে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, এ কোঠী তোমারা বাবুজী। এ বাগিচা ভি তোমারা। মুখার্জী সাব মেহেরবানী করে আমাদের এখানে থাকতে দিয়েছেন। তিনি আজ নেই, তা বলে চাচা তো ভাতিজার সঙ্গে বেইমানী করতে পারবে না।

বললাম, চাচাজী এ কোঠি কার সে নিয়ে ফয়সালা পরে হবে। এখন চাচার কাছে এসেছি ব্যস। সব ভাবনা এখন চাচাজীর।

নরসিংলালজী আমাকে নিয়ে একটা কাঠের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলেন।

চাচাজী এবার বললেন, এই তোমার কামরা। কুর্শি টেবিল সব আছে। খাটিয়া পর বিস্তারাভি পাতা আছে। খুশিসে আরাম করো, কোই তকলিফ হোনে সে বোলো।

নরসিংলালজী বেরিয়ে গেলেন। কাঠের সিঁড়িতে ভারী পায়ের আওয়াজ উঠলো।

ডিসেম্বরের সন্ধ্যায় গায়ের কোট খোলার প্রশ্নই ওঠে না। নেয়ারের চারপায়ার ওপর দেহটাকে ঢেলে দিলাম।

তখনও ঘরের ভেতর আধময়লা কাপড়ের মত একটুখানি আলো ছিল। দেখলাম আমার খাটিয়ার পাশের টিপয়ে পোর্সিলেনের ফুলদানিতে ফুল রাখা আছে। সামনের জানালা বন্ধ ছিল। তার কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বন পাহাড় আর বিপাশার ছবি। সন্ধ্যার আবছায়ায় আমি খাটিয়ার ওপর বুক চেপে শুয়ে সেই অস্পষ্ট হয়ে আসা দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

কতক্ষণ পরে সিঁড়িতে আবার পায়ের সাড়া জাগল। এবার শব্দটা মৃদু। মনে হল চাচাজী নয় অন্য কেউ আসছে। খাটিয়ার ওপর চুপি চুপি উঠে বসতে গেলাম কিন্তু সারা ঘরে চারপায়ার একটা করুণ আর্তনাদ বেজে উঠলো।

ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে ঝিন্নি। হাতে থালার ওপর রাখা চায়ের কাপ। প্লেটে কিছু খাবার।

সে এবার টিপয়ের ওপর থালাটা বসিয়ে রেখে পাশের দেয়ালে হাত বাড়াল। চকিতে একটা সোনার ঈগল যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের ভেতর।

আলোয় দেখলাম ঝিন্নিকে। টিপিক্যাল কুলুর তরুণী। লালে সাদায় মেশা রং, ঠোঁটে গোলাপী আভা, বাদামী চুলের রাশ বিনুনী আর টাসেলে বাঁধা, ঝকঝক করছে চোখ দুটো।

ও-ই কথা বলল, চাচাজী আসছেন, আপনি হাতমুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিন। পাশে বাথরুম দেখিয়ে বলল, গরম জল রাখা আছে ওখানে।

চমকে উঠলাম। এমন নিখুঁত উচ্চারণে হিমাচল প্রদেশের একটি মেয়েকে বাংলা বলতে শুনে সত্যি থ বনে গেলাম।

ও চলে যাচ্ছিল দেখে ওকে ডাকলাম। আমার মুখের ওপর চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে রইল ও।

এমন বাংলা শিখলে কোত্থেকে ?

ঝিন্নি বলল, পিতাজীর কাছে।

সংশয় জানিয়ে বললাম, তোমার পিতাজী তো এমন সুন্দর উচ্চারণে বাংলা বলতে পারেন না।

ঝিন্নির চোখেমুখে হাসি উপছে পড়ল। সে বলল, আপনার পিতাজী আমাকে শিখিয়েছেন। ছোটবেলা থেকে শিখেছি ওঁর কাছে। ওঁকে আমি পিতাজী বলে ডাকতাম, আর আমার পিতাজীকে আপনার মত আমিও চাচাজী বলে ডাকি।

আমি আর কোন কথা তোলার আগেই ঝিন্নি পাক খেয়ে সিঁড়ির দিকে ফিরে তাকাল। ওর কানবালার ঝুরিগুলো টুলটুল করে নড়ে উঠল। বিনুনীতে বাঁধা লাল টাসেল দোল খেয়ে থেমে গেল।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন নরসিংলালজী। বললেন, বহুৎ ঠাণ্ডা পড়া হ্যায় বাবুজী। গরম গরম চা পিও।

চাচাজী কুর্শিতে বসে চায়ের কাপ হাতে তুলে নিলেন। ঝিন্নির দিকে তাকিয়ে বললেন, ঝিন্নি তোমার ভাষা আমার থেকে ভাল বলতে পারে বাবুজী। ওকে মুখার্জী সাব শিখলায়েছেন।

হেসে বললাম, একটু আগে ও কথা বলে আমাকে অবাক করে দিয়েছে।

ঝিন্নি আর দাঁড়াল না। সে ঘরের বাইরে অদৃশ্য হল। শুধু তার দ্রুত পায়ের সাড়া সিঁড়িতে তবলার বোলের মত বেজে উঠল।

নরসিংলালজী বললেন, তোমার পিতাজী ঝিন্নিকে বহুৎ প্যার করতেন। ঝিন্নির মা যত রোজ জিন্দা ছিল মুখার্জী সাবকো জিজাজী বলে ডাকত। মুখার্জী সাব বলতেন—বহিনজী। ঝিন্নির মা মারা যাবার দু বরষও পার হল নাই মুখার্জী সাব চলিয়ে গেলেন। দোসরা জনমে সাগা ভাই বহিন ছিল বাবুজী।

বোধহয় চাচাজী অদূর অতীতের দিকে চোখ ফেরালেন। হাতে ধরা রইল চায়ের কাপ।

আমি কোন কথা বললাম না। স্মৃতিভারাক্রান্ত প্রৌঢ় একসময় হাতের কাপটা টিপয়ের ওপর নামিয়ে রেখে বললেন, বাবুজী আপনা কোঠীতে আরাম করো,—বলেই নিচে ধীরে ধীরে নেমে গেলেন।

একটু পরে ঝিন্নি এসে ঘরে ঢুকল। সে আর আমার দিকে চেয়ে দেখল না। টিপয়ের ওপর থেকে কাপ প্লেটগুলো নিয়ে থালায় সাজিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ও চলে যাচ্ছিল। বললাম, আলোটা নিভিয়ে দেবে?

দেয়ালের যেখানে সুইচ আছে সেদিকে ও এগিয়ে গেল, হাত বাড়াল কিন্তু নেভাল না। কাঁধের ওপর দিয়ে এক ঝলক তাকিয়ে বলল, আলো নিভলেই আপনার ঘুম এসে যাবে তখন রাতের খাবার খেতে চাইবেন না।

বললাম, তোমার হাতের রান্না খাবার লোভে আমার ঘুম আসবে না ঝিন্নি।

আমার কথা ঝিন্নির মুখে কি ছবি ফোটাল তা দেখার আগেই টুক করে একটা শব্দ হলো আর সারা ঘরখানা অন্ধকারে ভরে গেল। সিঁড়িতে অভ্যস্ত পা ফেলে ঝিন্নি অন্ধকারেই দ্রুত লয়ে নেমে গেল।

গায়ের ওপর কম্বল টেনে নিলাম কিন্তু চোখ চেয়ে রইলাম। ঘরে অন্ধকার বাইরে অন্ধকার। হাওয়ার শব্দ একটানা কান্নার মত বেজে চলেছে। জানালার শার্সিতে চোখ পাতলাম। দূরে পাহাড়ের গায়ে গায়ে জোনাকীর মত আলোগুলো ঝিকমিক করে জ্বলছে। কনকনে ঠাণ্ডায় আলোগুলোকে অনেক উজ্জ্বল দেখায়। ওদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কখন চোখে ঘুম নেমে এল জানি না।

ভোরবেলা জেগে উঠে আমার প্রথম অনুভূতি হল, তিন-চারখানা কম্বলের তলায় আমি আরামে শুয়ে আছি। মুখ বের করে দেখলাম এক চিলতে রোদ আমার মাথার দিকের বন্ধ জানালা ফুঁড়ে ঝকঝকে তলোয়ারের মত মেঝেতে পড়ে আছে।

আমি বিছানায় উঠে বসলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে রাতের কথাগুলো কানে বেজে উঠলো। ঝিন্নির গলা, 'আলো নিভলেই আপনার ঘুম এসে যাবে, তখন রাতের খাবার খেতে চাইবেন না।'

উত্তর একটা তখন দিয়েছিলাম কিন্তু ঝিন্নির কাছে হেরে গেলাম। রাতে ওরা যে আমাকে নানা কৌশলে জাগাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে এটা আমার অনেকদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। ছোটবেলা থেকে রাতে একবার বিছানা নিলে আমাকে ঠেলে ওঠানো দায়। বড় হয়ে এই বদভ্যাস তাড়ানোর চেষ্টা করেছি কিন্তু স্বভাব নাকি মলেও যায় না এই প্রবাদের পাক্কা উদাহরণ হয়ে বসে আছি।

মনে মনে খুশি হলাম। ঝিন্নির কাছে হেরে গেছি বলে খুশি হলাম! অনেক সময় মানুষ মনে মনে হার মেনে সুখী হয়। আজ এই রোদে ভরা সকাল আমার কপালে হারের একটা তিলক পরিয়ে দিয়ে আমাকে খুশি করে তুলল। রোদ্দুরের এক বিন্দু টিপ জানালার ফুটো দিয়ে আমার কপালের ওপর এসে পড়েছে। টিপটা আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু তার উত্তাপ আমাকে ছুঁয়ে আছে।

জানালাটা খুলতেই এক ঝলক কনকনে শীতের হাওয়া প্রথমেই আমাকে কাবু করে ফেলল। বেশ খানিকটা রোদ্দুর অবশ্য ঢুকে এলো খোলা জানালা দিয়ে। আমি তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের কোলে আপেল বাগিচার একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঝিন্নি। চোখ দুটো ভোরের সূর্যের দিকে চেয়ে আধবোজা, রোদের জলে যেন ভোর বেলাকার স্নান সেরে নিচ্ছে সে।

পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলাম কোন মানুষের সাড়া নেই। চাচাজী কোথাও বেরিয়ে থাকবেন হয়ত। আমি ঝিন্নির প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে পেছন থেকেই বললাম, এখুনি চলে যাচ্ছি কিন্তু।

চমকে ও পেছন ফিরে চাইল। ঝিন্নির অবাকলাগা খোলা ঝিনুকের মত চকচকে দুখানা চোখের দিকে আমি চেয়ে রইলাম।

ঝিন্নির কথা চাচা নরসিংলালজীর মুখ থেকে কত প্রসঙ্গেই না শুনেছিলাম কিন্তু ওর মুখচোখের টুকরো টুকরো অভিব্যক্তিগুলো যে এত নিটোল সুন্দর তা জানতাম না।

ও বলল, চাচাজী বাইরে গেছেন। এসে যদি শোনেন আপনি চলে গেছেন তাহলে বড় গুস্সা করবেন।

বললাম, ঝিন্নি, না খেয়ে কতক্ষণ থাকা যায় বল?

ও আমার মুখে কৌতুকের পাঠটা পড়তে পারল না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘরের দিকে চলতে লাগল। যেতে যেতে বলল, আপনি আসুন, আমি পাঁচ মিনিটে নাস্তার জোগাড় করে ফেলছি।

বললাম, যেও না, দাঁড়াও।

ও বাগানের শেষপ্রান্ত থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, সব কথাকে এমন সিরিয়াসলি নাও কেন ঝিন্নি? তুমি কি মনে কর, এই ডিসেম্বরের শীতে একহাঁটু বরফ ভেঙে আবার আমি মানালীর বাংলোতে গিয়ে উঠব? আমাকে একবেলা খেতে দিলেও আমি অন্তত মাস দুয়েকের আগে এখান থেকে নড়ছিনে।

এবার ও হেসে ফেলল। দেখলাম, ঝিন্নির দাঁতগুলো নিখুঁত সাজান নয়। কিন্তু এমনি দু'একটা উঁচু-নীচু দাঁতে ওর হাসিটা আশ্চর্যভাবে মুখের সঙ্গে মানিয়ে গেছে।

ও সরাসরি বলল, কাল রাতে কিন্তু অনেকবার খাবার জন্যে আমি আর চাচাজী আপনাকে সেধেছি। ঘুম ভাঙাতে পারিনি। এমন ঘুমকাতুরে আপনি!

বললাম, ধাক্কাধাক্কি করেছিলে?

ঝিন্নি সারা শরীরে তরঙ্গ তুলে হাসল। হাসি থামলে বলল, এখন মনে হচ্ছে তাই করলে ঠিক হত।

আমি ওর কাছাকাছি গিয়ে বললাম, তাতেও যদি ঘুম না ভাঙত, তাহলে এক মুঠো বরফ মুখের ওপর চাপিয়ে দেখতে পারতে।

ঝিন্নি আবার তেমনি করে ঢেউ তুলে হাসল।

ঝিন্নির খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, চাচাজীর কাছে তোমার অনেক কথা শুনেছি কিন্তু তুমি যে কথায় কথায় এমন হাসি ঝরাতে পার তা জানতাম না।

আশা করেছিলাম, আমার কথার জবাব ঝিন্নি হাসিতেই দেবে। কিন্তু এবার ও হাসল না। বলল, চাচাজী আপনার গল্পও অনেক করেছেন কিন্তু আপনি যে রাগ দেখাতে পারেন তা একটিবারও বলেননি।

এবার হেসে বললাম, দু-দুটো মাস রইলে তোমাদের কাছে, অনেক বদভ্যাসের খবরই এক এক করে পাবে। তখন হয়ত ভাববে, দুটো মাস যে আর ফুরোতেই চায় না।

ঝিন্নি মাথাটা একটু নাড়ল, তারপর কোন কথা না বলে পায়ে পায়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

সকালের জলযোগ পর্ব শেষ করে বাগানের ভেতর বেড়িয়ে বেড়ালাম। অনেকটা সময় ঘুরলাম কিন্তু কাক আর কাঠবেড়ালী ছাড়া মনুষ্যেতর অন্য কোন তৃতীয় প্রাণীর দেখা পেলাম না।

স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে আমার পরলোকগত পিতৃদেবকে মনে মনে কতবার যে তারিফ করেছি, তার হিসেব নেই।

জায়গাটা বেশ শান্ত নির্জন। দোকানপাট বেশ খানিকটা দূরে। কাছেপিঠে বসতির চিহ্ন নেই। নিতান্ত দরকার ছাড়া এ তল্লাটে কারো আসারও কথা নয়। যদি কেউ প্রকৃতি বা নিজের সঙ্গে কথা বলতে চায়, তাহলে এ বাংলো বাড়ি সত্যিকার একটি আদর্শ স্থান।

এখানে আপেলের বাগান আছে, পাহাড় আছে, আর যা আছে তা আমাকে দেখাল ঝিন্নি। বাগান পেরিয়ে পাহাড় ঘুরিয়ে ও আমাকে নিয়ে এল নদীর ধারে। বলল, বিপাশা যে এত কাছে, তা আপনি ভাবতে পেরেছিলেন?

বললাম, না। আমাকে একেবারে অবাক করে দিলে!

আরও বললাম, ঘর থেকে কিছু বোঝার উপায় নেই। পাহাড় ঘুরে একবার এখানে পৌঁছলে মনে হয়, একটা নতুন জগৎ আবিষ্কার করে ফেললাম। ঘরে বসে সারাদিন নদীর দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে এ অনেক ভাল।

ঝিন্নি বলল, আমারও ঠিক ঐ একই কথা।

হেসে বললাম, মনে হচ্ছে সামনের দুটো মাস ভালোই কাটবে। অন্তত তোমার সঙ্গে গরমিলের আশঙ্কাটা কম।

ঝিন্নি হাসল। পানপাতার মত সুন্দর মুখখানা একটুখানি কাৎ করে ভুরুর দিকে চাহনি হেনে হাসল।

পরক্ষণে হাসি থামিয়ে নদীর দিকে চেয়ে বলল, এখনও বিপাশার কলকলানি ছলছলানি আছে, কদিন পরে দেখবেন ধবধবে সাদা র‍্যাপারে গা ঢেকে চুপচাপ শুয়ে আছে।

নদীটা বেশখানিক নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ওপারে পাহাড়। পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের পাহাড়ে বরফ ঝকঝক করছে। নীল জলের একটানা স্রোত। কোথাও পাথরের চাঁইতে ধাক্কা খেয়ে সাদা ফেনার তুলো ধুনছে।

বললাম, তোমার দেশের তুলনা নেই ঝিন্নি।

ও বলল, আমার দেশ বলছেন কেন? এ দেশ কি আপনারও নয়?

বললাম, তা ঠিক। এখানে নতুন যা কিছু দেখছি সবই ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে কুলু ভ্যালি ছেড়ে যেদিন চলে যাব, সেদিন সত্যি কষ্ট হবে।

ঝিন্নি আমার মুখের ওপর খানিকটা বিস্ময়মাখা দৃষ্টি ফেলে বলল, চাচাজী তবে কেন বললেন যে আপনি মানালীতেই প্র্যাকটিশ করবেন।

হেসে বললাম, আমার ভবিষ্যৎ প্রোগ্রামগুলো তাহলে তোমার জানা হয়ে গেছে দেখছি। কথাটা হয়ত ঠিক বলেছেন চাচাজী, তবু বলা তো যায় না। মন যতদিন চাইবে থাকার মেয়াদ ততদিন।

ঝিন্নি আর কিছু বলল না। অন্যমনে সে কি যেন ভাবতে লাগল। সকালের আলোটুকু ঝিন্নির গোল্ডেন অ্যাপেল রঙের মুখখানাকে বড় লোভনীয় করে তুলেছে। আমি আমার সামনের বন পাহাড় আর নদীর ছবি দেখব, না ঝিন্নিকে দেখব ভেবে পেলাম না।

ঝিন্নি বলল, আপনি কি এখন এখানে থাকবেন না কোঠীতে যাবেন?

বললাম, তুমি যাও ঝিন্নি, হয়ত চাচাজী এসে গেছেন। আমি খানিক বাদে আসছি।

ঝিন্নি বলল, চাচাজীর হুকুম নেই। কাল রাতে বলে দিয়েছেন, আপনাকে আগলে বেড়াতে।

বললাম, আমি কি ছোট একটা বাচ্চা যে আমাকে তুমি আগলে বেড়াবে?

ও আবার বলল, জানি না, হুকুম নেই একা ছেড়ে দেবার।

রাগ করে বললাম, সারাদিন যদি এখানে বসে থাকি, তাহলে তুমিও কি আমাকে পাহারা দিয়ে বসে থাকবে নাকি?

ঝিন্নি কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল।

বুঝলাম, ঝিন্নি দারুণ রকম পিতৃভক্ত। ও আমাকে নির্জনে রেখে এক পাও নড়বে না।

বাংলোর পথে পা বাড়িয়ে বললাম, চল তাহলে বাংলোতেই ফেরা যাক। এখানে নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে জানলে কে নামত মানালী থেকে কুলুতে।

ঝিন্নি কোন উত্তর করল না। অপরাধীর মত মুখ নিচু করে আমার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। আড়চোখে দেখলাম, ঝিন্নির মুখে একটা বিষাদের ভাব ছায়া ফেলেছে। চলতে চলতেই বললাম, তবে একটা লাভ, নিজের ইচ্ছেমত চলা ফেরার শক্তি হারালেও আর একজনের সঙ্গ পাওয়া যাবে।

ঝিন্নি এবারও কিছু বলল না। নিঃশব্দে আমার সঙ্গে বাংলোয় ফিরে এল।

মধ্যাহ্নভোজের খানিক আগে ফিরলেন নরসিংলালজী। মুখোমুখি হতেই বললেন, আখরা বাজারসে মাসকাবারী সওদা করে আনলাম। তোমার খানাপিনা হয়েছে তো?

বললাম, সকালে ঝিন্নি কাল রাতের খাবারটা খাইয়ে দিয়েছে, তাই এত বেলাতেও ক্ষিদে নেই।

নরসিংলালজী দরাজ গলায় হেসে বললেন, বেটী খাওয়াতে পারলেই খুশি। একটু থেমে বললেন, বাবুজী, ওর মায়ের দিলটা বিলকুল এমনি ছিল। তোমার পিতাজী এ বাংলোতে ঠিক এই টাইমে এসে থাকতেন। আর ঝিন্নির মা দু-তিন মাহিনা ওঁকে বহুৎ যত্ন করে খাওয়াতো।

প্রৌঢ় নরসিংলালজী কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে ঝিন্নির মায়ের কথা বোধহয় ভাবতে লাগলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, চাচা নরসিংলালজী আবেগপ্রবণ মানুষ। পারিপার্শ্বিক ভুলে

তিনি নিজের ভেতর ঘুরতে লাগলেন। দেখলাম, ফেলে আসা জীবনের ব্যথাটুকু তিরতির করে কাঁপছে তাঁর চোখের তারায়।

যে অতীতকে আমরা কোনদিনও ফিরে পাব না তার জন্যে মনের ভেতর গভীর এক মমতা থাকে। বাইরের হাওয়ায় যখন অতীতের জানালাটা খুলে যায়, তখন ঐ কোমল মমতার গায়ে ছোঁয়া লাগে। আর অমনি ঝিরঝির করে ঝরতে থাকে ব্যথার নদীটা।

ঝিন্নি এসে সামনে দাঁড়াল। নির্বাক দুটো মানুষের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করল, খানা রেডি, এখন চটপট তৈরি হয়ে নিতে হবে।

পরিস্থিতিকে হালকা করার জন্যেই বললাম, চাচাজী, আপনি বেশ লোকের জিম্মায় আমাকে ফেলে গেছেন যা হোক। ঘুমুলে পাহারা, হাঁটলে পাহারা, বসতে খেতে সব সময় পাহারা। ওর গার্জেনীর জ্বালায় সকাল থেকে জ্বলছি।

নরসিংলালজীর ধ্যান ভাঙল। তিনি হেসে বললেন, খুব জ্বালাচ্ছে বুঝি ? একা আমার ওপর খবরদারী করত, এখন আর একজন মানুষ পেয়েছে।

বললাম, একা একা কোথাও ঘুরে বেড়াই এটা বোধহয় ঝিন্নির পছন্দ নয়।

নরসিংলালজী বললেন, ওটা ওর দোষ নয় বাবুজী। তোমাকে একটু সামলে রাখতে আমিই বলেছিলাম।

কৌতূহলী হয়ে বলে উঠলাম, কেন চাচাজী?

সে অনেক কথা, বললেন নরসিংলালজী, এখানে বনে বনে পাহাড়ের খাঁচ খোঁচে যোগ্‌নীরা থাকে। ওরা বাবুজী কারো খারাপ ছাড়া ভাল করে না।

অবাক হয়ে বললাম, যোগ্‌নী কি, চাচাজী?

নরসিংলালজী বললেন, ওরা হল ইভল স্পিরিট। মারা যাবার পরেও এই দুনিয়ার মায়া কাটাতে পারে না। ঝোপঝাড়ের আঁধারে আঁধারে, নিরালা পাহাড়ের কোণে কোণে ঘুপটি মেরে বসে থাকে। জান পহচানে আদমীকে বাগে পেলে ছোড়বে না। আর অচেনা মানুষ দেখলে ওরা তার পিছু আলবাৎ ঘুরবে। তার জান নিকলে ছাড়বে।

নরসিংলালজী প্রবীণ মানুষ। তাঁর এতদিনের সংস্কারে আঘাত দিয়ে লাভ হবে না জেনে চুপ করে রইলাম।

ঝিন্নির মুখের দিকে চাইলাম। বাবার বিশ্বাস তার মুখে কি ছায়া ফেলেছে তাই দেখার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঝিন্নির মুখে কিছুই পড়া গেল না।

আবার বেলা পড়ে এলে ঝিন্নির সঙ্গে বেড়াতে বেরোলাম। চাচাজী সারা বছরের হিসেবের খাতা খুলে বসেছেন, তাই আমাকে সঙ্গ দিতে পারলেন না বলে দুঃখিত হলেন। কিন্তু ঝিন্নিকে সঙ্গে দিতে ভুললেন না।

বাগান পেরিয়ে ঝিন্নি বলল, কোন দিকে যাবেন?

বললাম, যেদিকে যোগ্‌নী আছে।

ও একবার থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, বিশ্বাস হয়নি বুঝি চাচাজীর কথা? আপনার কপালে সত্যি দুঃখ আছে।

বললাম, দুঃখ যদি কপালে বিধাতাপুরুষ লিখেই থাকেন তাহলে তাকে খণ্ডাবে কে বল? ঝিন্নি শক্ত করে আমার হাতখানা টেনে রাখলেও কি আর যোগ্নীর হাতের টান থেকে আটকাতে পারবে?

ঝিন্নি চলতে চলতে বলল, আপনি ভীষণ অবিশ্বাসী।

বললাম, অবিশ্বাসী বোলো না। উদ্ভট কিছুতেই আমার বিশ্বাস নেই। সবকিছু যাচাই করে তবে বিশ্বাস করতে চাই।

আমরা এখন নদীর দিকের পাহাড়টাকে ডাইনে রেখে চলেছি। ঝিন্নি একটু পরেই বাঁদিকে বেঁকে একটা অতি সংকীর্ণ পথ ধরে চলতে লাগল। পথটা ধাপে ধাপে নীচের দিকে নেমে গেছে। পাহাড়ের কোল জুড়ে ক্ষেতি। এখন কোন ফসল নেই। সব ফসলই ঘরে তোলা হয়ে গেছে। দূর থেকে ভারী সুন্দর লাগে ক্ষেতগুলো দেখতে। সমুদ্রের কয়েকটা আছড়ে পড়া ঢেউ যেন বেলাভূমিতে সীমাচিহ্ন আঁকতে আঁকতে সরে গেছে।

আমরা ক্ষেতি পেরিয়ে আসার সময় কাটা ফসলের পরিত্যক্ত অংশগুলো পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে নামতে লাগলাম। অনেকখানি নিচে নেমে কয়েকটা দেওদারের জটলার ভেতর এসে পড়লাম। এতটা পথ লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নামতে গিয়ে এই ডিসেম্বরেও আমার শরীরে তেমন কোন শীত বোধ হচ্ছিল না। হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আমাকে ছুঁয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মিঠে আওয়াজ কানে এসে বাজল।

ঝিন্নি এতক্ষণ একটি সোনার হরিণের মত শেষ বেলার রোদ্দুর গায়ে মেখে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছিল আর আমি সেই রবিঠাকুরের গানের মনোহরণ চপলচরণ হরিণটিকে অনুসরণ করে চলছিলাম। এখন ঝিন্নি থেমে গিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। গলায় আমন্ত্রণের সুর তুলে বলল, এটা একেবারে আমার নিজস্ব জায়গা। আসুন বসা যাক।

বলতে বলতে আরও খানিকটা এগিয়ে দেওদারের জটলার ভেতর ঢুকল ঝিন্নি। আমিও ওর পেছন পেছন বনের ভেতর ঢুকলাম। একটুখানি ভেতরে গিয়েই ঝর্ণাটার দেখা পেলাম। দুটো দেওদারের পাশ কাটিয়ে একটা পাথরের চাঁইকে আধখানা বেড় দিয়ে জলের ধারা নেমে গেছে। ঝিন্নি বলল, জায়গাটা সুন্দর না? বসা যাক এখানে।

বসলাম। আমার খুব ভালো লাগছিল। ঝিন্নি আমার একটু তফাতে ঐ পাথরের চাঁইটার নিচের ধাপে পা ঝুলিয়ে বসল। ও ইচ্ছে করলে পা ডুবিয়ে ঐ ঝর্ণার জল ছুঁয়ে খেলা করতে পারে।

বললাম, আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। মনে হচ্ছে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কেউ যেন পালিয়ে এসে লুকিয়ে আছে এখানে।

দেখলাম, আমার কথাটা শুনেই কেমন যেন চমক লাগলো ঝিন্নির দেহে। সে কিন্তু আমার দিকে চাইল না। মুখটা একবার তুলেই ঝর্ণার দিকে চোখ নামাল।

ঝিন্নি গাঢ় মেরুন রঙের একটা পোশাক পরেছে। কুলুর মেয়েদের পোশাক পরার বিশেষ ধরন আছে একটা। মনে হয় ওদের কাপড়ের ঘূর্ণিটা শুরু হয় বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে। তারপর কাপড়খানাকে ডান কাঁধের তলা দিয়ে টেনে নিয়ে বুক ঢেকে বাঁ কাঁধের তলা দিয়ে

পিঠ বেষ্টন করে ডান কাঁধে ফেলে দেয়। পিন দিয়ে সুন্দর করে আটকে নেয় কাপড়টা। কোমর থেকে হাঁটু অবধি জড়িয়ে নেয় পছন্দমত রঙের ব্ল্যাঙ্কেট। শীতে ওরা উলেন ট্রাউজার পরে। গরমে প্রায় মেয়েরাই ট্রাউজার পরে না। নিটোল অনাবৃত পায়ের অনেকখানি অংশই তখন নজরে আসে।

গাঢ় নীল রঙের একটা ব্ল্যাঙ্কেট ঝিন্নির কোমর জড়িয়ে আছে। বুকের ওপর পড়ে আছে হারখানা। লাপিস লাজুলি পাথর সেট করা পেণ্ডেন্টটা ওর বুকের ওপর জেগে ওঠা দুটি নিটোল স্তূপের মাঝখানের উপত্যকায় লুটিয়ে পড়ে আছে।

এই মাত্র শেষ বেলার কয়েক টুকরো রোদ ডালপালার ফাঁকে এসে পড়ল ঝর্ণা আর ঝিন্নির ওপর। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, ঝিন্নি অসাধারণ। ওর তারুণ্য বেলা শেষের রোদ মেখে ঝর্ণার জলে যেন সোনার বিন্দুর মত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মনে নেই ওকে দেখার মোহে কতগুলো মুহূর্ত আমার পার হয়ে গিয়েছিল। এক সময় ঝিন্নিই কথা বলতে শুরু করল, আমি কোঠীতে এলে রোজ বিকেলে এখানে চলে আসি। আমার খুউব ভালো লাগে এখানে একা একা বসে থাকতে।

বললাম, তোমার জমিদারীতে এমন অবাক করে দেবার মত জায়গা আরও কটি আছে ঝিন্নি?

ও আমার দিকে তাকাল। মুখে মিষ্টি হাসি। বলল, আমার জমিদারী বলছেন কেন, এ তো আপনারই জমিদারী। আমাদের দয়া করে দেখা শোনার ভার দিয়েছেন।

কথাটা সোজা আমার মনের ওপর এসে ধাক্কা দিল। কথা সত্যি হলেও অনেক সময় তার সূক্ষ্ম আঘাত দেবার একটা ক্ষমতা থাকে। ঝিন্নির কথায় সেই আঘাতটা বুকে এসে বাজল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে এক সময় বললাম, দয়ার কথা এল কেন ঝিন্নি। আমার বাবার সঙ্গে কি তোমাদের দয়ার সম্পর্ক ছিল?

ঝিন্নি সঙ্গে সঙ্গে গভীর আবেগে প্রতিবাদ করে উঠলো, না-না কখ্‌খনো না।

হেসে বললাম, তাহলে? বাবার পরে আমার ওপর তোমাদের ভরসাটা নিশ্চয়ই কমে গেছে।

ঝিন্নি বলল, রাগ করবেন জানলে কথাটা বলতাম না। এখন ক্ষমা করা আর না করা আপনার দয়া।

বললাম, ক্ষমা কেবল একটি শর্তেই করা যেতে পারে।

ঝিন্নি আমার মুখের ওপর চোখ রেখে তাকাল।

বললাম, দয়া কথাটাকে আজ থেকে ছাঁটাই করে ফেলতে হবে। অন্তত আমার সঙ্গে কথা বলার সময় ঐ শব্দটি কোন রকমেই তোমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে না, এ প্রতিশ্রুতি চাই।

ঝিন্নির মুখে চোখে হাসি উপছে পড়ল। সে চোখ নামিয়ে মাথা নেড়ে জানাল, আমার কথা সে মেনে চলবে।

বললাম, ঝিন্নি তুমি ভাল করেই জানো, মা মারা যাবার পরে আর বাবাকে কাছে পাইনি। দশ বছরের ছেলে, থেকেছি মাসির বাড়ি। তারপর আরও পনেরটা বছর কেটে গেছে কলকাতায়। শুধু মাসের প্রথমে মানিঅর্ডারের পাতায় ছিল বাবা আর ছেলের যোগাযোগ। সেদিক থেকে বরং বলব তোমরা তাঁর অনেক কাছের মানুষ। অনেক আপনার জন। তাই তাঁর এই কুলু ভ্যালির দু'দুটো সম্পত্তির ওপর তোমাদের দাবীটা আমার চেয়ে কিছু কম নয়, বরং অনেক বেশি বলেই মনে হয় আমার।

হঠাৎ কি হলো ঝিন্নির, চোখ দুটো তার ছলছলিয়ে উঠল। দুটো হাতের পাতায় সে মুখ ঢেকে ফেলল।

বললাম, কি হল ঝিন্নি, অমন করছ কেন?

ও আমার কথায় আরও ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

এই প্রথম আমি ঝিন্নির মাথায় হাত রেখে নাড়া দিয়ে বললাম, কান্নার কি হল ঝিন্নি, আমি তো তোমাকে আঘাত দিয়ে কোন কথা বলি নি।

কিছু পরে ঝিন্নি চোখের জল মুছে স্থির হয়ে বসল। তারপরেও অনেকক্ষণ তার পক্ষে কোন কথা বলা সম্ভব হল না।

আমি এক সময় বললাম, তোমাকে যদি কোন কারণে দুঃখ দিয়ে থাকি তাহলে তুমি ছোট হলেও আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

ও আমার নিচের ধাপে বসেছিল। হঠাৎ হাতখানা আমার হাঁটুর কাছে ছুঁইয়ে মাথায় ঠেকাল। বলল, ক্ষমার কথাই উঠছে না। মনের খুশি ধরে রাখতে পারলাম না তাই আঁসু হয়ে গড়িয়ে এল।

বললাম, কিসে এমন খুশি হয়ে উঠলে ঝিন্নি?

আপনার কথায় বাবুজী।

ব্যাপারটা ধরতে না পেরে ওর মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে ও বলল, আজ এখুনি আমি যে কত খুশি তা আপনাকে কেমন করে বোঝাব বলুন।

কথা থামিয়ে ঝিন্নি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে স্থির চাহনি মেলে বসে রইল। তার মুখে তখন আশ্চর্য এক সুখ খেলা করছিল। খুশির সূক্ষ্ম আলোর ঢেউগুলো যেন উপচে পড়ছিল তার চোখের তারা থেকে।

ঝিন্নি বলল, আপনার পিতাজী মারা যাবার মাস খানেক আগে বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর যাবার সময় এগিয়ে আসছে। তিনি আমার বাবাকে ডেকে বললেন, সব সম্পত্তি তোমার নামে আমি লিখে দিতে চাই। আমার ছেলে ডাক্তার হয়েছে, তার পথ সে দেখে নিতে পারবে।

চাচাজী অমনি বললেন, তা হয় না দাদাজী। ভাতিজার সঙ্গে আমি বেইমানী করতে পারবো না। দোহাই আপনার এমন অনুরোধ আপনি করবেন না।

পিতাজী অমনি রাগ করে বললেন, চিরকালটা গোঁয়ার রয়ে গেলে নরসিংলাল। শেষে হয়ত পস্তাতে হবে।

চাচাজী কথায় ছেদ টেনে দিয়ে বললেন, দাদাজী, তোমার ছেলের কথাটা ভেবে দেখ একবার। আমরা পেলাম তোমার পুরো ভালবাসা আর ও বেচারা পাবে তোমার শুকনা পাথর আর মাটি। আমি এও জানি দাদাজী, তোমার লেড়কা বাপকা বেটাই হবে। তোমার দিল ও জরুর পাবে।

একটু থেমে আবার বলল ঝিন্নি, তাই কাঁদছিলাম। আপনার ভেতর আপনার পিতাজীর দিল দেখে কাঁদছিলাম।

আমি এবার বললাম, তোমার ধারণাটা একদিন যদি ভুল হয়ে যায় ঝিন্নি? হয়ত দেখবে কুলুর দু'দুটো আপেল বাগিচার মালিক হয়ে আমি তোমাদের বেমালুম ভুলে গেছি।

ঝিন্নি আমার দিকে চেয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসতে লাগল। বলল, ঝিন্নির আন্দাজ কখনো ভুল হয় না বাবুজী।

বললাম, নিজের ধারণার ওপর এতটা ভরসা নাইবা রাখলে। পরে কোনদিন আঘাত এলে সহজে সামলাতে পারবে না।

কথা বলতে বলতে দুজনে এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম যে ঝর্ণার জল থেকে রোদের সোনালী উত্তরীয়খানা কখন গাছের ডালে পাতায় দুলতে দুলতে পাহাড়ের আড়ালে উড়ে চলে গেছে তা জানতে পারিনি। কথা বলার ভেতর দিয়ে একটা ভাল লাগা আমাদের দু'জনের মনকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। ঠিক যেন কথার টানাপোড়েনে একটা নকসী পাড় বোনা চলছিল এতক্ষণ। কথাগুলোর হয়ত বিশেষ কোন ব্যবহারিক অর্থ ছিল না, কিন্তু পারিপার্শ্বিক ভুলিয়ে দেবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল সেই টুকরো টুকরো কথার।

খেয়াল হলো হঠাৎ অন্ধকার ঘনিয়ে আসায়।

ঝিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন শোনার জন্যে কান পাতল। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

ঝিন্নি অসংকোচে আমার হাতখানা ধরলো। বনের বাইরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, ঝড় উঠেছে একদম খেয়াল হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি উঠতে হবে ওপরে।

আমি ঝিন্নির হাত ধরে ঐ সরু ভাঙা পথে ওপরে উঠতে লাগলাম। পাহাড়ে আন্দাজ করে পথ চলা বড় কঠিন। সন্ধ্যার মুখে যে অস্পষ্ট আলোটুকু পথ দেখায়, কয়েকটা মেঘের তাল আজ তা শুষে নিয়েছিল।

থেকে থেকে ঝিন্নির গলা বেজে উঠছিল। ওর নির্দেশেই আমি প্রায় অন্ধের মত পা ফেলে ফেলে চলছিলাম। কোন কোন জায়গায় ও আমাকে নিচ থেকে টেনে ওপরে তুলছিল। ওর শারীরিক সামর্থ্যের পরিচয় পেয়ে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

বাগানের খানিক নিচে থেকেই শুনতে পেলাম চাচাজীর গলা। তিনি ফিরে ফিরে ঝিন্নি আর আমার নাম ধরে ডাকছিলেন।

ঝিন্নি মুখের ওপর হাত দুটো বিশেষ ভঙ্গীতে জড়ো করে এক ধরনের শব্দ করল। অমনি চাচাজীর ডাক থেমে গেল। মনে হল আমাদের অবস্থান জানতে পেরে তিনি আশ্বস্ত হয়েছেন।

ঝিন্নি বলল, চাচাজী আমাদের খোঁজে নদীর দিকে গিয়েছিলেন।

বললাম, বুঝলে কি করে?

ও বলল, ওঁর ডাকগুলো আসছিল নদীর দিকের পাহাড়টার কোল থেকে।

তারপর আবার বলল, আমরা যে এত নিচে ঐ দেওদার বনের কাছে চলে গেছি তা চাচাজী ভাবতে পারেন নি।

বললাম, সত্যি এতটা পথ গিয়ে আমরা বোধহয় ভাল করিনি। চাচাজী আবার না রাগ করে বসেন।

ঝিন্নি বলল, এতক্ষণ তো গল্প করলেন, এখন না হয় একটু বকুনিই খেলেন। বকুনি খাবার অভ্যেস বুঝি নেই আপনার?

আমরা ততক্ষণে আপেল বাগিচা পেরিয়ে বাংলোর চাতালে এসে পড়েছি। ঝিন্নি আচমকা আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে ঘরের ভেতর দৌড়ে পালাল।

বললাম, এখনও আমি অন্ধ হয়ে আছি ঝিন্নি, কিছু ঠাওর করতে পারছি না।

ভেতর থেকে কোন আওয়াজ এলো না, হঠাৎ সারা উঠোন বিজলী আলোর তরঙ্গে ভেসে গেল।

বাংলোর ভেতর ঢুকতে ঢুকতে আশ্চর্য এক অনুভূতি হল। ঝিন্নির খুশি যেন একঝলক আলো হয়ে আমার সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে আছে।

সন্ধ্যে থেকে হেঁকে হেঁকে ঝড়ো হাওয়া বইছিল। আমরা তিনজনে একই সঙ্গে বসে রাতের খাবার খেলাম। খাওয়া শেষ হলে নরসিংলালজী কয়েক মিনিট ব্যবসা-বাণিজ্যের মামুলি দু'একটা কথা তুললেন, কিন্তু আমার দিক থেকে বিশেষ কোন সাড়া না পেয়ে বললেন, বাবুজী, নিদ যাও।

বলেই তিনি বাইরের ঘরে শুতে চলে গেলেন।

এই বাংলোবাড়ি তৈরি করার সঙ্গে সঙ্গে বাবা বাগানের অপর প্রান্তে আর একখানা আউট হাউস তৈরি করেছিলেন। দিল্লী কলকাতার মত দুর দূর সিটি থেকে যেসব ক্রেতারা ফল আর পশমিনার জন্যে আসত, তাদের থাকতে দেওয়া হত ঐ আউট হাউসে।

আমি আসার পর ওপরের ঘরখানা আমাকে ছেড়ে দিয়ে নরসিংলালজী আউট হাউসে আস্তানা পেতেছেন। আমি বাধা দিয়েছিলাম এ ব্যবস্থায় কিন্তু ফল হয় নি। আমার বাবা নাকি এই ঘরটি ব্যবহার করতেন। উত্তরাধিকার সূত্রে আমাকেও তাই করতে হবে।

রাতে নরসিংলালজী বাগান পেরিয়ে শুতে চলে গেলে আমিও ওপরে উঠে এলাম। সন্ধ্যে থেকে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। আজ লেপের তলায় নিজেকে সঁপে দিয়েও শীতের হাওয়ার কনকনে কামড় থেকে রেহাই পাচ্ছিলাম না। ছেলেবেলা থেকেই আমার শীতবোধ

একটু মাত্রা ছাড়ানো। তাই এখানকার শীত আমাকে একেবারে যেন পেড়ে ফেলল। পায়ের তলায় একস্ট্রা কম্বলখানা লেপের ওপর চড়াতে গেলাম। তার ফাঁকফোকরে শীতের হাওয়া ঢুকে আমার হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে! একপাশ হয়ে পড়ে থাকলে তবু একরকম। পাশ ফিরলেই বরফের একখানা তলোয়ার সিধে হাড় অব্দি গেঁথে যায়।

তখন রাত কত খেয়াল নেই, ঘরের ভেতর অতি ক্ষীণ একটা আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। এমনিতে ঘুমুলে আমাকে জাগিয়ে তোলা রীতিমত কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের সামিল, কিন্তু জবরদস্ত শীতের দৌরাত্মে ঘুমটা হেমন্তের হিমের মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। তাই সামান্য শব্দটুকুও কানে বাজল। চেয়ে দেখি অন্ধকার ঘরের কোণে কি যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার চলছে। দগদগে লাল ডুবুডুবু সূর্যের মত কি একটা বস্তু দপদপ করে আমার দিকে চেয়ে আছে।

হঠাৎ একটা ছায়ামূর্তি ওর পাশ থেকে উঠে দাঁড়াতেই আমি শীতের ভয় ছেড়ে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে চারপাইয়ের করুণ কান্না ছড়িয়ে পড়ল ঘরের ভেতর।

কে ?

নিজের গলার স্বর নিজের কানেই কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল। দরজার পাশে তখন সেই ছায়ামূর্তি সরে দাঁড়িয়েছে।

আমি ঝিন্নি।

বললাম, এত রাতে ! ঘুমোও নি ?

মনে হল ও খুবই সংকুচিত হয়েছে গভীর রাতে আমার ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ায়। বেশ কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, আপনার খুব শীত করতে পারে মনে হল, তাই রুম-হিটারটা জ্বালিয়ে দিতে এসেছিলাম।

ও আর কোন কথা বলল না। চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই আমি বললাম, তুমি হয়ত ভেবেছ আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কিন্তু ঘুম আসে নি আমার। কেমন যেন শীত শীত করছে। লেপে কম্বলে শীতটাকে বাগে আনা যাচ্ছে না।

ও ঘুরে দাঁড়াল। বলল, আজ হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়েছে তাই আপনার তকলিফ হতে পারে ভেবে পিতাজীর পুরনো হিটারটা জ্বালিয়ে দিলাম।

সাগ্রহে জানতে চাইলাম, আমার বাবা বুঝি আমার মত শীতকাতুরে ছিলেন ঝিন্নি ?

ও বলল, নভেম্বরের শেষ থেকেই প্রতি রাতে ওঁর ঘরে হিটার জ্বালানো চাই। আমার ওপর পিতাজী এটুকু কাজের ভার দিয়েছিলেন।

বললাম, তোমার ঘুমটা নষ্ট হলো ঝিন্নি। এত রাতে আমার কষ্টের কথা ভেবে এসেছ, ভারী খারাপ লাগছে তাই। শীতের রাতে তোমাকে অনেক কষ্ট পেতে হল।

ও বলল, আপনি এসব কথা মনে করছেন কেন ? আমার হঠাৎ মনে হল তাই ওপরে চলে এলাম। কেন জানি না বিছানায় শুয়ে পিতাজীর কথা মনে এল। ভাবলাম ওঁর স্বভাবের সঙ্গে আপনার মিল থাকা তো স্বাভাবিক। হয়তো শীতে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন।

বাবার কথা উঠলেই মনটা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। অভিমান হয় কেন তিনি আমাকে তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত করলেন। মায়ের মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে বহুদূরে সরিয়ে রাখলেন। কিন্তু যাকে এ পৃথিবীতে আনলেন তার ওপর কেন তিনি কোন আকর্ষণ বোধ করলেন না। বাবা আর ছেলের সম্পর্ক কি শুধু কর্তব্যের?

ঝিন্নি দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার ঘর। রুম-হিটারের লাল আগুনের হাল্কা একটা আভা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে প্রথম বসন্তের হাওয়ার মত একটা উপভোগ্য উত্তাপ আমার শরীরটাকে ছুঁয়ে ভারী সুখকর এক ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি করেছে।

বললাম, ঝিন্নি, বড় কষ্ট হয় বাবার কথা ভেবে। যখন বাবাকে কাছে পেয়েছিলাম তখন বাবার জন্যে তেমন কোন মনের টান ছিল না। যখন বাবাকে দেখার জন্যে মন অস্থির তখন আমার চোখের আড়ালে সরে গেলেন।

ঝিন্নি বলল, চাচাজী কিন্তু আপনাকে এখানে নিয়ে আসার জন্য পিতাজীকে বারবার বলতেন। পিতাজীর ঐ এক কথা—নরসিংলাল আমার ছেলের মুখখানাতে যদি তার মায়ের মুখের ছাপ না থাকত তাহলে হয়ত কুলুতে আসার আগেই আমি দেশে ফিরে যেতাম। ওকে দেখলে আমি অস্থির হয়ে পড়ব।

এতদিন বাবার পালিয়ে বেড়ানোর ভেতর যে রহস্য ঘনিয়ে উঠেছিল তার ওপর নতুন একটা আলো এসে পড়ল। বাবা তাহলে তাঁর ছেলেকে ভোলেন নি। মায়ের সঙ্গে অভিন্ন আকর্ষণে আমিও তাহলে জড়িয়েছিলাম তাঁর মনের মধ্যে।

ঝিন্নি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললাম, বড় খারাপ লাগছে, তুমি দাঁড়িয়ে আছ এমনি করে। রাত অনেক হয়েছে, ঘুম পেয়েছে নিশ্চয়। কোন চিন্তা নেই, ঘর কিছুটা গরম হয়ে উঠলেই সুইচটা আমি অফ করে দেব।

ও বলল, আপনি ঘুমিয়ে পড়লে আমিই অফ করে দিয়ে চলে যাব। বিছানায় না বসে থেকে শুয়ে পড়ুন তো দেখি।

হেসে বললাম, একজন আমার ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে একথা ভাবলেই আমার ঘুম আসবে না। তার চেয়ে ইচ্ছে হলে আমার বিছানায় বসে গল্প করতে পার। আমার এখন ঘুম আসবে না।

ঝিন্নি বললো, ভারী অদ্ভুত স্বভাব তো আপনার। ঘুমের ব্যাপারে যেমন ওস্তাদ, জেগে থাকার ব্যাপারেও ঠিক তেমনি।

বললাম, পরীক্ষার সময় অনেকগুলো রাত একনাগাড়ে বই নিয়ে জেগে থেকেছি, ক্লান্ত হয়ে পড়ি নি। আবার দু'এক ঘণ্টা বাদ দিয়ে দিনে-রাতে শুধু পড়ে পড়ে একটানা পাঁচ-সাতদিন ঘুমিয়েছি, এ নজীরও আছে।

ঝিন্নি আমার বিছানার কোণায় এসে বসল।

একটা কম্বল ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, এটা মুড়ি দিয়ে বস। শুধু একখানা গরম জামায় আর যা হোক ডিসেম্বরের শীত তাড়ানো যায় না।

ও কিছু না বলে কম্বলখানা গায়ে ঢেকে নিল।

বললাম, এখন অনেকটা আরাম হচ্ছে তো?

ও বলল, আমার সবেতেই অভ্যেস আছে। নাগ্গরে রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারীর কোয়ার্টারে আমি ভোর চারটেতে উঠি। একখানা আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভোর হতে দেখি।

বললাম, বরফের পাহাড় আর বিপাশার দেশে থেকে দেখছি তোমার শীতবোধটা একেবারেই চলে গেছে।

ঝিন্নি কিছু সময় চুপচাপ বসে থেকে অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল, একটু আগে আপনি আপনার ঘুমোনো আর জেগে থাকার কথা নিয়ে আলোচনা করছিলেন না? আমি কিন্তু তখন আপনার ঐ অদ্ভুত স্বভাবের সঙ্গে আপনার পিতাজীর অনেক মিল দেখতে পাচ্ছিলাম।

বাবার প্রসঙ্গে কৌতূহলী হয়ে বলে উঠলাম, যেমন?

ঝিন্নি বলল, পিতাজী তাঁর জীবনের অনেক গল্প আমাদের শুনিয়েছিলেন। তাতে তাঁর অদ্ভুত কতকগুলো স্বভাবের কথা জানতে পেরেছিলাম।

ও চুপ করে গেল দেখে বললাম, বাবার কথা আমার জানতে বড় ইচ্ছে করে ঝিন্নি।

ঝিন্নি বলল, আপনি হয়তো জানেন না পিতাজী একসময় দেশছাড়া হয়ে ঘুরতে ঘুরতে হরিদ্বার পেরিয়ে সপ্তধারায় যান। সেখানে সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরের মন্দিরে মন্দিরে আরতির ঘণ্টাধ্বনি শোনেন। দূরের নীল পাহাড়, গঙ্গার নীল জল, নীল আকাশ, পবিত্র তপোবন, সব যেন তাঁকে টানতে থাকে। সেখানে একটি মন্দিরে তিনি অনেকগুলি দিন কাটিয়ে দেন। প্রতি সন্ধ্যায় ঘণ্টা বাজানোর কাজ ছিল তাঁর। ছোট-বড় অনেকগুলো ঘণ্টা বিভিন্ন আওয়াজ তুলে বাজত! নির্জন প্রকৃতির বুকে সে সব শব্দ আশ্চর্য সুর তুলে ছড়িয়ে পড়ত। তিনি কান পেতে তাই শুনতেন।

বেশ বিভোর হয়ে ছিলেন গঙ্গাতীরের মন্দিরে। হঠাৎ একদিন খেয়াল হল, আমি স্বার্থপরের মত এখানে শান্তিতে বসে আছি আর আমার ছেলে হয়ত কষ্ট পাচ্ছে টাকার অভাবে। অমনি ব্যবসার ঝোঁক চাপল। পাহাড়ী মেয়েদের দিয়ে গরম পুলওভার বোনালেন। সেগুলো নিয়ে সমতলের সঙ্গে ব্যবসা জুড়ে দিলেন।

এমনি যখন অনেক টাকা হল তখন আপনার কাছে কিছু পাঠিয়ে দিলেন আর বাকী টাকা তীর্থের পথে পথে কয়েকটা চটি বানানোর জন্যে খরচ করে দিলেন।

বললাম, অদ্ভুত স্বভাবের মানুষ ছিলেন দেখছি।

ঝিন্নি বলল, এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এলেন কুলুতে। ভারী ভাল লেগে গেল জায়গাটা। অতি সামান্য টাকা তখন হাতে। কিন্তু সম্বল ছিল ওঁর বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি দিয়েই আবার ব্যবসা শুরু হলো। ফুলে ফেঁপে উঠল পশমিনার কারবার। তারপর ধীরে ধীরে মানালী আর কুলু দু-জায়গাতেই বাংলো তুললেন। কিনলেন দু-দুটো ফলের বাগান।

বললাম, চাচাজীর সঙ্গে আলাপ হল কখন?

কুলুতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চাচাজীর সঙ্গে আলাপ। সেই থেকে চাচাজী আপনাদের ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন!

বললাম, এখনও কিন্তু তুমি তোমার পিতাজীকে নিজের বলে ভাবতে পারনি ঝিন্নি!

ঝিন্নি গলায় বিস্ময় ঢেলে বলল, কি করে একথা বলছেন আপনি? যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন তাঁকে ডাকছি চাচাজী বলে, আর আপনার বাবাকেই ডেকেছি পিতাজী বলে, তাতেও কী বোঝা যায় না আমি ওঁকে কতটা ভালবাসতাম।

বললাম, তাহলে তুমি তোমার পিতাজীর ব্যবসাটাকে নিজের বলে ভাবতে পারছ না কেন? বারবার ওটা আমাদের সম্পত্তি বলেই বা উল্লেখ করছ কেন?

ঝিন্নি চুপচাপ বসে রইল। বলল, আপনার বাবা কোনদিন খাতার হিসেব দেখতেন না। আমার বাবা যেখানে বলতেন সেখানেই তিনি না দেখে সই করে দিতেন, কিন্তু আপনি নতুন এসেছেন।

বললাম, আমার মেজাজ মর্জি কেমন হবে তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না তাই না ঝিন্নি?

ঝিন্নি আর কিছু বলল না।

আমি বললাম, বিষয়ের টান কোনদিন আমাকে কুলুতে টেনে আনতে পারত না ঝিন্নি। বাবার সম্পর্কে কৌতূহল মেটাবার ইচ্ছাই আমাকে এখানে এনে ফেলেছে। যে রহস্যময় মানুষটি জীবিত থাকতে ছেলের দিকে তাকালেন না সে মানুষটি কি ধাতুতে গড়া তাই জানবার জন্যে তোমাদের কাছে আসা। হিসেবী মানুষ আমিও কোনদিন নই তবে কাজ ভালবাসি বাবার মত।

ঝিন্নি বলল, আমার কথায় গুস্‌সা করবেন না। ভুলত্রুটি হলে মাপ করে নেবেন।

বললাম, ঝিন্নি, কুলুতে এসে এমন বাঁধা পড়ে গেলাম, মনে হচ্ছে হঠাৎ করে দেশে ফেরা বুঝি সম্ভব হবে না।

হেসে আবার বললাম, চারদিকে এমন সব ছবি সাজিয়ে রেখেছ তোমরা যে তাই দেখতে দেখতে জীবনটা ফুরিয়ে যাবে তবু ছবি দেখা শেষ হবে না।

ঝিন্নি বলল, এ আপনার কৃপা।

হঠাৎ বলে ফেললাম, ঝিন্নি, আমার সম্বন্ধে চাচাজী কি বলেন একটু জানতে ইচ্ছে করে। মানালীতে তো কাটালাম কমাস একই সঙ্গে।

ঝিন্নি হাসল। হাসি থামলে বলল, সে শুনতে নেই।

বললাম, কেন?

ও বলল, শুনলে বহুৎ গুস্‌সা হবে আপনার।

তবু বল। শুনতে ইচ্ছে করছে।

ঝিন্নি বলল, চাচাজী বলেন আপনি বিলকুল বাচ্চা, কিছু বোঝেন না, বুঝতেও চান না।

বললাম, কি হবে ওসব বুঝে বল? এতকাল চাচাজী একাই বুঝে এসেছেন, দরকার কি আমার মাথা ঘামিয়ে। আমি বরং একটা প্রস্তাব রেখেছি চাচাজীর কাছে।

ও বলল, তাও শুনেছি।

কি শুনেছ বল?

ঝিন্নি বলল, আপনি মানালীতে একটা দাওয়াইখানা খুলে প্র্যাকটিশ চালাতে চান।

বললাম, চাচাজীর কি মত বুঝলে?

ঝিন্নি বলল, উনি আর কি বলবেন, আপনার ইচ্ছে মতই কাজ হবে। শুধু বললেন, বেটা বিলকুল দাদাজীর মত হয়েছে। বুড়ো বয়স অবধি এই ব্যবসার কাজে আমাকে খাটিয়ে ছাড়বে।

হেসে বললাম, যার কাজ তারই সাজে ঝিন্নি। ওসবে নাক গলাতে যাবার কোন মানেই হয় না।

ঝিন্নি বলল, সত্যি এখন মনে হচ্ছে আপনার আর পিতাজীর ভেতর কোন ফারাক নেই।

ঘরটা অনেকখানি গরম হয়ে উঠেছে। ঝিন্নি তার গায়ের থেকে কম্বলটা সরিয়ে রাখতেই বললাম, উঠছ বলে মনে হচ্ছে?

কতক্ষণ আর আপনার ঘুম নষ্ট করব বলুন।

তুমি ঘুমুতে চলে গেলেও আজ রাতটা আমার জেগে জেগেই কাটবে ঝিন্নি।

ও বলল, তা কেন হবে, এখনও অনেক রাত বাকি। একটু চেষ্টা করলেই ঘুম এসে যাবে। আপনি শুয়ে পড়ুন তো দেখি, আমি মাথাটা ম্যাসাজ করে দিচ্ছি। আপনার নিদ আলবৎ এসে যাবে।

হেসে বললাম, তাহলে তো এখুনি শুয়ে পড়তে হয় ঝিন্নি। কিন্তু মাথা ম্যাসাজের ব্যাপারটা শিখলে কোত্থেকে?

পিতাজী শিখিয়ে দিয়েছেন, বলল ঝিন্নি।

আমি আর কোন কথা না বলে লেপখানা গায়ে টেনে নিয়ে বললাম, দেখি তোমার হাতের ম্যাজিক। ওতেই হয়ত ঘুমটা এসে যাবে, আর তাহলে তুমিও রাত জাগার হাত থেকে রেহাই পাবে।

ঝিন্নি আমার চুলের ভেতর হাত চালিয়ে বিলি কাটতে লাগল। আমি শুয়ে শুয়ে কোন একটা সুখের স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

মনে হলো কলকাতার এক আবর্জনা ভরা গলি থেকে অ্যারেবিয়ান নাইটস-এর কোন এক জিন আমাকে তুলে এনে কুলুর এই নির্জন সীমাহীন সৌন্দর্যের জগতে শুইয়ে রেখে দিয়ে গেছে। আমি এইমাত্র এক হুরীকে আমার মাথার পাশে বসে পালকের মত নরম আঙুলে আমার চুলগুলো নিয়ে খেলা করতে দেখছি।

আমি এবার চোখ বন্ধ করলাম। জানি, চেয়ে থাকলেই ঝিন্নির হাত চলবে আর ও জেগে থাকবে সমানে। ওকে বেশি সময় কষ্ট দিতে সংকোচ হচ্ছিল, কিন্তু ও চলে যাক এটা মন কোন রকমে মেনে নিতে চাইছিল না। অনেক সময় ও আমার চুলে বিলি কাটল। আমি নিশ্চুপ হয়ে পড়ে আছি দেখে ও একবার আমার মাথা থেকে হাত তুলে নিল। তারপর আবার কিছুক্ষণ খুব ধীরে ধীরে হাত চালাতে লাগল চুলের ভেতর। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা ভাবছে ঝিন্নি। কারণ ওর হাতটা একবার থামছে আবার চলছে। ভাবনার ভেতরে থেকে যেমন কাজটা হতে থাকে এলোমেলো।

এবার ও হাতের কাজ থামিয়ে মনে হলো আমার চোখের ওপর সিধে ওর মুখখানা নামিয়ে এনেছে। উষ্ণ একটা নিঃশ্বাসের ছোঁয়া পেলাম আমি। সে নিঃশ্বাস ঢেউয়ের মত আমার সারা শরীরের ওপর ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

একসময় ও অতি সন্তর্পণে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর চারপায়ার শব্দ বেজে উঠল না। আমি চোখ চেয়ে দেখলাম ঝিন্নি মাথার কাছের জানালাটা টেনেটুনে ভাল করে বন্ধ করে দিল। সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে হিটারের সুইচটা অফ করল।

এখন ঝিন্নি ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে লাগল। যতক্ষণ হিটারটা সামান্য এক আধটু আলো ছড়াল, ততক্ষণ ওর শরীরটার উপস্থিতি অস্পষ্টভাবে অনুভব করলাম। হিটারটা একেবারে নিভে গেলে ঝিন্নিও অন্ধকারে মিশে গেল।

আমি এখন ওর পায়ের মৃদু সাড়া পাচ্ছিলাম। ও আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। অনুভবে বুঝলাম, লেপের ওপর ধীরে ধীরে কম্বলখানা টেনে দিল। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। অতি সন্তর্পণে ওর হাতের একটা মৃদু ছোঁয়া লাগল মাথায়। তারপর হাতখানা তুলে নিল ও। শেষ স্পর্শ রেখে ও চলে যেতে চায়। হয়ত বা আমার ঘুমের নিবিড়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে যেতে চায়।

ও ফিরে দাঁড়াতেই অন্ধকারে অনুমানে ওর হাতখানা ধরে ফেললাম।

চমকে ও ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু জোর করে হাতখানা ছাড়িয়ে নিল না। আমার বিছানার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে অস্পষ্ট গলায় বলল, আপনি ঘুমোন নি!

বললাম, কষ্টই যখন পেলে তখন পুরোপুরি কষ্টটা ভোগ করে যাও। এসো আজ রাতটা গল্প করেই কাটিয়ে দিই। কপালে আজ আর ঘুম নেই।

ঝিন্নি বলল, আপনি ভীষণ দুষ্টু তো, কেমন ঘুমের ভান করে এতক্ষণ পড়েছিলেন।

ওর হাতটা আমার হাতে ধরা রইল।

বললাম, তুমি তো আমার বন্ধ চোখের ওপর চেয়ে চেয়ে অনেক পরীক্ষা করলে, কই ধরতে পারলে কিছু?

ও বলল, ছল করে পড়ে থাকলে কি ধরা যায়।

আমি বিছানার ওপর উঠে বসলাম। আমার গায়ের থেকে কম্বল আর লেপ খসে পড়ে যেতেই ঝিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে ওগুলো আমার ওপর চাপিয়ে দিতে গিয়ে বলল, এমন করে খোলা গায়ে থাকলে আর দেখতে হবে না। তখন আপনার আর কি, শাস্তি পাবে অন্যে।

কথাগুলো শেষ করে ও সুইচ বোর্ডের কাছে চলে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে বাধা দিয়ে বললাম, দোহাই তোমার ঝিন্নি, আলোটা আর জ্বেলো না।

ততক্ষণে ও টুক করে সুইচটা অন করে দিয়েছে। আমিও আলোর ঝলক থেকে চোখ বাঁচাব বলে দুটো হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছি।

কিন্তু আলো কই! অন্ধকার তেমনি নিশ্ছিদ্র। চোখ চেয়ে দেখি হিটারটা ঘরের কোণে ধীরে ধীরে আবার রাঙা হয়ে উঠছে। আর তারই আভায় ঘন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসছে ঝিন্নি।

বললাম, গায়ের ঢাকাগুলো খুলে ফেলতে বড় ইচ্ছে করছে ঝিন্নি।

ও চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, কেন এমন করছেন?

বললাম, তোমাকে শাস্তি দেব বলে। আমি অসুখে পড়লে তোমারই তো শাস্তি।

ও হেসে বলল, কখন কি বলেছি, তাই অমনি মনে করে রেখে দিয়েছেন।

বললাম, আমার মেমারি খুব সার্প ঝিন্নি। সহজে কোন কিছু ভুলি না।

অন্ধকার, হিটারের হালকা রাঙা আভায় তরল হয়েছে, কিন্তু মুছে যায় নি।

ঝিন্নি ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল, সে আর এগিয়ে এল না। রাতে তাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না ঝিন্নিকে আর ওতেই ও কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে!

ঝিন্নি বলল, কাল ভোরবেলা আর নাস্তা খেতে পাবেন না। রাত শেষে বিছানায় গেলে বেলা হবে বিছানা ছাড়তে।

বললাম, নাস্তা রোজ সকালেই তোমার হাতে খেতে পাবো, কিন্তু রোজ রাতে তো আর গল্পের জন্যে ঝিন্নিকে পাব না।

ঝিন্নি এ কথার কোন জবাব না দিয়ে একটা কুর্শি আমার চারপায়ার কাছে তুলে এনে বসল।

বললাম, কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে বস। তুমি আবার শাস্তি দিতে চাও নাকি কাউকে ?

ঝিন্নি মাথা দোলাতে দোলাতে সেতারের মিষ্টি বাজনার মত হাসি ছড়িয়ে বলল, আপনাকে ডাক্তারী করার একটা সুযোগ দিতে চাই। ডাক্তারের হাতযশের পরীক্ষাটা আমার ওপর দিয়েই হয়ে যাক।

বললাম, আমি তেমন ডাক্তার নই। রোগ হতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখলেই ট্রিটমেন্ট শুরু করে দি। তাই রোগে পড়ার সুযোগই কেউ পায় না।

ঝিন্নি আবার হেসে উঠল।

বললাম, চাচাজী যদি তোমার হাসি শুনতে পান তাহলে এক্ষুনি কিন্তু এখানে এসে হাজির হবেন।

ঝিন্নি বলল, সারাদিন কাজের ভেতর ঘুরে বেড়ান তাই বিছানা নিলে আর ওঁর জ্ঞান থাকে না।

অন্য প্রসঙ্গে এলাম।

আচ্ছা ঝিন্নি, নাগ্‌গরে একা একা থাকতে বোর ফিল কর না?

নাগ্‌গরের কথায় ঝিন্নি বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠল। বলল, একটুও না। আমি ছবি খুব ভালবাসি। তাই আর্ট গ্যালারীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছবি দেখে কাটাতে আমার একটুও খারাপ লাগে না।

একটুখানি থেমে ঝিন্নি আবার বলল, ছবির গ্যালারী থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেও চারদিকে ছবি দেখতে পাই। যে ছবি এক সময় শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিখ দেখতেন।

হঠাৎ মনে এল, তাই বললাম, তুমি ছবি আঁকতে পার ঝিন্নি?

ও বলল, সিমলাতে থেকে পড়াশোনা আর ছবি আঁকার কাজই তো করেছি।

একটু অবাকই হলাম। বললাম, এত দূরে থেকে এই সব করতে তুমি?

ঝিন্নি বলল, পিতাজী চেয়েছিলেন তাই ওখানে যেতে হয়েছিল। তিনি নিজে গিয়ে রেখে এসেছিলেন। পিতাজী যা ভাল মনে করতেন তাই করতেন, ঘরের আর সবাই তাঁর ইচ্ছাকে মেনে নিত। তাঁর ওপর কারো কোন কথা চলত না।

বললাম, নাগ্‌গরের আর্ট গ্যালারীর কেয়ারটেকারের চাকরিটা কি পিতাজীই করে দিয়েছিলেন?

ঝিন্নি বলল, না। এক সময় দিল্লীর একটা আর্ট কম্পিটিশানে ছবি পাঠিয়ে প্রাইজ পাই। তাতেই সরকারী কর্তৃপক্ষের কারো নজরে পড়ে যাই। আমি কুলুতে থাকি জানতে পেরে ওঁরা রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারীর ঐ চাকরিটা অফার করে পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে পিতাজীর সম্মতি মিলল আর আমি রাজি হয়ে গেলাম।

মনের মত চাকরি কিন্তু।

ও বলল, এমন করে বলবেন না, চাকরিটা না জানি হাতছাড়া হয়ে যায় কখন।

কি কাজ করতে হয় ওখানে?

ঝিন্নি বলল, ভিজিটার এলে ছবির বিষয়গুলো বুঝিয়ে দেওয়াই আমার কাজ। তাছাড়া নিকোলাস রোয়েরিখের লাইফ সম্বন্ধেও অনেকে জানতে চান।

বললাম, নাগ্‌গরে যাওয়াই হয়নি, একদিন গিয়ে দেখে আসতে হবে তোমার রাজ্যটা।

ঝিন্নি উৎসাহে তুবড়ীর মত ফুটে উঠল।

সত্যি যাবেন আপনি! কি ভাল যে লাগবে। আমি সব কিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাব।

উত্তেজনায় ঝিন্নি কুর্শি ছেড়ে আমার বিছনার একটা কোণ আবার দখল করে বসল। বসেই বলল, এত ভাল লাগবে না, আপনি ওখান থেকে আর নড়তেই চাইবেন না।

বললাম, সে তো বুঝলাম, কিন্তু ওখান থেকে যদি না নড়ি তাহলে থাকা খাবার ব্যবস্থাটা কি কেয়ারটেকারের কোয়ার্টারেই হবে নাকি?

ঝিন্নি বলল, কি আছে, চাচাজী আমার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তো ওখানেই ওঠেন।

বললাম, জানা রইল, সময়মত কাজে লাগানো যাবে।

ঝিন্নি হঠাৎ অবিশ্বাসের সুরে বলল, আপনি আর গেছেন।

বললাম, এই তো সবে এলাম তোমার দেশে। বলতে পার দেখার সবকিছুই বাকি। এক এক করে তারিয়ে তারিয়ে সব দেখব।

ঝিন্নি বলল, মানালীতে ডিসপেনসারী স্টার্ট করলে কি আর ঘুরে বেড়াতে পারবেন, না—ঘুরে বেড়ানোর মন থাকবে।

বললাম, খুব থাকবে। কাজের ভেতর থেকে পালিয়ে বেড়ানোতেই তো আনন্দ। দেখো, ঠিক একদিন না জানিয়ে নাগ্‌গরে গিয়ে তোমাকে চমকে দেব।

ঝিন্নি মনে হল অন্যমনস্ক হয়েছে। কোন কথা আর বলল না। মুখখানাও ধীরে ধীরে একপাশে ফিরিয়ে নিয়ে চুপচাপ বসে রইল। দেখলাম, ঝিন্নি পরিবেশ ভুলে মুহূর্তে নিজের ভাবনার ভেতর ডুব দিতে পারে।

হঠাৎ একসময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আজ লক্ষ্মীছেলের মত শেষরাতটা ঘুমোবারচেষ্টা করুন, ক'দিনের ভেতরেই আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেব।

বললাম, ঘুম না আসারই কথা, তবে দেখি তোমার সারপ্রাইজের লোভে যদি এসে যায়।

শুযে পড়লাম। ওকে আর বসিয়ে রেখে কষ্ট দিতে চাইলাম না। মনে মনে অনেক কিছুই চাওয়া যায় কিন্তু চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি সবকিছুই পাওয়া যায়? আর যতক্ষণ না পাওয়া যায় ততক্ষণই তো পাওয়ার জন্যে রাজ্যের মাথা খোঁড়াখুঁড়ি।

ঝিন্নি সুইচটা এবার অফ করে দিয়ে বলল, ঘুমোন।

বলেই ও সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। এমন সন্তর্পণে নামল যে পায়ের সাড়া প্রায় পাওয়াই গেল না।

এলোমেলো কত কি কথা আর ছবি মনে নাড়াচাড়া করতে করতে কখন ঘুম এসে গেল জানতে পারলাম না।

ঘুম ভাঙল ঝিন্নির হাতের ঠেলায়। ও আমাকে নাড়া দিয়ে তুলল। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, রোদ্দুরে পথ পাহাড় বাগান সব ভেসে গেল আর আপনি পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছেন! উঠুন। এদিকে চাচাজী দু'দুবার আপনার খোঁজ করেছেন! আপনার জন্যে তাঁরও নাস্তা খাওয়া হয়নি।

বললাম, খুব অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি একটু আগেও তো ডেকে দিতে পারতে আমাকে।

ও বলল, ডাকতে চেয়েছিলাম, কিন্তু চাচাজী বারণ করলেন। এখন উনি বাগানের ওপারে গেছেন তাই চুপি চুপি আপনাকে জাগিয়ে দিতে এলাম।

আমি ঝিন্নির হাতখানা খপ্ করে ধরে ফেলে বললাম, চোর ধরে ফেলেছি, আর ছাড়ছিনে। চাচাজী এসে দেখুন তাঁর বারণ না শুনে তুমি আমার ঘরে কেমন করে চুরি করে ঢুকেছ।

ঝিন্নি অনুনয় করে বলল, দোহাই আপনার ছোটে সাহেব, ছেড়ে দিন দয়া করে। চাচাজী এখুনি এসে পড়বেন।

ছাড়তে পারি একটি শর্তে।

ঝিন্নি করুণ চোখ করে তাকাল।

বললাম, শর্তটা মেনে নেবে কথা দাও।

ঝিন্নি মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

বললাম, আমি যখন মানালীতে থাকব তখন মাঝে মাঝে তুমি ওখানে যাবে।

ও বলল, চাচাজী আপনার ওখানে থাকলে বিনি কারণে কেমন করে যাই বলুন। তাছাড়া আমার চাকরি আছে। শীতের এই দুটো মাস ছুটি। এখন বরফ পড়বে নাগ্গরে। তারপর ছুটি ফুরোলে চব্বিশ ঘণ্টা কাজের জায়গাতে থাকতে হবে।

হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম, তাহলে আর হল না। ফিরিয়ে নিচ্ছি আমার শর্ত।

ও হঠাৎ করে আমার ছেড়ে দেওয়া হাতখানা ধরে ফেলে বলল, যেতে খুব ইচ্ছে করবে আমার। আচ্ছা কথা দিচ্ছি খু-উ-ব চেষ্টা করব আমি। কিন্তু আপনি তো বোঝেন, একবার কথা না দিয়ে রাখতে পারলে আপনার চেয়ে আমারই কষ্ট হবে বেশি।

বললাম, তোমার কাছে আমার আর কোন শর্ত নেই ঝিন্নি। আমার ডাকের অপেক্ষা না করেই জানি তুমি মানালীতে কোনদিন এসে পৌঁছবে।

এবার ও অতি দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, আবার যেন ঘুমিয়ে পড়বেন না। খুব তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নিচে নেমে আসুন।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে প্রায় রোজই মেঘ জমছে উত্তরের পাহাড়ে। মেঘ সরে গেলে দেখা যাচ্ছে, বরফ ঘন হয়ে ঢেকে ফেলছে পাহাড়ের চূড়োগুলো। দিনে দিনে পাহাড়ের অনেকখানি নিচ অবধি বরফ তার এক্তিয়ার বাড়িয়ে চলেছে। এখন ভোরে বিছানা থেকে উঠে জানালা খুললেই চোখ চলে যায় সোজা বরফের সীমানায়।

এপারের পাহাড়গুলো এখনও তাদের বাদামী আর পাংশুটে গা-গুলো খুলে নাঙ্গা সন্ন্যেসীর মত বসে আছে। তাদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা পাইন গাছ। ঝিন্নি বলে, জানুয়ারির মাঝামাঝি ওদের খোলা গাগুলোও সাদা আলোয়ানে ঢাকা পড়ে যাবে।

এখন একটি ছবি আমাকে অবাক করে দেয়। এই প্রায় ন্যাড়া পাহাড়গুলোর ফাঁক দিয়ে বহুদূরে আর একটা পাহাড় দেখা যায়। দূর বলে কুয়াশার একটা আবছায়াতে সে সব সময় ঢাকা থাকে। দু'তিন সারি কুচকাওয়াজরত সৈন্যের মত কতকগুলো গাছ দাঁড়িয়ে। কেউ যেন হল্ট বলে ওদের কুইক মার্চটাকে রুখে দিয়েছে।

সেদিন বৃষ্টি এল। বেশ ঝমঝমিয়েই নামল। ওপারের ঐ পাহাড় আর পাইনগাছগুলো সূর্যাস্তের সোনার ছোঁয়ায় ক্যানভাসে আঁকা ছবি হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ কে যেন জল ছিটিয়ে মুছে দিল সব রঙ। জাঁকিয়ে নামল ডিসেম্বরের বর্ষা। সন্ধ্যা থেকে সেই যে বর্ষার শুরু হল সপাসপ আওয়াজ, চলল গভীর রাত অব্দি।

খেতে বসে চাচাজী বলল, ডিসেম্বরের এ বর্ষায় গমের চারা বহুৎ জোর পাবে।

বললাম, ক্ষতি হবে না এই অকাল বৃষ্টিতে ?

চাচাজী বললেন, ক'দিন একটানা বরসাত চলতে থাকলে ক্ষতি হবে ঠিক তবে জলের ব্যবস্থা তো নেই, তাই আশমানকী বরসাতকা হি ভরসা।

মাঝে মাঝে চাচাজী তাঁর শেখা বাংলা শব্দের সঙ্গে কিছু হিন্দির মিশ্রণ ঘটিয়ে দেন। শুনতে ভালই লাগে। এদিকে ঝিন্নির আলাপের ধরনই আলাদা। বাংলা শব্দ নির্বাচন থেকে উচ্চারণ পর্যন্ত এমন নিখুঁত যে তার কুলুর ঐ পোশাকখানা বদলে শাড়ি পরিয়ে দিলে অবাঙালী ভাববার কোন উপায় নেই।

রাতের বৃষ্টিতে আমি চাচাজীকে বাগান পেরিয়ে আউটহাউসে শুতে যেতে বারণ করলাম। চাচাজী বললেন, নিদ আসবে না বাবুজী। অভ্যেস বিলকুল খারাপ হো গিয়া।

হাসতে হাসতে চাচাজী চলে গেলেন।

ঝিন্নিকে বললাম, আজ রাতে বিছানায় শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে খুব ভাল লাগবে।

ঝিন্নি বলল, জেগে থাকলে কত রকম কথা মনে আসে, তাই না?

হেসে বললাম, তাই বুঝি ?

ঝিন্নির মুখে একটা লাজুক লতার ছায়া পড়ল।

মুহূর্তে সে-ভাব কাটিয়ে মুখখানা তুলে বলল, আপনার মনে আসে না বুঝি? সত্যি করে বলুন তো?

বললাম, তোমার দিকে চেয়ে অন্তত মিথ্যেটা বলি কি করে বল। সব মানুষ জেগে থাকলেই স্বপ্ন দেখে। আর সে স্বপ্নটাই আসল স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যে দেখা স্বপ্নগুলো সব ভুয়ো।

ঝিন্নি বলল, যান এখন চারপাইয়ের ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রাত জাগুন গে।

মনে মনে বললাম, চলই না আমার সঙ্গে। ওপরে বসে রাতভোর বৃষ্টির বাজনা শুনি দু'জনে।

কোথায় যেন বাধল, কথাটা বলা গেল না। কেউ যদি আপনি আসে তাহলে তো সেটা আবির্ভাব, টেনে নিয়ে আসা মানেই তো আসামীকে হাজির করার সামিল।

একটু হেসে বিদায় নিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছি, পেছন থেকে ঝিন্নির ডাক এল, আপনি উঠে যান, আমি আসছি। কথা আছে।

কিছু না বলে উঠে এলাম ওপরে। শীতের আগুনের মত একটা মিঠে তাপ আমার দেহে মনে ছড়িয়ে পড়ল।

আমি ওকে নিজের থেকে কিছু বলতে দিতে চাই। আমি শুধু শুনব। ওর সব কথা যেন এক মুহূর্তে ফুরিয়ে না যায়। অনেক সময় ধরে অনেক কথা যেন ও আমাকে বলে যায়। এমনি একটা ইচ্ছা আমার ভেতর থেকে উঠে হেমন্তের হিমের মত চারদিকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঝিন্নি কাজের লোকটির সঙ্গে কি যেন কথা বলছিল। আমি বিছানার ওপর বসে আওয়াজটুকু পাচ্ছিলাম, কিন্তু অর্থবোধ হচ্ছিল না। কুলুহী ভাষায় ওরা টুকরো টুকরো কথা বলছিল।

একসময় আমার মনে হল, প্রয়োজনের ভাষাগুলো মানুষের কত দীর্ঘ। সারাদিন ঐ ভাষাগুলো সংসারের আসর জাঁকিয়ে বসে থাকে। অভিধান থেকে ওদের একটু ছাঁটাই করে দিলে ক্ষতি কি। অকাজের ভাষাগুলো না হয় কিছু দীর্ঘই হল।

ঝিন্নি এল। সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল ও। যেন বিপাশায় জলতরঙ্গ বাজিয়ে সাঁতরে আসছে।

ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতেই বলল, বাব্বাঃ কি মানুষ, দরজাটা ভেজিয়ে দিতেও ভুলে গেছেন।

দরজা ভেজিয়ে ও আস্তে অস্তে পা ফেলে এসে বসল আমার বিছানায়। পা তুলল না কিন্তু। ওর পায়ে চোখ ফেলতেই ও চারপাইয়ের তলায় পা দুটো ঢেকে রাখার চেষ্টা করল।

বললাম, মূল্যবান কিছু একটা লুকোচ্ছো বলে মনে হচ্ছে।

ঝিন্নি পায়ের ওপর পোশাক ঝেঁপে বলল, ও কিছু না।

বললাম, রূপোর ঝলকানি চোখে পড়ল যে।

ঝিন্নি বলল, ওঃ সবতাতেই চোখ। ছেলেদের সবকিছুতে অমন চোখ দিতে নেই।

বলতে বলতে কিন্তু পা দুটো জড়ো করে সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এই দেখুন, সোনাদানা নয় সামান্য রূপোর ঝাঞ্জর।

বললাম, আওয়াজ এসেছিল কানে। তবে ঘরে ঢুকেই দরজা হাট হয়ে আছে বলে অভিযোগ তুললে তাই মিষ্টি শব্দটার কথা ভুলেই গেলাম।

ও তেমনি বসে আছে দেখে আবার বললাম, কই তোমার পায়ে আগে তো দেখিনি।

ঝিন্নি বলল, ছিল, তবে সামান্য টুটে গিয়েছিল তাই সারাতে দিয়েছিলাম। আজ আখরা বাজার থেকে চাচাজী নিয়ে এসেছে। আপনি এই প্রথম দেখলেন।

খুব সুন্দর মানিয়েছে ঘুঙুর জোড়াটি ওর পায়ে।

বললাম, দারুণ দেখতে হয়েছে কিন্তু।

আমার উৎসাহে ও পা দুটো আবার ঢেকে ফেলল। বলল, ধ্যেৎ, ভাল দেখাচ্ছে না ছাই।

বললাম, ভাল লাগা তো সকলের সমান নয় ঝিন্নি। কারো হীরে পছন্দ কারো বা সোনাদানা, আমি কিন্তু রূপোর সমজদার।

সত্যি?

শুধু একটা সত্যি নয়, তিন সত্যি।

ও হাসল।

আমি বললাম, ঐ যে কদিন আগে তুমি একটা সারপ্রাইজ দেবে বলেছিলে, নিশ্চয়ই সেটা তোমার আজকের এই ঝাঞ্জর।

ঝিন্নি বলল, কি সব যে ভুলভাল আঁচ করে বসে থাকেন তার ঠিক নেই, আমি আপনাকে ঝাঞ্জর দেখাতে এলাম নাকি!

বললাম, তাহলে বল তোমার কথা। ঝাঞ্জরের আওয়াজটা আমার উপরি লাভ।

ঝিন্নি আলোর দিকে একবার তাকাল। চারপাই থেকে উঠে চলে গেল সুইচ বোর্ডের দিকে। টুক করে রুম-হিটারের সুইচটা অন করল। ঠিক পর-মুহূর্তে আলোর সুইচে হাত দিয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, অফ্ করে দিলে অসুবিধে হবে?

হেসে মাথা নাড়তেই ও আলোটা নিভিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে ঝিন্নি ছায়া হয়ে গেল।

ঘরের কোণে হিটারটা প্রথম সূর্যের মত লাল হয়ে উঠছে। তাপ আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়। একটা ঘুঙুরের আওয়াজ এগিয়ে চলেছে জানালার দিকে। ভারি মিষ্টি লাগছে কানে। আবার ফিরতে লাগল সে শব্দ। মনে হচ্ছে, ক্ষুধিত পাষাণ গল্পের সেই তরুণী ইরাণীর মত রহস্যময়ী ঝিন্নি ঘুঙুরের আওয়াজ তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরময়।

ও কাছে এসে আমার বিছানায় বসল। বসেই বলল, আর ক'দিন বাদেই কোলি-রি-দেওয়ালি। সারা কুলু জুড়ে উৎসব চলবে। নাগ্‌গরে মেলা বসবে। যাবেন সেখানে?

বললাম, দেওয়ালি তো পার হয়ে গেছে, এখন ডিসেম্বর শেষ হতে চলল, আবার দেওয়ালি কি?

ঝিন্নি বলল, এটা কুলুর একটা বিশেষ উৎসব। ডিসেম্বর মাসেই হয়। সে যা হোক, এখন যা বলি চুপচাপ বসে শুনে যান তো।

মেয়েরা চিরদিনই শাসনের অধিকার নিয়ে জন্মায। বললাম, বলো।

ঝিন্নি বলল, নাগ্‌গরে এ সময় খুব ঠাণ্ডা পড়ে। চাচাজীর পারমিশান ছাড়া যাওয়া যাবে না আর সে পারমিশান আদায় করার ভার আপনার।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, ও হুড়োহুড়ি করে ভুলিয়ে দিয়ে বলল, কিন্তু খবরদার, আমার নামটি ভুলেও যেন উচ্চারণ করবেন না।

বললাম, উনি যদি জানতে চান, আমি দেওয়ালি ফেস্টিভ্যালের কথা কি করে জানলাম?

ঝিন্নি কপালে চাপড় মেরে বলল, তামাম কুলু মাতবে কোলি-রি-দেওয়ালিতে, দীপ জ্বলবে, বাজী পুড়বে, আকাশ জুড়ে রোশনাই, আর আপনি সে খবর আগে থেকে জানবেন না!

বললাম, তা না হয় হল, কিন্তু চাচাজী যদি বলেন, চল আমি তোমাকে দেখিয়ে আনি, তখন কি হবে?

ঝিন্নির গলায় বিচিত্র সুর বাজল, যাবেন।

এত শীতে আবার নাগ্গরে যাওয়া!

ঝিন্নি বলল, চাচাজী কাজ ফেলে যাবেন না নাগ্গরে। এক আধ দিনের ব্যাপার তো নয়, তিন-চারদিনের হৈ-হুল্লোড়। ও সবের ভেতর নেই চাচাজী! আপনি বলেই দেখুন না। আর এত শীতকাতুরে কেন আপনি?

বললাম, তুমি যাবে কি করে?

দেখা যাবে, আগে তো পারমিশানটা মিলুক।

বললাম, তখন আমাকে আবার বরফের রাজ্যে একা ঠেলে দেবে না তো?

ঝিন্নি আবার হাসিতে সেতার বাজাল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলল, তাই না হয় দিলাম। আচ্ছা, আমাকে দেখে কি তাই মনে হয়?

বললাম, যাক্ গে, যথাসময়ে দেখা যাবে। এখন চাচাজীর পারমিশানটা পেলে হয়।

ঝিন্নি বলল, পারমিশান হলে উনি আপনাকে একা পাঠাবেন না, আমাকে নিশ্চয়ই সঙ্গে যেতে বলবেন।

কি করে এতখানি নিশ্চিত হতে পারছ?

ঝিন্নি প্রায় ঝাঁঝিয়ে উঠল, চুপ করুন তো, চাচাজীকে আমার চেয়ে আপনি ভাল চেনেন নাকি!

একটু থেমে গলা নরম করে আবার বলল, আমার ওপর একটুও কি ভরসা রাখতে পারেন না।

বললাম, ঠিক আছে, তোমার প্ল্যানমাফিক কাজ হবে।

ঝিন্নিকে যত দেখছি ততই মনে হচ্ছে, কি দ্রুত ওর মনের আনাচে-কানাচে ভাব-ভাবনাগুলো চড়ুইয়ের মত হুটোপুটি খেলা করে বেড়ায়।

সে রাতে ঝিন্নি কিন্তু আমার অনুচ্চারিত ইচ্ছেগুলোর কোন দামই দিল না। বাইরে কনকনে ঠাণ্ডায় বৃষ্টি ঝরার শব্দ, ভিতরে রুমহিটারের ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা উত্তাপ, একটি পুরুষের সান্নিধ্য, সব কিছু আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করে ঝিন্নি চলে গেল। যাবার সময় শুধু বলল, আমি হিটারটা নিভিয়ে দিয়ে যাই?

বললাম, তোমার খুশি।

ও হিটারের সুইচ অফ করে আমার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। বাইরের জমাট অন্ধকার লাফিয়ে পড়ল হিটারের নিভে আসা লাল আলোটুকু শুষে নিতে।

ঝিন্নির ছায়া আস্তে আস্তে অন্ধকারে মুছে যাচ্ছে। আমি একটা দরজা ভেজিয়ে দেবার আওয়াজ পাচ্ছি; অস্পষ্ট পায়ের সাড়া নিচে নেমে মিলিয়ে যাচ্ছে। এখন বেজে উঠছে বাইরের ঝড়ো হাওয়া আর বৃষ্টির একটা সম্মেলক শব্দ। কেউ যেন অশান্ত আবেগে কাউকে বুকে চেপে ধরে অর্থহীন শব্দের প্রলাপে চারদিক ভরে তুলছে।

আমার হঠাৎ পাওয়া আশ্চর্য ক'টি মুহূর্ত আমার উন্মুখ যৌবনের ভাবনাকে ছুঁয়ে দিয়ে প্রজাপতির মত উড়ে চলে গেল।

ঝিন্নির অনুমান যে নির্ভুল তা প্রমাণিত হল পরের দিন। আউট হাউসে বসে ব্যবসার কথা শুনতে শুনতে আসল কথাটা তুললাম। চাচা নরসিংলালজী আমার মুখ থেকে কথাটুকু খসামাত্রই রাজি হয়ে গেলেন। নিজে যেতে পারছেন না বলে অসহায়ের মত সঙ্কোচ দেখিয়ে ঝিন্নির কৃতিত্বের তারিফ করলেন। ঝিন্নি সঙ্গে থাকলে তাঁর চেয়েও যে সবদিক থেকে ব্যবস্থা ভাল হবে তা জানালেন।

তবু একবার বললাম, ডিসেম্বরে আপনাকে না হয় টানাটানি নাই করলাম কিন্তু এপ্রিল-মে-তে যদি নাগ্‌গরে যাই, তখন কিন্তু আপনি না করতে পারবেন না।

চাচাজী অমনি বললেন, আলবৎ যাব। কাজকাম তখন কমতি থাকবে, যাবার কোই মুশকিল থাকবে না।

রাতে আবার ঘরে এল ঝিন্নি। বলল, কিছু কথা হল চাচাজীর সঙ্গে?

গম্ভীর মুখ করে বললাম, চাচাজী রাজি হয়ে গেছেন। সামান্য কি কাজ আছে, সেটুকু এর ভেতর শেষ করেই আমার সঙ্গে বেরোবেন।

ঝিন্নির গলায় বিস্ময় ভেঙে পড়ল, চাচাজী এ সময়ে বেরোবেন! আপনাকে সত্যি বললেন! একটা অসম্ভব ব্যাপার।

নিষ্প্রাণ গলায় বললাম, তাহলে কথাটা আমি বানিয়ে বলছি।

ঝিন্নি বলল, না না—তা কেন বলবেন। আমি আপনার কাছে হেরে গেলাম। সত্যি হেরে গেলাম।

শেষের দিকে ঝিন্নির গলায় আশাভঙ্গের একটা ভাঙা ভাঙা ঢেউ।

বললাম, নাগ্‌গরে তোমার বাসায় যদি তিন-চারদিন থাকতে হয়, তাহলে রান্নাবান্নার কি ব্যবস্থা হবে? কেউ তো এখন সেখানে নেই।

ঝিন্নি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মুখ নীচু করে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগল। এক সময় বলল, তাই তো ভাবছি। চাচাজী কি করে আপনাকে নিয়ে যেতে চাইছেন! কোনোদিন একটুখানি দুধও গরম করেন নি নিজের হাতে।

বললাম, আমি তোমার কথাও বলেছিলাম। বলেছিলাম, ঝিন্নির কি খুব অসুবিধে হবে আমাদের সঙ্গে যেতে?

অমনি চাচাজী বললেন, কোলি-রি-দেওয়ালিতে যে কেউ একজনকে তো কোঠীতে থাকতে হবে, না হলে দীপ জ্বালাবে কে ?

চাচাজীর কথা শুনে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না।

ঝিন্নি আমাকে এবার সান্ত্বনা দেবার সুরে বলল, নাগ্‌গরে রোশনাই দেখবেন, মেলা দেখবেন, গান শুনবেন, ভারী ভালো লাগবে আপনার। এখানে এ ধরনের উৎসব তো আগে দেখেন নি। আর চাচাজী নিশ্চিত কাউকে সঙ্গে নিয়েই যাবেন। থাকা খাবার অসুবিধে কিছু হবে না।

বললাম, ডিসেম্বরের শীতে বরফের রাজ্যে একা একা ঘুরে বেড়াতে হবে, সেখানে কেউ তো আর শোবার ঘরে হিটার জ্বেলে দেবে না।

ঝিন্নি বলল, এবারের মত আমাকে মাপ করে দিন। আর আমি কোনদিন আপনাকে নাগ্‌গরে আসতে বলব না। সত্যি আপনাকে কি অসুবিধের ভেতরই না ফেললাম।

বললাম, মুশকিলের ভেতর ফেলেছ, এখন তার একটা আসানের পথ করে দাও।

ঝিন্নি আমার মুখের ওপর তার চোখ দুটো মেলে তাকিয়ে রইল। সে যে কত অসহায়, তার ছবি ফুটে উঠেছিল ওর সারা মুখে।

দেখে খুব মায়া হল। তবু মনের ভাব চেপে রেখে বললাম, তুমি তো পথ পেলে না, দেখি আমি কিছু পাই কিনা।

ও চোখ দুটো বড় বড় করে চেয়ে রইল। বিশ্বাস অবিশ্বাসের ছায়া কাঁপছে ওর চোখের পাতায়।

বললাম, তুমি জেনো ঝিন্নি, নাগ্‌গরে যদি আমি যাই তাহলে তুমিও যাবে। আর তা না হলে দুজনেরই যাওয়া হবে না।

ঝিন্নি আমার চারপাইয়ের কাছে এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। আকুল হয়ে বলল, দোহাই আপনার ছোটে সাহেব, এমনটি করবেন না। চাচাজী বড় দুঃখ পাবেন, তাছাড়া কিছু ভেবে বসতেও তো পারেন।

ওর বিনুনিটা কাঁধ ডিঙিয়ে বুকের ওপর লোটাচ্ছিল। ওটিকে হাতে তুলে নিয়ে খেলা করতে করতে বললাম, চাচাজী আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবতে পারেন ঝিন্নি?

জানি না, বলেই ও ঘুরে দাঁড়াতে গিয়ে বিনুনীতে টান পড়ায় আমার চারপাইয়ের ওপর ঘুরে এসে পড়ল।

ওকে ধরে ফেলে বললাম, ভয় নেই, চাচাজী কিছুই ভাববেন না। তিনি নিজে যেতে পারছেন না বলে দুঃখ জানিয়েছেন। কিন্তু তাঁর একটিমাত্র ডাকাবুকো মেয়েকে অতিথির সমস্ত তদারকীর ভার দিয়ে পাঠাতে চান।

হঠাৎ কি হল, ঝিন্নি দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল।

কি হল ঝিন্নি, খুশি তো?

ও আর হাত নামায় না। এক সময় জোর করে ওর হাত নামাতেই দেখি, ওর চোখে সজল মেঘের ছায়া।

বললাম, তুমি কাঁদছ ঝিন্নি!

ও উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বাইরে চলে গেল। আমি খোলা দরজার দিকে চেয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে ঝিন্নি ফিরে এল। একেবারে অন্য চরিত্র। হিটার জ্বেলে আলো নিভিয়ে আমার পাশে এসে বসে বলল, দুজনে নাগ্‌গরে যাব, এই সারপ্রাইজটুকু দেবার জন্যেই আমি প্ল্যান করেছিলাম।

বললাম, তোমার সারপ্রাইজ তো সফল হল তবে এমন কাঁদো কাঁদো মুখ করে উঠে গেলে কেন?

ও বলল, আপনি প্রথম এমন ভয় পাইয়ে দিলেন যে, আসল কথাটা তারপর যখন পাড়লেন তখন নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলাম না।

মনে মনে বললাম, তোমার চোখে জল দেখে বুঝেছি তুমি খুশি হয়েছ।

মুখে বললাম, এখনও কোলি-রি-দেওয়ালির সাত আটদিন বাকি। এখন থেকে রোজ অন্তত একবার করে আমরা ঐ উৎসবের দিনগুলোর প্ল্যানিং করতে বসব।

দারুণ খুশিতে উপচে উঠল ঝিন্নি, সারাদিন আমরা ঘুরে বেড়াব! সন্ধ্যায় কোয়ার্টারে বসে পরের দিনের প্ল্যানিং করব।

বললাম, খুব মজা হবে।

ঝিন্নি বলল, কিন্তু হিটারের ব্যবস্থা তো ওখানে নেই, আপনার যদি খুব শীত করে? যেমন শীতকাতুরে আপনি।

বললাম, কিচ্ছু হবে না। লেপ তোষক কম্বল থাকলেই হলো।

ও বলল, খুব দামী গরম কম্বল আছে। ভি-আই-পি-দের জন্য একসেট বিছানা তোলাই থাকে।

হেসে বললাম, কোনদিন তো ভি-আই-পি হতে পারলাম না, এখন ঝিন্নির দৌলতে যদি ভি-আই-পি-র খাতিরটা পাওয়া যায়।

ঝিন্নি বলল, গোল্ডেন অর্চার্ডের মালিক বিখ্যাত ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জী সাব যদি ভি-আই-পি না হন, তাহলে ভি-আই-পি-র ডেফিনেশন আজও আমার জানা হয় নি।

এক ঝলক হেসে বললাম, দু'খানা ফলের বাগানের মালিক আর একজন ডাক্তারকে ভি-আই-পি-র দলে ফেললে সত্যিকারের ভি-আই-পি-দের অপমান করা হয় ঝিন্নি।

ও বলল, তা হোক্, আপনি আমার কোয়ার্টারে ভি-আই-পি-র খাতিরই পাবেন। 'কোলি-রি-দেওয়ালি' তে নাগ্‌গরে আপনার চেয়ে বড় ভি-আই-পি আমার আর কেউ নেই।

সকালে নিচে নেমে দেখি আমার অপেক্ষায় একটি লোক দাওয়ায় বসে। চাচাজী তার সঙ্গে কথা বলছেন।

আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। আমি প্রতি নমস্কার জানালাম।

চাচাজী লোকটির আগমনের উদ্দেশ্যটুকু যা বুঝিয়ে বললেন, তার মর্মার্থ দাঁড়াল, আখরা বাজারের ডানদিকে যে পাহাড়, তার ওপর ওয়াল্টার লী সাহেবের বাংলো আর বাগিচা। ওখানে কদিন ধরে বড়দিনের উৎসবের প্রস্তুতি পর্ব চলছে। একটি ছেলে কাজের সময় তাড়াহুড়োতে পাহাড়ের খানিক নিচে গড়িয়ে পড়ে পায়ে বেশ চোট পেয়েছে। রাতে ডাক্তার মেলেনি, ভোরে খবর পেয়ে চাচাজীর ডেরায় লোক পাঠিয়েছেন লী সাহেব।

বললাম, মিঃ লী কি করে আমার খোঁজ পেলেন চাচাজী?

নরসিংলালজী বললেন, মানালীতে আমাদের বাগিচার পাশেই মিঃ বেননদের বাগিচা আছে তুমি জান। ওঁদের সঙ্গে সামান্য আলাপও আছে তোমার, বাবুজী। ওঁরা মিঃ লীদের ফেস্টিভ্যালে এসেছেন। তাঁদের কাছে তোমার এখানকার ডেরার কথা জেনে থাকবেন।

আমি আর দেরি করলাম না। লী সাহেব আমার যাবার জন্যে একটি টাট্টুও পাঠিয়েছেন। লোকটি সেই টাট্টু আমার সামনে হাজির করার জন্যে মাকুর মত হাওয়ায় কনুই ঠুকতে ঠুকতে আউট-হাউসের দিকে ছুটল।

সার্জিক্যাল ব্যাগটা নেবার জন্যে আমি ওপরের ঘরে চলে এলাম। আসার সময় সিঁড়ি থেকে দেখলাম, ঝিন্নির সঙ্গে আরও দুটি মেয়ে নিচের ঘরে খড়ের মাদুরে হাঁটু মুড়ে বসে ছেঁড়া কাপড়ের খিন্দ্ তৈরি করছে। ঐ বস্তুটি মাদুরের ওপর কাঁথার মত পেতে রাখতে দেখেছি বাড়িতে বাড়িতে।

আমার পায়ের সাড়া পেয়ে ঝিন্নি উবু হয়ে সেলাই করতে করতেই ঘাড় ঘুরিয়ে এক ঝলক দেখে নিয়ে আবার কাজে মন দিল।

আমি ওপরের ঘরে এসে পোশাকটা বদলে নিলাম। ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরুবো, ঝিন্নি প্রায় নিঃশব্দে মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।

ও চোখে প্রশ্ন এঁকে তাকাতেই বললাম, লী সাহেবের ওখানে ছোটখাটো একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, তাই যাচ্ছি। উনি টাট্টু পাঠিয়েছেন। চাচাজীর কাছে সব খবর পাবে।

আমার ব্যস্ততা দেখে ও সরে দাঁড়াল। আমি ওর পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে এলাম। বেশ বুঝতে পারছিলাম, যতক্ষণ না আমি পথের বাঁকে মিলিয়ে যাই ততক্ষণ ওর দুটো চোখ আমাকে অনুসরণ করে চলেছে।

আমি ক্ষুদ্রাকার টাট্টুতে চড়ে চলেছি। ভারবাহী পশুটি মাঝে মাঝে দৌড়ে আর বিপজ্জনক বাঁকগুলি অবলীলায় পেরিয়ে তার সামর্থ ও নির্ভরযোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছিল। জীবটির পরিচালক তার পেছন পেছন ছুটে আসতে আসতে তাকে বিচিত্র অনুকার ধ্বনিতে উৎসাহিত করে চলল। কখনও বা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে লাগল অশ্ববোধ্য ভাষায়।

মিঃ লী আর বেননদের আমি দূর থেকে দেখতে পেলাম। পাহাড়ের কোলে ছিমছাম সুন্দর বাংলো। ফুলের কেয়ারী। লনের ওপর ধবধবে সাদা বেতের চেয়ারে বসে উজ্জ্বল রঙের গরম পোশাক পরা গুটিকয় সাহেব মেম।

আমি বাংলোর ঠিক নিচে গিয়ে পৌঁছতেই সবাই উঠে দাঁড়ালেন। ওঁদের ভেতর এক প্রৌঢ় সমর্থ ভদ্রলোক খাঁজকাটা পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে এলেন। মনে হল, উনিই গৃহকর্তা মিঃ লী। বেশ সম্ভ্রান্ত চেহারা।

আমার টাট্টুর লাগাম নিজের হাতে ধরে আমাকে গ্রীট্ করলেন।

টাট্টু থেকে নেমে সহিসের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছি, মিঃ লী আমার হাতের ব্যাগ প্রায় ছিনিয়ে নিলেন।

আমরা ওপরে উঠে এলাম। মানালীর ক্যাপটেন বেননের ফ্যামিলির কয়েকজন আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

ভেতরে একটি ছোট্ট ঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে রোগীটি শুয়েছিল। অতি ক্ষীণ একটা কাতর শব্দ উঠছিল কম্বলের ভেতর থেকে।

মুখের কম্বলটা সরাতেই একটি মিষ্টি মুখ চোখে এসে পড়ল। বছর বারো বয়সের ছেলে। এ দেশীয় পাহাড়ী। মুখখানা থমথম করছে। থারমোমিটার দিয়ে দেখলাম টেম্পারেচার রয়েছে। চোট লেগেছে পায়ের আঙুলে। ওপর থেকে পরীক্ষা করে মনে হল আঙুলের হাড় ভেঙে গেছে। বাঁ পায়ের পাঁচটা আঙুলই বিচ্ছিরি রকম ইনজিওরড্।

লী সাহেব যা বললেন, তাতে জানা গেল কাজ করতে গিয়ে ছেলেটি ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ে নি, একটা ভারি পাথরই হঠাৎ ওপর থেকে গড়িয়ে পড়তে থাকে। তখন ও সান্তাক্লজের হরিণটানা রথের কাছে বসে তন্ময় হয়ে দেখছিল। সবাই পাথর গড়াতে দেখে সরে এলেও ও বেচারা আর সরে আসতে পারে নি। ওর পায়ের পাতায় আঘাত করে ভারী পাথরখানা নিচে নেমে যায়।

থেঁতলানো পা-টা দারুণরকম ফুলে উঠেছিল। বুড়ো আঙুলের মাংস উঠে গেছে। হাড়ের আধখানা দেখা যাচ্ছিল।

প্রাথমিক যা কিছু করার তা করলাম। এক্স-রে নেবার কোন সুযোগ নেই এ তল্লাটে। যেখানে আছে, সেখানে শেষ ডিসেম্বরে কোন যানবাহনই চলাচল করে না। এ অবস্থায় রোগীকে নিয়ে কি করা যায় ভেবে পেলাম না।

আমার অসুবিধের কথাগুলো মিঃ লী-কে জানিয়ে বললাম, ইমিডিয়েটলি ওর একটা অপারেশনের দরকার মনে হচ্ছে।

লী সাহেব বললেন, আমারও তাই মনে হয়েছিল। হয়ত ওর আঙুলগুলো কেটে বাদ দিতে হতে পারে। এখন দুটো সমস্যা আমাদের সামনে।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলতেই মিঃ লী বললেন, একটি জীপ জাতীয় গাড়ির সমস্যা, অন্যটি ওর মা বাবা।

বললাম, জীপের ব্যাপার বুঝলাম, কিন্তু ওর মা বাবার সমস্যাটা ঠিক বুঝলাম না।

লী সাহেব যা বললেন তাতে জানা গেল, ছেলেটি মেষচারক গাদ্দী-সম্প্রদায়ের। ভেড়া চরাতে চরাতে ওরা কাংড়া থেকে চম্বা কুলু সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। গরমে আর বর্ষায় ওরা থাকে অনেক উঁচু পাহাড়ের ওপর। ভেড়া নিয়ে সে সময় লাহুল, পাঙ্গী এমনকি স্পিতি পর্যন্ত চলে যায়। আবার শীত পড়লেই নিচে নামতে থাকে। ডিসেম্বরের শেষে ওরা ভ্যালিতে এসে আশ্রয় নেয় ওদের ভেড়ার পাল নিয়ে।

ছেলেটির নাম ভাগ্তু। ও বছর তিনেক ওর মা বাবার সঙ্গে কুলুভ্যালিতে আসছে। মিঃ লীদের এই উৎসব দেখতে আসে ওরা। ছেলেটিকে মিঃ লীর ভালো লেগে যায়। উৎসবের দিনগুলো তাঁর বাংলোতেই কাটিয়ে যায় ছেলেটি।

এখন হঠাৎ এবছর এই আকস্মিক অঘটন।

এদিকে ভাগ্‌তুর মা বাবা নাকি পাহাড়ের ঢালের দেবতা কেহ্‌লুবীরের পুজো করছে গত রাত থেকে। তাদের ধারণা কেহ্‌লুবীর যে কোন কারণেই হোক্ রাগ করেছেন আর তাই তাদের ছেলের ওপর পাথর ছুঁড়ে মেরেছেন। এখন অপারেশন করতে গেলেই ওদের অনুমতি চাই।

মিঃ লী বললেন, এখুনি ওর বাবা মা এসে যাবে, ওদের বোঝাতে হবে ব্যাপারটা। কিন্তু একটা কথা ভাবছি, গাড়ি জোগাড় হলেও সিমলা যাওয়া সম্ভব হবে কি ? ওপরের পাহাড়ী পথ তো বরফে ঢেকে গেছে।

বললাম, অপারেশন করা যেতে পারে, কিন্তু ব্লাড চাই আর তার জন্যে পরীক্ষা দরকার। মানালীতে মোটামুটি ও অ্যারেঞ্জমেন্ট আমার করা আছে। অন্তত কাছাকাছি মানালীতে পেসেন্ট সিফ্‌ট করার ব্যবস্থাটুকু করুন।

ভাগ্‌তুর মা বাবা এলো। তারা কেহ্‌লুবীরের পূজার ফুল ছেলের গায়ে মাথায় বুলিয়ে বিছানার তলায় রেখে দিলে। দেখলাম, হলুদ রঙের গট্টর ফুল।

তারপর ফ্রকের মত চোল থেকে ভাগ্‌তুর মা বের করল কটি পাতা! একটা নোড়ার মত পাথরে সেই পাতা থেঁতো করে ছেলের ভাঙা পায়ে বেঁধে দিলে। আমরা ওদের ব্যাপারস্যাপার দেখছিলাম। গাদ্দান মেয়েটি ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দাঁড়াতেই মিঃ লী ওদের ছেলের পায়ের গুরুতর অবস্থাটা বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

ভাগ্‌তুর বাবা বলল,

জিৎ বণ বসটী বরে
তিৎ মাণু কি আঁ মরে।

বণ গাছের পাতা বেটে লাগান হল। সব ব্যথা সেরে যাবে।

যদিও জানি ভাগ্‌তুর অবস্থা গুরুতর এবং ওর জন্যে এখুনি কিছু একটা করা দরকার, তবু বসে দেখা ছাড়া উপায় রইল না। ওদের বিশ্বাসে বাধা দিতে পারলাম না।

যথারীতি ইন্‌জেকশান দিয়ে বাংলোতে ফিরলাম। মিঃ লী-কে বলে এলাম দরকার পড়লে আমাকে অসংকোচে ডাক দেবেন। পেসেন্টকে নিয়ে মানালী যাবার জন্যে আমি তৈরি রইলাম।

দু'দিন পেরোতে না পেরোতেই মিঃ লী এলেন আমার বাংলোয়। পথে একখানা জীপ দাঁড়িয়ে। এসেই বললেন, বিরক্ত করলাম ডাক্তার। এখুনি একবার মানালী আসতে হয়। জীপে পেসেন্ট রয়েছে। কন্ডিশন ভাল মনে হচ্ছে না।

চাচাজীকে কথাটা বলতেই তিনি বললেন, ঝিন্নিকে সাথ্‌মে লে যাইয়ে বাবুজী। নেহি তো বহুৎ তক্‌লিফ হোগা।

বললাম, যা হোক্ করে ম্যানেজ করে নেব। ঝিন্নি চলে গেলে আপনাকে অনেক অসুবিধেয় পড়তে হবে।

সমস্ত মন কিন্তু চাইছিল, ঝিন্নি চলুক আমার সঙ্গে। হাতের কাছে অনেক দরকারী জিনিস ও এগিয়ে দিতে পারবে।

নরসিংলালজীর কাছে আমার অসুবিধেটা এত বড় হয়ে দেখা দিল যে তিনি আমার কথার কোন উত্তর দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করলেন না। ঘরের ভেতর ঢুকলেন আর অল্প সময়ের ভেতরেই ঝিন্নিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

আমি আর ঝিন্নি, মিঃ লী ও বেননদের সঙ্গে রোগীকে নিয়ে প্রায় দশটায় মানালীর বাংলোতে পৌঁছলাম।

অগোছালো অপারেশন টেবিলটাকে মোটামুটি ঠিকঠাক করে নিলাম। ঝিন্নির ব্লাড নেওয়া হল, কারণ আশ্চর্যভাবে শুধু ওরটাই মিলে গেছে রোগীর ব্লাড গ্রুপের সঙ্গে।

সত্যি ঝিন্নি না এলে কি যে হত !

পরের দিন অপারেশন হল। কেটে বাদ দিতে হল ভাগ্‌তুর কচি কচি আঙুলগুলো।

ঝিন্নি তো রীতিমতো নার্স। একটুও বিচলিত না হয়ে আমাকে সব কাজে নিখুঁত সাহায্য করে গেল। মিঃ লী আর বেনন পরিবারের লোকেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ঝিন্নির।

ক'টা দিন বেননরা ঝিন্নি আর আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন ওঁদের বাংলোয়।

রোগী বিপদমুক্ত হল আর আমরা সবাই মিলে ফিরে এলাম কুলুতে। বেননরা মানালীর বাংলোতেই থেকে গেলেন। ওঁরা আর বড়দিনের উৎসবে যোগ দিতে এলেন না। যে হারে দিনে দিনে বরফপাত বাড়ছে তাতে ফেরার পথে সঙ্কট দেখা দিতে পারে।

মিঃ লী আমাদের কুলুর বাংলোয় এলেন একদিন। ভারী আমুদে লোক। উৎসবে যোগ দেবার জন্যে ঝিন্নি, চাচাজী আর আমাকে বিশেষভাবে ইনভাইট করলেন। যাবার সময় বললেন, অসাধ্য সাধন করেছ ডাক্তার, এখন সান্তাক্লজের পুরস্কার তোমারই প্রাপ্য। আমি তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকব।

২৫শে ডিসেম্বর আমাদের জন্যে দুটো টাট্টু এলো। মিঃ লী চিঠিতে লিখেছেন, আর একটি টাট্টু যোগাড় করতে পারি নি বলে দুঃখিত। যে কোন দুজনে চলে আসার পরে আবার টাট্টু পাঠানো হবে তৃতীয়জনকে আনার জন্যে। নিঃসন্দেহে তিনি সবচেয়ে সম্মানীয় অতিথি।

চাচাজী বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন, আমার ছেলেমেয়েদের পাঠাচ্ছি মিঃ লী। ওতেই আমি খুশি। ঘর আগলাতে হবে, তাই আমার পক্ষে যাবার একটু অসুবিধে আছে। আপনার আর কষ্ট করে টাট্টু পাঠানোর দরকার নেই। অনুপস্থিতির জন্য মাপ চেয়ে নিচ্ছি।

মিঃ লী আর তাঁর ফ্যামিলির সবাই আমাদের কর্ডিয়ালী রিসিভ করলেন।

উৎসবের মঞ্চ পরিকল্পনা হয়েছে বাংলোর ওপরের পাহাড় ঘিরে। লী পরিবারের সঙ্গে আমরা উঁচু-নীচু পাহাড়ী পথ ধরে এগোতে লাগলাম। আমার মুখে কোন কথা ছিল না। প্রকৃতির পটভূমিকে এমন করে যে কাজে লাগান যায় তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কষ্টকর।

পাহাড়ের উঁচু মাথায় কে যেন অভ্র ছড়িয়ে রেখেছে। কুচি কুচি বরফের টুকরোগুলো রোদ্দুরে ঝক্‌ঝক্ করছে। ঠিক তার নীচেই বনরেখা শুরু। দেওদারের সারি অনেক ওপরে থাকায় আকারে ছোট। যেন এক সারি দর্শক দাঁড়িয়ে। তারপরেই পাইনের সমারোহ। পাহাড়ের গায়ের রঙ কোথাও কোথাও ব্রাউন আবার কোথাও বা নীলচে ধূসর।

এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। ঠিক যেন ওপর থেকে নেমে আসছেন যীশু। মেষচারকের পোশাক পরা। ঢিলে ফারানে ঢাকা দেহ। হাতে লম্বা লাঠি। বাঁ হাত দিয়ে সস্নেহে বুকের ওপর চেপে ধরেছেন একটি মেষশাবক। যীশুর পেছনে মেষের পাল ঢালু পাহাড়ী পথ বেয়ে নেমে আসছে। কাছে গিয়ে দেখলাম তাবের ফ্রেমে কাপড় আর প্লাস্টার সেঁটে তুলির টানে এই জীবন্ত দৃশ্য তৈরি করা হয়েছে। এরপর মেরীর কোলে নবজাতক যীশু আর দূর নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ তিন প্রাচ্যজ্ঞানীকে দেখতে দেখতে বাঁ দিকের পাহাড় ঘুরে এলাম।

এখন আমাদের দৃষ্টি সূর্যের দিকে। শৈলশিরা ধরে নীচ থেকে ওপরের দিকে উঠে গেছে এক সারি নিবিড় ঘন পাইন। তার ফাঁকে সূর্যের ঝাঁক ঝাঁক রশ্মি সোনালী সিল্কের গোছা গোছা সুতোর মত বেরিয়ে আসছে! বনের লম্বা লম্বা গাছের কাণ্ডের ফাঁক থেকে লাফ দিয়ে ছুটে আসছে শিং-উঁচু হরিণের দল। তারা টেনে আনছে সান্তাক্লজের রথ। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, সূর্যের সোনালী রশ্মিগুলি ঠিক যেন সান্তাক্লজের হাতে ধরা বল্‌গা।

আমাকে একেবারে হতবাক করে দিল এ দৃশ্য। আমি মিঃ লীকে তাঁর এই পরিকল্পনার জন্য প্রশংসা করতেও ভুলে গেলাম।

মিঃ লী কখন এসে দাঁড়িয়েছেন আমার পাশে জানতে পারি নি। তিনি হয়ত আমার মুগ্ধতাকে তৃপ্তির সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন।

একসময় মিঃ লী-ই কথা বললেন, ডাক্তার মুখার্জী, সত্যিকারের সমঝদার তুমি। এমন নিবিষ্ট হয়ে দেখছ যাতে আমি মনে করতে ভরসা পাচ্ছি যে আমার রচনা, পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে।

লী সাহেবের হাত ধরে বললাম, সিমপ্লি চার্মড, মিঃ লী। অনেক শিল্পীর শিল্পকর্ম দেখার সুযোগ আমার হয়েছে কিন্তু আপনার মত একজন গুণী শিল্পীর কাজ দেখার সুযোগ এই আমি প্রথম পেলাম।

মিঃ লী বললেন, এ আমার একটা সখ বলতে পার ডাক্তার। আমাদের লী পরিবারের ক্যাপ্টেন লী আঠারশ সত্তর সালে বানড্রোলে প্রথম ইউরোপীয় জাতের আপেল বাগান করেছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু তার চেয়ে শিল্পী কিছু কম ছিলেন না। সারা দুনিয়া ঘুরে তিনি এই কুলু ভ্যালিকেই তাঁর নির্জন বাসের যোগ্য জায়গা বলে ভেবেছিলেন। আমার সেই গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারের কাছে এ জন্যে আমি ঋণী মিঃ মুখার্জী।

হাসতে হাসতে বললেন লী, আমার রক্তেও বোধহয় ক্যাপটেন সাহেবের কিছু প্রেরণা থেকে থাকবে!

বললাম, কিছু নয়, পুরোপুরি। আরও উৎকর্ষ হয়ত এসেছে আপনার ভেতর।

মিঃ লী বললেন, সুন্দর জায়গায় থেকে সুন্দরকে ভালবেসে ফেলেছি মিঃ মুখার্জী। মেজর বেননও ঐ একই কথা বলতেন। সারা দুনিয়ায় চার ঋতুর এমন মন-মাতানো খেলা কোথাও নেই। চারদিকে তুষারের এমন শোভাও নাকি দুর্লভ।

বললাম, আমার তো মনে হয় কুলু সিলভার ভ্যালী।

মিঃ লী আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, ওম্যান ইন হোয়াইট। পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় রূপো। বসন্তের ফলের গাছে সাদা ফুলের মেলা, সব মিলিয়ে শ্বেতবসনা কুলুসুন্দরী—কি বল?

বললাম, নিখুঁত উপমা।

সুইটস আর স্ন্যাকস-এর ব্যবস্থা ছিল। রাতের ডিনারে যোগ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। খাওয়া দাওয়ার শেষে ফিরে আসছি, মিঃ লী আমার হাতে খামে আঁটা একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, এ চিঠিখানা বাংলোতে গিয়ে খুলবে।

আমরা দুজনে দুটো পনিতে ফিরে এলাম। মিঃ লীর সহিস এল আমাদের সঙ্গে।

লোকটি ফিরে যাবার সময়ে একটি টাট্টু নিয়ে যাচ্ছে দেখে জানতে চাইলাম, পরে আবার এসে অন্য টাট্টুটা কি নিয়ে যাবে?

সহিস সসম্ভ্রমে মাথা নিচু করে বলল, সাহেবের হুকুম নেই।

হঠাৎ মনে পড়ায় চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলাম :

প্রিয় ডাক্তার মুখার্জী,

তোমাকে সান্তাক্লজের একটা উপহার দেব বলেছিলাম। তাই আমার সব সেরা টাট্টুটি তোমাকে দিলাম। এর ওপর তুমি নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পার। তুমি ডাক্তার, তাই এ বস্তু তোমার অপরিহার্য। পাহাড়ী এলাকায় তোমাকে ঘুরে ঘুরে চিকিৎসা করতে হবে। অন্য বাহন সেখানে অচল। পছন্দ হল কিনা জানালে খুশি হব।

তোমার একান্ত অনুরক্ত
লী

আমার দারুণ পছন্দের কথা লী সাহেবকে জানিয়ে তক্ষুনি চিঠি লিখে দিলাম। চাচাজী মিঃ লীর অনেক সুখ্যাতি করলেন।

আমাদের রাতের আসরে পায়ে পায়ে ঝিন্নি এসে ঢুকলে তাকে বললাম, আজ লী-দের উৎসব তোমার কেমন লাগল ঝিন্নি?

ও বলল, কুলুর লোকেরা দূর থেকে পথের ওপর দাঁড়িয়ে ওদের উৎসব দেখে। আমিও তাই দেখেছি এতদিন। আজ আপনার দৌলতে একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হল।

বললাম, মিঃ লী আমাকে একেবারে যাদু করে ফেলেছেন।

ও বলল, মিস লী কিন্তু আপনার একজন অ্যাডমায়ারার!

কি রকম? ওঁর সঙ্গে আমার মাত্র একবারই কথা হয়েছে। মিঃ লী যখন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন।

ঝিন্নি হেসে বলল, মেয়েদের প্রশংসার কথা ছেলেদের শুনতে নেই।

বললাম, তার চেয়ে বল একটি মেয়ের প্রশংসার কথা অন্য মেয়ের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে নেই।

ঝিন্নি অমনি চেপে ধরল, কেন এমন কথা বললেন বলুন।

হেসে বললাম, আচ্ছা পাগল তো, এমনি বললাম।

ঝিন্নি তবু জেদ ধরতে লাগল, কেন বললেন সত্যি করে বলুন।

বললাম, আচ্ছা এসো আমরা একটা কম্প্রোমাইজ করে নি।

ও ওর বায়না ছেড়ে তাকাল আমার দিকে।

বললাম, তুমি আমাকে বল মিস লী আমার সম্বন্ধে কি বলেছিলেন, তাহলে আমিও তোমাকে একটা কথা শোনাব।

ও বলল, আগে আপনার কথাটা শুনি।

বললাম, উঁহু সেটি হচ্ছে না, আগে তোমাকে বলতে হবে। শেষে দারুণ একটা কথা তোমাকে শোনাব।

ঝিন্নি বলল, আপনি যখন সান্তাক্রুজের দিকে তাকিয়েছিলেন তখন মিস লী আপনার দিকে তাকিয়ে আমাকে বলল, আ হ্যান্ডসাম ইয়ংম্যান লাইক পোয়েট বায়রন। দেখ দেখ, কেমন তন্ময় হয়ে সান্তাক্রুজের দিকে চেয়ে আছে।

হেসে বললাম, মিস লী আমাকে এত বড় একখানা কমপ্লিমেন্ট দিলেন কিন্তু আমি তাঁর সম্বন্ধে একটুও কিছু ভাবিনি। এখন মনে হচ্ছে, সত্যি অন্যায় হয়ে গেছে।

ঝিন্নি বলল, আপনি ভীষণ দুষ্টুমি করতে ভালবাসেন। আর বানিয়ে কথা বলতেও।

কি রকম?

কি রকম আর কি, নিশ্চয়ই মিস লী সম্বন্ধে আপনি কিছু ভেবেছেন। এত সুন্দর মিস লী, তার সম্বন্ধে না ভেবে পারাই যায় না।

অন গড বিশ্বাস কর, আমার কিছুই মনে আসে নি।

ঝিন্নির ডান হাতখানা হঠাৎ ওর থুতনি আর ঠোঁট দুটোর ওপর চাপা পড়ল। ও নিবিষ্ট চোখে আমাকে দেখতে লাগল।

আমি ঝিন্নির সেই মুহূর্তের মনোভাব ওর ঢেকে রাখা মুখ থেকে পড়ে নিতে পারলাম না।

ঝিন্নি হয়ত আমার কথায় খুশি হয়েছে। একটি বিশেষ মেয়ে সম্বন্ধে একটি পরিচিত ছেলের উদাসীনতা অনেক সময় মেয়েদের খুশির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হয়ত ঝিন্নিও এর ব্যতিক্রম নয়। তবু সঠিক কিছু জানতে না পারায় ওকে কেমন যেন রহস্যময় মনে হল।

এবার ও কথা বলল, মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিয়েছে। সেখানে আগের মুহূর্তের ভাবনার কোন ছায়া পড়ে নেই।

এবার আপনার কথাটা বলুন।

কথাটা কিভাবে বলা যায় তাই ভাবছি দেখে ঝিন্নি বলল, কি হল বলুন!

বললাম, কথা যখন দিয়েছি তখন বলতেই হবে। তবে তুমি কিভাবে নেবে, তাই ভাবছি।

ভণিতা না করে বলুন তো—ঝিন্নির অধীর ঔৎসুক্যের সুর বাজল।

বললাম, তাহলে চোখ বন্ধ করেই বলি আর তুমি না হয় কানে আঙুল দিয়েই শোন।

ঝুমঝুমি বেজে উঠল ঝিন্নির হাসিতে। বলল, তাই হবে। আগে তো আপনি বলুন।

বললাম, এ আমার কথা নয়, মিঃ লীর কথা। অপরাধ যদি কিছু ঘটে যায় তাহলে সে দায় কিন্তু আমার নয়।

ঝিন্নি এবার অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, আসল কথাটা বলতে এত দেরি হয় আপনার! যে শুনবে তার ধৈর্যের বাঁধটুকু একেবারে ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত বুঝি কথাটা মুখের বাইরে বের করতে নেই।

বললাম, আচ্ছা, আচ্ছা, রাগ করো না, সব বলছি। আমরা যখন লী সাহেবের বাংলোর দিকে টাট্টু নিয়ে উঠছিলাম তখন উনি আমাদের দেখেছিলেন। তোমার চুলে গোঁজা সবুজ পাতাটা পড়ে গেলে আমি টাট্টু থেকে নেমে সেটা তোমাকে কুড়িয়ে দিয়েছিলাম, তাও তিনি দেখেছিলেন। এরপর আমরা সবাই যখন লী সাহেবের বড়দিনের সাজসজ্জা দেখে চায়ের টেবিলে ফিরে এলাম তখন উনি আমাকে তাঁর স্টাডিতে নিয়ে গিয়ে একটা আর্টের বই খুলে ছবি দেখালেন।

এখানে এসে থেমে গেলাম দেখে ঝিন্নি বলল, কি ছবি?

বললাম, পাশাপাশি দুটি ঘোড়া। মধ্যযুগের একজন নাইট ঘোড়া থেকে নেমে পথের ধারে পড়ে থাকা একটি রঙীন পালক তুলে তার বিলাভেড-এর হাতে দিচ্ছে।

ঝিন্নি আমার সামনে আর দাঁড়াল না। সেই মুহূর্তে আবহাওয়ার খবর ঘোষণা তার কাছে জরুরী হয়ে পড়ল।

দারুণ শীত পড়েছে আজ। এতক্ষণ হিটারটা জ্বালাতে একদম খেয়ালই হয় নি। —বলতে বলতে আমার দিক থেকে মুখখানাকে সরিয়ে নিয়ে ও সুইচটা অন করল। তারপর ঘরের কোণে রাখা হিটারটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসে তার জ্বলাটা দেখতে লাগল।

ঝিন্নি যে লী সাহেবের ছবির বিষয়-বস্তুর কাছ থেকে পালাতে চাইছে, তা বুঝতে পেরে বেশ কৌতুক বোধ করছিলাম মনে মনে। এতক্ষণে হিটারের লালচে আলোর মত হয়ত রঙের ছোপ ধরেছে ঝিন্নির গোল্ডেন অ্যাপেল মুখখানাতে।

আমি ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু ওর এই হঠাৎ পালিয়ে বেড়ানো আর নিজেকে লুকোনোর খেলাটুকু উপভোগ করছিলাম, এক সময় বললাম, কতক্ষণ এমনি করে সরে থাকবে ঝিন্নি?

উঁ—শব্দটুকু উচ্চারণ করেই ও কিন্তু লক্ষণীয় ভঙ্গীতে শরীরটাকে পাক দিয়ে ফিরে দাঁড়াল। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এল আমার পাশে!

বললাম, আজ যে বড় আলোটা জ্বেলে রাখলে? চোখে লাগছে না?

ও মুখখানাকে ওপর-নীচে কয়েকবার নাচাল। তারপর সোজা চলে গেল সুইচ বোর্ডের ধারে। আমাকে প্রথমে আশ্বস্ত তারপর অবাক করে দিয়ে ঝিন্নি সুইচ অফ করে দরজা ভেজিয়ে পাহাড়ী স্রোতের মত সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে গেল। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, ঝিন্নি হাতের নাগালের বাইরে ওড়ার খেলা দেখানো রঙীন একটি প্রজাপতি। একেবারে সহজলভ্য নয়।

সকালে কাপে চা ঢালতে ঢালতে ঝিন্নি নীচু গলায় বলল, ডাক্তার সাব, আপনার পেসেন্টের মা আপনার সঙ্গে দেখা করবে বলে বাইরের উঠোনে বসে আছে।

বললাম, কোন পেসেন্ট, ভাগ্তু ?

ঝিন্নি বলল, ঐ একটিই তো পেসেন্ট এখন অব্দি।

বললাম, তা যা বলেছ। যে রকম হাতযশ ডাক্তারের তাতে ওর বেশি পেসেন্ট থাকাই আশ্চর্যের।

ঝিন্নি টুলটুলে কাপটা প্লেটে বসিয়ে আমার দিকে এগিয়ে দিতে গিয়ে বলল, ও কথা কেন বলছেন, আপনি না থাকলে ভাগ্তুর ভাগ্যে যে কি অঘটন ঘটত তা ভাবাই যায় না।

হঠাৎ বলে বসলাম, তোমার মত অ্যাডমায়ারার পাশে থাকলে পেসেন্টের অভাব আমার কোনদিনই হবে না।

ও আমার দিকে এক ঝলক কড়া চাউনি হেনে পাশের ঘরের দিকে উঁকি দিল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, চাচাজী ঘরের ও প্রান্তে হিসাবের খাতা খুলে নিবিষ্ট হয়ে অঙ্ক কষছেন।

চা-পর্ব তাড়াতাড়ি চুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দেখি ভাগ্তুর মা বসে আছে। বছর তিরিশ বয়স হবে নিশ্চয়ই তবু এত বয়স মনে হয় না। কালো রঙের ঘাগরার ওপর লাল চোলি পরেছে। লম্বা সুথানের আকাশ-নীল রঙ। সাদা দোপাট্টায় মাথাটি ঢাকা। মেষচারক গাদ্দীদের মেয়ে গাদ্দান।

মেয়েটি আমার উপস্থিতি লক্ষ্য করেও যেন করল না। আমার পাশে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকা আপেল গাছের একটা ডালের দিকে চেয়ে গাদ্দীদের ভাষায় কি যেন বলে গেল।

আমি ওর কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে না পারলেও বেশ বুঝলাম, কথাগুলো আমাকে লক্ষ্য করেই বলা হচ্ছে! অবুঝ আপেল শাখাটা উপলক্ষ্য মাত্র।

আমার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে ও আবেগভরা গলায় আবার কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করল। আমি ওর দিকে চেয়ে দারুণরকম বিচলিত আর অসহায় বোধ করলাম। ভাগ্তুর মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

ত্রাণকর্ত্রীর মত আমাদের মাঝখানে ঝিন্নি এসে না দাঁড়ালে হয়েছিল আর কি ! সামনে মেয়েটির সঙ্গে তারই ভাষায় সে অনেকক্ষণ কি সব কথা বলে গেল। আমি নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

ঝিন্নি আমার দিকে ফিরে একসময় বলল, ও জানতে চাইছে ওর ছেলে একেবারে ভাল হয়ে গেলে তার বাপের মত কাংড়া থেকে ভুবুজোত পেরিয়ে কুলুতে ভেড়া চরিয়ে আনতে পারবে কি ?

মাথা নেড়ে জানালাম, তা কি করে হয় বল। পাহাড়ে খুশিমত ওঠা-নামা করা কি ভাগ্‌তুর পক্ষে আর সম্ভব।

আমার কথা গাদী ভাষায় ও মেয়েটিকে অনুবাদ করে শুনিয়ে দিলে।

কথা শুনে ভাগ্‌তুর মার দোপাট্টায় মুখ ঢেকে সে কি কান্না! এবার ফুঁপিয়ে নয়, একেবারে ডুকরে ডুকরে কান্না। ঝিন্নি যত বোঝায়, তার কান্না তত উথলে ওঠে।

শেষটায় গতিক সুবিধের নয় বুঝে বললাম, ভাগ্‌তুকে আমার কাছে একবার নিয়ে আসতে বল। যদি ওর বাবা সঙ্গে আসে তো ভাল হয়।

ঝিন্নি মেয়েটিকে কথাটা বলতেই সে কান্না থামিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেছে। আমি চাচাজীর সঙ্গে বাগান পরিক্রমা করে বেড়াচ্ছি। চাচাজী আমাকে বিভিন্ন জাতের আপেলের গাছ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করার চেষ্টা করছেন।

বাগানে ঘুরতে ঘুরতে বললাম, কত জাতের আপেল আছে চাচাজী?

নরসিংলালজী একটু ভেবে বললেন, জাত তো দুটো, খাট্টা আওর মিঠা। তবে পুরা দুনিয়ামে ভ্যারাইটি আছে বাবুজী দো হাজার সে ভি জাদা।

বললাম, আমাদের বাগানে কত রকম আছে চাচাজী?

বললেন, পনের-বিশ রকমের। তোমার পিতাজী ক্যাপ্টেন বেননের 'সানসাইন অর্চার্ড' থেকে খুব ভাল জাতের কলমের গাছ সংগ্রহ করেছিলেন।

আবার জানতে চাইলাম, আমার কাছে সব গাছই তো সমান মনে হয়। কোন গাছে কি রকম আপেল হবে তা আপনি বলতে পারবেন?

চাচাজী প্রাণ খুলে হাসলেন। বললেন, আমার বাগানের গাছ আমি চিনবো না! ডালিয়ার ছোট ছোট চারা দেখলেই মালীর মালুম হয়ে যাবে, কোন গাছে কি রঙের ফুল ফুটবে। এসো তোমাকে চিনিয়ে দি।

আমি চাচাজীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে গাছ চিনতে লাগলাম।

এটা ককসেস অরেঞ্জ পিপিনস। ঐ হল নিউটন। এদিকে ছোটা ছোটা যে গাছ দেখছ ওটা মেরী লুইসের গাছ। আমাদের বাংলোর উঠোনের গাছটা উইলিয়ম পিয়ার্স।

বললাম, এদের ভেতর কোনগুলি টক চাচাজী?

কোনটাই না আছে। সব কটা জাত-আপেল বাবুজী। তাছাড়া পাহাড়ের দিকের ঐ সারিটা কুলুর ফেমাস গোল্ডেন আপেলের গাছ।

বললাম কোন্ আপেলের বাজারে চাহিদা বেশি?

চাচাজী বললেন, নিরেস হোক সো ভি আচ্ছা, বায়ার্সদের টুকটুকে লাল রঙের আপেল চাই।

আপেলের জাত ধর্ম ছেড়ে এখন ঐ বিশেষ ফলটির ব্যবসার দিক নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল।

চাচাজী বললেন, পাইলে বহুৎ অসুবিধা থা বাবুজী। ট্রান্সপোর্ট খুব কিছু ছিল না। এখন ট্রান্সপোর্টের কিছু সুবিস্তা হয়েছে। বাঙ্গালোর কলকাত্তা উটকামন্ড যাচ্ছে কুলুর আপেল।

বললাম, কাশ্মীরী আপেল কিন্তু মার্কেট জুড়ে বসে আছে চাচাজী।

নরসিংলালজী অমনি বললেন, সোজাসুজি পাঠানকোট থেকে ট্রান্সপোর্টের সুবিস্তাটা পাচ্ছে। আমাদের তো তা নেই বাবুজী। আগে বহুৎ ফল একদম বরবাদ হয়ে যেত, এখন মানালীতে জ্যাম, জেলি তৈয়ারির ফ্যাক্টরী হয়েছে। তাছাড়া ফি বরষ ট্যুরিস্ট লোক আসছে। আপেল পিষে রস তৈয়ারী হচ্ছে। বিক্রি ভি হচ্ছে বহুৎ।

কথা বলতে বলতে আমার চোখ পড়ল আউট হাউসের দিকে। একটা টুপি উঁকি দিচ্ছে। আমি যতটুকু জানি এ টুপি গাদ্দীদের। কৈলাস পর্বতের চূড়োর আকারে টুপি বানিয়ে ওরা মাথায় দেয়। ওদের ধারণা ওদের দেবতা শিবকে ওরা সারাক্ষণ মাথায় বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

আমি পায়ে পায়ে ওদিকে এগিয়ে গেলাম। চাচাজীও এলেন আমার পেছন পেছন।

ভাগ্‌তুকে তার বাবা বয়ে এনেছে। আউট হাউসের দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে আছে ভাগ্‌তু। আমাকে দেখে এক মুখ হাসি ছড়াল।

চাচাজীকে আজকের ঘটনাটা বললাম। তারপর পরীক্ষা করে দেখলাম ভাগ্‌তুর পা-খানা। অপারেশনের ক্ষত শুকিয়ে গেছে প্রায়।

চাচাজী ভাগ্‌তুর বাবাকে বোধ করি তার ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বুঝিয়ে বক্তৃতা দিলেন। মনে হল, ভাগ্‌তুর বাবা অবুঝ নয় ওর মায়ের মত! মাথা নেড়ে নেড়ে লোকটি সব শুনল। তারপর হঠাৎ তুবড়ির মত অজস্র কথা ওগরাতে লাগল ওর মুখ থেকে। আবার এক সময় চুপচাপ। যেমন শুরু ওর কথা, তেমনি হঠাৎ থেমে যাওয়া।

চাচাজী এবার আমার দিকে ফিরে বললেন, লোকটি তার আক্ষেপের কথা বলছে বাবুজী। এ খোঁড়া ছেলেকে নিয়ে সে চলবে কেমন করে।

বললাম, প্রাণে বাঁচত না ও। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তো বেঁচে থাকবে চাচাজী।

চাচাজী বললেন, সেই কথা তো সমঝালাম এতক্ষণ ধরে, বাবুজী। ও শুনছে কই। বলে কি, ছেলে জিন্দা থেকে ভি মরে রইল। কি কামে লাগবে।

হঠাৎ কি মনে হল ঝোঁকের মাথায় বলে বসলাম, আপনি ভাগ্‌তুর বাবাকে বলুন চাচাজী, আমি ওর ছেলের ভার নিতে রাজী আছি। ও আমার মানালীর বাংলোতে থাকবে। ফি বছব যখন ভেড়া চরিয়ে কাংড়া থেকে কুলুতে আসবে তখন ছেলেকে দেখে যাবে। তাছাড়া আমি ভাগ্‌তুর কাজের বাবদ বছরে বছরে কিছু টাকাও ওদের দেব।

চাচাজী আপন মনে কি যেন ভাবলেন। হয়ত ভ্রাতুষ্পুত্রটির খেয়ালীপনার পরিণামটা একবার ভেবে নেবার চেষ্টা করলেন। তারপর গাদী ভাষায় লোকটিকে আমার মনোভাব জানালেন।

ভাগ্‌তুর বাবার মুখে প্রথমে একটা ভাবনার ছবি ফুটল, পরক্ষণেই মুখখানা খুশি খুশি হয়ে উঠল। ও চাচাজীর কাছে ওর মনের ইচ্ছার কথা জানাল। আমি ওর ভাষা না বুঝলেও ওর মুখের ভাবে সমর্থনের আভাস পেলাম।

ভাগ্‌তুকে বসিয়ে রেখে লোকটি কোথায় চলে গেল। চাচাজীর কাছ থেকে জানলাম, ভাগ্‌তুর বাবার অমত নেই। সে গেছে ভাগ্‌তুর মাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে তার সম্মতি আদায় করে আনতে।

সেই থেকে আমার কাছে থেকে গেল ভাগ্‌তু। ঝিন্নির সঙ্গে ওর দোস্তি জমল বেশি। ওর সুবিধের দিকে ঝিন্নির সারাক্ষণ নজর। তাছাড়া ভাগ্‌তুর গাদী ভাষা আমার কাছে একদম হিব্রুর সামিল। এদিকে সারাদিন ঝিন্নি তুখোড় ভাষাবিদের মত ভাগ্‌তুর সঙ্গে ওর ভাষাতেই কথা চালিয়ে যাচ্ছে। দুজনের ছেলেমানুষী হাসি-ঠাট্টা, কথার তরঙ্গে সারা ঘর কলকলিয়ে উঠছে।

মনে মনে আমিও খুশি হয়ে উঠলাম। ভাগ্‌তু ছেলেটার মুখে এমন একটা মিষ্টি হাসি লেগে আছে যা তার চারদিকের সব্বাই-এর দৃষ্টি কেড়ে নেবে। ওদিকে ঝিন্নিকে যেন নতুন করে আবিষ্কার করছি। একটি অখ্যাত গাদ্দীদের ছেলের জন্যে কি অগাধ মমতা তার! ভাগ্‌তুর সারাক্ষণের সুখ-দুঃখের সে যেন সমান অংশীদার।

ঝিন্নিকে একান্তে পেয়ে বললাম, কেমন হেলপার যোগাড় করে দিয়েছি বল। ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে।

ঝিন্নি অল্প হেসে আমার দিকে চোখ টিপে তাকিয়ে বলল, ছোটে সাহেবের খিদমতগারের তোয়াজ করছি।

বললাম, চাচাজী কি বলেন?

ঝিন্নি বলল, আপনার রকম-সকম দেখে বলেন, বিলকুল দাদাসাহেব। ঠিক তেমনি মেজাজ, তেমনি খেয়াল খুশির মানুষ!

আমার ভেতর বাবার চরিত্রের কিছু ছাপ আছে জেনে হঠাৎ মনে একটা দোলা লাগল। এ আমার নিজের আবিষ্কার নয়, বহু দূর প্রবাসী অনাত্মীয়দের দ্বারা আবিষ্কৃত।

আমাকে অন্যমনস্ক হতে দেখে ঝিন্নি বলল, কি ভাবছেন এত?

বাবার কথা।

ঝিন্নি বলল, আপনাব চলনে-বলনে কাজে-কর্মে পিতাজীর অনেক মিল আছে।

বললাম, আমি তাঁর ছেলে হয়েও তাঁকে দেখার যতটুকু সুযোগ পেয়েছি তারচেয়ে অনেক বেশি পেয়েছ তোমরা। তাই তোমাদের মুখে তাঁর কথা শুনলে আমার ভেতর অদ্ভুত এক ধরনের অনুভূতি জাগে।

ঝিন্নি বলল, আপনি যখন বিপাশার ধারে বসে ওপারের পাহাড় আর বনের দিকে তাকিয়ে থাকেন তখন আমি আপনার কাছে বসে অপনাকেই দেখতে থাকি। তখন একেবারে অন্য মানুষ আপনি! আপনার দৃষ্টি তখন হয় আপনার ভেতর নয়তো আপনার দেহের সীমা ছাড়িয়ে ঐ দূরের প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যায়। পিতাজীর চোখেও আমি ঠিক এই একই ছবি দেখেছি।

আচ্ছা ঝিন্নি আমার বাবা নদীর ধারে বেড়াতে এসে কোথায় বসতেন?

ঝিন্নি বলল, আপনি যে মসৃণ পাথরটার ওপর বসেন, ঠিক ওখানেই বসতেন। অবিকল আপনার মত তাকিয়ে থাকতেন।

কোথায় রক্তের অণু-পরমাণুতে স্বভাব আর সংস্কারের অদৃশ্য বীজ লুকিয়ে থাকে, যা পুরুষানুক্রমে এক দেহ থেকে অন্য দেহে সঞ্চারিত হয়ে চলে। তাই পিতৃ-পিতামহের মেজাজ-মর্জির অংশীদার হয় তার উত্তর-পুরুষেরা।

আমি ভাবতে ভালবাসি। নির্জনে খেলা করতে ভালবাসে আমার মন। সে খেলার সঙ্গী আমার একান্ত প্রিয়জনেরা। অনুপস্থিত সেই চরিত্রগুলিই আমার নির্জনে খেলার সঙ্গী। আমি একটিও কবিতা লিখিনি কিন্তু প্রকৃতির গহন গভীরে আমার নিত্য যাওয়া-আসা। আমি আমার চারদিকের চরিত্রাবলীকে আমার প্রিয় প্রকৃতির মাঝখানে এনে দাঁড় করাতে ভালবাসি। যাদের মনে মনে ভালবাসতাম, কৈশোর জীবনেই তাদের হাত ধরে আমি কল্পিত কোন নদীর বালু-চিকচিক চরে ঘুরে বেড়াতাম। সে রোগ আমার আজও সারেনি। হয়ত আমার বাবার রক্তে এ রোগের বীজ থেকে থাকবে।

ঝিন্নি ঘরের কাজে যাবার আগে মনে করিয়ে দিল, কাল বাদে পরশু আমাদের নাগ্‌গরে যাবার দিন স্থির হয়েছে। ঐ দিনই কোলি-রি-দেওয়ালির উৎসব শুরু।

বললাম, কদিন কুলু মানালী করতে গিয়ে বেমালুম ভুলে বসেছিলাম কথাটা। দারুণ জমবে, কি বল?

ঝিন্নি যেন নিভে গেল। যেতে যেতে বলল, জমবে না ছাই।

ও চলে যেতে ভাবলাম, ঝিন্নি এ কথা বলল কেন! খানিক হাতড়াতে হাতড়াতে রহস্যটা স্বচ্ছ হল। আমি যে নাগ্‌গরে যাবার মত একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনাকে ভুলে বসে আছি, সেজন্য ঝিন্নির অভিমান। হয়ত অনেক প্রতীক্ষিত মুহূর্ত নিয়ে ও রঙে রসে আপন মনে জাল বুনে গেছে। ঐ অভাবনীয়কে আমি অনুভব করিনি অথবা যথোচিত মর্যাদা দিই নি, তাই ঝিন্নি ক্ষোভ দেখিয়ে চলে গেল আমার সামনে থেকে।

যাবার আগের রাতে ঝিন্নি চাচাজীকে পই পই করে বলল, যেন কোলি-রি-দেওয়ালির সঙ্কেত পাবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িতে চেরাগ জ্বালান হয়। সব সাজিয়েই সে রেখে যাচ্ছে, শুধু জ্বালিয়ে দেবার অপেক্ষা।

আর বারণ করে গেল ভাগ্‌তুকে, উৎসবের রাতে আলোর রোশনাই দেখার জন্যে একদম তার ছুটোছুটি করা চলবে না। সে চেরাগেও হাত দিতে পারবে না। শুধু অনুমতি রইল দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে উৎসবের রোশনাই দেখার। তাও বেশিক্ষণ নয়। দুর্বল পায়ে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকলে ক্ষতি হতে পারে।

ঝিন্নির আদেশ ঘোষণার পর দেখলাম, ভাগ্‌তু বেচারার মুখ এতটুকু হয়ে গেছে। মনমরা হয়ে সে ঘুরতে লাগল। হাসি কথাবার্তা মুখ থেকে একেবারে মুছে গেছে। বেচারা ভাগ্‌তুর অবস্থাটা দেখে বড় মায়া হল। কিন্তু হার্ড টাস্কমাস্টার ঝিন্নির হৃদয়ের কঠিন বরফ তাতে একটুও গলল না।

কুলু থেকে একটা স্পেশাল বাস ছাড়ল নাগ্‌গরের দিকে। উপলক্ষ মেলা। বরফ যেভাবে আর্লি পড়েছে এবার তাতে গাড়ি মাঝপথ থেকেও ফিরে আসতে পারে। এ সম্বন্ধে গাড়ির চালক যাত্রীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তবে বাস ছাড়ল। আমরা ঐ বাসে ঠাঁই করে

নিয়েছিলাম। যাত্রীদের সুকৃতির ফলেই হোক অথবা ওপরওয়ালার দয়াতেই হোক, বিনা বাধায় গাড়ি নাগ্‌গরে এসে পৌঁছল।

আমি আর ঝিন্নি বাস থেকে নেমে ওপরের পাহাড়ে উঠতে লাগলাম। ঝিন্নি একটা পাহাড়ীকে পাকড়াও করেছে আমাদের মালপত্রগুলো ওপরে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। লোকটা কিল্‌তায় ভরে নিয়েছে আমাদের সব-কটা মাল। তিনকোণা বাক্সটাকে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে সট্‌ধি ঠুকতে ঠুকতে লোকটা এগিয়ে চলল আমাদের ডেরার দিকে।

পাহাড়ের প্রায় চূড়ো বরাবর নিকোলাস রোয়েরিখের আর্ট গ্যালারী।

আমরা আর্ট গ্যালারী লক্ষ্য করে পাশাপাশি হেঁটে চলেছি। বিপাশার কুল ছেড়ে একটা বাঁধানো পথ পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে ঘুরে ওপরের দিকে উঠে গেছে। আমরা ঐ পথ ধরে চলেছি। ঘড়িতে দেখলাম, নটা বাজে বাজে। শীতের দিনের সূর্যের আলোয় স্নিগ্ধ একটা জ্যোতি আছে, কিন্তু উত্তাপ ছড়িয়ে দেবার ক্ষমতা নেই। আমরা উপরে উঠছি আর একটা অতি শীতল অভ্যর্থনা ডান দিকের পাহাড় আর পাইন বন থেকে উচ্চারিত হচ্ছে। পাইনের ডালে পাতায় গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ জমে আছে। ওপরের পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বরফের কুচি ছড়ানো। হাওয়া তীব্র নয় তবু শীতের দারুণ প্রভুত্বের সামনে সসম্ভ্রমে নত হয়ে আমাকে এগোতে হচ্ছিল।

খানিক ওপরে উঠে আসতেই বাঁদিকে একটা কাঠের তৈরি বাড়ি দেখা গেল। আমি থমকে ওদিকে তাকাতেই ঝিন্নি বলল, এক সময় এটি কুলুর রাজাদের প্রাসাদ-কেল্লা ছিল। এখন এটি গভর্ণমেন্ট রেস্ট হাউস।

পাশে একটি ছোট্ট মন্দির দেখিয়ে বলল, আজ এই কেল্লার মন্দিরে পুজো হবে। এখান থেকেই সূচনা হবে উৎসবের।

বললাম, তাই বুঝি ? তাহলে সন্ধ্যায় আসব আমরা।

ঝিন্নি এবার চলতে চলতেই বলল, সন্ধ্যায় দারুণ ঠাণ্ডা পড়বে। তখন আপনাকে নিয়ে এখানে নেমে আসাটা ঠিক হবে না।

একটু রাগ করে বললাম, তাহলে নাগ্‌গরে এলাম কেন ঝিন্নি।

ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। আমাদের পায়ের জুতোগুলোর শব্দ পাথুরে রাস্তার ওপর বেজে বেজে চলল।

হঠাৎ ও চলার পথে থেমে গিয়ে ওপর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ঐ আমাদের আর্ট গ্যালারী। ওখান থেকে উৎসব দেখতে আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধে হবে না। তাছাড়া ওপর থেকে সবকিছু অনেক সুন্দর দেখায়।

বললাম, তোমার ওপর ভরসা করে এসেছি, আমার নিজস্ব ভাবনা বলতে কিছু নেই।

ও ছোট্ট করে বলল, একটু ভরসা করে দেখুনই না।

ঝিন্নির কোয়ার্টারে বসে মনে হল সারা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি একটা শূন্যলোকে রয়েছি আর সেখান থেকে পৃথিবীর আশ্চর্য সব ছবি দেখতে পাচ্ছি। আমার তিনদিক ঘিরে গভীর উপত্যকা। সবুজ চাদর বিছান। রোদ্দুরে নানা ধরনের সবুজের ছবি

ফুটছে। কোথাও ঘন, কোথাও হালকা, কোথাও একেবারে ফিকে। উপত্যকার বুকের ওপর যেন অগোছালো সাদা কাপড়ের মত লুটিয়ে পড়ে আছে ধবধবে সাদা একটি নদী। উপত্যকার ওপরে অনেক উঁচু-উঁচু পাহাড়। হালকা নীল তাল তাল কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে। কোথাও বসতির চিহ্ন, তার ধারে পাইন গাছগুলো ছোট ছোট সংসার রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণের পাহাড়ে নিবিড় বন। নীচে ব্লু পাইন। ওপরে সারে সারে দেওদার আর সিলভার ফার উঠে গেছে। দূর দক্ষিণে দুটো নীলাভ পাহাড় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তাদের চূড়োর ফাঁকে দেখা যাচ্ছে দুধের মত সাদা একটা পর্বতশীর্ষ। পীরপাঞ্জালের কোন একটা তুষার ধবল শৃঙ্গ মনে হয়।

আমার সামনে এক টুকরো ছবি ফুটে আছে। শীতের দিনের একটি ভায়োলেট ফুল উঁকি দিচ্ছে একটা পাথরের আড়াল থেকে। কবি ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের দেখা কবেকার সেই ফুলটি আজও যেন ঠিক তেমনি থেকে গেছে—'হাফ হিডন ফ্রম দ্য আই'। বড় নম্র নত আর লাজুক।

কোয়ার্টারের পেছন থেকে ঝিন্নির গলা বেজে উঠল, কোথায় আপনি?

এই যে ঘরের ভেতর। তুমি কোথায়?

উত্তর এলো, ঘরের পেছনে লহরীতে। একা একা কি করছেন? আসুন না এখানে।

গিয়ে দেখি সব্জির বাগানে বসে একটা ফুলকপির গায়ে হাত বুলোচ্ছে ঝিন্নি।

বললাম, কেউ কোথাও নেই, হঠাৎ তোমার সব্জিক্ষেতে ফুলকপি এল কোত্থেকে?

ঝিন্নি বলল, যাবার আগে গাছ তৈরি করে গিয়েছিলাম, এখন ফুল ফুটেছে সেই গাছে। আজ আমার হাতের তৈরি ফুলকপির সব্জি রান্না করে খাওয়াব আপনাকে।

একটা কুহল সব্জি ক্ষেতের ধার দিয়ে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছিল। বললাম, এই স্রোতধারাটি বুঝি তোমার জল সংগ্রহের উৎস?

ঝিন্নি বলল, ঠিক ধরেছেন। কিন্তু জানলেন কি করে?

এটা আবার খড়ি পেতে জানতে হয় নাকি?

ও বলল, আর কটা দিন পরে অন্তত মাসখানেকের জন্যে এই কুহলটি একটা সাদা আলোয়ান মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকবে।

তাকিয়ে দেখলাম, পাহাড়ের গায়ে পাইন গাছের ওপরের দিকে কয়েকটা ওক আর দেওদার দাঁড়িয়ে। গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে একটা স্রোত এঁকেবেঁকে নীচে নেমে এসেছে। পালিশ করা রূপোর হারের মত মনে হচ্ছে ঐ স্রোতধারাটিকে। ওপরের দিকে ওর গায়ে বরফের একটা সরের মত জমে আছে। জায়গায় জায়গায় রোদ্দুর পড়ে ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

বললাম, সত্যি ঝিন্নি, তুমি আমাকে একটা ছবির রাজ্যে এনে ফেলেছ। কি যে ভাল লাগছে!

ঝিন্নি অমনি আমার সামনে ওর হাতখানা পেতে দিলে।

বললাম, কি?

ও বলল, কিছু দিন। এমন একটা ভাল জায়গায় এনে ফেললাম, বকশিস দেবেন না?

হেসে বললাম, আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা এই ভাল লাগার বিনিময়ে তোমাকে দিতে পারি।

ঝিন্নি তার প্রসারিত হাতখানা ছোট করে গুটিয়ে নিল। শুধু হাতের পাতাটা পেতে রেখে বলল, আমি এই এতটুকুতেই খুশি। যা দেবেন, তাতেই খুশি।

হঠাৎ মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল। ওকে ওখানে বসতে বলে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ঝিন্নির কোয়ার্টার আর রোয়েরিখের আর্ট গ্যালারীর মাঝে এক চিলতে বাগান। দুটি আপেল গাছ দাঁড়িয়ে ওখানে। ঘরে ঢোকার সময় চোখে পড়েছিল অসময়ের একটি আপেল, গাছের ডাল-পাতার ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে।

আমি গাছ থেকে আপেলটি পাড়লাম। সাদাটে রঙ, গোলাপী আভা মেশান, আকারে অনেক বড় আর নিটোল গোলাকার।

আপেলটা বাঁ হাতে ধরে পেছন দিকে লুকিয়ে নিয়ে সব্জি বাগানে ঝিন্নির পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ও চুপচাপ তেমনি হাত পেতে মুখ নিচু করে বসেছিল। আমার সাড়া পেয়ে মুখ তুলে বলল, কই দিন কি দেবেন?

বললাম, তুমি তো দেখছি দারুণ মেয়ে। সেই থেকে হাত পেতে বসে আছ?

ঝিন্নি বলল, পাওনাগুলো সঙ্গে সঙ্গে বুঝে না নিলে কখন তামাদি হয়ে যায় সেই ভয়ে হাত পেতেই বসে আছি।

বললাম, চোখ বন্ধ কর তো দেখি।

ও সঙ্গে সঙ্গে চোখ বন্ধ করল।

আমি তবু বললাম, অ্যাই—দেখছো।

ও চোখ না খুলেই বলল, আমাকে তাহলে একেবারে অন্ধ করে দিন, তবে যদি বিশ্বাস হয় আপনার।

কি কথায় কি এসে পড়ল। আমি আর কথার পিঠে কথা না বাড়িয়ে বললাম, একদিন গার্ডেন অব ইডেনে প্রথম রমণী ইভ অ্যাডামকে একটি আপেল দিয়েছিল। তাই ইভকে চিরদিন দুঃখ সৃষ্টির জন্য অপবাদ বয়ে বেড়াতে হচ্ছে। আর আজ একটি পুরুষ তোমাকে গার্ডেন অব ইডেনের শেষ আপেলটি দিচ্ছে। অপবাদ যদি কিছু রটে, তাহলে তা আজ থেকে ঐ পুরুষের।

বলতে বলতে আপেলটা ওর প্রসারিত হাতে দিয়ে দিতেই ও চমকে উঠে তাকাল। অনেকক্ষণ আপেলটার ওপর চোখ রেখে কি যেন ভাবতে লাগল।

এক সময় উঠে দাঁড়াল ঝিন্নি। কি অপূর্ব দেখাচ্ছিল ওকে সেই মুহূর্তে। সিমলার মিশনারী স্কুলে পড়া মেয়ে ঝিন্নির কাছে গার্ডেন অব ইডেনের আপেলের তাৎপর্য নিশ্চয় অজ্ঞাত ছিল না। ঐ ফলের মত ঝিন্নির মুখখানা হঠাৎ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। ও আর সেখানে দাঁড়াল না। কোন কথাও বলল না। আপেলটা নিয়ে কুহলের পাশ কাটিয়ে লহরী পেরিয়ে ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকল।

আমি বুঝলাম, গার্ডেন অব ইডেনের ঐ নিষিদ্ধ ফলটি স্পর্শমাত্রই ঝিন্নির মধ্যে ক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে ঘুরে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। দুটি দেওদার গাছের ফাঁকে পাথরের মূর্তি পড়ে আছে। রোদ্দুর এসে পড়েছে মূর্তির ওপর। কোন দেবীমূর্তি নয়। আভরণ আর আবরণহীন এক নারীমূর্তি। চোখ কেড়ে নেয় তার যৌবনের উদ্ধত ভঙ্গীটি। হয়ত শিল্পী রোয়েরিখ এই নারীমূর্তি পাথর কেটে সৃষ্টি করেছিলেন। হয়ত বা তিনি এটিকে উপত্যকার কোন স্থান থেকে সংগ্রহ করে এনে এখানে রেখে দিয়েছিলেন। যিনিই এ মূর্তি পাথরে খোদাই করুন, তিনি যে জীবনশিল্পী তাতে সন্দেহ কি! পাথরের মূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে নারীদেহের দুর্নিবার আকর্ষণ ঘোষণা করছে।

আমি মূর্তি থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘরের দিকে তাকাতেই দেখলাম ঝিন্নি জানালার লম্বা লম্বা গরাদগুলোতে মুখ চেপে রেখে দূরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে।

আমি এতক্ষণ ওর জানালার অদূরে রাখা মূর্তিটাই দেখছিলাম। হয়ত আমি যখন নিবিষ্ট হয়ে ঐ নারীমূর্তিটিকে লক্ষ্য করছিলাম, তখন ঝিন্নি আমাকেই দেখছিল। এখন অবশ্য ওর চোখ দুটো দূর পাহাড়ের পাইন বনের গভীরে হারিয়ে গেছে। আবার এমনও হতে পারে ওর বাইরের চেয়ে থাকাটা সত্যি নয়। ওর দৃষ্টি মনের কোন অতল তলে ঢেউ তুলে সাঁতার কাটছিল।

ওখানে থেকে আমি পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম কোয়ার্টার-সংলগ্ন বাগানে। বাঁদিকে পাহাড়ের ঢালে কাঠের কেল্লা দেখা যাচ্ছে। ছোট মন্দিরটির ওখান থেকেই নাকি সূচনা হবে কোলি-রি-দেওয়ালি উৎসবের। আমি জানি না কেমন সে উৎসব, তবে দেওয়ালির মত দীপ জ্বালানো হবে, রোশনাই হবে—এটুকু জেনে এসেছি। দুদিন পরে একটা মেলাও বসবে এখানে। দশেরা উৎসবের পরে এটি নাকি কুলুবাসীদের কাছে বিশেষ প্রতীক্ষিত মেলা।

টুকরো টুকরো কথা ভাবছি, পেছন থেকে শান্ত গলায় ডাকল ঝিন্নি, একা একা দাঁড়িয়ে আছেন কেন, আসুন ভেতরে।

কোন কথা না বলে ফিরে দাঁড়ালাম। ঝিন্নি এবার ঘরের দিকে পা বাড়াল, আমি ওর পেছন পেছন ঘরে এসে ঢুকলাম।

ঝিন্নি বিছানা পেতেছে কখন। বলল, বসুন এর ওপর, ঠাণ্ডা লাগবে না।

বসলাম। ও ভেতরের আর একখানা ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এল হাতে চায়ের কাপ আর নানখাটাই-এর মত একটা বস্তু নিয়ে।

আমার হাতে চা ধরিয়ে দিয়ে ও আবার ভেতরে চলে গেল। এবার বেরিয়ে এল নিজের কাপটা হাতে নিয়ে।

আমি চা খেতে খেতে তাকাতে লাগলাম ঝিন্নির দিকে। ও দরজার চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে কাপে পিঙ্ক রোজের পাপড়ির মত ঠোঁট ছুঁইয়ে চোখ নামিয়ে চা খাচ্ছিল। আমার দিকে কিন্তু ও একবারও তাকাচ্ছিল না, কিংবা ঘরের ভেতর আসছিল না।

বললাম, দাঁড়িয়ে কেন, বসবে না?

অন্যমনস্ক অবস্থায় কোন কথা শুনলে চমক লাগে, ঝিন্নিও তেমনি করে তাকাল। তারপর বলল, রান্না চাপিয়েছি এখন বসব কি ? আপনি বরং বসুন।

বলতে বলতেই ঝিন্নি ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল।

সারা দুপুর ওর খাওয়াতে আর বাসন-কোসন ঘষে মেজে পরিষ্কার করতে কেটে গেল। খাওয়ার পর আমার বিছানায় কম্বল একখানা ফেলে দিয়ে বলল, মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ুন, সন্ধ্যের আগেই ডেকে তুলব।

বেশ শীত করছিল খাবার পর, বাধ্য ছেলের মত কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

বিকেল চারটে নাগাদ ঘুম ভাঙল ঝিন্নির হাতের ছোঁয়ায়। আমার মাথায় হাতটা রেখে আস্তে আস্তে ও নাড়া দিচ্ছিল। ধড়মড়িয়ে বিছানার ওপরে উঠে বসলাম।

টেবিলে চায়ের কাপ বসানোই ছিল। ধোঁয়া উঠছিল তার থেকে, শীতের দিনের সকালে পুকুরের জল ছুঁয়ে কুয়াশাগুলো যেমন এলোমেলো উড়তে থাকে।

ঝিন্নি আমার হাতে কাপটা তুলে দিয়ে চলে যাচ্ছিল দেখে বললাম, কি হয়েছে তোমার ঝিন্নি? আমি কি তোমাকে কোনরকম আঘাত করেছি?

ঝিন্নি খুব সহজ শান্ত গলায় বলল, কই না তো! আপনি আঘাত করতে যাবেন কেন?

বললাম, সারাদিন তুমি আমার কাছ থেকে দূরে দূরে সরে থাকছ, আমি নিজেকে তাই তোমার অশান্তির কারণ বলে ভাবছি।

ঝিন্নির গলায় উদ্বেগ, ওভাবে বলবেন না। বিশ্বাস করুন, এমন কোন ঘটনা ঘটে নি যাতে আপনাকে আমি আমার দুঃখের কারণ বলে ভাবতে পারি।

ও আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ভেতরে চলে গেল।

খানিক পরে আমার বিছানার পাশে এসে স্বাভাবিক গলায় বলল, উৎসবের অনেক দেরি, এখন চলুন আপনাকে নিকোলাস রোয়েরিখের আর্ট গ্যালারীটা দেখাই।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঝিন্নির সঙ্গে বেরিয়ে দেখি পাইন আর দেওদার বনের দীর্ঘ ছায়া নেমেছে সামনের বাগান আর পথের ওপর। রোদ্দুরের রঙ লালচে সোনার মত। পথের ওপর পেতে রাখা একটা সোনালী কার্পেট যেন ছায়া কালো ডোরায় কেটে কেটে গেছে।

ঝিন্নি আর আমি আর্ট গ্যালারীর দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ঝিন্নি তালায় চাবিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, আপনি একটু দাঁড়ান, ভেতরে ভাল দেখা যাবে না, আমি আলোটা জ্বেলে নি।

দরজা খুলে ঝিন্নি ঢুকল। আলো জ্বেলে ভেতর থেকে আমাকে ডেকে বলল, আসুন।

আমি ঢুকে বাঁদিকের টেবিলের ওপর রাখা একটা বাঁধানো মন্তব্যের পাতা দেখলাম। নীচে পণ্ডিত নেহরুর স্বাক্ষর। পড়ে দেখলাম, দার্শনিক দৃষ্টিতে পণ্ডিতজী শিল্পী রোয়েরিখের সৃষ্টির বিষয়ে মন্তব্য করেছেন—সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতভূমির ওপর যে মহান হিমাচল দাঁড়িয়ে আছে, তার আত্মার সুরটি বেজে উঠেছে এই ভারতপ্রেমিক শিল্পীর শিল্পকর্মের মধ্যে।

আমি ওখান থেকে চোখ সরিয়ে ছবি দেখতে লাগলাম। ছবি দেখার ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা পদ্ধতি আছে। কোন একক শিল্পীর প্রদর্শনী দেখতে গেলেই আমি আগে একবার ঘুরে সব ছবিগুলোর ওপর মোটামুটি চোখ বুলিয়ে নিই। তারপর এক একটি ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। ওতে শিল্পীর সামগ্রিক মেজাজটা ধরতে আমার বিশেষ অসুবিধে হয় না।

ঠিক আগের পদ্ধতিতেই আমি ছবিগুলো এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে দেখে নিলাম। এবার ফিরে এলাম প্রথম যেখান থেকে শুরু করেছিলাম। একবার তাকালাম ঝিন্নির দিকে। ও অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে। কেউ যে এমন দু-এক মিনিটে ছবি দেখে নিতে পারে, তা বোধহয় ওর বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। আমি মনে মনে হেসে আবার ছবি দেখার কাজ শুরু করলাম।

প্রথম দেখায় আমার মনে হল রোয়েরিখের ঝোঁক নীল রঙের ওপর। তাঁর অধিকাংশ ছবিতেই নীলের ঢালাও ব্যবহার। শিল্পীর মনের সীমাহীন প্রসার যেন ঐ নীল রঙের ভেতর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। পাহাড় পর্বতের ধূসর নীলাভ দেহ, কুয়াশার ফিকে নীল, আকাশের ঘন নীল, সাদা আর নীলে মেশা জলপ্রবাহ, সব কিছু মিলে আশ্চর্য এক নীলের জগৎ।

একটি ছবির কাছে এসে আমার চোখ আটকে গেল। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে জলধারা। তার পাশে একটি গেরুয়া রঙের শিলা দাঁড়িয়ে। ঐ শিলার তলায় ছড়িয়ে পড়ে আছে আরও কয়েকটি শিলা। সব কটিই গৈরিক। ভাল করে দেখলাম, যেগুলিকে শিলা মনে হচ্ছিল সেগুলি মানুষেরই ফর্ম।

আমি ভাবতে লাগলাম। এ কি বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের পরিকল্পনা? না সনাতন ভারতের ধ্যানের কোন ছবি? হিমালয়ের বিরাট সাধনলোক থেকে কি সমভূমির দিকে বয়ে আসছে নিরন্তর করুণাধারা।

এসব প্রশ্ন আমার মনে জাগছিল।

আমি ছবির পর ছবি দেখে যাচ্ছিলাম আর মনে মনে এক একটা অর্থ খাড়া করে নিচ্ছিলাম।

ঝিন্নির দিকে চোখ পড়তেই ও এগিয়ে এল। এতক্ষণ যেন আমাকে কিছু বলার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

কাছে এলে বললাম, কিছু বলবে?

ঝিন্নি বলল, আপনি যে ছবির সমঝদার তা বুঝতে আমার ভুল হয় নি। তবে একটা কথা বলব।

বললাম, আমি সমঝদার কিনা জানিনা কিন্তু ছবি আমি ভালবাসি। আর আমি আমার মত করেই দেখতে ভালবাসি। কারো শেখান পথ পদ্ধতি ধরে নয়। হাঁ, এখন কি বলতে চাইছিলে বল।

ঝিন্নি বলল, শিল্পী রোয়েরিখের শিল্পসৃষ্টিতে আর একজনের যে দান আছে এ কথাটুকুই বলতে চাইছিলাম। হয়ত এটা আপনার জানা নেই।

বললাম, কি রকম! কে তিনি?

ঝিন্নি বলল, ওঁর স্ত্রী। তিনি ছিলেন দর্শনের ছাত্রী। রোয়েরিখের সৃষ্টির প্রেরণা ছিলেন তিনি। বহু ছবির ভেতর স্বামী-স্ত্রী একাত্ম হয়ে আছেন।

ঝিন্নির কথা শোনার পর আমার মনে শিল্পী রোয়েরিখ আরও গভীর দাগ কেটে দিয়ে গেলেন।

আমার চোখের সামনে একটা ছবি ফুটে উঠতে দেখলাম। হিমালয়প্রেমিক এক শিল্পী নিজেকে এক সীমাহীন নির্জনতায় নির্বাসিত করে রেখেছেন। তাঁর জীবনের একমাত্র প্রেরণার উৎস তাঁর সঙ্গিনী পাশে দাঁড়িয়ে। দূর হিমালয়ের নিসর্গ চিত্রাবলীর দিকে প্রসারিত তাঁদের দৃষ্টি।

আমরা গ্যালারী থেকে বেরিয়ে এলাম। সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। সূর্য সরে গেছে ওপরের পাহাড়ের আড়ালে। দেওদার গাছগুলো মৃদু একটা আওয়াজ তুলছিল। অতীতের দ্রষ্টা তারা। হয়ত দূর অতীতের কোন কথা উচ্চারিত হচ্ছিল ঐ শব্দে। আমরা দেওদার গাছগুলোর নীচ দিয়ে হাঁটছিলাম। বিশাল বৃক্ষগুলোকে শীতের আসন্ন সন্ধ্যায় কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছিল।

একেবারে জনহীন অরণ্যভূমির ভেতর দিয়ে আমরা চড়াই পথে উঠে চলেছিলাম দুটি প্রাণী। ঝিন্নি কিংবা আমার মুখে কোন কথা ছিল না। ঝিন্নি সেই মুহূর্তগুলোতে কি ভাবছিল তা অনুমান করে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু একটা ভাবনার মৌমাছি আমার চারদিকে গুনগুন করে উড়ে ফিরছিল। আমি সেই মৌমাছির গান শুনতে শুনতে ঝিন্নিকে অনুসরণ করছিলাম।

মৌমাছিটা আমাকে কি গান শোনাচ্ছিল? ছ'হাজার ফিট ওপরের এই অরণ্যলোক, ঐ শেষ সূর্যের সিঁদুরমাখা পীরপাঞ্জালের তুষারশিখর, দুটি মাত্র নারী আর পুরুষ, সব কিছু মিলে এক বিহ্বল করে দেওয়া গার্ডেন অব ইডেনের গান!

আমি যেন সেই আদি পুরুষ অ্যাডাম, অনুসরণ করে চলেছি প্রথমা নারী ইভকে। স্যাটান ভাবনার মৌমাছি হয়ে ক্রমাগত গান শুনিয়ে প্রলুব্ধ করে চলেছে।

ঝিন্নি নৈঃশব্দের মধ্যে হঠাৎ ঢেউ তুলে বলল, আমরা কিন্তু কোয়ার্টার ছাড়িয়ে একটা নতুন আস্তানায় উঠে এলাম।

কথা শেষ হতে না হতেই বনের জটলা পেরিয়ে আমরা এসে দাঁড়ালাম একটা ফাঁকা জায়গায়। সামনে একটি ছোট বাংলো।

ঝিন্নি বলল, এটি আমাদের ফরেস্ট গার্ডের ডেরা। এখন মাস দেড়েক ছুটিতে নীচে নেমে গেছে। ওর চাবি থাকে আমারই কাছে। এ তল্লাটে ঐ বৃদ্ধই আমার একমাত্র ভরসা।

সেই মুহূর্তে আমার দারুণ শীতবোধ হচ্ছিল। হঠাৎ কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে গেল একটা হাওয়া। বললাম, ঝিন্নি দারুণ শীত এখানে।

ও বাংলোর দরজা খুলে ফেলল। আমার হাত ধরে সন্ধ্যেব আবছায়ায় ঘরের ভেতর নিয়ে গেল। একটা চারপাই-এর মত কিছু পড়েছিল। ও বলল, এর ওপর বিছানা পাতা, কম্বলও আছে। আপনি বসুন, আমি আসছি। এখানে কিন্তু ইলেকট্রিকের কোন ব্যবস্থা নেই।

আমি পাতা বিছানার ওপর বসে পড়লাম। কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিলাম। আমার কাঁপুনিটা আস্তে আস্তে কমে এল।

ঝিন্নির যেন সব কিছু মুখস্থ। এই অন্ধকারে সে একটা লণ্ঠন জ্বেলে আনল। আলোয় ঘরখানা ভরে উঠতেই দেখলাম, চারপাই-এর ওপর পরিচ্ছন্ন একটা বিছানায় আমি বসে আছি। বিছানার চাদর, লেপ, কম্বল সবকিছু মনে হল আমার চেনা। কুলুর বাংলোতে ঝিন্নিকে ব্যবহার করতে দেখেছি। বুঝলাম, আমি যখন দিবানিদ্রা দিচ্ছিলাম ঝিন্নি তখন তার বিছানাখানা ওপরের এই বাংলোতে তুলে এনেছে।

বললাম, ঝিন্নি, এখানে আমরা এলাম কেন?

ও ফায়ারপ্লেসের পাশে রাখা কাঠগুলো সাজাতে সাজাতে বলল, এখান থেকে কুলু উপত্যকা সবচেয়ে সুন্দর দেখা যায়। আজ রাতে আপনি এখানে থাকবেন আর এই বিছানায় বসেই উৎসব দেখবেন।

কি মনে এল, বললাম, আমি একা থাকব এখানে?

ইচ্ছে হলে একা থাকতে পারেন।

বললাম, আমার কোন ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই। আসার আগে সবই তো তোমার হাতে সঁপে দিয়েছি।

ও কাঠের ওপর একটা বোতল থেকে কেরোসিন ঢালতে ঢালতে বলল, তাহলে চুপচাপ বসে থাকুন, যা হচ্ছে হতে দিন।

দেশলাই জ্বেলে ও কাঠ ধরাল। কিছুক্ষণের ভেতর চিড়চিড় শব্দ করে কাঠ জ্বলতে লাগল।

আগুনটা নাচছে, ঝিন্নির ছায়া কাঁপছে। মেঝেতে খড়ে বোনা মাদুর পাতা। তার ওপর পুরোনো কাপড়ে তৈরি খিন্দ্ বিছানো। ঝিন্নি হাঁটু মুড়ে তারই ওপর বসে ফায়ারপ্লেসে একটার পর একটা কাঠ জুগিয়ে যাচ্ছে। যখন গনগনে হল আগুন, ঘরের হাওয়ায় আরামের তাপ লাগল, তখন ও উঠে এল আমার পাশে। বলল, এখুনি উৎসব শুরু হবে। জানালার ধারে সরে বসুন। তাকিয়ে থাকুন বাইরের দিকে।

আমি দূরে তাকিয়ে ঘন অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতে পেলাম না। বললাম, কিছু তো দেখছি না।

একটু ধৈর্য্য ধরে বসে থাকুন, ঠিক দেখতে পাবেন।

নিজের চঞ্চলতায় নিজেই লজ্জা পেলাম।

ঝিন্নি বিছানায় বসল না। আমার পাশে দাঁড়িয়ে ও জানালা দিয়ে ঘোলাটে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ এমনি চেয়েছিলাম অভাবিত কিছু দেখার আশায়। হঠাৎ ঝিন্নি বলে উঠল, দেখুন, দেখুন, কেল্লার মন্দির থেকে প্রথম হাউই উঠছে আকাশে।

দেখলাম, অথৈ অন্ধকার সমুদ্রের বুক চিরে একটি উজ্জ্বল অগ্নিনাগ তীরবেগে শূন্যে ছুটে চলেছে। হঠাৎ একটা শব্দে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হল। অতল আঁধারের জলে ডুবে গেছে সেই অগ্নিনাগ। এখন আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে রাশি রাশি আলোর জলবিন্দুগুলি।

সে দৃশ্য মুছে যেতে না যেতেই নীচের উপত্যকা থেকে অন্ধকারের বুকে শুরু হল আলোর ফুল ফোটানোর খেলা। ঝাঁকে ঝাঁকে উজ্জ্বল সাদা সাদা ফুল ফুটে উঠছে আকাশে আবার সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝর ঝরে পড়ে যাচ্ছে পাপড়িগুলো। কখনো বা এক পাহাড়ী টিকা থেকে অন্য টিকায় ছুটে চলেছে আলোর ঝাঁক ঝাঁক তীর।

প্রায় দু'ঘণ্টা এই উৎসব চলল। পাহাড়ে পর্বতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত শব্দে, রোশনাই-এর উজ্জ্বল আলোর বৃষ্টিতে কুলু উপত্যকা অদৃশ্য কোন যাদুকরের রহস্যময় সৃষ্টি বলে মনে হল।

এখন রাত বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শব্দ আর আকাশমুখী আলোর খেলা থেমে গেছে। শুধু দূরে কাছে পাহাড়ী গ্রাম বা টিকা থেকে ঝিকমিক জোনাকীর মত জ্বলতে দেখা যাচ্ছে কোলি-রি-দেওয়ালির চেরাগের আলো।

ইতিমধ্যে একবার চায়ের কাপ হাতে ধরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ঝিন্নি। তারপর আর তার উপস্থিতির খবর রাখিনি। চোখের উৎসবে আমার মন এমনি ডুবে ছিল যে ঝিন্নির আসা যাওয়ার লঘু পদধ্বনি আমার কানে তেমন করে বাজেনি।

এখন উৎসব শেষে পাহাড়ী রাত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেক উত্তেজনার পরে ঝিমিয়ে পড়েছে রাতের নিসর্গ। আমি জানালা থেকে চোখ ফেরাতেই দেখলাম, ফায়ারপ্লেসের ধারে ঝিন্নি একটা ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে বসে আছে। আমার দিক থেকে মুখখানা ফায়ারপ্লেসের দিকে ফেরানো। নতুন কোন কাঠ তখন জ্বলছিল না। সব কাঠ-পুড়ে দগদগে লাল একটা আভা ছড়াচ্ছিল। মনে হচ্ছিল কারো যেন রক্তঝরা হৃদয় পড়ে আছে।

আমি ডাকলাম, ঝিন্নি!

ও যেন আচ্ছন্ন একটা অবস্থা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে ফিরে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, আপনি রোশনাই দেখছিলেন তাই ডাকিনি। রাতের খাবার তৈরি।

বললাম, খাবার ইচ্ছে নেই ঝিন্নি, মন আর চোখ ভরে গেছে কোলি-রি-দেওয়ালির উৎসব দেখে।

ও বলল, আমি কিন্তু আপনার মত বসে বসে উৎসব দেখিনি, অতিথির জন্য কিছু আয়োজন করেছি।

বললাম, নিয়ে এসো, খাবার পাটটা চুকিয়ে ফেলা যাক।

আমাকে একটা টেবিলের ওপর খাবার দিয়ে ঝিন্নি দাঁড়িয়ে পরিবেশন করছে দেখে বললাম, একটা অনুরোধ রাখবে?

ঝিন্নি আমার দিকে ঘাড় কাৎ করে তাকাল।

বল রাখবে?

বলুন।

হেসে বললাম, তুমি খুব হুঁশিয়ার মেয়ে ঝিন্নি, অনুরোধটা রাখবে কিনা স্পষ্ট করে বললে না।

ও অমনি বলল, রাখব, এবার বলুন।

আমি থালা থেকে একখানা পকৌড়া তুলে নিয়ে ঝিন্নির দিকে হাত উঁচিয়ে বললাম, এটুকু বিনা প্রতিবাদে খেতে হবে। আর তোমার খাবারও আন এখানে, একই সঙ্গে বসে খাব।

ঝিন্নি হাত বাড়াল পকৌড়াটা নেবার জন্যে। অমনি আমি হাত সরিয়ে নিলাম।

উঁহু ওটি হবে না, আমার হাত থেকেই খেতে হবে।

ঝিন্নি মনে হল দারুণ বিব্রত হয়ে পড়েছে। ও হঠাৎ বলল, আমি আসছি, খাবারটা নিয়ে আসছি।

মুহূর্তে ও অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝলাম, আমার বৈপ্লবিক প্রস্তাবটা একেবারে মেনে নেবার আগে একটুখানি ভেবে নেবার সুযোগ নিল ঝিন্নি।

এক সময় একটা থালা হাতে বেরিয়ে এলো ও। চেয়ারখানা আমার টেবিলের সামনে টেনে এনে বসল। তারপর নিজের থালায় হাত দিয়ে বলল, বাব্বা কি ভীষণ লোক আপনি। এই বসলাম একসঙ্গে খেতে, হল তো?

আমি কোন কথা না বলে বসে রইলাম। হাতে আমার পকৌড়াটা তেমনি ধরা রইল।

ও আমার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ নিজের খাবারগুলো নাড়াচাড়া করল। তারপর আমার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলল, দিন।

ওর মুখে 'দিন' শব্দটা অনেক দূরের থেকে ভেসে এল।

আমি হাত বাড়াতেই ঝিন্নি আমার হাতটা ওর দুটো হাতে চেপে ধরল, তারপর মুখখানা আমার হাতের ওপর ছুঁইয়ে পকৌড়াটা তুলে নিয়েই ঘরের ভেতর দৌড়ে পালাল।

আমি চুপচাপ বসে রইলাম। ঝিন্নি আর ফিরে আসে না! আমার সারা শরীরে তখন এক অননুভূত রোমাঞ্চ খেলা করছে। ভোরের শিশিরে ভেজা আধফোটা একটা গোলাপ যেন আমি ছুঁয়ে আছি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে।

এক সময় উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে পায়ে পাশের ঘরে গেলাম। আমার পা দুটো কাঁপছিল। ও-ঘরে আলো ছিল না। বাইরের ঘরের আলোর সামান্য রশ্মি পড়েছিল ভেতরে।

আমি দেখলাম, ঝিন্নি একটা শূন্য চার-পাই-এর ওপর উপুড় হয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

আমি ঝিন্নির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও মাথা তুলল না। আমি আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম ওর চুলে ভরা মাথায়।

কতক্ষণ পরে ও একটু শান্ত হল। আমি ওকে চারপাই-এর ওপর তুলে বসালাম। ও কিন্তু ওর মুখখানা দুটো হাতের পাতা অঞ্জলিবদ্ধ করে ঢেকে রাখল।

আমি ওর পাশে বসে হাত দুটো মুখ থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঝিন্নি কিন্তু শক্ত করে মুখের ওপর চেপে রাখল ওর হাত।

বললাম, একটা দুর্বল মুহূর্তে তোমাকে দিয়ে যা করিয়ে নিলাম, তার জন্যে ক্ষমা চাইছি ঝিন্নি। তোমার সেবার বিনিময়ে আমি তোমাকে অপমান করে বসলাম। আমি তোমার যোগ্য অতিথি নয়।

মুখ থেকে দুটো হাত সরে গেল ঝিন্নির। আমি অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম, ঝিন্নি আমার দিকে স্থির দুটো চোখ মেলে চেয়ে আছে।

আমরা কেউ কারো মুখের ভাষা পড়তে পারছিলাম না।

ও কথা বলল, আপনি এমন কথা বললেন কেন বলুন?

তুমি কাঁদলে যে!

ঝিন্নি বলল, আপনি কাঁদালে কাঁদব না!

বললাম, তাই তো তোমার কাছে যে হাত দিয়ে অন্যায়টা করলাম, সেই হাত জোড় করে এখন ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

ঝিন্নি হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। ও নীচু হয়ে আমার হাত দুটো তুলে নিয়ে ওর মুখ ঢেকে ফেলল।

আশ্চর্য একটা শিহরণ আমার রক্তের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আমি ওর নরম নিটোল গাল দু-হাতে চেপে ধরতেই মনে হল ও চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেছে। আমি দারুণ উত্তেজনায় কাঁপছিলাম। ডিসেম্বরের সেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়ও আমার তপ্ত নিশ্বাসগুলো বুক ঠেলে বেরিয়ে আসছিল।

আমি ওকে চুমু খেতে গেলাম। হয়ত আমার অস্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ওকে সচেতন করে দিয়েছিল। ও আমাকে ওর চাঁপার পাপড়ির মত দুটো সুন্দর নরম ঠোঁটে চুমু খেতে দিল না। আমার বুকের ওপর মুখখানা চেপে রেখে বলল, ছোটেসাহেব, তুমি আমাকে এমনি করে মেরে ফেলো না। তুমি এমন করলে সত্যি মরে যাব।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ঝিন্নি একথা উচ্চারণ করল কেন! সে যদি আমার সান্নিধ্য না চাইত, তাহলে প্রথমেই রূঢ় তিরস্কারে আমাকে ফিরিয়ে দিত। আমার বুকের ভেতর মুখখানাকে এমন করে লুকিয়ে রাখত না। কিন্তু ঝিন্নি এমন করে বলল কেন? ও কি তবে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার আকর্ষণে আমার কাছে এসেছে!

ওর কাছ থেকে আমি ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নিতে গেলাম। ঝিন্নি আমার কাঁধের ওপর ওর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বলল, তুমি ভীষণ খেয়ালী ছোটেসাহেব, আর তুমি দারুণ.....।

কথাটা ও শেষ করতে পারল না দেখে বললাম, দারুণ কি ঝিন্নি?

ঝিন্নি ফিস্ ফিস্ করে বুকের ভেতর থেকে বলল, দারুণ কাঁদাতে পার।

আমি সে রাতে পাইন আর দেওদারের গান শুনলাম ঝিন্নিকে বুকে চেপে রেখে। রাতে আধো ঘুমে হিমেল স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরে বেড়ালাম। পাবলো পিকাশোর সেই বিখ্যাত ছবি 'জলি ইভা'এর কথা মনে এল। সেই সুন্দরী আদি নারী ইভের ছবি। কোনারকের মন্দিরে মিথুন চিত্রের সামনে দুজনে গিয়ে দাঁড়ালাম। নিটোল স্তনে হাত রেখে প্রেমিকটি চেয়ে আছে তার মুদে-আসা আঁখি প্রেমিকার মুখের ওপর। আশ্চর্য সেই ভাস্কর যে আমার ঝিন্নিকে কোন জন্মান্তরে দেখেছে।

আজ সকালের সেই সুন্দব আপেলটি মনে হল দ্বিখণ্ডিত হয়ে আমার বুক ছুঁয়ে আছে।

কখন ঘুমের মাঝে ভোর হল আমি জানতে পারিনি। চেয়ে দেখি আমার কাছ থেকে নিঃশব্দে কখন উঠে চলে গেছে রাতের ধরা পড়া সেই সোনার হরিণটি।

বিছানা ছেড়ে উঠতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলাম কত অপূর্ণতাকে কে যেন একটি রাতেই পূর্ণ করে দিয়ে গেছে। এতদিনের নিঃসঙ্গতার সব অবসাদ মুছে গিয়ে বাইরের ঐ রোদ্দুরে স্নান করা ডালিয়াটির মত আমি তাজা হয়ে উঠেছি। কি অজস্র ঠাসা পাপড়ি তার। কি আকুল তার ফুটে ওঠার আবেগ।

ঝিন্নি এসে দাঁড়াল আমার সামনে। হাতে চায়ের কাপ। ওকে চেনা যাচ্ছে না। এক রাতের ভেতর ও যেন অসম্ভব রকম পাল্টে গেছে। ওর সুন্দর চোখ, দর্শনীয় মুখখানা অনেক স্থির আর গম্ভীর হয়েছে।

বললাম, ঐ কাপে আজ আর খেতে মন চাইছে না ঝিন্নি।

ওর চোখে বিস্ময়। বলল, আমি তো ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করেই এনেছি।

বললাম, তুমি দুনিয়ার সব সেরা পাত্রে অমৃত এনে দিলেও মন আমার আর ভরবে না। এই দশটি আঙুল কাল রাতে যে দুটি আশ্চর্য সোনার পেয়ালা ধরেছিল, যে মাদক পান করেছিল তার থেকে, সেই পেয়ালার স্মৃতি আমি মুছে ফেলতে পারব কি করে ঝিন্নি।

হঠাৎ ওর চোখ দুটি ঝিলিক দিয়ে উঠল! ও চায়ের কাপখানা টিপয়ে বসিয়ে রেখে খপ্ করে আমার একখানা হাত টেনে নিয়ে ক'টা আঙুলে দাঁত বসিয়ে দিলে।

বেশ দাগ পড়ে গেলেও আমি চেঁচালাম না দেখে ও আহত হাতখানা গালের ওপর সজোরে চেপে ধরে সোহাগে আদরে ভরে দিতে লাগল। মুখে বলে চলল, তুমি ভী-ষ-ণ অসভ্য ছোটেসাহেব, বিলকুল একটা ডাকু!

দু'দিন পরে মেলা বসেছে নাগ্গরে। আমি আর ঝিন্নি পাশাপাশি হেঁটে চলেছি মেলা দেখতে। আমার পরিচিত কারো সঙ্গে যদি এ সময় আমার চোখাচোখি হয় তাহলে নিশ্চিত সে আমার পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। আমি যে পুষ্কর মুখার্জী, আস্ত এক বাঙালী সন্তান, তার কোন চিহ্নই আর আমার ভেতর তারা আবিষ্কার করতে পারবে না।

আমি পরেছি গ্রে উলেন একখানা ট্রাউজার। তার ওপর কোমরে জড়িয়েছি একটুকরো গরম কাপড়! কুর্তার ওপর চাপিয়েছি একটা ছোট কোট। সবার ওপরে গায়ে দিয়েছি রঙীন

একখানা কম্বল। আমার মাথায় ডিপ মেরুন রঙের টুপি। টুপির একেবারে চূড়োয় লালের ছোঁয়া। টিপিক্যাল কুলুর ভদ্রলোক এখন আমি। চুপচাপ আছি শুধু ভাষাটা এখনো রপ্ত করতে পারি নি বলে।

আমার পাশে চলেছে ঝিন্নি। তার পরনেও গরম সুথান। চোলির ওপর বুক থেকে বিশেষ ভঙ্গীতে কাপড় জড়ান। ব্রোচ দিয়ে জায়গায় জায়গায় আটকানো হয়েছে মেরুন রঙের কাপড়খানা। কোমর ঘিরে হলুদ রঙের একখানা ব্ল্যাঙ্কেট। কানের একাধিক ছিদ্র থেকে ঝুলছে কানবালা। অজস্র ঝুরি দোল খাচ্ছে ওর চলার তালে তালে। লম্বা বিনুনী পিঠে। টাসেলটা ঝুলছে আরও অনেকটা নিচ অব্দি। মাথায় একখানা রুমাল বাঁধা, তার ওপর টুপি।

আমার আজকের সাজখানা ঝিন্নির রচনা। সে তার বাবার এক সেট পোশাক রেখেছে এখানে। চাচাজী নাগ্‌গরে এলেই এই সেটটি ব্যবহার করেন। ঝিন্নি আমাকে পোশাক পরিয়ে ঘুরে-ফিরে দেখেছে। নিজের পোশাক পরতে ভেতরের ঘরে ঢুকেও আড়চোখে বারবার দেখেছে আমার দিকে তাকিয়ে। এই পোশাকে আমায় দেখে দেখে যেন ওর আশ মেটে না।

ও পরেছে ওর মায়ের পোশাক আর অলঙ্কার। এক সুটকেশ বোঝাই পোশাক ও রেখেছে নিজের কাছে। ওর মায়ের স্মৃতি মাখা সব ক'টি জিনিস।

কানবালা ঘাড় কাত করে পরার সময় মুক্তোর মত দু'ফোঁটা জল ওর চোখ থেকে গড়িয়ে পড়তে দেখে অবাক হয়ে বলেছিলাম, তুমি আবার কাঁদছ ঝিন্নি?

ও চোখ মুছে বলেছিল, আমার সারা গায়ে আজ মায়ের ছোঁয়া লেগেছে ছোটেসাহেব, তাই কাঁদছি।

ঝিন্নির সাজসজ্জা হয়ে গেলে ওকে বললাম, তোমার মায়ের ঐ সুন্দর ছোট্ট টুপিটা মাথায় পরবে না?

ও মাথা নেড়ে বলল, বিয়ে না হলে কোন কুমারী মেয়েই টুপি পরে না ছোটেসাহেব।

আমি ওর মায়ের টুপিখানা নেড়েচেড়ে দেখতে লাগলাম। তারপর ওর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে এক ফাঁকে সেই টুপি ওর মাথায় পরিয়ে দিতেই ও চমকে আমার দিকে ফিরে চেয়ে বলল, এ কি করলে ছোটেসাহেব! এর অর্থ তো তোমার অজানা নয়।

বললাম, জানি বলেই তোমার মাথায় ঐ সুন্দর টুপিটা পরিয়ে দিলাম ঝিন্নি। এর সব দায় আমার। তোমার অমত না থাকলে এ দায় আজীবন বইতে পারব।

ঝিন্নির চোখে আবার জল গড়াল। ও অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুমি কাছে এসো ছোটেসাহেব। তোমাকে আমি আর একটুও দেখতে পাচ্ছি না।

আমি কাছে যেতেই ও আমার বুকে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদল কতক্ষণ। আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। ও শান্ত হল। মাথায় সুন্দর ছোট্ট টুপিটা তেমনি পরা রইল।

মেলায় বেরিয়ে আসার সময় ঝিন্নি বলল, জান ছোটেসাহেব, টুপিটা মাথায় রেখে মনে হচ্ছে আমার মায়ের আশীর্বাদ আমি মাথায় ধরে আছি।

আমি ওর সুন্দর মুখখানা তুলে অনেকক্ষণ ওকে দেখলাম।

এখন আমরা কেল্লা ছাড়িয়ে অনেক নিচে নেমে এসেছি। আরও খানিক নিচ থেকে মেলার শুরু। গানের সুর ভেসে আসছিল। মেলার কোলাহলও। সাজ-পোশাক পরে ছেলে-বুড়ো তরুণ-তরুণীরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে। দোকানপসার বসে গেছে। এখন দুপুর। অনেক অনেক লোক ঘুরে ঘুরে কেনাকাটা করছে।

আমরা এদিক-ওদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ ঝিন্নি তার মাথা থেকে এক ঝটকায় টুপিটা খুলে ফেলে আমার হাতে দিয়ে চাপা গলায় বলল, তোমার কম্বলের ভেতর লুকিয়ে ফেল তাড়াতাড়ি।

কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই, তাই কোন প্রশ্ন না করে ওর টুপিটা কম্বলের আড়ালে ঢেকে ফেললাম।

ঝিন্নি চোখের পলকে পথ বদলে নিল। আমিও ওকে অনুসরণ করে মেলার জনারণ্যে হারিয়ে গেলাম।

মেলা ছেড়ে আমরা এক সময় নেমে এলাম একটা পাহাড়ের ঢালে। ওখান থেকে আঁকাবাঁকা পথে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এক সময় এসে পড়লাম বিপাশার তীরে।

কাছাকাছি কতকগুলো গাছের জটলা। তার তলায় এক দঙ্গল ভেড়া। কতকগুলো গাদ্দী মেয়ে-পুরুষ সেখানে সংসার সাজিয়ে বসে আছে। ওরা পায়ে চাপড় দিয়ে দিয়ে গান গাইছিল :

গাদ্দী চরদা ভেদন
গাদ্দান দিন্দি ধুপ।
গাদ্দী জো দিন্দা ভেদন
গাদ্দান জো দিন্দা রূপ।।

ঝিন্নি চলতে চলতে থেমে গেল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

ওরা গান থামিয়ে ঝিন্নি আর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসল। ঝিন্নিও সে হাসিতে যোগ দিয়ে এগিয়ে গেল। আমি তেমনি দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঝিন্নি কাছে যেতেই গাদ্দী মেয়েরা উঠে দাঁড়াল। ঝিন্নি ওদের সঙ্গে গাদী ভাষায় অনর্গল কথা বলে চলল। মাঝে মাঝে সবাই মিলে হাসির লহর তুলছিল।

পুরুষদের পরনে চোল, টুপিতে পালক, কানে রিং, কোমরে উলের দড়ি।

গাদ্দানরা চোল পরেছে পুরুষদের মত। এদের পোশাক আঁটসাঁট। গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে আছে একেবারে গোড়ালী ছুঁয়ে মেয়েদের পোশাক। মাথাটি ঢেকে নিয়েছে চাদরে। কানে দুলছে বালি। রূপোর টাকা আধুলি সিকি দিয়ে তৈরি হয়েছে ওদের হার। সুন্দর গলায় সে হার মানিয়েছেও সুন্দর।

আমি চেয়ে আছি ওদের মুখের দিকে। কথায় কথায় এমন চোখের কারুকার্য দেখলে মাথায় ঘোর লাগে। পাশে নিচু একটা পাহাড়। গাদ্দীরা বলে ব্যান। সেই ব্যানে গার্ণা আর কাংগুর ঝোপ। একটা কাংগু অতি দীনের মত একরাশ ডালে গোটাকতক পাতা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক'টা লোভী ভেড়া শীতের দিনে ঘাস পাতা না পেয়ে গার্ণার ঝোপে মুখ

ঠেকিয়ে বুলবুল করে পাতা চিবোচ্ছে। তাদের ভেতর দুঃসাহসী একটা মদ্দা ভেড়া পেছনের দুটো পা পাহাড়ের ওপর ঠেলে রেখে সামনের পা দুটো তুলে দিয়েছে কাংগু গাছটার কাণ্ডে। অনেক কসরৎ করে একটিমাত্র পাতা সংগ্রহ করতে সে সমর্থ হল।

একটি গাদ্দী বুড়ো উঠে এল গাছতলা থেকে। আমাকে ডেকে নিয়ে গেল ওদের ডেরায়।

আমি গাছতলায় গিয়ে পৌঁছতেই একটি মেয়ে ছাগলের লোমে তৈরি একখানা রঙীন থোবি পেতে দিল মাটিতে। লোকটি ইঙ্গিতে বসতে বললে, আমি তার ওপর বসলাম। মেয়েটি আমার দিকে সেই আশ্চর্য চোখে চেয়ে একটু হেসে চলে গেল। কিছুক্ষণের ভেতরেই সে একটা কলি আগুন বোঝাই করে নিয়ে এসে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল।

তামাক খাবার অভ্যেস আমার নেই। একে তো সেজেছি উদ্ভট, তার ওপর যখন বেপরোয়া হয়ে আনাড়ীর মত কল্কে টানতে লাগলাম, তখন নিশ্চয়ই সে এক দর্শনীয় ব্যাপার হল। ভাগ্যিস আয়না ছিল না সামনে। আর বিধাতার অনুগ্রহে মানুষ নিজের চেহারাখানা ভাল করে দেখতে পায় না, এই যা রক্ষে। আমি কলি টানি এক এক দম আর কেশে কেশে খুন হই। শেষে সবিনয়ে একজনার হাতে চালান করে দিয়ে নিষ্কৃতি।

তাও নিষ্কৃতি চাইলেই কি পাওয়া যায়। কথা বলছে ওরা, আমি মাথা নেড়ে মৃদু হাসিতে পরিস্থিতি ঠেকাচ্ছি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসি গল্পে মেতে আছে ঝিন্নি। বার চারেক আড় চোখে ও দেখল আমাকে। কিন্তু কি ভীষণ মেয়ে রে বাবা, আমি ঘোর বিপদে পড়ে আছি জেনেও একেবারে কাছে ঘেঁষল না।

কিছু সময় ওদের ভেতর কাটিয়ে উঠলাম আমরা। চলতে লাগলাম বিপাশার তীর ঘেঁষে। পেছন ফিরে দেখলাম, গাদ্দী মেয়েরা কোমর জড়িয়ে ধরে আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে! আমরা হাসি দিয়ে ওদের হাসির জবাব দিলাম।

চলতে চলতে ঝিন্নি বলল, বেশি চেয়ো না ওদের দিকে, ঘরে ফিরতে পারবে না। গাদ্দানদের চোখের ভাষা ওদের মুখের ভাষার চেয়েও জোরালো।

বললাম, ওদের দোষ দিচ্ছ কেন ঝিন্নি, সব মেয়েরই মুখের ভাষার চেয়ে চোখের ভাষার জোর বেশি।

ঝিন্নি আমার মুখের ওপর মৃদু তিরস্কারের এক চাউনি হানল। ওর চোখ দুটো সুন্দর। আরও সুন্দর আর অর্থবহ হয়ে উঠল এখন।

আমরা গমের একটা ক্ষেত পেরিয়ে এলাম। ক্ষেতের ঢাল কয়েকটা ঢেউ তুলে তুলে বিপাশার তীর অব্দি নেমে এসেছে। সবুজের যেন ঢল নেমেছে শীতের নদীতে।

ঝিন্নি কথা বলল, আমরা যখন গাদ্দীদের আড্ডায় গিয়েছিলাম তখন ওরা একটা গান গাইছিল না?

বললাম, হাঁ, কিন্তু ধুপ আর রূপ এ দুটো শব্দ ছাড়া আর কিছু বুঝি নি।

ঝিন্নি বলল, জানো, গাদ্দীদের নানা ধরনের বিচিত্র সব বিশ্বাস আছে। ওদের পথে পথে দেবতার বাস। ওরা যখন লাহুল স্পিতি, আরও অনেক উঁচু উঁচু পর্বতে ভেড়া নিয়ে যায় তখন গিরিপথের দেবতার কাছে ভাল আবহাওয়ার জন্যে প্রার্থনা জানায়। ওরা পাস পার

হবার সময়ে মাথা নীচু করে চলে, কথা বলে না, পাছে পর্বতের দেবতার কোপে পড়তে হয়। আবার বনের ভেতর দিয়ে যাবার সময় ওরা বনের দেবতা বাণবীরের পূজো করে। ওরা যখন নদী পার হয়, তখন নদীর আত্মা বাতালের উদ্দেশ্যে খাবার উৎসর্গ করে। সাপে যাতে ওদের না কাটে, সে জন্যে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে সাপের রাজা কেলাং-এর মূর্তি। ওদের আদি বাসভূমি ধৌলাধারের টিকায় টিকায় দেবতা গুগার পুজো হয়। গাদ্দীদের সম্পদ, ভেড়াদের রক্ষা করার ভার তাঁর ওপর।

বললাম, যাযাবর মেষচারক ওরা, খোলামেলা প্রকৃতির সঙ্গেই ওদের নাড়ীর যোগ। তাই প্রকৃতির পাহাড় নদী বন সব জায়গাতেই ওদের দেবতার এক একটা আস্তানা রেখে দিয়েছে।

ঝিন্নি বলল, দেখ তো, কি কথা নিয়ে শুরু করলাম আর এসে পড়লাম কোন কথায়।

বললাম, তোমার ঐ গানের কথা হচ্ছিল।

ঝিন্নি বলল, মনে আছে। ওরা অনেক দেবতার পুজো করে ঠিক, কিন্তু ওদের আসল দেবতা শিব। আর ঐ গানটিতে শিবের কথাই হচ্ছিল।

ঝিন্নি গানটা সুর করে নিচু গলায় গাইল :

গাদ্দী চরদা ভেদন
গাদ্দান দিন্দি ধূপ।
গাদ্দী জো দিন্‌দা ভেদন
গাদ্দান জো দিন্‌দা রূপ।।

নির্জন নদীর পথে গানের পাহাড়ী সুরটুকু বড় ভাল লাগল। এ গানে গলার কাজ নেই, শুধু সুরের ওঠানামা আছে। পাহাড়ের যেন চড়াই উৎরাই। ঝিন্নির গলায় ঠিক গাদ্দী মেয়েদের সুরটা যেন বেজে উঠেছে।

গান থামিয়ে ঝিন্নি বলল, গাদ্দীরা মেষ চরায় তাই শিব তাদের দান করলেন মেষ। আর গাদ্দী মেয়েরা শিবকে দিল ধূপ তাই শিব দিলেন তাদের রূপ।

বললাম, চমৎকার।

ঝিন্নি বলল, ওদের গানের ভাবগুলো ভারী সুন্দর। আর একটা গান শুনবে?

কথাটা বলেই ঝিন্নি আবার গুন গুন করতে লাগল। একটু পরে বলল, দূর ছাই মনে আসছে না সুরটা। আচ্ছা মানেটা বলছি শোন। মেয়েটির বাপের বাড়ি কাংড়ায় ধৌলাধার পাহাড়ের কোলে। বিয়ে হয়েছে তার ধৌলাধারের ওপারের চম্বা ভ্যালিতে। মেষ চরাতে গিয়ে অনেক দূরে মেয়ের বিয়ে দিয়ে এসেছে বাপ। এখন বাপের বাড়িটা দেখার জন্য মেয়ের মন কেঁদে উঠল। বাধা ধৌলাধার পর্বতটি। সে তাই মিনতি করে বলছে, হে ধৌলাধার, কৃপা করে একটুখানি নিচু কর তোমার মাথা, আমি এক পলকে আমার বাপের বাড়িটা একবার দেখে নি।

বললাম, ঝিন্নি, সত্যি তোমার গুণের শেষ নেই। আঁকতে পার গাইতে পার আবার গবেষকের মত হাজার তথ্যও যোগাড় করতে পার।

ঝিন্নি বলল, আর এত মুখরোচক খাবারগুলো যে তৈরি করে খাওয়ালাম সেগুলো বুঝি কোন গুণের নয়?

বললাম, তোমার এতগুলো গুণের কথা শুনলে পাত্রপক্ষ আর সাহস করে তোমার কাছে এগোবে না।

ঝিন্নি বলল, বাঁচা যাবে।

বললাম, একজন কিন্তু এ বিষয়ে খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছে। সে নির্ভয়ে এগিয়ে এসেছে।

ঝিন্নি আমার দিকে ফিরে দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

ওর কাছে গিয়ে বললাম, আমি শুধু ডাক্তার ঝিন্নি, কানাকড়ি এমন গুণ আমার নেই যার বলে তোমাকে কাছে টানতে পারি।

ঝিন্নি আমার হাত দুটো হাতের ভেতর ধরে দোলাতে দোলাতে বলল, তাই তো! একটুও তুমি আমার পছন্দের মানুষ নও ছোটেসাহেব! এখন বল তোমাকে নিয়ে আমি কি করি।

হঠাৎ মনে এলো কথাটা। বললাম, আচ্ছা মেলা থেকে তুমি হঠাৎ এ পথে চলে এলে কেন ঝিন্নি, আর কেনই বা টুপিখানা আমাকে লুকিয়ে ফেলতে বললে?

ঝিন্নি আমার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, মদনলালকে দেখলাম যে।

মদনলাল কে, ঝিন্নি? তোমাদের পরিচিত?

ও চলা শুরু করল। গলার স্বর নামিয়ে বলল, বলতে পার। ও সরকারী ট্যুরিস্ট বাংলোর একজন অফিসার।

বললাম, ওঁকে দেখে লুকোবার বা ভয় পাবার কি আছে?

ঝিন্নি বলল, বড্ড জ্বালাতন করে লোকটা। কুলুতে যখন ছিল তখন রোজ হাঁটাহাঁটি করত চাচাজীর কাছে। চাচাজী তো মদনলালের ব্যবহারে একেবারে গলে জল। এখন আমার যেই নাগ্‌গরে চাকরিটা হয়েছে অমনি পিছু নিয়েছে। তদ্বির করে কুলু থেকে এসেছে নাগ্‌গরে।

বললাম, ভদ্রলোককে খারাপ ভাবছ কেন ঝিন্নি? হতে পারে উনি একজন গুণগ্রাহী।

ঝিন্নি কেমন যেন ক্ষেপে গেল, তুমি থামবে? আমার চেয়ে তুমি ওকে বেশি চেন ছোটেসাহেব? একটি পুরুষের মুখের দিকে চাইলেই আমরা তার মনের অনেক কিছু আঁচ করতে পারি।

বললাম, ভয় পেয়ে যাচ্ছি ঝিন্নি। কতবার তোমার মুখোমুখি হয়েছি, কি যে ভেবে বসে আছ তুমি আমার সম্বন্ধে তা ভগবানই জানেন।

ঝিন্নি বলল, আচ্ছা সব কথাকে এমন হালকা করে দাও কেন বল তো? লোকটা ভীষণ খারাপ।

আমার চেয়েও?

ঝিন্নি বলল, সারা পথ দেখো তোমার সঙ্গে যদি আর একটিও কথা বলেছি।

আমি ঝিন্নির পেছনে চলেছিলাম। এখন ওর একখানা হাত ধরে পাশাপাশি চলতে লাগলাম।

বললাম, ঝিন্নি, সব কিছুকে সিরিয়াসলি নিলেই কষ্ট পেতে হয়। এমনও তো হতে পারে মানুষটি মনে মনে তোমাকে ভালবাসে।

ঝিন্নি কোন কথা বলল না।

আবার বললাম, এই যে তোমার আমার চারদিকে এত অজস্র টুকরো টুকরো ছবি, এদের দিকে কি না তাকিয়ে পারা যায় ঝিন্নি? তেমনি ও মানুষটাও হয়ত সুন্দরের দিকে না তাকিয়ে পারে না। এতে তুমি খুশি না হতে পার, কিন্তু মানুষটাকে নিশ্চয়ই তারিফ করতে হয় তার শিল্প-রুচির জন্য।

ঝিন্নি হঠাৎ আমার হাত ছেড়ে খুব জোরে পা চালিয়ে চলে গেল সামনের দিকে। আমি যেমন চলছিলাম তেমনি চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণের ভেতর সামনের একটা পাহাড়ের বাঁকে ও অদৃশ্য হল। আমি সম্ভবমত জোরে পা চালিয়ে পাহাড়টার কাছে গিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই।

পাহাড়টার মাঝামাঝি জায়গায় দুটো বড় বড় শিলাস্তূপ দেখা যাচ্ছিল। আমি পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে ভেবে পেলাম না, এত লম্বা একটা পাহাড়ী বাঁক ও এই অল্প সময়ের ভেতর পেরিয়ে গেল কি করে।

আমি ধীরে ধীরে অচেনা পথে এগোতে লাগলাম। পাহাড়ের মাঝামাঝি দুটো শিলাস্তূপের ভেতর অন্ধকার একটা ফাটলের মত। একটা ঝোরা তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে নিচের উপত্যকায় গিয়ে পড়েছে।

বেশ খানিক নিচে সরশোনের ক্ষেত। ফিকে হলুদ ফুলগুলো যেন বিরাট একখানা হলুদ কার্পেট পেতে রেখেছে। জলধারা গেছে ক্ষেতের মাঝ বরাবর। ওপর থেকে আমি দেখেছিলাম, সূর্যের আলো নীচের জলধারার ওপর পড়ে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। কে যেন আকাশ থেকে রূপোলী তীর ছুঁড়ছে ঝাঁক ঝাঁক।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম অনেক পথ হেঁটে। জলতেষ্টা পেয়েছে। ঝোরার জল খাব বলে যেই বসে হাত বাড়িয়েছি, পেছন থেকে ঝিন্নির গলা ভেসে এল, এই, খেয়ো না ও জল, শরীর খারাপ করবে।

পেছনে চেয়ে দেখি অন্ধকার পাহাড়ী ফাটলের ভেতর থেকে একটি পরিচিত মুখ উঁকি দিচ্ছে। সে মুখে আতঙ্কের ছবি।

কোন কথা না বলে আমি যেন ঝিন্নিকে উপেক্ষা করছি এমনি ভাব দেখিয়ে আবার আস্তে আস্তে জলের দিকে হাত বাড়ালাম।

একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার তুলে ঝিন্নি প্রায় আমার পেছনে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল।

কি হচ্ছে ছোটেসাহেব, এ জল কেউ খায় না, খেতে নেই।

ঝিন্নি পেছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। মুখ ফিরিয়ে বললাম, এত পথ হাঁটালে, এখন তেষ্টা মেটাই কিসে বল?

আমার চোখে দুষ্টুমির ছবি ফুটে উঠেছিল। ঝিন্নি আমাকে সামনের দিকে প্রায় ঠেলে দিয়ে পিছু হটে দাঁড়াল। আমি কোন রকমে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই ঝিন্নি বলল, খূ-উ-ব লোভী হয়ে উঠেছ তুমি।

কোন কথা না বলে ওর পাশ কাটিয়ে পথের ওপর গিয়ে উঠলাম। তারপর ঝোরাটা পেরিয়ে পায়ে পায়ে চলতে লাগলাম।

ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেলল ঝিন্নি। বলল, অমনি রাগ হয়ে গেল?

বললাম, অনেকক্ষণ বাইরে তো ঘুরে বেড়ান হল, এখন মেলায় ফিরবে না?

ঝিন্নি আমার হাত ছেড়ে দিয়ে পথের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। বেশ বুঝতে পারলাম আমার কথায় ঝিন্নি আহত হয়েছে। আমি যে ওর নির্জন সঙ্গ থেকে মেলায় যাওয়াটাকে পছন্দ করছি এটা তার অভিমানে আঘাত করেছে। ফিরে বললাম, কি হল?

ঝিন্নি নীচের সেই হলুদ ক্ষেতের দিকে চেয়ে রইল, মুখে কথা নেই।

কাছে গিয়ে বললাম, দেবী হির্মার নামে শপথ করছি, ঝিন্নি .....।

হঠাৎ ঝিন্নি আমার দিকে ফিরে আমার মুখে ওর হাতটা চেপে রেখে বলল, দোহাই তোমার ছোটেসাহেব, হির্মার নামে শপথ নিও না। আমার বড় ভয় করে। হির্মা বড় জাগ্রত। তুমি যা চাও তোমাকে তাই দেব।

ওর চোখ ছলছল, গলাটা কাঁপছে।

ওর হাতটা ধরে আমার ঠোঁটে ঠেকিয়ে বললাম, ভয় নেই ঝিন্নি, আমি শপথ নেবো না। আর তোমার কাছে এত পেয়েছি যে লোভীর মত আরও বেশি চেয়ে আমার পাওয়া জিনিসগুলোর মূল্য কমিয়ে দেব না।

ঝিন্নি সহজ হল। সে শক্ত করে আমার হাত ধরে কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আমি ওর হাতের ভাষা থেকে বুঝলাম, ঝিন্নি ওর আকুল অনুভূতির গভীরে ডুব দিয়েছে।

একসময় ও বলল, প্রথম যেদিন তুমি চাচাজীর সঙ্গে কুলুতে এলে সেই দিনটি থেকেই আমার সমস্ত মন তোমার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত ছোটেসাহেব। তোমার প্রতিটি পায়ের সাড়া, প্রতিটি কথা আমার কানে ধরা পড়েছে। তোমার হাসি চলাফেরা আমি আমার চোখের ভেতর ধরে রেখেছি। শুধু মুখ ফুটে বলতে পারিনি, আমি তোমার বুকে মুখ লুকিয়ে একটু চুপচাপ থাকতে চাই।

বললাম, বেলাশেষের আলোয় সেদিন তোমাকে আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছিল। অনেক কথা শুনেছিলাম তোমার সম্বন্ধে, তাই মনে হল তুমি যেন আমার অনেক দিনের চেনা। যাকে চোখের প্রথম দেখায় ভাল লাগে তার সম্বন্ধে বোধহয় এমনি মনে হয়।

ঝিন্নি বলল, পিতাজী থাকলে কি যে খুশি হতেন আমাদের দেখে।

বললাম, চাচাজী যখন বাবার মৃত্যুর খবর জানিয়ে কলকাতায় চিঠি লিখলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে কুলুতে চলে আসতে বললেন, তখনও বুঝি নি আমি কুলুতে এসে সত্যিকারের কি পাব। আজ মনে হচ্ছে বাবার ওপর অভিমান করে যদি না আসতাম তাহলে বেলা শেষের হলুদ আলোয় যে মেয়েটিকে প্রথম দেখেছিলাম, তাকে এত কাছে পেতাম না।

ঝিন্নি আমার দিকে চেয়ে রইল। ও কথা বলতে পারছিল না। আমি লক্ষ্য করেছি ঝিন্নি অল্পতেই গভীর হতে পারে। ও যেমন উচ্ছল তেমনি আবাব আবেগপ্রবণ।

ঝিন্নি নিজেকে এবার সহজ করে নিয়ে বলল, এসো তোমাকে আজ আমার একটা গোপন জায়গা দেখাই। কুলুর বাংলো থেকে পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে বিপাশা নদী আর বন দেখিয়ে তোমাকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলাম না?

ওর পেছনে চলতে চলতে বললাম, হাঁ, সেদিন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

ঝিন্নি এবার আমার হাত ধরে ঝোরাটা সাবধানে ডিঙিয়ে ঢুকল সেই অন্ধকারপ্রায় ফাটলের ভেতর। একটু ভেতরে যেতেই একটা আলোর রশ্মি দেখা গেল। আরও কয়েক পা এগোলাম, কখনো বা জল ছুঁয়ে আবার কখনো বা পাথরের বড় বড় নুড়ির ওপর সাবধানে পা রেখে। জায়গাটার পরিসর এখন অনেক বেড়েছে।

ঝিন্নি একটা বড় পাথর দেখিয়ে বলল, এসো এখানে বসি।

ভেতরে যতটা শীত বোধ হবে ভেবেছিলাম তা হচ্ছিল না। বাইরের কনকনে হাওয়াটা ছিল না এখানে, তাই রোদ্দুর না থাকলেও জায়গাটা অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক ছিল।

আমি কম্বলটা গা থেকে খুলে পাথরখানার ওপর পাততে যাচ্ছিলাম, ঝিন্নি বাধা দিয়ে আমার হাত থেকে কম্বলটা টেনে নিয়ে বলল, বসই না এমনি। কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে নিলে আরাম পাবে।

আমি পাথরখানার ওপর বসে পড়তেই ঝিন্নি আমার গায়ে কম্বলটা ঢেকে দিতে লাগল। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওকে টেনে আমার পাশে বসালাম। কম্বলখানার ভেতর ওকেও জড়িয়ে নিলাম।

ও মিঠি মিঠি হাসছিল আমার দিকে চেয়ে। ফিসফিস করে বলল, আবার দুষ্টুমি!

আমি শুধু ওর চোখের দিকে চেয়েছিলাম। ওর ঐ ছোট্ট আয়নায় আমার প্রতিবিম্বখানা কিভাবে পড়েছে তাই দেখছিলাম।

বললাম, ঝিন্নি, আমার মনে হচ্ছে এখন আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে নিভৃত নির্জন স্থানে রয়েছি। এখন দুষ্টুমি করে এই নির্জনতাটুকুকে ভেঙে দিতে কি মন চায়।

ও চোখের পাতা ফেলছে না। অবাক হয়ে আমার কথা শুনছে। একটি যুবক যে এই নির্জনতাকে ভাঙতে চাইছে না এটা যেন অবিশ্বাস্য একটা ঘটনা।

ওকে আমার বাঁহাতে জড়িয়ে ধরে আরো কাছে টেনে এনে বললাম, ঝিন্নি, এ জায়গাটা তুমি আবিষ্কার করলে কি করে বলতো? আমার ভীষণ অবাক লাগছে।

ঝিন্নি বলল, বলব না।

হেসে বললাম, আমার এমন কিছু নেই যে ঘুষ দিয়ে কথা আদায় করে নেব।

ও বলল, তাহলেও বলতাম না।

বললাম, তাহলে তো আমার সব কথাই এখানে ফুরোলো।

ও কিছুক্ষণ চুপচাপ কি ভাবল। এক সময় বলল, তুমি হয়ত জাননা আমার চরিত্রে একটা বেপরোয়া ভাব আছে। আমি ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি। ভয় পাই না কোন কিছু থেকে। নিভৃত কোন জায়গা হঠাৎ আবিষ্কার করাতেই আমার আনন্দ।

নাগ্‌গর থেকে একদিন নেমে ঠিক এমনি দুপুরে এই নির্জন পাহাড়ী পথটা ধরে চলছিলাম। হঠাৎ পাহাড়ের এই ফাটলের কাছে এসে একটা চাপা আওয়াজ শুনতে পেলাম। প্রথমে ভাবলাম এই কুহলটার শব্দ। কান পেতে কিন্তু আমার ধারণা পাল্টাল। কেউ যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে বলে মনে হল। হয়ত অন্য কেউ হলে ভয় পেত, আমার কিন্তু দারুণ কৌতূহল হল। আমি পায়ে পায়ে ভেতরে ঢুকে এতদূরে চলে এলাম। দেখি, একটি মেয়ে বসে আছে ঠিক যেখানটাতে আমি বসে আছি এখন।

মেয়েটা আমাকে দেখে চমকে উঠল। আমি তার কাছে এসে দাঁড়ালাম। ওর চোলি বুক থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। সারা গায়ের কাপড় এলোমেলো। আমাকে এখানে দেখবে ও একেবারে ভাবতে পারেনি। অজানা একটা ভয়ে ওর কান্না থেমে গেছে।

বললাম, তুমি এখানে!

ও বলল, বেরোতে পারছি না। বলেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

আমি আমার চোলিখানা ওকে খুলে দিয়ে বললাম, শিগ্‌গির পরে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

ও আমার কথামত কাজ করল। যাবার সময় আমার সামনে নতজানু হয়ে বসে কৃতজ্ঞতা জানাল। বললাম, আর কোনদিন এখানে এসো না, তাহলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।

মেয়েটা বলল, ও যে এমন সাংঘাতিক তা আমি বুঝতে পারিনি। ওকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম।

বললাম, নিজেকে রক্ষা করার বুদ্ধি বা শক্তি কোনটাই তোমার নেই। তাই ও তোমাকে ঠকাতে পেরেছে। ওকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই।

মেয়েটি পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেল। আমি সন্ধ্যে না নামা পর্যন্ত এইখানেই বসে রইলাম। চোলি ছাড়া দিনের আলোয় বেরিয়ে আসতে পারলাম না। সেই থেকে এ গুহা আমার দখলে।

বললাম, তুমি চিনতে মেয়েটিকে ?

ঝিন্নি বলল, না।

অবাক হয়ে বললাম, সেকি ! তাহলে সব কাহিনীটুকু জেনে নিলে না কেন?

ঝিন্নি বলল, খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করার অভ্যেস কোনদিনই আমার নেই ছোটেসাহেব। আর জেনেই বা লাভ কি। একটি পুরুষ মেয়েটিকে লোভ দেখিয়ে এখানে এনেছে। মেয়েটি হয়ত বেশিদূর এগোতে চায় নি, ফলে পুরুষটি হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার ওপর। এর বেশি জানার কি আছে।

বললাম, আজ এমন সুন্দর একটা জায়গায় এসে মনটা সত্যি খারাপ হয়ে গেল ঝিন্নি। পৃথিবীতে কি এমন কোন নিভৃত জায়গা নেই যেখানে বুকের মধ্যে একখানা মুখ নিবিড় করে ধরে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু চুপচাপ বসে কাটিয়ে দেওয়া যায়।

ঝিন্নি আমার বুকের মধ্যে ওর মুখখানা লুকিয়ে ফেলে বলল, আমি হারিয়ে গেছি ছোটেসাহেব, তুমি আর আমাকে খুঁজে পাবে না।

ওর একরাশ চুলে ভরা মাথায় আমার মুখখানা নামিয়ে এনে বললাম, কোথায় হারাবে ঝিন্নি, আমার বুকের ভেতর হাতড়ে হাতড়ে আমি ঠিকই আমার হারানো রক্তপ্রবালটি খুঁজে পাব।

ঝিন্নি দুষ্টুমি করে ওর কপাল আর টিকলো নাকখানা আমার বুকের মাঝে ঘষতে লাগল। তারপর হঠাৎ ধড়মড় করে একটা খরগোশের মত কম্বল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই যা! আসল জিনিসটাই তোমাকে দেখানো হয়নি ছোটেসাহেব। এসো একটা ম্যাজিক দেখাই।

বোকার মত বললাম, তুমি ম্যাজিক দেখাবে ঝিন্নি?

ও আমার হাত ধরে তুলে ঐ পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পথে আরও দু-এক পা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, এবার বাঁদিকে উঁকি দিয়ে দেখ, আর এক পা-ও এগিয়ো না যেন।

আমি ওর কথামত চেয়ে দেখি, পাহাড়ের এপারে নাগ্‌গরের সেই পরিচিত মেলা, সেই জনারণ্য।

বললাম, সত্যি অবাক যাদু দেখালে ঝিন্নি! এই পথে সুড়ঙ্গ পেরিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামলে অল্পসময়ের ভেতরেই আমরা মেলায় পৌঁছে যাব।

ঝিন্নি পাশ থেকে আমার হাতখানা জোরে টেনে ধরে বলল, মাথায় হঠাৎ প্ল্যানটা গজিয়ে উঠল বুঝি? খুব সোজা পথে মেলায় নেমে যাবে, তাই না?

হঠাৎ ঐ কুহলের মত কলকল হাসি হেসে বলল ঝিন্নি, ছোটেসাহেব, এটা যাদুর মেলা, যাদুর তৈরি পথ। এ পথে নামতে নেই।

পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের মেলাটা মনে হচ্ছে ঠিক যেন একটা সাজানো ফুলের বাগান। সাদা নীল লাল হলুদ ফুল ফুটে আছে। বাতাসে ফুলগুলো যেন দুলছে। কত বিচিত্র রঙের পোশাক, কত সজ্জিত নারীপুরুষের মিছিল।

মেলার একপ্রান্তে একটি বৃত্ত রচনা করে কোমরে হাত জড়িয়ে উদ্দাম নেচে চলেছে একদল পুরুষ। ধবধবে পোশাকে তাদের মনে হচ্ছে ঢেউয়ের মাথায় জেগে ওঠা পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্র ফেনা। বৃত্তের কেন্দ্রে লালপোশাক পরা কটি মেয়ে ঠিক যেন পাপড়ি-খোলা একটি রক্ত-শতদল। বৃত্তের ঢেউগুলো শ্বেতহংসের মত একবার এগিয়ে চলেছে সেই রক্তপদ্মের দিকে, আবার পিছিয়ে আসছে। উদ্দাম হয়ে উঠেছে তাদের আকাঙ্ক্ষা। স্পর্শ করতে হবে ঐ অধরা রক্তপদ্মটিকে। ঘূর্ণির মত ঘুরে ঘুরে প্রবল বেগে চলেছে নাচ। সমুদ্রের ঢেউ যেন উচ্ছ্বসিত আবেগে এগিয়ে চলেছে, আবার পেছনের টানে সরে যাচ্ছে দূরে।

আমি তন্ময় হয়ে দেখছিলাম, আমার হাত ধরে ভেতরের দিকে টানল ঝিন্নি। বলল, তোমাকে না এগিয়ে যেতে মানা করেছি! সবার চোখ এসে পড়বে এই সুড়ঙ্গের মুখে।

লজ্জিত হলাম। নিচে তাকাতে গিয়ে কখন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেছি। হয়ত অধরাকে ধরার নেশায় পেয়ে বসেছিল আমাকেও।

আমরা আবার এসে বসলাম সেই পাথরের আসনে, ঠিক তেমনি কম্বলের ভেতরে দুজনে। হঠাৎ আমার মনে হল, সবটা সত্যিই বুঝি যাদু। এই চঞ্চল রঙিন মেলা, এই বিস্ময়কর সুড়ঙ্গ-পথ আর এই রহস্যময়ী তরুণী, যাকে পৃথিবীর এমন এক নির্জন নিভৃততম স্থানে বুকের মধ্যে পেয়েছি।

সন্ধ্যার কাছাকাছি সেই যাদুর জগৎ থেকে আমরা দুজন বেরিয়ে এলাম। বাইরে প্রচণ্ড শীত। হাওয়ায় করাতের ধার।

ঝিন্নি আকাশের দিকে চেয়ে রইল। অস্তসূর্যের ঘোলাটে লাল রঙটা পীরপাঞ্জালের মাথায় থমকে থেমে আছে।

ও বলল, চল তাড়াতাড়ি পালাই। তুষার ঝড় শুরু হতে পারে।

আমরা যে পথে পাহাড়ে উঠেছিলাম সেই পথে নেমে এলাম। ঝিন্নি আর আমি চলেছি পাশাপাশি, কখনো বা আগে পিছে। আমি ভাবতে ভাবতে চলেছি, এখন থেকে অনাগত দিনের কত উঁচু নিচু পথ আমরা এমনি করে একই সঙ্গে চলব। ঝিন্নি আমার পাশে থাকবে একথা ভেবে একধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করছি। কত মানুষ এই পৃথিবীর কত পথ ধরেই না চলে। হঠাৎ দুজন থমকে দাঁড়ায়। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বলে, চল, এখন থেকে আমরা একই সঙ্গে পথ চলি।

আবার কোথা থেকে একটা ভাবনা এলো মনে। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার ঘোলাটে রঙের মত বিষণ্ণ হয়ে উঠল মন। ঝিন্নি আমার অনেক কাছে সরে এসেছে ঠিক কিন্তু স্পষ্ট করে ও তো কখনো বলেনি যে ও আমার জীবনের সঙ্গী হতে চায়! নিজের মনের থেকেই একটা উত্তর ভেসে এল। একটি মার্জিত রুচির মেয়ে এর চেয়ে বেশি কি বলবে। ওর বাধাহীন আত্মসমর্পণের ভেতরেই তো ওর সব কথা পাণ্ডুলিপি হয়ে আছে। শুধু পাঠোদ্ধার করে নেবার অপেক্ষা।

আমাদের ঠিক মাথার ওপর দিয়ে রাতের দুটো পাখি উড়ে গেল।

ঝিন্নি বলল, কি ভাবছ এত ?

বললাম, এখুনি যে দুটো পাখি উড়ে গেল, বলতে পার তাদের কথা।

ঝিন্নি যেন কিশোরী হয়ে গেছে। বলল, কি ভাবছ একটু বল না?

বললাম, ওদের দুজনের প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তটা কেমন ছিল তাই ভাবছি। দুজনের দুজনকে ভাল লাগার পর কি কথা ওরা বলছিল। মন দেয়া-নেয়ার পরের মুহূর্তগুলোতে ওদের মনে কি ধরনের রোমাঞ্চ জেগেছিল। দুজনে নীড় রচনা করে প্রথম যেদিন সে নীড়ে আশ্রয় নিয়েছিল সেদিন কি ওরা নিবিড় সান্নিধ্যের উত্তাপে পরস্পরকে সবচেয়ে সুখী মনে করেছিল!

ঝিন্নি হঠাৎ বাধা দিয়ে বলল, তুমি কিছু জান না ছোটেসাহেব। ওরা ডিম পাড়ার সময় এলেই বাসা বুনতে থাকে।

বললাম, হয়ত তোমার কথা ঠিক। দুজনের নিবিড় ইচ্ছার সৃষ্টিকে কত সুখে কত নিরাপদে রাখা যায় তাই ভেবেই হয়ত ওরা নীড় রচনা করতে থাকে।

ঝিন্নি আকাশের দিকে চেয়ে বলল, এখুনি ঝড় উঠবে, তার আগেই আমাদের কোয়ার্টারে পৌঁছতে হবে।

বললাম, ঝড়ের আগে পাখি দুটো তাদের বাসায় পৌঁছতে পারবে তো!

ঝিন্নি হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠল। বলল, জানার এই ইচ্ছেটা চিরদিনের, কিন্তু এর কোন উত্তর চাইলেই কি পাওয়া যায় ছোটেসাহেব?

আমার মনটা আবার বিষণ্ণ হয়ে উঠল। আমি ঐ পাখি দুটির নির্বিঘ্নে বাসায় পৌছানোর জন্য জীবনের অদৃশ্য পরিচালকের কাছে প্রার্থনা জানালাম।

মেলা অনেক আগেই ভেঙে গেছে। শূন্য মেলায় শুধু কিছু এঁটো পাতা আর ছেঁড়া কাগজ উড়ছে। আমরা মেলা পেরিয়ে কাঠের কেল্লার কাছে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বেগে ঝড় উঠল। আমরা আত্মরক্ষার জন্য কেল্লার এপারে পরিত্যক্ত একটি গুমটি ঘরের আড়ালে আশ্রয় নিলাম। ওখানে স্থির হয়ে দাঁড়াতেই চোখ গিয়ে পড়ল পথের ওপারে কেল্লার একটি ঘরের ভেতর। আলো আসছিল জানালার পথে রাস্তা পেরিয়ে গুমটি ঘর অব্দি। একটি লোক সে ঘরে বসে একমনে ড্রিঙ্ক করে যাচ্ছিল। নেশার ঘোরে ঝড়ের খবরটা হয়ত পায়নি, তাই খোলা থেকে গেছে জানালাটা।

হঠাৎ আমাকে ওখানে দাঁড়াতে ইঙ্গিত করে কেল্লার দিকে দৌড়ে গেল ঝিন্নি। বাইরে থেকে চুপি চুপি জানালার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে আবার ছুটে এসে দাঁড়ালো আমার পাশে।

আমার সারা শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল কেন? এই সামান্য ঘটনাটুকুর ভেতর কোন অশুভ ইঙ্গিত কি আমাকে ছুঁয়ে দিয়ে গেল? ঐ মানুষটাই কি মদনলাল? তাহলে ঐ মত্ত বেহুঁশ লোকটাকে সাহায্য করার ইচ্ছে জাগল কেন ঝিন্নির! এই তো কয়েক ঘণ্টা আগে মদনলালকে দূর থেকে দেখে নিজেকে মেলা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়েছিল ও। আমাকে বলেছিল মদনলাল লোকটা নাকি ভীষণ খারাপ। এখন সেই মদনলালকে ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে নিজেকে ঝড়ের ভেতর ফেলতেও দ্বিধা করল না ঝিন্নি।

কি এক অপরিচিত যন্ত্রণা আমার সমস্ত চেতনায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার উত্তেজনা ধীরে ধীরে কমে এল। তখন মনে হল, এমন করে বিষয়টাকে দেখা আমার ঠিক হয়নি। বিপদের মুখে যে কোন মানুষকে সাহায্য করাই মানুষের কাজ। আর পাহাড়ী দেশের মানুষ একটু বেশিরকমের কর্তব্যসচেতন। তাই ঝিন্নি ছুটে গেছে তার কর্তব্যটুকু করতে। ঐ লোকটা মদনলাল না হয়ে যদি অন্য কেউ হত তাহলে ঝিন্নি নিশ্চয়ই এমনিভাবে তার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত।

আমার মনে হল, লোকটা মদনলাল নাও তো হতে পারে। আর যদি সত্যি তা না হয় তাহলে এই মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী ভূভারতে আর কেউ থাকবে না। এর সমাধান কে

করতে পারে? একমাত্র ঝিন্নি। কিন্তু এ ঘটনায় আমার উদ্বেগের যতবড় কারণই ঘটুক না কেন আমার আত্মসম্মানকে ভাসিয়ে দিয়ে ঝিন্নিকে আমি এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই করতে পারব না।

আমি ঝিন্নির মুখ থেকেই কোনকিছু শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলাম।

ঝিন্নি বলল, ঝড় পর পর বেড়ে উঠছে। বরফ পড়তেও পারে। তার চেয়ে কষ্ট করে এটুকু চড়াই ভেঙে কোয়ার্টারে পালিয়ে যাই চল।

অন্ধকারে আমরা আবার পা বাড়ালাম। পথটা ঝিন্নির মুখস্থ। ও আমার হাত শক্ত করে ধরে প্রায় টানতে টানতে আর হুঁশিয়ারী দিতে দিতে ওপরের দিকে নিয়ে চলল।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আমার মত শীতকাতুরের পক্ষে জমে যাবারই কথা কিন্তু ঐ কেল্লার কাছ থেকে ঝিন্নিকে নিয়ে চলে আসতে পেরে আমার সোয়াস্তি এত বেড়ে গিয়েছিল যে আমি তীব্র শীতের কামড় তেমন অনুভব করতে পারছিলাম না।

আর্ট গ্যালারী সংলগ্ন কোয়ার্টারে পৌঁছে ঝিন্নি তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে ফেলে আমাকে ভেতরে টেনে নিয়ে অন্ধকারে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বলল, আজ এখানেই থাকব, ওপরে যাওয়া অসম্ভব। তুমি দাঁড়াও, আমি আলো জ্বালছি।

সুইচ্ অন্ করার শব্দ হল কিন্তু আলো জ্বলল না। ঝিন্নি বলল, ঝড়ে এইমাত্র কারেন্ট অফ হয়ে গেছে। একটু আগে কেল্লায় আলো জ্বলছিল। কিন্তু বিপদ যে চারদিক থেকেই এল ছোটেসাহেব। এখানে ইলেকট্রিক আছে বলে টর্চ কিংবা লণ্ঠন কোনটাই নেই।

বললাম, আপদ গেছে। এখন হাত ধরে আমার পোশাকগুলোর কাছে নিয়ে চল, আমি আধভেজা জামাকাপড়ের ঠাণ্ডা থেকে রেহাই পাই।

ও আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণের ভেতর আমার সুটকেশখানা টেনে আনল। বলল, নাও, আন্দাজে হাতড়ে বের করে নাও তোমার দরকারী কাপড়চোপড়।

বলেই ঝিন্নি অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

আমি খুঁজে পেতে জামাকাপড় বের করে পরে নিলাম। ঝিন্নি ভেতরের ঘরে কি করছে কে জানে। ও নিশ্চয়ই এতক্ষণ বদলে ফেলেছে ওর ভেজা পোশাক।

আমি হাতড়ে হাতড়ে বিছানাটা পেয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কম্বলের ভেতর ঢুকে পড়লাম শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে।

ঝিন্নির দেখা নেই। আমি কম্বল জড়িয়ে অন্ধকারে বসে আছি। বাইরে ঝড়ের একটানা গোঙানি। দমকা হাওয়ায় পেছনের পাইন বনে কান্নার রোল উঠেছে। বরফ পড়া হয়ত শুরু হয়ে গেছে এতক্ষণে।

আমি কতক্ষণ একইভাবে বসেছিলাম জানি না, হঠাৎ আলো জ্বলে উঠতেই পেছন ফিরে ঝিন্নিকে দেখতে গেলাম, কিন্তু কোথায় ঝিন্নি! কেউ কেথাও নেই, আলো জ্বলছে। নিশ্চয়ই

ঝিন্নি সুইচটা অন করে রেখে থাকবে, তাই কারেন্ট আসার সঙ্গে সঙ্গে বাতিটা জ্বলে উঠেছে।

আমি ঘরে বসেই ডাকলাম, ঝিন্নি, কোথায় তুমি?

কোন সাড়া এল না।

অমনি কম্বল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ ঘরের সূক্ষ্ম কোন্ ছিদ্রপথে শীতের কালনাগিনী ঢুকে পড়ে আমাকে ছোবল দিয়ে গেল। একটা কঠিন কন্‌কনে যন্ত্রণা আমার রক্তমাংস ভেদ করে হাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

তবু ঝিন্নির সন্ধানে আমাকে ভেতরের ঘরে যেতে হল। অনুমানে সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে আলো জ্বাললাম। কেউ নেই। পাতি পাতি করে খুঁজলাম, সারা কোয়ার্টারের কোথাও ঝিন্নি নেই। ভেজা পোশাকখানা না বদলেই ঝিন্নি কোথায় চলে গেছে!

একটা অজ্ঞাত ভয়ে আমি যেন মূর্ছিত হয়ে রইলাম। আসার আগে নরসিংলালজী বলেছিলেন, ওপরের জঙ্গলে মাঝে মাঝে ভালুক দেখা যায়। শীত প্রচণ্ড পড়লে ওরা স্নো-লাইন থেকে ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। তখন জঙ্গলের গুহা-গহ্বরে আশ্রয় নেয় ওরা।

পেছনের যে দরজাটা কোয়ার্টার-সংলগ্ন সব্জি ক্ষেত বা লহরীর দিকে রয়েছে, আমি সেখানে চলে গেলাম। দরজা ভেজান ছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম, দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ নেই। আমি হাত দিয়ে ঠেলতেই বাইরের দিকে খুলে গেল। মনে হল দরজাটা ভেজিয়ে ঝিন্নি একটা পাথর চাপা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে গিয়েছিল। ঐ খোলা দরজার পথে এখন ঢুকে আসছে ঝড়ো হাওয়া। আমি কোনরকমে দরজাটা আবার টেনে নিয়ে বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমার মনে এখন আর কোন অনুমানই কাজ করছে না। শুধু ঝড়ের রাতে কোন একটা অভাবনীয় ঘটনার জন্য প্রতীক্ষা করে আছি।

বাইরে করাঘাত বেজে উঠতেই দরজাটা খুলে দিলাম।

ঝিন্নি ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ওর হাতে একটা টিফিন কেরিয়ার।

ও কথা বলতে পারছিল না। ঘরের ভেতরে গিয়ে টিফিন কেরিয়ারটা রেখে দিয়ে ও আমাকে বলল, চারপাইয়ের ওপর চাবির গোছাটা পড়ে আছে, তুমি আলনার পাশে ঐ সুটকেশটা খুলে শুকনো পোশাকগুলো বের করে দাও। আমার সারা শরীর ভিজে গেছে।

ওর কথাগুলো প্রবল কাঁপুনিতে জড়িয়ে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি সুটকেশ খুলে ওর নির্দেশমত পোশাকগুলো বের করে দিয়ে বাইরের ঘরে চলে এলাম।

কিছুক্ষণ পরে ঝিন্নি আমার ঘরে এল। ফায়ার প্লেসে কাঠ সাজিয়ে আগুন ধরাল। কাইল আর ফার গাছের কাঠ সহজেই ধরে যায়। ঝিন্নির তাই আগুন ধরাতে বেশি সময় লাগল না।

আধ ঘণ্টার ভেতরেই হিমঘরখানা আরামদায়ক উত্তাপে ভরে গেল। ঝিন্নি চুল খুলে ফেলেছিল। ভেজা চুল মুছে দুটি গাল ও পিঠের ওপর দিয়ে প্রপাতের মত বইয়ে দিয়েছিল। এখন আগুনের তাপে শুকিয়ে নিচ্ছিল সে চুলের রাশ।

আমি কথা বললাম, কেন এমন দুঃসাহসের কাজ করতে গেলে ঝিন্নি?

ও এইবার চিরুনি বের করে মাথাটা একদিকে ঝুঁকিয়ে জট ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে তো? ভাবছিলে, লেপার্ড বুঝি তোমার ঝিন্নিকে লোপাট করে দিলে। অথবা পাহাড়ী প্যানথার হয়ত আস্ত গিলেই ফেলল মেয়েটাকে।

বললাম, যখন দেখা গেল তুমি ঘরে নেই তখন আমি কিছু ভাবতেই পারছিলাম না।

ঝিন্নি বলল, তোমার সুটকেশখানা বের করে দিয়েই আমি দেশলাইয়ের খোঁজে গিয়ে দেখি দেশলাই নেই। হঠাৎ মনে পড়ল, কাল ওপরের কোয়ার্টারে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। সারারাত ফায়ার প্লেসে আগুন না জ্বেলে থাকতে পারা যাবে না। তাই ওপর থেকে দেশলাই আনতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ও বেলার তৈরি খাবারগুলোও নামিয়ে আনলাম।

বললাম, ঝিন্নি, আমি যদি জানতাম তুমি এ ধরনের একটা কাজ করতে যাচ্ছ তাহলে তোমাকে একপাও বাইরে বেরুতে দিতাম না।

ঝিন্নি বলল, তাইতো তোমাকে কিছু বলিনি, চুপিচুপি বেরিয়ে গেছি।

আমি শুধু বললাম, সত্যি ঝিন্নি খুব দুঃখ পেয়েছি।

ঝিন্নি চুলে চিরুনি চালানো বন্ধ করে বলল, কেন, দুঃখের আবার কি হল?

আমি আর কোন কথা বললাম না দেখে ও উঠে এল আমার পাশে। হঠাৎ আমার মাথাটা ওর বুকের ওপর চেপে ধরে বলল, তোমার জন্যে এত কষ্ট করলাম, একটু আদর করে দেবে না? তাহলে সব কষ্টই আমার দূর হয়ে যাবে।

আলো জ্বলছে। ওর ফুলে-ফেঁপে ওঠা চুলের অরণ্য থেকে জেগে ওঠা মুখখানা যেন আমার একটুখানি আদর কেড়ে নেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

বললাম, তোমার এ অতি বাস্তব ভোজপর্বটা শেষ হোক, তারপর সারারাত গল্প করে কাটানো যাবে।

ঝিন্নি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চুলে বিনুনী করতে লাগল। হঠাৎ খেয়াল চাপল আমার। বললাম, একটা ইচ্ছা আছে, পূরণ করবে?

ও বলল, তোমার ইচ্ছার কথাটা শুনি আগে।

কোন ভণিতা না করেই বললাম, তোমাকে আজ খোলা চুলে কাছে পেতে চাই ঝিন্নি। এটা যে কতবড় থ্রিল তা তুমি মেয়ে হয়ে বুঝবে না।

ঝিন্নির হাত থেমে গেল। সে মাথা দুলিয়ে বলতে লাগল, কি যে পাগলামী তোমার ছোটেসাহেব, দারুণ দারুণ সব খেয়াল বন বন করে ঘুরছে তোমার মাথায়। চুল খোলা রেখে কি শোওয়া যায়?

ও চটপট হাত চালিয়ে বিনুনীটা কোনরকমে শেষ করে রাতের খাবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি বিছানায় বসে বসে দেখতে লাগলাম, কত নিখুঁত আর গোছানো কাজের হাত ঝিন্নির। ওর কোন কিছু দেয়া নেয়ার ছন্দটি সমঝদারের চোখে ধরা পড়বেই পড়বে। একটি পরিচ্ছন্ন সুখী সংসারের ছবিগুলো যেন ফুটে উঠছে ওর প্রতিটি কাজে।

রাতের খাবার শেষ হয়ে গেছে। আমি বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে দুটো হাতের পাতায় মাথা রেখে সিলিংয়ের দিকে মুখ করে শুয়ে আছি। আলো জ্বলছে, তাই বন্ধ করে রেখেছি

চোখ। ঝিন্নি ভেতরের ঘরে কিছু করছে। মিশ্রিত কতকগুলো ছোটবড় শব্দ ভেসে আসছে আমার কানে। ফায়ার প্লেসের থেকে উঠে আসছে তৃপ্তিকর তাপ-প্রবাহ। আমার লেপটিতে রয়েছে অনেক আরামের সঞ্চয়। ভেতরের ঘর থেকে শব্দের ধারগুলো ধীরে ধীরে কমে আসতে লাগলো আর আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম একটা তন্দ্রাচ্ছন্নতার ভেতর।

কতক্ষণ ঝিন্নি ঘুমন্ত পুষ্কর মুখার্জীকে দেখেছিল জানিনা। কি অনুভূতি একটি মেয়ের জাগে যখন সে চেয়ে চেয়ে দেখে তার ভালবাসার মানুষটিকে অকৃত্রিম অচেতন অবস্থায়, তা আমার জানা নেই। তবে ঝিন্নি যে সেই আলো জ্বালা ঘরে অন্তত কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, তা কারোর পক্ষেই অনুমান করা কষ্টকর ছিল না।

আমার অবচেতন মন ঝিন্নির উপস্থিতির জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছিল, তাই হঠাৎ আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। আর ঠিক আমার চোখের ওপর দেখলাম,একটি মুখ তার রাশি রাশি ছড়ানো চুলের ভেতর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে।

ঝিন্নি আমার মাথার দিকে বসেছিল, আর আলো ছিল ঠিক তার উল্টো দিকে। তাই আমি ঝিন্নির উদ্ভাসিত মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে ঝিন্নি তার মুখখানা একটু ওপরে তুলে নিয়ে বলল, কি ঘুম-কাতুরে মানুষ তুমি,সারারাত না গল্প করে কাটাবে বলেছিলে?

মিথ্যে কথা বললাম, চোখ বুজে তোমার ছবি দেখছিলাম।

ঝিন্নি আমার কপালে ওর ঠোঁট দুটো ছুঁইয়ে নাড়া দিতে দিতে বলল, মিথ্যুক কোথাকার, এত কথাও বানিয়ে বলতে পার তুমি। সেই কতক্ষণ বসে আছি, চেতনাই নেই।

ওর চুলে ভরা মাথাটা আমার মুখের ওপর রেখে বললাম, এতক্ষণ কি দেখছিলে ঝিন্নি?

ঝিন্নি অনুচ্চে বলল, তোমার মুখে দুষ্টুমীর ছবিগুলো কেমন ফুটে ওঠে তাই দেখছিলাম।

বিছানায় পাশ ফিরে ওর থুতনি আর গোলাপী আভার নাকটা ঠোঁটে চেপে আদর করলাম।

ও শুধু বলল, তুমি অনেক লোভী হয়ে যাচ্ছ কিন্তু ছোটেসাহেব, শাসন না করলে বিপদ ঘটাবে।

ওকে আমার মাথার দিক থেকে টেনে আনলাম বিছানার ওপর। আশ্লেষে আদরে ভরে দিতে লাগলাম আমার ঝিন্নিকে। লুঠেরার মতো লুঠ করতে লাগলাম বহু যত্নে সংগোপনে রক্ষিত ওর দুর্মূল্য রত্নগুলি।

একসময় আমার লুণ্ঠনের প্রবৃত্তি যখন দুর্দম হয়ে উঠল তখন করুণ মিনতির সঙ্গে তাকে বাধা দিয়ে ঝিন্নি বলল, আমার যা আছে এখন থেকে সে তো তোমারই হয়ে রইল। এই মুহূর্তে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিও না ছোটেসাহেব। সব তোমার, শুধু তুমি আমাকে সযত্নে গচ্ছিত রাখবার অধিকারটুকু দাও। কোন এক বিশেষ লগ্নে আমি আমার যা কিছু আছে অনেক শ্রদ্ধা আর ভালবাসা মিশিয়ে তা তোমার সেবায় উজাড় করে দিতে চাই।

আমি ঝিন্নির মর্যাদা রাখলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও।

বললাম, তাই হবে ঝিন্নি। তোমার অনুমতি ছাড়া কোন কিছুই আমি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে যাব না। আর যদি কোনদিন বড় বেশি লোভী হয়ে উঠি তাহলে তুমি আমার সে লোভকে প্রশ্রয় না দিয়ে শাসন কোরো।

অনেক গভীর রাত অব্দি বাইরে ঝড়ের গান আর ভেতরে দুজনের বুকের ধ্বনি শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে জেগে উঠে দেখি নিবিড় বিশ্বাস আর নির্ভরতায় ঝিন্নি আমাকে জড়িয়ে অচেতনে ঘুমিয়ে আছে।

রোদ্দুরের সোনা ছড়িয়ে পড়তেই আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম কুলুর বাংলোর উদ্দেশ্যে। রাতের ঝড়ে পথের ওপর বরফ জমে গেছে। পাইনের সবুজ ঝালরে রূপোলী লেস ঝুলছে। দূরে কাছে পাহাড়ের মাথায় বরফ বরফ আর বরফ। সারা পীরপাঞ্জাল ধব্‌ধবে সাদা। সূর্যের আলোয় চারদিকের বরফ ঝকঝক করছে।

ঝিন্নি বলল, হেঁটে যাওয়াই স্থির, তবে তুমি যদি লাকি হও তাহলে গাড়ি একটা পেয়ে যেতেও পার।

বললাম, লাক আমার কোনদিনই ভাল না, তবে তোমার সঙ্গে থেকে যদি কপালটা খোলে।

আমরা কেল্লার কাছাকাছি এলে ঝিন্নি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত নীচে নামতে লাগল।

কেল্লা পেরিয়ে ঝিন্নি বলল, মদনলাল আস্ত একটা শকুনি। অনেক দূরের থেকেও ও সবকিছু দেখতে পায়।

একটু থেমে আবার বলল, কাল দেখলে না আমি ঝড়ের ভেতরেও চুপি চুপি গিয়ে ওর জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এলাম। জানালা খোলা থাকলে আলোর রেখা ধরেই ও আমাদের চিনে ফেলত।

বললাম, তোমার যত সব উদ্ভট ভাবনা। তবে কাল ঝড়ের রাতে কাজটা তুমি ভালোই করেছ। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে একটা মানুষকে তুমি বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছ।

মনে মনে কিন্তু আমি ঝিন্নির কথায় গভীর তৃপ্তি পেলাম। মদনলালের ওপর ওর বিতৃষ্ণা আমার মনের ওপর গেঁথে থাকা ছোট্ট কাঁটাটা তুলে দিয়ে গেল।

নাগ্‌গরের পাহাড় ছেড়ে আমরা নিচে নেমে এলাম। ঝিন্নি কুলীর খোঁজে কাছাকাছি একটা টিকার দিকে চলল। আমি মালের পাহারায় রইলাম।

ঝিন্নি সেই যে গেছে আর পাত্তা নেই। এদিকে আমি মালের ওপর চেপেচুপে বসে আছি। হঠাৎ একটা গড়ির হর্ন শুনে উঠে দাঁড়ালাম।

ওপর থেকে আমার সামনে গড়িয়ে এল একখানা জীপ। ব্রেক কষে দাঁড়াতেই দেখলাম গত রাতে কেল্লার ভেতরে দেখা সেই মানুষটি। এই তাহলে মদনলাল! দূর থেকে যার চেহারার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণাই হয়নি, আজ তাকে মুখোমুখি দেখলাম। বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়ই হবে। বয়সের তুলনায় কিন্তু অনেক বেশি স্মার্ট।

গাড়িটাকে পথের একধারে সুবিধামত জায়গায় রেখে মদনলাল এগিয়ে এল আমার পাশে। প্রথমে কুলুহী ভাষায় কথা বলে আমার মুখ থেকে বিস্ময় আর মৃদু হাসি ছাড়া যখন কিছুই পেল না তখন ইংরেজীতেই শুরু করল।

মদনলালের প্রথম জিজ্ঞাসা, আপনি একা একা এভাবে বসে আছেন কেন? কোথায় যেতে চান?

বললাম, আমার সঙ্গীটি বিশেষ কাজে পাশের টিকাতে গেছে তাই অপেক্ষা করছি। ও এসে পড়লেই আমরা মানালীর দিকে রওনা দেব।

ইচ্ছে করেই মিথ্যে কথাটা বললাম। আমি অনুমান করে নিয়েছিলাম, মদনলাল কুলুর পথেই পাড়ি জমাবে। আর সত্যি কথাটা বললেই মদনলালের গাড়িতে বন্দী হয়ে যেতে হবে কুলু।

মদনলাল বলল, আপনি ট্যুরিস্ট বলেই মনে হচ্ছে আর ট্যুরিস্ট হলে নিশ্চয়ই দুঃসাহসী ট্যুরিস্ট। এ সময় বেড়িয়ে বেড়ানোতে হিম্মত চাই।

মৃদু মৃদু গর্বের হাসি হাসতে লাগলাম। ভাবটা, তুমি ঠিক ধরেছ মদনলাল।

মদনলালের আবার প্রশ্ন, আপনি কি মেলা দেখতে এসেছিলেন? উঠেছেন কোথায়?

দেখলাম লোকটা দারুণ কৌতূহলী আর এক একবারে অন্তত দুদুটো করে প্রশ্ন করতেই অভ্যস্ত।

বললাম, হাঁ, কোলি-রি-দেওয়ালি উৎসব দেখতেই এসেছিলাম। আশ্রয় পেয়েছিলাম সামনের ঐ পাহাড়ী টিকায়।

মদনলাল বলল, ইনফরমেশান রাখেন না তাই, নইলে আপনার একটু ওপরের পাহাড়েই সরকারী বাংলো আছে। দিব্যি আরামে থাকতে পারতেন।

হেসে বললাম, এখানে এসে পাহাড়ীদের সঙ্গে কাটাতেই চেয়েছিলাম। আর তাই আনন্দও পেয়েছি প্রচুর।

মনে মনে বললাম, এখন তুমি দয়া করে জীপখানা চালিয়ে এখান থেকে সরে পড়লেই বাঁচি।

মদনলালের যাবার তাড়া নেই। লোকটা যেন প্রশ্নের তুবড়ি। আমার বাড়িঘর দেশ গাঁ থেকে চতুর্দশ পুরুষের খবর নিতে লাগল আর আমিও রকেটের গতিতে গল্প বানিয়ে চললাম। ডাহা মিথ্যেগুলো বলতে মাঝে মাঝে খারাপই লাগছিল, কিন্তু লোকটাকে নিয়ে কেমন যেন খেলার নেশায় পেয়ে বসেছিল আমার।

হঠাৎ মনে হল কারা যেন পাশের পাহাড়ের বাঁকে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। আমার সমস্ত রক্ত মাথায় উঠল। এখুনি ঝিন্নি এসে মঞ্চে হাজির হবে আর নাটক দারুণভাবে জমে উঠবে। সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যাবে মিথ্যুক গল্পকারটা।

আমি পেছন দিকে আর তাকাতে পারছিলাম না। প্রশ্নের তুবড়ি কি যে বলে চলেছে তাও ঠিকমতো কানে যাচ্ছিল না। হয়ত আমাকে অন্যমনস্ক দেখে মদনলালের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। সে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে কেতাদুরস্ত একটা বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গাড়িতে

গিয়ে উঠল। তার গাড়ি গোঙানি ছাড়তে ছাড়তে ছুটে চলল আর আমার ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

এখন পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে গেলাম কারা আসছে।

কাউকেই দেখতে পেলাম না। তাহলে আমি কি ভুল শুনেছিলাম!

সঙ্গে সঙ্গে একটা পাথরের চাঁইয়ের আড়াল থেকে আধখানা নাক আর দুটো চোখসহ একটা মাথা বেরুলো।

আমি হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলাম। ঝিন্নির চোখ থেকে তখনও ভয় মুছে যায়নি। চেঁচিয়ে বললাম, বেরিয়ে এসো, এতক্ষণে মদনলাল কুলু পৌঁছে গেল বলে।

ঝিন্নি পেছন থেকে কাদের যেন ডাক দিলে। জনাদুয়েক লোক এগিয়ে এল। সঙ্গে চারটে টাট্টু। কাছে এলে বললাম, লোকটা ফিরছিল, গাড়িও এসেছিল কিন্তু তুমি পাশে না থাকায় লিফ্‌টটা আর নেওয়া গেল না।

তখনও ঝিন্নির চোখে দারুণ উত্তেজনা। সে ঘটনাটা জানার জন্যে আমার দিকে চেয়ে আছে।

বললাম, ভয় নেই, তোমার নাম মুখেও আনিনি। আর আমার নাম-ধাম যা বাতলেছি, ভূ-ভারতের কোথাও খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না। তবে দেখলাম কৌতূহলের একটা চলন্ত বিজ্ঞাপন কাকে বলে।

চোখে মুখে হাসি ফুটিয়ে ঝিন্নি বলল, বাঁচিয়েছ। আমার তো এত আনন্দ হচ্ছে, মনে হচ্ছে এখুনি আবার কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে হুল্লোড় করি।

বললাম, আপত্তি নেই আমারও। এক পায়ে দাঁড়িয়ে, আদেশ হলেই পাহাড়ে উঠি।

ঝিন্নি বলল, হয়েছে। এখন টাট্টুর ওপর ওঠো তো দেখি, অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

আমরা দুটো টাট্টুতে উঠলাম। দুটো পাহাড়ীতে মাল বাঁধাছাঁদা করে বাকী দুটো টাট্টুর ওপর চাপিয়ে আমাদের পেছনে আসতে লাগল। আমি লক্ষ্য করলাম, ওদের পায়ে খড় কিংবা ঐ ধরনের ঘাস জাতীয় কোন বস্তু দিয়ে তৈরি জুতো।

ঝিন্নিকে বলতেই ও বলল, এ অঞ্চলের পাহাড়ীরা খড়ের তৈরি জুতো পরে থাকে।

বললাম, টেঁকে?

মাসখানেক তো চলে যায়। মানুষগুলো বড় গরীব, ছোটেসাহেব। কালেভদ্রে আমাদের মত খেয়ালী দু-একটি খদ্দের পেয়ে যায়, নইলে দু-চার জায়গায় মাল বয়ে যা দু'দশ টাকা রোজগার করে।

আমরা চলেছি পাশাপাশি। কখনো বা সামনে পেছনে। পাহাড়ী দেশের উঁচু নিচু আঁকা বাঁকা ভাঙাচোরা পথে টাট্টুই একমাত্র নির্ভরযোগ্য বাহন। খচ্চরে আর টাট্টুতে ভারী মাল বয়। ছাগলের পিঠেও মাল বোঝাই দিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি। পশুদের গলায় সারি

দিয়ে ঘণ্টা বাঁধা থাকে। চলতে গেলেই টং টং টুং টুং আওয়াজ ওঠে। পথচারীরা জানতে পারে। অমনি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ায়।

ঝিন্নি এক সময় বলল, এত জোরে ছোটাচ্ছ কেন তোমার টাট্টু ?

বললাম, ঘর পৌঁছতে হবে না?

ঝিন্নি বলল, সন্ধ্যের আগে কুলুতে আর ঢুকছি না। ওদিকে ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনে দিয়েই যাবার পথ। মদনলালের এলাকা। এ অবস্থায় দেখতে পেলেই গল্প বানানেওয়ালাকে লাড্ডু বানিয়ে ছাড়বে।

বললাম, তোমার মদনলাল কিন্তু আমাকে প্রথমে বেকুব বানিয়েছিল।

ঝিন্নি বলল, আমি তোমার কথায় দারুণ রকম আপত্তি জানাচ্ছি। এক নম্বর, ও লোকটা আমার মদনলাল নয়। দু নম্বর, তোমাকে বোকা বানানোর ক্ষমতা নিশ্চয়ই মদনলালের নেই।

বললাম, বিশ্বাস কর ঝিন্নি, তোমাদের কুলুহী ভাষাতেই যখন আমার সঙ্গে আলাপ শুরু করল, তখন আমি তো এক নম্বর বুড়বক বনে গেলাম। তারপর অবশ্য ইংরেজীতেই চালিয়ে গেল।

ঝিন্নি বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাকে ছুটি ফুরোবার আগেই কুলুহী আর গাদী ভাষা দুটো চলনসই রকমের শিখিয়ে দেব। কথাবার্তা মোটামুটি চালিয়ে যেতে পারবে।

বললাম, এখন দু-দুটো মাস চুপচাপ বসে থাকতে হবে, তার ভেতর একটা কাজে জড়িয়ে থাকলে সময়টা কাটবে ভাল।

ঝিন্নি বলল, দক্ষিণা চাই। গুরু-দক্ষিণা।

বললাম, আমার তো পেছনের কোন বাঁধন নেই ঝিন্নি। তাই এখন থেকে আমার বলতে যা কিছু তার সবটাই তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি নিষ্কৃতি পেতে চাই।

ও বলল, আমি যদি সবকিছু নষ্ট করে ফেলি?

বললাম, তার জন্যে আর যা হোক তোমার কাছে নিশ্চয়ই কৈফিয়ৎ চাইব না। আর এও জানি, আমার কাছে যা থাকবার নয় তা তোমার কাছে অনেক যত্নে থাকবে।

ঝিন্নি টাট্টুর মুখখানা নাগ্‌গরের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে দাঁড়াল।

বললাম, কি হল, টাট্টুর মুখ ফেরালে যে?

ঝিন্নি চেয়ে দেখতে দেখতে বলল, এবার পাহাড়ের আড়ালে চলে গেলে আর আমরা নাগ্‌গরের কোয়ার্টার, পাহাড়, বন কিছু দেখতে পাব না। তাই আর একবার দেখে নিচ্ছি।

হঠাৎ বললাম, এখানেই যদি আমাদের বিয়ে হয় ঝিন্নি।

ঝিন্নি টাট্টুর মুখ ফিরিয়ে চলতে চলতে বলল, তাই যেন হয় ছোটেসাহেব। নাগ্‌গরে বিয়ের আগেই আমরা দুজনকে এমন ঘনিষ্ঠ করে পেলাম, তাই বিয়ের বাসর, মধুচন্দ্রিমা সবই এখানে হোক এই আমারও মনের ইচ্ছে।

বললাম, নাগ্‌গরে আমার জীবনের সব সেরা স্মৃতিগুলো রইল ঝিন্নি।

ঝিন্নি কতক্ষণ কথা বলতে পারল না। সে হয়ত ডুবে রইল কটি হারিয়ে যাওয়া দিনের স্মৃতির অতলে।

এক সময় বলল, আচ্ছা ছোটেসাহেব, বিয়ের ব্যাপারে তোমার দিনক্ষণ মানার সংস্কার আছে?

বললাম, একেবারে নেই। তবে তুমি যদি মানো তাহলে আমার তা স্বীকার করে নিতে আপত্তিও নেই।

ঝিন্নি অনেক ভাবনার ওপার থেকে যেন বলল, চাচাজীর মত হবে কিনা জানি না, তবে আমার ইচ্ছে কোলি-রি-দেওয়ালির দিনটিতেই আমাদের বিয়ে হোক। সারা কুলুতে চলবে উৎসব আর সেই উৎসবের রাতে নাগ্‌গরের পাইন বনে ঘেরা ছোট্ট কোয়ার্টারে আমরা মন্ত্র পড়ে নতুন জীবনে প্রবেশ করব।

বললাম, এখনও কোলি-রি-দেওয়ালি ফিরে আসতে একটা বছর বাকী। তাহলেও আমি মানালীতে বসে বসে সেই বিশেষ দিনটির জন্যে প্রতীক্ষা করে রইব ঝিন্নি। যেখানেই থাকি, অন্ধকার আকাশে আলোর ফুল ফোটার রাতে আমি আমার সেরা ফুলটিকে কুড়িয়ে নিতে আসব এই নাগ্‌গরে।

ঝিন্নি হঠাৎ তার টাট্টুটা আমার টাট্টুর পাশে নিয়ে এসে বলল, কেউ নেই এখানে, তোমার হাতের আঙুলগুলো একটু ছুঁতে দেবে আমাকে ?

মৃদু হেসে ওর বাড়িয়ে দেওয়া হাতখানা ধরে রেখে বললাম, আর যদি ছেড়ে না দিই?

ঝিন্নি মিনতির সুরে বলল, এখুনি পোর্টাররা এসে পড়বে। দোহাই তোমার দুষ্টুমী করো না ছোটেসাহেব।

আমি হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম, চিরদিন যে হাতখানা ধরে চলতে হবে, তাকে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরতে পুষ্কর মুখার্জী কারো ভাবনার পরোয়া করে না ঝিন্নি।

মিষ্টি হাসিতে শাসনের একটা ছবি ফুটিয়ে টাট্টুটা সামনের দিকে ছুটিয়ে দিল ঝিন্নি। আমি ওকে ধরবার জন্যে দ্রুত এগোতে লাগলাম। আমাদের পাশ দিয়ে খলখল খুশিতে ভেঙে পড়া নীলাম্বরী নদীটা কুলুর পথ দেখিয়ে ছুটে চলল।

বসন্ত এসেছে!

রাতারাতি পাল্টে যাচ্ছে পাহাড়ী দেশটার চেহারা। উপত্যকা পথ পাহাড় নদীতীর সব জায়গাতেই লেগেছে বসন্ত উৎসবের ছোঁয়া। আপেলের ডালে ডালে থোকা থোকা সাদা আর পিঙ্ক ফুলের সমারোহ। ভালবাসার রঙীন প্রলাপগুলো যেন বেরিয়ে আসছে বুক ঠেলে। হায়উন্দ্ বা হিম ঋতুর ধার কমে গিয়ে হাওয়ায় লেগেছে তউন্দি বা তপ্তঋতুর আমেজী একটা ভাব। বুনো চেরীর লাল আর লালচে বেগুনী ফুলগুলো ফুটিয়ে তুলছে রঙের বাহার। মুঠো মুঠো রঙীন ফুলের পাপড়ি কারা যেন উড়িয়ে দিয়েছে হাওয়ায়। উড়ছে প্রজাপতি, হাজার রঙের ঝাঁক ঝাঁক প্রজাপতি।

গান গেয়ে উঠল নদী, ঝর্ণা, কুহল, সারা দেশটা। গাদ্দীরা এখন ভেড়া নিয়ে শীতের ভ্যালি ছেড়ে উঠছে ওপরের পাহাড়ে। ওরা ভারী একটা মিষ্টি সুরে ভেড়াগুলোকে ডাক দিতে দিতে নিয়ে চলেছে।

লী সাহেবের টাট্টু চড়ে পাহাড়ী টিকাগুলোতে ডাক্তারী করে বেড়াচ্ছি। কদিন আগে একটা গাদ্দী তরুণ ছেলে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। কোথা থেকে শুনেছে আমি নাকি ধন্বন্তরী। গিয়ে দেখি রাস্তার ধারে একটা পাঙাড় গাছের তলায় কালো কাপড় দিয়ে টাঙানো তাঁবু। চারদিকে ঘিসঘিস করছে কতকগুলো ভেড়া। তাঁবুর ভেতর উঁকি দিয়ে দেখি, একটা বাচ্চা বউ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। লেবার পেইন।

জিজ্ঞেস করে জানলাম, পুরো একটা দিন পার হয়ে গেছে।

জায়গাটা আমার বাংলোর কাছাকাছি। ছেলেটাকে ছুটিয়ে দিলাম ঝিন্নিকে ডেকে আনতে।

ঝিন্নি এলে ওকে নিয়ে ঢুকলাম তাঁবুর ভেতর। বছর ষোল সতের বয়েস হবে মেয়েটার। ফার্স্ট ইসু। পরীক্ষা করে দেখলাম, ডাইলেটেশান তেমন হয়নি। অস ওয়ান ফিংগার মাত্র। ইউটেরাইন কন্ট্রাকসন মোটেই জোরালো নয়। প্রেসার নিয়ে দেখা গেল, হান্ড্রেড ফিফটি ওভার নাইনটি। ইডিমা নেই। ফিটাল ডিসট্রেসের লক্ষণ স্পষ্ট নয়।

ঝিন্নি আমার মুখের দিকে চেয়েছিল। হঠাৎ বলল, সিজার করতে হবে নাকি ?

বললাম, না। আরও অপেক্ষা করা যাবে। আমাদের বাংলোতে মেয়েটাকে নিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়।

অনেক কষ্টে ধরাধরি করে বয়ে আনা হল বাংলোতে। গাদ্দী ছেলেটার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। একদিন অপেক্ষা করে দেখা গেল, টু ফিংগারের বেশী অস ডাইলেটেশান হল না।

ওকে এবার ট্রায়াল লেবার দেওয়া হল। অমনি একটা ফুটফুটে বাচ্চা বেরিয়ে এল। তরুণী মা ঝিমিয়ে পড়ে রইল কতক্ষণ। গাদ্দী তরুণটির মুখে হাসি আর ধরে না।

মনে হল সবচেয়ে খুশি হয়েছে ঝিন্নি। আমার নির্দেশে চব্বিশ ঘণ্টা সে নার্সিং করে চলল বাচ্চা আর প্রসূতির।

গতকাল সকালে ছেলে কোলে নিয়ে তাঁবুতে ফিরে গেছে মেয়েটি। আমি বাধা দিইনি। ভেড়া ছাগলের ভেতরেই বেড়ে ওঠে গাদ্দীদের বাচ্চাগুলো। ইনফেকশানের ভয় নেই ওদের।

বিকেলেই একটা ভেড়া নিয়ে হাজির সেই গাদ্দী তরুণটি।

বললাম, কি ব্যাপার?

ও বলল, এটা তোমাকে নিতে হবে ডাক্তার। তোমার সেবার জন্যে এনেছি।

না নিলে দুঃখ পাবে, তাই নিতে হল। বড় সহজ সরল এই গাদ্দী সম্প্রদায়ের মানুষগুলো।

রাতে ঝিন্নির মুখে একটা খবর পেলাম। গাদ্দী ছেলেটি মেয়েটিকে ঝিন্দ্‌ফুঁক করে বিয়ে করেছে। কাউকে না বলে লুকিয়ে বিয়ে করা হল ঝিন্দ্‌ফুঁক। পালিয়ে এসে একটা ঝোপে আগুন লাগিয়ে ক'পাক ঘুরে নিয়ে বিয়েটাকে সিদ্ধ করে ফেলেছে ওরা।

ঝিন্নিকে বললাম, ব্যাপারটা জানলে কি করে?

ঝিন্নি বলল, গোপীর বউ পিন্‌ঝি নিজেই আমাকে বলেছে। তাই বেচারা এখন কিছুদিন দলছাড়া হয়ে আছে।

বললাম, বাচ্চাটা কিন্তু ভারী মিষ্টি হয়েছে দেখতে। প্রায় সারাক্ষণ চোখ বুজে অদ্ভুত সব আঁকিবুকি কাটছে মুখে।

ঝিন্নি কিছুক্ষণ উদাস হয়ে অন্যদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ওর হাত ধরে কাছে টেনে এনে বললাম, কি হল ঝিন্নি?

চোখ দুটো ওর ছলছলিয়ে উঠল। আঙুল দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, খুব খারাপ লাগছে আমার।

উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম, কেন?

ঝিন্নি বলল, দুদিন ছেলেটাকে নাড়াচাড়া করে বড্ড মায়া পড়ে গিয়েছিল। তাই ও চলে যেতে একটুও ভাল লাগছে না।

আমি ঝিন্নিকে পাশে টেনে বসিয়ে ওর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললাম, ওরা গাদ্দী ঝিন্নি, ওরা আদ্দেক যাযাবর। পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে ভেড়া চরিয়ে ঘুরে বেড়ানোই ওদের কাজ। বয়ে যাওয়া নদীর মত ওদের চলা। গাদ্দীদের পায়ের তলায় পাহাড় আর মাথার ওপর আকাশ। ওদের কাছে টানতে নেই। ওদের ভালবাসলে দুঃখ পেতে হয়।

ঝিন্নি আর কিছু বলল না। আমার বুকের কাছে ওর মাথাটা শুধু এগিয়ে আনল। আমি ওর চুলেভরা মাথাটা বুকে চেপে ধরে ভাবতে লাগলাম, আমার ঝিন্নি ঐ গাদ্দীদের বাচ্চাটির মত ছোট্ট সুন্দর একটি শিশুর স্বপ্ন দেখছে।

আজ সকালে গোপী আর পিন্‌ঝিকে আবার দেখলাম। বাচ্চাটাকে পিঠে পুঁটলি বেঁধেছে পিন্‌ঝি। আগে চলেছে গোপী। পিঠে বোঝা, হাতে একখানা পাতলা কুঠার। পাহাড়ে চলার সময় ব্যালান্স রাখতে আর কাঠ কাটতে দরকার হয় ঐ অস্ত্রটি। গোপীর পেছনে একপাল সাদা ফেনাতোলা তরঙ্গিত ভেড়া। সবার পেছনে চলেছে পিন্‌ঝি। হাতে ঘুরছে উলবোনা তকলি।

আমি টাট্টুতে চড়ে ভোরবেলার ছবি দেখতে বেরিয়েছিলাম। উপত্যকা জুড়ে বসন্ত বাহারের ছবি। দেখা হয়ে গেল ওদের সঙ্গে। আমার ঠিক নীচের পথটা ধরে চলেছে।

গোপী কুঠারখানা বাঁ হাতে ধরে ডান হাতখানা নাড়তে লাগল। আমিও হাত নেড়ে ওদের অভিনন্দন জানালাম।

গোপী যতক্ষণ আমার দিকে চেয়েছিল, পিন্‌ঝি ততক্ষণ একমনে ঘুরিয়ে চলেছিল তকলি। এখন সারা দলটা এগিয়ে যেতেই পেছন ফিরে পিন্‌ঝি এক কাণ্ড করে বসল। তকলিটা ফেলে দুটো হাঁটু গেড়ে বসে ও আমাকে নমস্কার করল। তারপর একমুখ মিষ্টিহাসি ছড়িয়ে তকলি কুড়িয়ে নিয়ে আবার চলতে লাগল।

ওরা পাহাড়ের বাঁকে মিলিয়ে যাবার আগে আমি শেষবারের মত দেখতে পেলাম পিন্‌ঝির পিঠে বাঁধা বাচ্চাটাকে। আমার দিকেই ফেরানো ছিল তার মুখ। সকালের মিষ্টি রোদটুকু পড়ে ওর ধবধবে মুখখানা নরম টিউলিপ ফুলের মতন মনে হচ্ছিল।

ওরা চোখের ওপর থেকে হারিয়ে গেল, আমার মনটাও কেমন করে উঠল। আমি ঝিন্নির পিঠে বাঁধা আর একটা রেশমের মত নরম টিউলিপ ফুলের ছবি দেখতে লাগলাম।

আজ বসন্ত পঞ্চমী। পাহাড়ী ছেলেমেয়ের দল আমার সামনে দিয়ে হলুদ পোশাক পরে হৈ-হল্লা করতে করতে চলে যাচ্ছে। ওরা দল বেঁধে উৎসবের দিনে পিকনিক করতে চলেছে।

আমার একা একা আর ভাল লাগল না। টাট্টুটাকে জোরে চালিয়ে আমি নিচের বাংলোতে নেমে এলাম।

ঝিন্নি সকালবেলার হলুদ রোদ মাখছিল ফুলেভরা আপেল গাছটায় হেলান দিয়ে। ওর পরনেও হলুদ পোশাক। মেয়েরা হলদে পোশাক পরলেই আমার কেমন যেন মনে হয় মুখখানা সোনামুখি ডাবের মত কোমল লাবণ্যে ভরে উঠেছে।

টাট্টুটাকে গাছে বেঁধে রেখে আমি ওর কাছে এগিয়ে যেতে ও চমকে ফিরে তাকাল।

চুপি চুপি বললাম, ভারী মিষ্টি দেখাচ্ছে তোমাকে, ঠিক পিন্‌ঝির মত।

ঝিন্নি চেঁচিয়ে উঠল, ডাকব চাচাজীকে ? বলব তোমার দুষ্টুমির কথা?

আমি তো ঘাবড়ে গেলাম। এমন করে গলা চড়িয়ে বলছে ঝিন্নি, চাচাজী আউট হাউসে থাকলেও শুনতে পাবেন!

আমি মুখে আঙুল চেপে বারণ করতে যেতেই ও ফুলন্ত আপেল গাছটার মত একমুখ হাসি ফুটিয়ে বলল, ভীতু, ভীতু কোথাকার। কেমন ভয় পাইয়ে দিলাম।

নিশ্চিত চাচাজী সকালে কোন কাজে বেরিয়েছেন, তাই ঝিন্নির এই আস্ফালন।

বললাম, তুমি যে এত সাহসী হয়েছ ঝিন্নি, তা তো জানতাম না।

ও ঠিক আমার সুরেই কথাটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, তুমি যে এত ভীতু হয়েছ ছোটে সাহেব, তা তো জানতাম না।

দুষ্টু মেয়েটাকে ধরতে যেতেই ও হাসি ঝরাতে ঝরাতে দৌড়ে পালাল। অমনি আপেল গাছের ডাল থেকে এক ঝাঁক চিড়িপাখি বাগানে লুটোপুটি খেতে খেতে ফরফর করে উড়ে চলে গেল।

কাল ভোরেই চাচাজীর সঙ্গে ফিরে যাব মানালী। বসন্ত পঞ্চমীর পুজোর জন্যে যাই যাই করেও থেকে যেতে হয়েছে কুলুর বাংলোতে।

চাচাজী আখরা বাজার থেকে পুজোর জিনিসপত্র কিনে আনলেন। তারই গোছ গাছে আর পুজোর আয়োজনে সারা দিনটা কাটল ঝিন্নির। পুজো শেষে পুরোহিত চলে গেলে উঁকি দিয়ে দেখলাম, ঝিন্নি গৃহদেবতা নরসিং-এর পেতলের মূর্তির সামনে স্থির হয়ে বসে আছে। ওর মুখখানা উত্তর আকাশের অচঞ্চল নক্ষত্রটির মত। কে বলবে, ঝিন্নি ছুটে চলা কুহলের মত চঞ্চল।

রাত্রে যখন ও এল আমার ঘরে তখনও মুখে কথা নেই। আমার জিনিসপত্র গোছগাছে ব্যস্ত।

আমি বসে আছি দেখে ও এক সময় উঠে এসে বলল, কাল ভোরবেলা না তোমার গাড়ি, এখনও জেগে আছ?

বললাম, আজ রাতে ঘুম আসবে না ঝিন্নি। চেষ্টা করলেও ঘুমুতে পারব না।

ও কিছু না বলে আবার গোছগাছের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কতক্ষণ পরে ও উঠে এসে বসল আমার পাশে। বলল, শুয়ে পড়, আমি বিলি কেটে দিচ্ছি তোমার চুলে।

বললাম, ঝিন্নি, আজ তোমার কোলে একটুখানি মাথা রেখে শুতে বড় ইচ্ছে করছে।

ও অমনি বিছানায় উঠে বসে কোল পেতে দিল। আমি ঝিন্নির কোলে মাথা রেখে চোখ বুজলাম। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমার জানালার ওপরে জ্বলজ্বল করছে যে নক্ষত্র তারই মত উজ্জ্বল স্থির চোখে ঝিন্নি তাকিয়ে আছে আমার মুখের ওপর।

ঝিন্নির চোখের তপ্ত একফোঁটা জল বকুল ফুলের মত আমার কপালে ঝরে পড়তেই চোখ মেলে তাকালাম।

অপ্রস্তুত ঝিন্নি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ততক্ষণে।

বললাম, আমারও কি আর ভাল লাগবে ঝিন্নি একা একা থাকতে। গিয়েই ডিসপেনসারী খোলার কথা, কিন্তু খোলাই সার হবে। কাজে মন বসানো দায় হয়ে উঠবে।

ঝিন্নির কান্না থেমে গেছে। গলার স্বরটা তখনও ভারী। ও বলল, না না, তা কেন হবে। তুমি কত বড় ডাক্তার হবে, কত নামডাক তোমার। কুলুর পাহাড়ী মানুষগুলোর চিকিৎসা করবে তুমি, তারা সুস্থ হয়ে তোমাকে আশীর্বাদ করবে। আমি রাতদিন সেই কথাই ভাবি ছোটেসাহেব।

শুধু বললাম, তাই হবে ঝিন্নি।

আর কোন কথা আমি বলতে পারলাম না। ঝিন্নি আমার মাথার চুলে ওর নরম আঙুলগুলো চালাতে লাগল।

এক সময় ওর কষ্ট হবে মনে করে আমি মাথাটা বিছানায় সরিয়ে নিতেই ও আবার তার কোলের ওপর তুলে নিয়ে বলল, আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না ছোটেসাহেব। সারাটা রাত এমনি করে বসে থাকতে দাও।

ওর হাতের আঙুলগুলো আমার চুলেভরা মাথাটাকে চেপে ধরে রইল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম আঙুলগুলো আবেগে কাঁপছে।

ভোরবেলা ঝিন্নির অন্য রূপ। সকাল সকাল চা আর খাবার খাইয়ে দিলে আমাদের। ভাগ্‌তুটা ইতিমধ্যেই খোঁড়া পায়ের গোড়ালীর ওপর ভর রেখে ব্যালান্স প্র্যাকটিস করে নিয়েছে। চাচাজী আর আমার সঙ্গী সে। ঝিন্নি ওকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল নাগ্‌গরে। কিন্তু ওর একটা ক্র্যাচ তৈরি করে দেওয়া দরকার, তাই ওকে সঙ্গে নিলাম আমি।

এক ফাঁকে বললাম, থাক ভাগ্‌তু আমার কাছে। তোমার খবর পাবার জন্যে যখন অস্থির হয়ে উঠব, মন বসবে না কোন কাজে, তখন ওকে মানালীর বাসে তুলে সিধে পাঠিয়ে দেব নাগ্‌গরে। ও হবে আমার পত্রবাহক দূত।

ঝিন্নি বলল, অতশত বুঝি না, ভাগ্‌তু আসে ভাল, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে আমার একটি করে অন্তত চিঠি চাই। আর তা পাঠাবে নীল খামে ভরে হাল্কা হলুদ রঙের কাগজে। ডাকপিয়ন বয়ে আনবে সে চিঠি। আমি পাইনগাছের তলায় দাঁড়িয়ে পড়ন্ত বেলায় সে চিঠি পড়ব।

বললাম, তা না হয় হল, কিন্তু খামের রং নীল আর কাগজের রং হলুদ কেন ঝিন্নি।

ও বলল, নীল খাম দেখলেই বুঝব তুমি চিঠি লিখেছ, তখন আমার মনটা আকাশ হয়ে যাবে। আর চিঠি পড়ে খুশির আলোর ঝিলিক দেবে মনের ভেতর তাই কাগজটা হবে হলুদ রঙের।

বললাম, তুমি জাত-কবি ঝিন্নি।

ও আমার হাতখানা জোরে টিপে দিয়ে বলল, আর তুমি একজন হার্টস্পেশালিস্ট। তোমার চিকিৎসাতেই মহিলা কবিটির বাঁচা-মরা নির্ভর করছে।

বাইরে থেকে চাচাজীর ডাক শুনে ওর মাথাটায় নাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। ঝিন্নি কুলুতে আসার দিনটির মত আপেল গাছের তলায় রোদ মেখে দাঁড়িয়ে রইল। আমরা চোখের আড়ালে চলে যাবার আগের মুহূর্তটি পর্যন্ত ও সমানে একটা ছোট্ট পতাকার মত ওর হাতের পাতাটা নাড়তে লাগল।

মানালীর বাংলোতে বসে আছি। চাচাজী গেছেন বাগিচা তদারকির কাজে। আমার সামনে গমের ক্ষেত ধাপে ধাপে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। সোনালী বাদামী রং ধরেছে গমের গায়ে। আর কিছুদিনের ভেতরেই পাকা ফসল ঘরে তোলা শুরু হবে। উঁচু পাহাড়ী অঞ্চল থেকে ভ্যালিতে গম চাষের কাজ দেরিতে শুরু হয়, কিন্তু ফসল তোলা হয় আগে। ওপরের পাহাড়ে শীত বেশি, তাই চারাগাছগুলো শীতের দাপটে তাড়াতাড়ি মাথা তুলতে পারে না।

গমের ক্ষেতগুলো দেখতে হয়েছে ঠিক বাঘের পিঠের ডোরার মত। ক্ষেত যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে দেওদার আর পাইনের বন। তার পেছনে উঁচু পাহাড়, মাথায় একরাশ বরফ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে বাঁয়ে ফিরলেই দুটো ফার গাছের কাণ্ডের ফাঁকে একটা ছবি চোখে পড়ে। অনেক দূরে বরফের কুঁচি ছড়ানো লম্বা টানা একটা পাহাড়। তার তলায় একটা ভ্যালি। পাহাড়ী ঝোরার স্রোত বইছে ভ্যালির ওপর দিয়ে। তার তীরে এখানে ওখানে বাঁকে বাঁকে দু-তিনটে করে পাইন গাছ দাঁড়িয়ে আছে। তুলি দিয়ে ছবি এঁকে রেখেছে কেউ।

পাহাড়ের কোলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কতকগুলো ঘরবাড়ি নিয়ে এক একটা টিকা। দূর থেকে বড় জীর্ণ দেখায়। কাল ওদিকে লী সাহেবের টাট্টু চেপে গিয়েছিলাম রোগী দেখতে। নিমোনিয়া কেস। আপার আর মিড জোনে হয়েছে। টেম্পারেচার ১০৫ ডিগ্রী। পেসেন্ট ডেলিরিয়াস, কোলাপসিংও।

বাজারের মেডিকেল স্টোরে ক্রিস্টেলাইন পেনিসিলিন পাওয়া গেল ভাগ্যিস। টেন ল্যাকস ইনজেকশনের ব্যবস্থা করে এসেছি। ডিসপেনসারীর কম্পাউন্ডার রাতে থাকবে

ওখানে। ইনজেকসন দিতে হবে ছ ঘণ্টা অন্তর। রোগীটি বৃদ্ধ, বিপত্নীক। ঝিন্নির মত একটি মেয়ে দেখলাম। খুব শান্ত প্রকৃতির। যা বললাম, কথা না বলে, একটি একটি করে সব করে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, আর কোন পুরুষ মানুষ নেই তোমার ঘরে?

উত্তর দিতে গিয়ে মেয়েটি অসহায়ের মত তাকাল। তারপর মাথা নেড়ে জানাল, নেই। আবার পরক্ষণেই বলল, আমার দাদা আছেন। মিলিটারীতে কাজ করেন। এখন লাডাকে রয়েছেন।

বললাম, অসুখের খবর জানিয়ে চিঠি দাও নি?

মেয়েটি মাথা নেড়ে জানাল, খবর দেওয়া হয়নি।

বললাম, অসুখটা সেরে যাবে ঠিক, তবু এ সময় তোমার দাদার এখানে থাকাটা দরকার ছিল।

মেয়েটি দেখলাম অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালো। মনের আবেগটুকু চেপে রেখে বলল, দাদা পাঁচ বছর আসেনি, কোন চিঠিও পাঠায় না। লোকের মুখে কখনো সখনো খবর পাই।

কিছু একটা পারিবারিক দুঃখ আছে ওদের, তাই ও ব্যাপারে আর কথা তুললাম না।

আমি চলে আসছি দেখে মেয়েটি অসহায়ের মত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কি আবার আসবেন ডাক্তারসাব?

বললাম, আজ রাতে এখানে থাকার দরকার আছে। তুমি পেসেন্টের কাছে থাক এখন, আমি বাজারের দাওয়াখানায় যাচ্ছি। ওখানে ওষুধ পাওয়া গেলে কম্পাউণ্ডারকে পাঠিয়ে দেব। ছ ঘণ্টা অন্তর ইনজেকসান দিতে হবে। রাতে তোমার এখানে থাকবেন কম্পাউণ্ডার।

আমি টাট্টুতে নেমে আসছিলাম। মেয়েটি দেখি হাঁপাতে হাঁপাতে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। ও সোজা পথে নেমে এসেছে।

বললাম, কি হল আবার?

ও একখানা পাঁচ টাকার নোট আমার দিকে তুলে ধরতেই বললাম, ওটা রেখে দাও এখন। আবার আসতে হবে। পরে একেবারে তখন নেওয়া যাবে।

চলে আসতে আসতে মনে হল, এমন কিছু সচ্ছল অবস্থা নয় ওদের। অন্তত বাড়িঘর দেখে তাইতো মনে হয়। কি করে মেয়েটি সংসার চালায়, কি করেই বা বুড়ো বাপের সেবা করে! মিলিটারীতে গিয়ে নিজের পথ দেখে নিয়েছে ছেলে। এখন মেয়েই বৃদ্ধটির একমাত্র ভরসা।

মনে মনে হাসিও পেল। নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কতদিন বিনি পয়সায় চিকিৎসা চালাবে ডাক্তার? প্রথম প্রথম ফি ছাড়বে, তারপর বিনি পয়সায় ওষুধ জোগাবে, তাহলে আর দেখতে হবে না। ভীড় জমে যাবে। কুলু থেকে মানালী অব্দি।

কম্পাউণ্ডার শিউশরণজী কাল রাতে ছিলেন রোগীর বাড়ি। সকাল ছ'টায় ইনজেকশন দিয়ে ডিসপেনসারীতে এসেছিলেন। খবর দিয়ে গেছেন। রোগীর অবস্থা সামান্য ইমপ্রুভ করেছে। উনি আবার বারোটায় গিয়ে ইনজেকশন দেবেন। ওঁকে কাল রাত জাগার জন্য আজ সকালে ছুটি দিয়ে দিয়েছি।

ক'টি পাহাড়ী এসেছিল। ব্রংকাল ট্রাবল, এ্যালার্জি ঘটিত চুলকোনি আর ফিমেল ডিজিজের রোগী। ওদের প্রেসক্রিপশান লিখে বাজারের দোকানে পাঠিয়ে দিয়েছি। জানি না, এসব ছোট জায়গায় সবরকম ওষুধ মিলবে কিনা। এবার শিউশরণজীকে পাঠাতে হবে সিমলা, চণ্ডীগড় কিংবা দিল্লীতে। ডিসপেনসারী চালাতে গেলে দরকারী সব ওষুধ মজুদ না করলেই নয়।

দুপুরবেলা খাবার পর বেরিয়েছেন চাচাজী। আমি দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। একা বসে থাকলে মানুষ নিজের মনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে। কত চরিত্র পুরোনো ঘটনার পোশাক পরে এসে হাজির হয়। সুখ দুঃখ হাসি দীর্ঘশ্বাসের কত গল্পই না চলে তাদের সঙ্গে। আমি নির্জনে আমার পরিচিত অপরিচিত চরিত্রগুলিকে নিয়ে খেলা করতে ভালবাসি। প্রতিদিনের জীবনে যেসব চরিত্রের মুখোমুখি হতে হয় তাদের কারো কারো সঙ্গ বেশিক্ষণ পছন্দ না হলেও ভদ্রতার খাতিরে সরে আসতে পারি না। আবার কাউকে একান্ত কাছে দীর্ঘসময় পেতে চাইলেও পাওয়া যায় না। কিন্তু নির্জন অবসরে কাউকে আমন্ত্রণ বা প্রত্যাখ্যানের পূর্ণ অধিকার আমার। তাই নির্জনতা আমার প্রিয়। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় উপভোগ নির্জনতায় বিচরণ।

বাঁদিকের রাস্তার ওপর চোখ পড়তে দেখি মিঃ বেনন জুনিয়ার আসছে। জুলিয়েন বেনন আমার বয়সী। ভাগ্তুর অপারেশনের সময় ঝিন্নি আর আমাকে বেনন পরিবার বহু সাহায্য আর যত্ন করেছিলেন। সেই সূত্রে মানালীতে আসার পরেই জুলিয়েনের সঙ্গে বন্ধুত্ব।

জুলিয়েনকে দেখে ঘরের ভেতর থেকে আর একখানা চেয়ার বের করে আনলাম। ওপর থেকে হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানালাম ওকে। জুলিয়েনও হেসে হাত নাড়ল। বাগান পেরিয়ে উঠে এলো ওপরের বারান্দায়।

ওর প্রথম কথা, কি ভাবছ ডাক্তার? নিশ্চয় কোন মেয়ে বন্ধুর কথা?

হেসে বললাম, না, এখন পুরোপুরি ভাবছি আমার পুরুষ বন্ধুটির কথা।

ও বলল, এটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। ছেলেরা মেয়েদের কথা আর মেয়েরা ছেলেদের কথা ভাববে না তাহলে তো ভাবনার জগতে দুর্ভিক্ষ।

বললাম, আমার আর তোমার বেশ খানিক ফারাক আছে জুলিয়েন। তুমি মেয়েদের মুখের দিকে চেয়ে মনের খবর জানতে পার, আর আমি স্টেথিসকোপ বুকে বসিয়েও বুকের ভাষা পড়তে পারি না। তাই ওদের ভাবনা ছেড়ে দিয়েছি বলতে পার।

জুলিয়েন মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ও ভাবনা ছাড়া যায় না ডাক্তার। কেন মিথ্যে লুকোচ্ছো আমার কাছ থেকে।

বললাম, বিশ্বাস কর জুলিয়েন, তোমার আসার আগের মুহূর্তে আমি রোগীদের কথাই ভাবছিলাম।

জুলিয়েন মাথা নেড়ে বলল, স্বাভাবিক। আমাদের মত তুমি তো কেবল ফলের কারবারী নও, আরও একটা বিদ্যে তোমার জানা আছে।

বললাম, ব্যবসার দিকটা পুরোপুরি কিন্তু নরসিংলালজীর। ওটার ভেতর আমাকে আর জড়িও না। ডাক্তারী বিদ্যের পরীক্ষাটা সবে শুরু করেছি।

নরসিংলালজীর নামে দেখলাম জুলিয়েন বিশেষ শ্রদ্ধাবিগলিত। বলল, ঐ এক মানুষ পেয়েছ ডাক্তার। সারা কুলুর ফলের ব্যবসা একদিকে আর নরসিংলালজী একদিকে। ওজন সমান থাকবে।

কথাটা বুঝতে না পেরে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। জুলিয়েন বলল, বুঝলে না, একদিকে ব্যবসা আর একদিকে সততা। নরসিংলালজী হলেন সিম্বল অব অনেস্টি। যার যেমন খুশি ব্যবসা করব, এ ধারণাটাই পাল্টে দিয়েছেন। ব্যবসার কানুন সব তৈরি করে দিয়েছেন মানুষটি। বাবা ভীষণ রেসপেক্ট করেন নরসিংলালজীকে। বলেন, আমার সব কটা আপেল বাগিচার যা ভ্যালু, একা নরসিংলালজীর কথার দাম তার চেয়ে অনেক বেশি।

বললাম, আমার বাবা ভাগ্যবান ছিলেন, তাই ওঁর মত একজন খাঁটি মানুষ পেয়েছিলেন। শুনেছি, বাবা ওঁকেই এখানকার সবকিছু দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু উনি তা নেন নি। আমাকে এখানে বসিয়ে তবে ওঁর শান্তি।

জুলিয়েন হঠাৎ বলল, নরসিংলালজীর মেয়েটির সম্বন্ধে তোমার ধারণা কি রকম ডাক্তার? অবশ্য যদি তোমার বলতে বাধা না থাকে।

বললাম, বাধা থাকবে কেন। আমার মনে হয়েছে ঝিন্নি তার বাবার মতই সাচ্চা, আবার বুদ্ধির ধারও রয়েছে।

জুলিয়েন বলল, আমার মায়ের ধারণাও ঠিক তোমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। বড়দিনের সময় ঐ যে তোমরা এলে, মা তো ওর ব্যবহারে উচ্ছ্বসিত।

বললাম, তোমার মায়ের ধারণার কোন ভুল নেই।

জুলিয়েন হঠাৎ বলল, আমি মেয়েটিকে কিছু স্টাডি করেছি সে সময়।

বিস্মিত হলাম। জুলিয়েন ঝিন্নিকে স্টাডি করেছে, এ কথার অর্থ কি!

আমি ওর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ও বলল, মুখার্জী, বন্ধু বলে যখন মেনে নিয়েছ, তখন মন খুলে কথা বলার অধিকারও দেবে আশা করি।

বললাম, নিশ্চয়ই।

কিন্তু আমি নিজেই বুঝতে পারছিলাম, আমার কথাটা কেমন যেন অস্পষ্ট শোনাচ্ছে।

জুলিয়েন সোজাসুজি বলল, নরসিংলালজীর মেয়ের তোমার ওপর কিছু আকর্ষণ আছে।

আমার এলোমেলো ভাবনার জটটা ছিঁড়ে গেল। এক চোট হেসে উঠে বললাম, তাই নাকি? কি করে বুঝলে বেনন? আমাকে দয়া করে একটু বুঝিয়ে দেবে?

জুলিয়েন বলল, আমাদের কোয়ার্টারে একদিন নরসিংলালজীর মেয়ে এলে মা ওকে বাগানের সবসেরা একটা গোলাপ প্রেজেন্ট করেছিলেন। পরে আমি ঐ গান্ধী ছেলেটার পায়ের খবর নিতে এসে দেখি, তোমার কোটের বাটন হোলে মায়ের দেওয়া সেই গোলাপ।

বললাম, হাঁ, মনে পড়ছে, ঝিন্নি আমাকে একটা গোলাপ এনে দিয়েছিল একদিন।

জুলিয়েন অমনি বলল, গোলাপ দেয়নি শুধু, ওর সঙ্গে আর কিছু বেশি দিয়েছে। একটি কুমারী মেয়ের হৃদয়ের রং আর গন্ধ।

চুপ করে ওর দিকে চেয়ে হাসছি দেখে জুলিয়েন বলল,

'Love and a cough cannot be hid'. বেননের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না ডাক্তার।

বললাম, আমি তো ফাঁকি দিতে চাই নি।

জুলিয়েন ধরে পড়ল, তাহলে তোমার রেড রোজের গান শোনাও ডাক্তার।

বলেই সে আপনমনে আবৃত্তি করল, 'Your voiceless lips, O flowers, are living preachers—each cup a pulpit and each leaf a book.'

বললাম, কি শুনতে চাও বল? যে মেয়েটি আমাকে গোলাপ দিয়েছিল, সে তার সঙ্গে একটা হৃদয়ও উপহার দিয়ে গেছে। তুমি ঠিকই ধরেছ জুলিয়েন। এবার আমার কথাটা শোন। প্রথম দেখাতেই আমি ঝিন্নিকে ভালবেসেছিলাম। এখন আমরা অনেকখানি পথ একসঙ্গে এগিয়ে এসেছি।

জুলিয়েন বলল, তোমাদের শুভদিনের জন্যে বন্ধু হিসেবে আমার আন্তরিক আনন্দটুকু জানিয়ে রাখলাম। আজ থেকে আমি তোমাদের যেকোন কাজে সাহায্য করতে পারলে বিশেষ গৌরব বোধ করব।

আমি বেননের হাতখানা ধরে বললাম, এতদিন নিঃসঙ্গতাই ছিল আমার সঙ্গী, আজ থেকে তুমি আমার একমাত্র বন্ধু।

বেনন আমার ধরে থাকা হাতখানায় একটা আন্তরিকতার চাপ দিল। ও আর কোন কথা না বলেই আমার বন্ধুত্বকে আরও গভীরভাবে স্বীকৃতি জানাল।

দুপুর কিংবা রাতের বেলা যখন রোগীর ভীড় থাকে না, তখন আমি জুলিয়েনের জন্যে মনে মনে অপেক্ষা করি। ও বিশেষ কাজে কোথাও চলে না গেলে আসবেই আসবে আমার বাংলোতে। এ মুল্লুকে মন খুলে কথা বলার দ্বিতীয় বন্ধু আর নেই। আমিও ইদানিং দারুণরকম একটা আকর্ষণ অনুভব করছি বেনন পরিবারের এই যুবকটির ওপর।

জুলিয়েনের মা ইতিমধ্যে আমাকে দু'চারবার চা আর ডিনারের নেমন্তন্ন করে খাইয়েছেন। আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করে অবাক হয়েছি, বেনন পরিবারে কোন ফর্মালিটি নেই। অনেকটা আমাদের ঢিলেঢালা দিশি আচার আচরণের মত। ঝিন্নির কাছে শুনেছিলাম, ক্যাপ্টেন এ. টি. বেননের ছেলে মেজর বেনন এ দেশীয় একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। স্ত্রীকে এত ভালবাসতেন যে ঘরের ভেতর হিন্দু আচার-আচরণের ঢালাও পারমিশান দিয়েছিলেন তিনি। হয়ত সেই থেকে বেনন পরিবারের রিসেপশনে খৃষ্টানী আর হিন্দুয়ানীর সহাবস্থান ঘটেছে।

জুলিয়েন সম্বন্ধে দেখলাম ওর মা কিছুটা চিন্তিত। মিসেস বেননের ধারণা জুলিয়েন পুরোদস্তুর খামখেয়ালী। ওর দাদাদের একজন লন্ডনে গিয়ে বিয়ে-থা করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। সেখানে তার সংসার সে নিজের মনোমত সাজিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয়টি সিমলায় কিউরিও শপের মালিক। ওখানে পরিবারের ফলের ব্যবসার দেখাশোনাটা সে করে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে জুলিয়েনকে নিয়ে। ইচ্ছে হলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে কয়েক মাস পড়ে রইল বাগান আর ফল নিয়ে। আবার মাথার পোকা নড়লেই বেরিয়ে পড়ল বন পাহাড়ে। তখন জুলিয়েন পুরোদস্তুর ভবঘুরে। পড়ে রইল ফল প্যাকিং-এর কাজ, জ্যাম জেলি তৈরির তদারকি, জুলিয়েন পলাতক। কখন কোথায় থাকবে তার হদিস নেই। ঘর ছাড়া আর ঘরে ফেরার কোন নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নেই তার।

মিসেস বেননকে হাসতে হাসতে বলেছিলাম, ছেলেকে সংসারী করে দিন, তাহলে হুট-হাট করে আর পালাতে পারবে না।

মিসেস বেনন বলেছিলেন, স্বভাব না বদলালে নতুন বিয়ে করা বউটিই কষ্ট পাবে। তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাক।

জুলিয়েন একটা উত্তর দিয়েছিল সে সময়। বলেছিল, একটা গাদ্দী মেয়েকে বিয়ে করলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। আমার মত সেও পথে পথে ঘর পাতবে।

জুলিয়েনের কথার পরে আর কোন কথা তোলেন নি মিসেস বেনন। কারণ তিনি জানতেন, এ ব্যাপারে কথা বাড়ালে ফয়সালার কোন আশা নেই।

বেলা পড়ে এলে লী সাহেবের দেওয়া টাট্টুতে চেপে আমি ভ্যালিতে ঘুরে আসি। এখানে গরমের দিনগুলোতে শেষ বেলার আলোটুকু যাই যাই করেও যায় না। রাতের অন্ধকার নামতে সেই প্রায় আটটার কাছাকাছি।

আমি ভ্যালির ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা শীর্ণ জলধারা পেরিয়ে ওপারের পাহাড়ের দিকে চলে যাই। পাহাড়ের নিচে এসে টাট্টুর মুখ ফিরিয়ে একবার দেখে নিই আমার বাংলো বাড়িখানা। কত ওপরে দেওদার গাছের ফাঁকে সাদা বাংলোটা ছবির মত দেখায়। তার একটু নিচে কফি সেন্টারের গোল বাড়ি, তারপরেই পাহাড়টা যেন খাড়া নেমে এসেছে!

আমি আবার টাট্টুর লাগাম ধরে উঠতে থাকি পাশের পাহাড়ে। তিন-চারটে পাইন গাছের পাশ দিয়ে একটা কুহল যেখানে লাফাতে লাফাতে নিচে নেমে যাচ্ছে সেখানে একখণ্ড শিলার ওপর বসি। পাশে টাট্টুটা বাঁধা থাকে। আরও খানিক ওপরে ছড়ানো ছিটানো বসতি এলাকা শুরু। আমার মাথার বিশ-তিরিশ ফুট ওপরে একটা গম পেষার কল চলে। কল বললে ভুল হবে, চাকীতে গম পিষে দেয় একটি মেয়ে। ওপরের টিকার লোকেরা এসে ভাঙিয়ে নিয়ে যায়। কুহলের স্রোতের সঙ্গে চাকি ঘোরানোর একটা ব্যবস্থা আছে।

আমি একটানা একটা আওয়াজ শুনতে পাই। বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে লোকজন কাজ সেরে ওপরে উঠে যায়। কেউ বা বেশি গম থাকলে ছাগল কিংবা ভেড়ার পিঠে বেঁধে দেয় বস্তা। ওরা সেই বস্তা পিঠে নিয়ে দিব্যি উঠতে থাকে ওপরে। সবশেষে মেয়েটি যখন

কাঠের দরজাটা বন্ধ করে ওপরের টিকার দিকে চলে যায় তখন আমিও টাট্টুটা খুলে নিয়ে নামতে থাকি ভ্যালির দিকে। ঐ চাকীর বন্ধ হাওয়াটা যেন আমার কাছে ঘরে ফেরার ওয়ার্নিং। এরপর বসে থাকলে ভ্যালি পেরিয়ে ওপারের পাহাড়ে উঠতে না উঠতেই অন্ধকার নেমে আসবে, আর তখন পথ চিনে পাহাড়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে।

একদিন হয়েছিলও তাই। ভ্যালির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল ভূমণ্ডলের একখানা ক্ষুদ্র মানচিত্র যেন আমার সামনে মেলে রেখেছে কেউ। উত্তরে বরফের পাহাড়টা জেগে আছে। স্নো লাইনের তলা থেকে ক্রমে ক্রমে পপলার ফার দেওদার পাইন গাছের সারি ছোট থেকে বড় হয়ে নীচের ভ্যালিতে নেমে এসেছে। আদি মানবগোষ্ঠীর এক একটি দল যেন ওরা। সারি দিয়ে নামছে বিশেষ বিশেষ শৈলশিরা বেয়ে। নিচের পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে কৃষিকর্ম। এখানে ওখানে সোনালী বাদামী গমের ক্ষেত। অবিকল ডোরাকাটা হলুদ বাঘের পিঠ। ভ্যালির ওপর দিয়ে চলেছে জলধারা। আঁকাবাঁকা চলন তার। পাইনের পাশ কাটিয়ে দেওদার বনের ভেতর দিয়ে সে পথ করে চলেছে। কটি পাহাড়ী গমের ক্ষেতের পাশ দিয়ে উঠে গেল পেছনের বসতি এলাকার দিকে। একজনের পিঠে বাঁধা কিল্‌তা। তিনকোণা বাক্সটিতে দরকারী মালপত্র বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে।

সূর্যাস্তের আবীর রঙে ধীরে ধীরে মিশছে সন্ধ্যার কালো ছায়া।

চোখ নেমে এল ভ্যালির প্রবহমান জলধারাটির ওপর। একপাল ফেনা তোলা ভেড়া নিয়ে একটি গাদ্দী পরিবার চলতে চলতে থেমে দাঁড়াল। ভেড়াগুলো জল দেখে থমকে গেছে। গাদ্দী লোকটা ধেড়ে একটা ভেড়াকে তুলে ধরে ছুঁড়ে দিলে জলের মধ্যে। ভেড়াটা লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ওপারে গিয়ে উঠতেই অন্য ভেড়াগুলো তাকে অনুসরণ করে জলে নেমে পার হয়ে গেল। সবশেষে গাদ্দী পরিবারের লোকগুলো কটা ভীতু ভেড়ার বাচ্চাকে বগলে পুরে জলের স্রোত ভেঙে ওপারে গিয়ে উঠল।

ওরা চলতে চলতে একসময় পাহাড় আর বনের ভেতর হারিয়ে গেল।

আমি তখন গাদ্দীদের কথা ভাবতে লাগলাম। ওরা মানালী থেকে এখন উঠবে আরও ওপরের পাহাড়ে। গরম না পড়া অব্দি কাটাবে স্নো লাইনের নিচে বনে পাহাড়ে। বিল কেম্বল খইর গার্ণা গাছের পাতা খেতে খেতে ওপরে উঠবে ভেড়ার পাল। শীতে এসব গাছের পাতা ছাড়া খাবার আর কিই বা আছে।

গরম যত বাড়বে ওরা তত তাড়াতাড়ি উঠবে স্নো লাইনের ওপরে। ওখানকার ঘাস নাকি ভেড়াদের দারুণরকম পুষ্টি জোগায়।

গ্রীষ্ম বর্ষায় রোটাং পেরিয়ে গাদ্দীরা চলে যাবে লাহুল। দূর স্পিতি অব্দি ওরা ঘুরে বেড়াবে ভেড়া চরিয়ে চরিয়ে।

কি অদ্ভুত ভ্রাম্যমাণের জীবন ওদের। জুলিয়েন বলেছিল, বেশ কয়েকবার ও গাদ্দীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে। গাছের তলায় পাহাড়ের ওপর শুয়ে বসে কাটিয়ে দিয়েছে রাত। আগুন জ্বেলে লেপার্ড ভালুক প্যানথারের কবল থেকে রক্ষা করেছে ভেড়ার পাল।

জুলিয়েন বলে, গাদ্দী মেয়েদের চোখের টানে মানালী থেকে লাহুল পাঙ্গী স্পিতি চম্বা কাংড়াই শুধু নয়, সারা দুনিয়াটা ঘুরে আসা যায়।

আমিও হয়ত জুলিয়েনের মত এমনি একদিন বেরিয়ে পড়ব পাহাড়ী পথে। সামনে নীল আকাশে হেলান দিয়ে জেগে থাকবে পীরপাঞ্জাল। সবুজ বার্চ বনে উঠবে হাওয়ার গান। আর সোনালী আলোয় স্নান করতে করতে গাদ্দীদের সঙ্গে এগিয়ে চলব আমি।

হঠাৎ ভাবনায় ছেদ পড়তেই দেখি ভ্যালিতে ছায়া বেশ গাঢ় হয়ে নেমেছে। আমাকে যেতে হবে ঐ ভ্যালি পেরিয়ে ওপারের পাহাড়ে। পেছনে মাথার ওপর চেয়ে দেখি গম ভাঙানো ঘরখানা বন্ধ করে মেয়েটি কখন চলে গেছে।

আমি নিজের নির্বুদ্ধিতায় দারুণরকম বিব্রত হয়ে পড়লাম। তাকিয়ে দেখি ওপারের পাহাড়ে সন্ধ্যার বাতিগুলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে ঝিকমিক করে জ্বলছে।

এখন আমার কোনদিকে যাবার উপায় নেই। পেছনের পাহাড়ে অনেকখানি ওপরে উঠলে তবে বসত এলাকা পাওয়া যাবে। সঙ্কীর্ণ ভাঙাচোরা আজানা পাহাড়ী পথে ওপরে ওঠার প্রশ্নই আসে না। নীচে নামলে আরও বিপদ। পায়ে পায়ে পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আছাড় খেয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

আমি কোন পথ দেখতে পেলাম না। সারারাত এখানে বসে থেকে যদি কোনরকমে প্রাণে বেঁচে যাই তবু নিউমোনিয়ার হাত থেকে আমাকে বাঁচায় কে।

অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসছে। কুহলের শব্দ ক্রমশ বেড়ে উঠছে। হঠাৎ একটা শব্দে চমকে উঠলাম। না, আমার টাট্টু অজানা অন্ধকারে অস্বস্তি বোধ করছে। তাই শব্দ করে উঠল! আমি অর্থহীন একটা ধ্বনি তুলে আমার অস্তিত্ব জানিয়ে ওকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও।

আজ কোন তিথি জানা নেই। আমি চিরদিন তিথি এমনকি বার সম্বন্ধেও কতকটা উদাসীন। তাই চাঁদের উদয়অস্ত সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। চাঁদ উঠলে পথ চিনে হয়ত ঘরে ফেরার চেষ্টা করা যেত কিন্তু তার কোন সম্ভাবনা অন্তত সামনে দেখা যাচ্ছে না। নিরন্ধ্র অন্ধকারের বুকে চোখ পেতে বসে আছি। সর সর করে পাশ দিয়ে কিছু একটা চলে গেল। আমার গায়ে কোনরকম ছোঁয়া না লাগলেও গা-টা দারুণরকম শিরশির করে উঠল। এ অঞ্চলের বিষাক্ত খর্পা সাপ নয় তো! নিরুপায় হয়ে প্রায় দমবন্ধ করে বসে রইলাম। যদি কাছেপিঠে থাকে আর গায়ে বেয়ে ওঠে তাই গাছের একটা অনড় কাণ্ড বলে নিজেকে ভাবতে লাগলাম।

হঠাৎ চোখ পড়ল সামনে। অন্ধকার ভেদ করে মানালীর ওপারের পাহাড়ে টকটকে লাল চাঁদটা উঁকি দিচ্ছে। চাঁদের আকার দেখে মনে হল কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়, চতুর্থীর চাঁদ। একটা ভরসার হাওয়া যেন ওপার থেকে ভ্যালি পেরিয়ে বয়ে এল আমার বুকের মধ্যিখানে।

চাঁদটায় আটকে গেছে আমার দুটো চোখ। দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে চাঁদের রঙ। কেউ যেন ঘষে মেজে ঝকঝকে করে তুলছে চাঁদটাকে। বড় বড় গাছের পাতার রঙ চেনা না গেলেও তাদের ছায়া আর আকার স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে জলো দুধের মত কতকগুলো ঢেউ

এসে ভরে তুলল উপত্যকার কালো পাত্রখানা। দেখতে দেখতে মাজা রূপোর মত ঝকঝকে চাঁদ আকাশের বেশ খানিক ওপরে উঠে গেল।

এখন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে পথপ্রান্তর। আমি কিন্তু ঠায় বসে আছি। উত্তরের পাহাড়ে তুষারের ওপর চাঁদের আলো পড়েছে। কোন কোন জায়গায় বরফের বণ্ড বেশ খানিকটা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। গাছগুলো সিলুয়েট ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে। তাদের তলায় সাদা খণ্ড খণ্ড বরফ ছড়ানো।

মনে হল, এই জনহীন নিসর্গের সঙ্গে অচ্ছেদ্য কোন বাঁধনে আমি জড়িয়ে আছি। ঐ চাঁদ, তুষার পাহাড়, নদী অরণ্য উপত্যকা সবকিছু, আমার অনেক দিনের দেখা, বহু যুগের চেনা। এ স্থানটা মানালী না হয়ে পৃথিবীর যে কোন জায়গা হতে পারে। সাইবেরিয়া বা আল্পসের তুষারভূমির ওপর জেগে থাকা চন্দ্রালোক প্লাবিত বনাঞ্চলের রোমাঞ্চ আমাকে বারবার ছুঁয়ে যেতে লাগল। আমার মনে হল, আফ্রিকার কোন নদীবাহিত গভীর উপত্যকা তার আলোছায়ার আমন্ত্রণ নিয়ে ঠিক যেন আমার চোখের সামনে প্রসারিত হয়ে আছে।

আমার টাট্টু এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে। সে তার হ্রেষার সঙ্গে ঘন ঘন পাথরে পদক্ষেপ করে চলেছে। সে বোধহয় ইঙ্গিতে এই কথাটুকু জানাতে চাইছে, হয় আমাকে খাটিয়ে নাও নয়তো বিশ্রামের সুযোগ করে দাও।

আমি ধীরে ধীরে উঠে টাট্টুতে চড়ে উপত্যকার দিকে নেমে চললাম। উপত্যকায় নেমে দেখি পাইন গাছগুলো উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় এক একটি ছায়াসঙ্গিনী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বড় বড় পাথরের চাঁইগুলো স্নান করছে চাঁদের জলে।

ছোট্ট নদীটা পেরিয়ে মানালীর পাহাড়ের দিকে টাট্টুর মুখ ফিরিয়ে দেখি দেওদার বনের ভেতর দিয়ে কে যেন হেঁটে আসছে। একবার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে আবার আলোছায়ায় ভেসে উঠছে। আমি টাট্টুর লাগাম টেনে ধীরস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এবার গাছের জটলা থেকে লোকটির বেরিয়ে আসার কথা কিন্তু তার আর পাত্তাই নেই। গল্পের অশরীরী আত্মার মত আগন্তুক উবে গেল নাকি!

আমাকে এখন ঐ বনের ভেতর দিয়েই টাট্টু নিয়ে উঠতে হবে। কি জানি মতলববাজ কোন লোকের মুখোমুখি যদি হতে হয়।

কে ওখানে?

চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, বেরিয়ে এসো এদিকে।

বাবুজী, আমি ভাগ্‌তু, বলতে বলতে একটা গাছের আড়াল থেকে ভাগ্‌তু বেরিয়ে এল। মোটা লাঠি একখানা দু'হাতে চেপে ধরে ব্যালান্স রাখতে রাখতে এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল সে।

টাট্টু থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে বললাম, তুই এখানে! এতটা পথ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেছিস?

ভাগ্‌তু মুখখানা নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ওর খোঁড়া পা খানার দিকে চোখ পড়তেই দেখি, রক্তে লাল হয়ে গেছে আঘাতের জায়গাটা।

তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখি, ভাগ্তু জখম পাখানাতে চোট লাগিয়ে বসে আছে।

ধমক দিয়ে বললাম, কে তোকে আসতে বলেছে এখানে?

ভাগ্তু তেমনি লাঠির মাথায় দুটো হাত মুঠো করে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে রইল।

বললাম, ওঠ টাট্টুর ওপর।

ভাগ্তু আর নড়ে না। জোর করে ওকে টেনে এনে টাট্টুতে ওঠালাম। ওর লাঠিখানা হাতে নিয়ে প্রবল জোরে ঠুকতে ঠুকতে আর ওকে ধমক দিতে দিতে চললাম।

এদিকে আমার বুক ঠেলে একটা ব্যথা উঠে আসছিল। সারা জীবনের মত পঙ্গু একটা ছেলে আমার কাছে এসেছে তার জীবন কাটাবার জন্য। এ বয়সে যখন ছেলেরা সঙ্গীদের নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে বনে জঙ্গলে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে, তখন ভাগ্তু সারাদিন মুখ বুজে ছোট্ট বাংলোর সীমানাটুকুর ভেতর হয় আমার ফরমায়েস খাটছে, নয়তো বিষণ্ণ মনে বাইরের দিকে চোখ মেলে চেয়ে বসে আছে।

আমরা বাঁধানো পাথরের রাস্তায় এসে পড়লাম। দু'দিকে দাঁড়িয়ে সারি সারি সিডার। ছায়া পড়েছে পথে। টাট্টুর খুরের বিশেষ শব্দটা বাজছে। এখন লাঠিখানা প্রায় টেনে টেনে চলেছি। টাট্টুর ওপর নীচু হয়ে ঝুঁকে বসে আছে শ্রীমান ভাগ্তু। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভূত আহত বালকবীরকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বাংলোর আলো দেখা যাচ্ছিল। চাচাজী কুলু গেছেন। ঠিকে রাঁধুনি মুন্নি ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাতের রান্না সেরে নিচ্ছে হয়তো।

আমার মনে হল, শিশুরা কত সহজে তার সবটুকু ভালবাসা নিঃস্বার্থভাবে উজাড় করে দিতে পারে। একটা মানুষকে যথাসময়ে ফিরতে না দেখে ভাগ্তুর শিশুমনটিতে যে আলোড়ন উঠেছিল, তাই তাকে নিজের অক্ষমতার কথা ভুলিয়ে চালিয়ে নিয়ে গেছে ঐ দূরের ভ্যালিতে। ভাঙাচোরা আবছা অন্ধকারের পথ পেরিয়ে যেতে আহত হয়েছে সে, কিন্তু প্রিয়জনের বিপদের কথা ভেবে সব যন্ত্রণা লঘু হয়ে গেছে তার।

রাতে খাবারের টেবিলে বসে খাচ্ছিলাম আমি আর ভাগ্তু।

বললাম, হ্যাঁরে ভাগ্তু তুই নাগ্গরে একা একা যেতে পারবি?

ভাগ্তু প্রবল উৎসাহে মাথা দুলিয়ে বলল, খুব যেতে পারব।

আবার বললাম, কিন্তু বাস রাস্তা থেকে যে তোর দিদির কোয়ার্টার অনেকখানি উঠে যেতে হবে, তুই পারবি কি করে?

উৎসাহে টুল থেকে নেমে ওর ঐ লাঠিখানা দেখিয়ে ভাগ্তু বলল, ঐ লাঠিতে ভর রেখে ঠিক চলে যাব।

বললাম, তুই জানিস জায়গাটা?

ও অমনি বলল, আমরা ওদিকে ভেড় নিয়ে গেছি। আর দিদি আমাকে সব বলে দিয়েছে। তুমি ছেড়ে দিয়ে একবার দেখই না বাবুজী।

বললাম, থাম্, আর বাহাদুরী করতে হয় না। এখন পা-টি আগে সারুক তো দেখি, তারপর দিদির কাছে যাওয়া।

ওর উৎসাহের আগুন হঠাৎ নিভে গেল।

ভাবলাম, এখুনি যেতে বললেই ভাগ্‌তু ঐ খোঁড়া পাখানা নিয়ে হয়ত সারারাত নাগ্‌গরের পথে হেঁটে চলত।

ক'দিন ছোট্ট মানালী টাউন আর তার আশ-পাশের অঞ্চল সরগরম। বম্বে থেকে এসেছে সিনেমা পার্টি। ঋতুর পালা বদলের মত সারা পাহাড়ী এলাকায় হাওয়া বদল হয়েছে। গরীব কুলিরা মালপত্র গাড়িতে ওঠানো নামানোর কাজ করে দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। উঠতি বয়সের ছেলেগুলোর চোখে লেগেছে রঙ। তারা পার্টির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে মণিকরণ, রোটাং, কাতরেইন। ফাই-ফরমায়েস খাটছে। বিনি পয়সার মজুরী। শুধু দৃষ্টিভোগ।

মূল দলটি উঠেছে 'হোটেল বিয়াসে'। মানালীর সব থেকে কস্ট্‌লি হোটেল—বেননদের চারটি হোটেলের ভেতর একটি।

প্রোডিউসার ডাইরেক্টার হিরো হিরোইন রয়েছে হোটেল বিয়াসে। বাকী সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে ওখানে। সরকারী ট্যুরিস্ট বাংলোতেও পার্টির লোকজন ঠাসা।

সকালে বাজারে সিগারেট কিনতে গিয়ে দেখি ক্রীম কালারের একটা গাড়ি রোটাং-এর পথে দাঁড়িয়ে। সম্ভবত হিরোইন ডাইরেক্টর প্রোডিউসাররা বসে। মনে হল শুটিং-এ চলেছে। দেখলাম, নীল মাছির মত এক দঙ্গল ছেলে তাদের ড্রিমল্যান্ডের আশ্চর্য মানুষগুলোকে ঘিরে ভন ভন করছে।

সিগারেটের দোকানে ঢুকতেই দেখি মদনলাল। কয়েক প্যাকেট হাতে ধরা। একটা ছোট বাক্সজাতীয় কিছুর ভেতর প্যাকেটগুলো ভরে দিতে হবে, তাই দোকানীকে তাড়া লাগাচ্ছে। বেচারা দোকানী জিনিসপত্র উল্টে-পাল্টে টুঁড়ে দেখছে একটা উপযুক্ত আধার।

হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়তেই মদনলালের চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিটাকে ঝালিয়ে নিয়ে বলল, নাগ্‌গরে দেখা হয়েছিল না?

ইংরেজীতেই বলল মদনলাল। আমি কিন্তু ইতিমধ্যে কুলুহী ভাষাটা আয়ত্ত করে ফেলেছি। তাই ঐ ভাষাতেই বললাম, মনে হচ্ছে।

হর্ন বাজল পাহাড় কাঁপিয়ে। দোকানদারের উপযুক্ত আধার মেলার আগেই মদনলাল প্যাকেটগুলো সামলে ধরে দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

দেখলাম, ঐ সিনেমা পার্টির গাড়িতেই উঠল মদনলাল। মুখ বের করে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছোঁড়াগুলোকে দেশজ ভাষায় দু'একটি চোস্ত গালি দিয়ে মুখখানা আবার ঢুকিয়ে নিলে। গাড়ি চলতে শুরু করল, আর হিরো হিরোইনের ফ্যানেরা গাড়ির পেছন পেছন পাঁই পাঁই করে দৌড়তে লাগল।

ঠিক সেদিন রাত ন'টা নাগাদ একটা চেঁচামেচির আওয়াজ শুনে বাংলোর বাইরে বেরিয়ে এলাম। গোলমালটা মনে হল নিচে বেননদের কোয়ার্টারের দিকে অথবা তার একটুখানি ওপরে সরকারী ট্যুরিস্ট বাংলোতেও হতে পারে।

এত ওপর থেকে ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছিল না, তবে কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রাম শুনে ব্যাপারটা যে ঘোরালো তা অনুমান করা যাচ্ছিল।

দেখলাম, বাগান পেরিয়ে লাঠিখানা ঠুকতে ঠুকতে সামনে এসে দাঁড়াল ভাগ্‌তু। ও বাগানের ওদিককার একখানা ঘরে থাকে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বাবুজী বহুৎ মারপিট চলেছে। জুলিয়েন সাহেব মেরে একজন বোম্বাইওয়ালা সাহেবের দাঁত উড়িয়ে দিয়েছে।

বললাম, তুই কি করে জানলি?

ভাগ্‌তু মাথা নিচু করতেই বুঝলাম, ইতিমধ্যে গোলমালের জায়গাটা ঘুরে সরেজমিনে তদন্ত করে আসা হয়েছে।

আমার তখন কোন কিছু ভাববার অবস্থা ছিল না। ব্যাগে দু একটা ওষুধ ভরে নিয়ে দৌড়লাম জুলিয়েনদের হোটেলের দিকে।

গিয়ে দেখি হোটেল বিয়াসের সামনে অনেক লোকের ভীড়। হাঁকডাক ইতিমধ্যে থেমে গেছে। পুলিশ ফাঁড়ি থেকে গাড়ি এসেছে। অফিসার ইনচার্জ হোটেলের বারান্দায় বসে কি যেন লিখছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মদনলাল আর একটি ভদ্রলোক। ভদ্রলোকটি এক হাতে মুখ ঢেকে রেখেছেন। তাঁর মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। দূর থেকে মনে হচ্ছে কেউ যেন চুলগুলো হিঁচড়ে টেনে এলোমেলো করে দিয়েছে। একটা দরজার ওপারে কাঁধের ওপর চুল লটকে ডিপ মেরুন রঙের বেলস্ আর ইয়োলো টপ্ পরে দাঁড়িয়ে আছে হিরোইন। চোখে মুখে আতঙ্ক!

জুলিয়েন পাশের কোয়ার্টার থেকে বেরিয়ে এল। দারুণ রকম উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। জুলিয়েনের বাবা মিঃ বেনন ছেলের সঙ্গে এলেন হন্তদন্ত হয়ে পুলিশ অফিসারটির কাছে।

আমি কাছাকাছি যেতেই মিঃ বেননের চোখে পড়ে গেলাম। অমনি মিঃ বেনন আমার দিকে পুলিশ অফিসারটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এই যে ডক্টর মুখার্জি এসে গেছেন। ওঁকে দিয়ে চোপ্‌রা সাহেবের উণ্ডটা একটু পরীক্ষা করিয়ে নিলে হয়।

আমি পুলিশ অফিসারটিকে আগে কখনও দেখি নি। উনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বিশেষ দুঃখিত ডাক্তার মুখার্জী, এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে। একটু ভুল বোঝাবুঝির দরুন এই ভদ্রলোক মুখে আঘাত পেয়েছেন। আপনি যদি ওঁকে একটু পরীক্ষা করে কোন মেডিসিনের ব্যবস্থা করেন তাহলে বড় উপকার হয়।

মিঃ বেনন আমাকে আর পেসেন্টকে নিয়ে পাশের একটা ঘরে গেলেন। জুলিয়েন স্ট্রেট দাঁড়িয়ে রইল পুলিশ অফিসারটির কাছে।

গরম জল এল। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম, সত্যি ভদ্রলোক দাঁতে দারুণ রকম আঘাত পেয়েছেন। রক্ত পড়ছে তখনও। তবে দাঁতগুলো অক্ষতই আছে। নড়ে গেলেও পড়ে যায়নি।

ভাগ্‌তুর কাছে ব্যাপারটা শুনে দরকারী ওষুধ সঙ্গেই এনেছিলাম। সেগুলো সব সদ্ব্যবহারে লেগে গেল।

আমি কাজ শেষ করে বেরিয়ে এসে দেখি, মদনলাল পুলিশ অফিসারটিকে চুপি চুপি কি সব বলছে।

কৌতূহলী লোকেরা পুলিশের তাড়া খেয়েই হোক্ অথবা রাত দশটা বেজে যাবার জন্যেই হোক্ সব ভেগে পড়েছিল। জুলিয়েনকে কাছে-পিঠে কোথাও দেখলাম না! হিরোইন অদৃশ্য।'সকালবেলার সেই রোটাংগামী গাড়ির আরোহী আরও দুটি ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদনলালের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিতে দেখলাম।

আমি আর দাঁড়ালাম না। চলে আসার সময় অফিসারটিকে বললাম, আশা করছি কাল-পরশুর ভেতর একেবারে সুস্থ হয়ে যাবেন। আঘাত তেমন গুরুতর নয়।

মদনলাল একবার হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকাল। নাগ্‌গরের সেই ট্যুরিস্ট হঠাৎ রাত দশটায় ডাক্তার হয়ে গেল কি করে, তা তার মগজে এল না।

অফিসারটি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের কাজে মন দিলেন।

আমি নেমে এলাম হোটেলের কম্পাউণ্ড থেকে। ওপরের রাস্তায় পড়ার আগে আধো অন্ধকারে দেখা হয়ে গেল জুলিয়েনের সঙ্গে। ক'টা মালবাহী কুলি তার পেছনে। ও থমকে দাঁড়াল আমাকে দেখে। বলল, যত রাত হোক আসছি তোমার ওখানে, দরজাটা খুলে রেখো।

জুলিয়েন চলে গেল। আমি পুরো ব্যাপারটা সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে শুধু ডাক্তারের কর্তব্যটুকু করে চলে এলাম।

ঘণ্টাখানেক পরে জুলিয়েন এল। এসেই বলল, সব ক'টাকে বিদেয় করে দিয়ে এলাম।

বললাম, আমার ডিনার রেডি। তুমি বকসিং লড়ছিলে, সুতরাং তোমার যে এখনও খাওয়া হয়নি, তা ধরে নিতে পারি। চল, খাবার টেবিলে খেতে খেতে গল্প করা যাবে।

আমরা দুজনে খেতে বসেছি। জুলিয়েন বলল, তুমি হঠাৎ ওপর থেকে নিচে হাজির হলে কি করে?

হেসে বললাম, নিচ থেকে তোমার গলা ওপরে ভেসে এল, তাই আমাকে নিচে নামতে হল।

দেখলাম, জুলিয়েনের বেশ ক্ষিদে পেয়ে গেছে। ও কয়েক গ্রাস খাবার খেয়ে নিয়ে বলল, আসল ব্যাপারটা কিছু জেনেছ?

বললাম, বিশ্বাস কর, আসল নকল কিছুই জানতে পারিনি। ভাগ্‌তুর মুখে শুনলাম, তুমি নাকি কার দাঁত উড়িয়ে দিয়েছ, তাই ব্যাপারটা দেখতে ছুটে গিয়েছিলাম। আর গিয়েই তোমার বাবার আদেশ পালন করলাম। লোকটা যাতে নিজের দাঁতের ওপর ভরসা রেখে আরো কিছুদিন অন্তত চালাতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়ে এলাম।

জুলিয়েন গম্ভীর হয়ে বলল, একটা স্কাউন্ড্রেল! এত বড় একটা কোম্পানীর ম্যানেজার হয়ে এসেছে।

বললাম, এখন আসল ব্যাপারটা কি বল তো শুনি?

জুলিয়েন বলল, এ স্কাউন্ড্রেলটা কদিন আমাদের হোটেলের কুক চম্বিয়ালীর পেছনে লেগেছিল। তুমি জান, হোটেল কম্পাউণ্ডের বাইরের রাস্তাটার ঠিক ওপারে ওদের

কোয়ার্টার। লোকটা থাকত গভর্ণমেন্ট ট্যুরিস্ট বাংলোতে। রাত দশটা নাগাদ আমাদের হোটেলে আড্ডা মেরে ফেরার পথে চম্বিয়ালীকে একবার করে জ্বালিয়ে যেত।

বললাম, ওর স্বামী নেই?

আছে বইকি, তবে তাকে আগেভাগেই ঐ লোকটা সরিয়েছে। মণিকরণের শুটিং সাইটে তাকে বসিয়ে রেখে এসেছে। সেখানে ক'টি মেয়ের ছবি নিতে হবে। কাস্তে নিয়ে গম কাটছে, এমন ক'টি যুবতী মেয়ে চাই।

বললাম, তারপর?

জুলিয়েন বলল, মেয়েটা ওর স্বামীর রোজগারের কথা ভেবে কিছু বলেনি। কিন্তু আজ লোকটা সোজাসুজি আমার হোটেলেই ওকে চরম প্রস্তাবটা দিয়েছে।

বললাম, তুমি জানলে কি করে?

মার কাছে চম্বিয়ালী কেঁদে বলছিল, আমি ওভারহিয়ার করলাম। তারপর যা হবার তাই হল। সবার সামনে কলার চেপে ধরে চেয়ার থেকে টেনে তুলে স্কাউন্ড্রেলটার মুখের ওপর একটা ছোট্ট ঘুষি লাগিয়ে ছেড়ে দিলাম। তাতেই হৈ রৈ কাণ্ড বেঁধে গেল।

বললাম, ভাগ্যিস ঘুষিটা জোরে চালাও নি, তাহলে ভদ্রলোককে বোম্বে ফিরেই ফলস টিথের অর্ডার দিতে হত।

জুলিয়েন পুডিং খেতে খেতে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল, ঐ স্কাউন্ড্রেলটাকে আবার তুমি ভদ্রলোক বলছ!

বললাম, জুলিয়েন, পুলিশ দেখলাম যে। ওদের কে খবর দিয়ে আনল?

ও বলল, ট্যুরিস্ট বাংলোর ঐ মদনলাল নির্ঘাৎ খবর দিয়ে থাকবে। ও ব্যাটা চেয়েছিল আমার এগেনস্টে ডায়েরী করতে, কিন্তু জানে না, কোর্টে চম্বিয়ালীকে দাঁড় করালে ম্যানেজারের বোম্বে ফেরা ঘুচে যেত। পুলিশ অফিসারকে ও ব্রাইব করার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু চম্বিয়ালীকে হাত করতে না পারলে সব ভেস্তে যাবে জেনে ওরা আর এগোতে চেষ্টা করেনি।

তোমার বাবা কি বলেন?

জুলিয়েন হেসে বলল, বাবা তাঁর পুত্রকে বিলক্ষণ চেনেন। তাই আমার কাজে বাধা দেননি। ল্যাঠা চুকে গেলে শুধু বললেন, আমরা ব্যবসায়ী, কেবল এটুকু কথা মনে রেখ।

এত রাতে কোথায় নির্বাসন দিলে ওদের?

জুলিয়েন বলল, মদনলালই মাথায় করে নিয়ে গেল ট্যুরিস্ট বাংলোতে।

বললাম, মদনলাল লোকটা নাগ্‌গরে ট্যুরিস্ট বাংলোতে থাকে বলে জানতাম, ও আবার এখানে এলো কি করতে ?

জুলিয়েন বলল, সরকারী অফিসে ওর দারুণ খুঁটির জোর। ও সুযোগ বুঝে ওর কর্মক্ষেত্র পালটে নেয়।

লোকটাকে দেখলেই মনে হয় ধুরন্ধর।

জুলিয়েন বলল, ওর সঙ্গে আগে একবার আমার ডুয়েল লড়া হয়ে গেছে।

সকৌতুকে বললাম, কি রকম?

জুলিয়েন বলল, একবার অক্টোবরে দুটো কলেজের ছেলে দিল্লী থেকে বেড়াতে এসে বিপদে পড়ে যায়। কোন হোটেলে জায়গা না পেয়ে আমার এখানে আসে। কিন্তু তুমি জানো, 'হোটেল বিয়াস' বেশ কস্টলি। ওতে ঘর ছিল ঠিক কিন্তু ঐ দুটি কলেজ বন্ধুর থাকবার মত রেস্ত ছিল না। আমি হয়ত ওদের ঘর দিতে পারতাম, কিন্তু তাহলে আমাকে হোটেলের নিয়ম ভাঙতে হয়। তাই একটু মুশকিলেই পড়ে গেলাম।

বললাম, সে তো ঠিক।

জুলিয়েন বলল, তারপর শোন। ওদের নিয়ে গেলাম মদনলালের কাছে। মদনলাল স্রেফ বলে দিল, নো ভেকেন্সি। তখন নিজের আইন নিজে ভেঙে ওদের চার দিন রাখলাম। ইতিমধ্যে খোঁজ নিয়ে জানলাম, মদনলালের হাতে একাধিক ঘর খালি আছে। মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ করে বসলাম। বেআইনী হলেও ওর অফিসের খাতা টেনে নিয়ে দেখলাম, ঘর খালি। ওর চোখের ওপর তুলে ধরে বললাম, সরকার বাহাদুর নিশ্চয় তোমাকে এই ট্যুরিস্ট বাংলো নিয়ে ব্যবসা চালাতে বলেন নি।

ও অপমানিত হল, কিন্তু আমাকে জানে বলে কথা বাড়াবার সাহস করল না।

বললাম, ছেলে দুটোকে জায়গা না দেবার কারণ কি থাকতে পারে জুলিয়েন? ওদের কাছ থেকেও তো টাকা পেত।

জুলিয়েন বলল, ব্যাপারটা তা নয়। দু'বছর আগে আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিল। আমি সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলাম রূঢ়ভাবে, তাই রাগ।

কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, প্রস্তাবটা কি?

জুলিয়েন বলল, সরকারী বাংলোতে স্থান নেই জানিয়ে বিভিন্ন শাঁসালো পার্টিকে মদনলাল আমার হোটেলগুলোতে এনে তুলবে আর মোটা কমিশন লুটবে। ওর এই লোভনীয় প্রস্তাবটি আমার মত নির্বোধ নিতে পারেনি, তাই প্রতিশোধ।

আমাদের খাওয়া শেষ হতে অনেকখানি রাত হয়ে গেল।

বললাম, এত রাত্তিরে নিচে নেমে আর কাজ নেই, এখানেই শুয়ে পড়।

জুলিয়েন বলল, অনেক রাতে ঘুম না এলে নদীর ধারে ধারে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আছে মুখার্জী।

বললাম, বিয়ে করলেই ঘুম এসে যাবে।

জুলিয়েন বাগানে লাফ দিয়ে নামল। চলে যেতে যেতে বলল, যেমন আজকাল তোমার ঘুম এসে যাচ্ছে মুখার্জী।

জুলিয়েন চলে গেল, আমার কিন্তু ঘুম এল না চোখে। আমি বিছানার ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে ঝিন্নিকে চিঠি লিখতে বসলাম। জুলিয়েন আমাকে এই মুহূর্তে ঝিন্নির কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেছে।

আমি চিঠি লিখছি। এ চিঠি নিয়ে চারখানা লেখা হল ঝিন্নিকে, কিন্তু একছত্র লেখাও ওদিক থেকে আসেনি। কুলু থেকে আসার সময় ঝিন্নি বলে দিয়েছিল, চাচাজী তোমার কাছে থাকবেন, আমি এখন মরে গেলেও তোমাকে চিঠি লিখতে পারব না। আমার হাতের লেখা ওঁর চোখে পড়লে ভীষণ খারাপ লাগবে। তুমি কিন্তু প্রতি সপ্তাহে অন্তত একখানা করে চিঠি আমার নামে নাগ্গরে পাঠাবে।

বলেছিলাম, চমৎকার! নিজের পাওনাটা বুঝে নিচ্ছ কড়ায় গণ্ডায় আর আমার বেলা টুঁ টুঁ।

ও অমনি বলেছিল, চাচাজী ফসল তোলার জন্যে মাসখানেক বাদেই কুলুতে ফিরে আসবেন। এখানে থাকবেন পুরো দুটি মাস। সে সময় সুদে আসলে তোমার পাওনাগুলো চুকিয়ে দেব। সব চিঠির জবাবই আমার সঙ্গে সঙ্গে লেখা হয়ে থাকবে, তুমি কেবল একসঙ্গে পাবে সেগুলো।

চাচাজী চলে যাবার পরই আমি নাগ্গরে চিঠি দিয়ে জানিয়েছি ঝিন্নিকে। দু-এক দিনের ভেতরেই ওর অনেকগুলো চিঠি একসঙ্গে আশা করছি। কিন্তু আজ আবার লিখতে ইচ্ছে করল। তাও এই রাত জেগে।

জুলিয়েনের আজকের ঘটনার কোন উল্লেখ করলাম না। কিন্তু ওর শেষ কথাটির উল্লেখ না করে পারলাম না।

অনেক আদরের ঝিন্নি!

এখন রাত শেষের ভাঙা চাঁদটা বাগানের পাইন গাছের শাখায় খেলনার একটা পেতলের নৌকার মত বাঁধা পড়ে আছে। এখুনি জুলিয়েন রাতের আড্ডা শেষ করে কোয়ার্টারে ফিরে গেল। ওকে আমার এখানে থেকে যেতে বলছিলাম। ও বলল, রাতে ওর নাকি ঘুম না এলে নদীর ধারে বেড়ানোর অভ্যেস আছে।

আমি ওকে বিয়ে করার পরামর্শ দিলাম, ঘুমের ওষুধ হিসাবে।

ও সঙ্গে সঙ্গে কি জবাব দিল জান, তোমার যেমন আজকাল ঘুম এসে যাচ্ছে মুখার্জী।

ও চলে যাবার পর আমার কিন্তু আর ঘুম এল না। কলম নিয়ে কাগজের ওপর আঁকিবুকি কাটতে বসে গেলাম।

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, রাতগুলো তোমার কাটছে কেমন? ক্ষীণ চাঁদটা হয়ত তোমার জানালার বাইরে আপেল গাছটার ডালে এখন আটকে আছে। ঐ চাঁদটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছে, আমরা কত কাছে রয়েছি।

তোমার কোয়ার্টারের পাশের ঐ আপেল গাছটার নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম চাচাজীকে। চাচাজী আশ্চর্য একটি নাম শোনালেন। কি নাম বল তো? বলতে পারলে না তো! তবে শোন, 'অ্যাডামস অ্যাপেল'।

আসলে কিন্তু অ্যাডামস অ্যাপেল বলে কোন আপেলের নাম নেই। ওটা গলার সামনে লারিংস-এর যে প্রোজেকসান থাকে তারই নাম। তবে প্রবাদে আছে, আদি মানবের গলার

ঐখানে নাকি ইভের দেওয়া আপেলের একটি টুকরো আটকে গিয়েছিল। তাই ও জায়গার ঐ নাম হয়েছে। চাচাজীকে প্রশ্ন করে জানলাম, রোয়েরিক গ্যালারীর ঐ জায়গাটা নাকি আগে এক ইংরেজের ছিল। আপেল গাছটির নাম তাঁরই দেওয়া।

এবার শোন, তোমার ইচ্ছাগুলো দেখছি পূর্ণ হতে চলেছে, অবশ্য ধীরে ধীরে। রোগীর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। বেলা এগারটা অব্দি চেম্বারে রোগী দেখি। তারপর স্নান ভোজন সেরে খানিক সময় বিশ্রাম নিতে না নিতেই ভোগীর দল আসে। না, না, রোগী নয়, ভোগী। পাহাড়ীদের বাচ্চাগুলো দল বেঁধে বাগানের ওপার থেকে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। ভাগ্‌তু দাদার সঙ্গে ভাব জমায়। এক সময় ভাগ্‌তু ওদের মুখপাত্র হয়ে আসে আমার কাছে। ওদের আগমনবার্তা ঘোষণা করে। আমার কাছ থেকে গ্রীন সিগনাল পেলেই ভাগ্‌তু হাতছানি দেয়, আর অমনি লিলিপুট ব্যাটেলিয়ান দৌড়ে আসে বাংলোর দাওয়ায়।

ওদের জন্যে জমা থাকে লজেন্স, ট্রফি, চিক্‌লেট। ভাগ্‌তু একটি একটি করে বিতরণ করে যায়। ওরা একটুও গোল করে না তখন। অসীম ধৈর্যে হাত পেতে রাখে। সে সময় তুমি যদি ওদের মুখের চেহারা দেখতে তাহলে মনে হত, মুঠো মুঠো ভোরের মিঠে রোদ যেন লুটোপুটি করছে তোমার বাগানে।

এদিকে ভাগ্‌তু নাগ্‌গরে যাবার জন্যে পা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। কেবল মুখ থেকে স্টার্ট কথাটা খসার যা অপেক্ষা।

দেখ শ্রীমতী ঝিন্নি, আমি রাত জেগে জেগে কঠোর তপস্যা করে প্রেমিকাকে চিঠি লিখছি আর তুমি দিব্যি টেনে টেনে ঘুম দিচ্ছ। তাই মনে হচ্ছে জুলিয়েন কথাটা আমাকে না বলে তোমাকে বললেই ঠিক মানাতো।

তোমার ছোটেসাহেব।

পুনশ্চ : এরপর তোমার চিঠি না এলে এদিকের কোন চিঠি নিয়ে নাগ্‌গরে আর ডাকপিয়ন উঠবে না।

পরের দিনই চিঠি এল। ঝিন্নির হাতে ঠিকানা লেখা খাম। অনেকগুলো টিকিট সাঁটা, অনেক ভারী চিঠি। আমি রোগী দেখছিলাম তখন। পিয়নের হাত থেকে খামখানা নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে রেখে দিলাম।

রোগী দেখে চলেছি তো চলেইছি। আজ কেন জানি না মনে হতে লাগল যে কটি রোগী দেখেছি তারা আমার একটি প্রেসক্রিপশানেই ভালো হয়ে যাবে।

গভীর একটা বিশ্বাস আমার সমস্ত চেতনার ভেতর ছড়িয়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ অদ্ভুত এক ধরনের অনুভূতি জন্ম নিল আমার মনের মধ্যে। মনে হল, ঝিন্নি আমার পাশেই রয়েছে। আমার প্রতিটি কাজ সে নিবিড় ঔৎসুক্যের সঙ্গে লক্ষ্য করছে।

আজ রোগী দেখতে গিয়ে অন্যদিনের চেয়ে সময় কিছুটা বেশী লাগল। ঘড়ির কাঁটা প্রায় বারোটার ঘর ছুঁইছুঁই, শেষ রোগীটি ডাক্তারকে ছুটি দিয়ে নমস্কার জানিয়ে নেমে গেল।

আমার একি হল! আমি সেই মুহূর্তে কিছুতেই ঝিন্নির খামখানা খুলতে পারলাম না। সুন্দর একগুচ্ছ ফুলকে যেমন নোংরা জামা কাপড় পরা থাকলে ধরতে ইচ্ছে করে না, আমিও তেমনি সারাদিনের গ্লানি ধুয়ে মুছে না ফেলা পর্যন্ত ঝিন্নির চিঠিগুলো খুলতে পারলাম না। চিঠির খামখানা নিয়ে বিছানায় বালিশের তলায় রেখে আমি স্নান সেরে নিতে গেলাম।

স্নানের ঘরে নিজের সঙ্গে কতক্ষণ কথা বললাম : কি ডাক্তারী শিখলে এতদিন পুষ্করবাবু? একটা হৃদয় অনেক দূরে থেকেও আর একটা হৃদয়কে ছুঁয়ে গেলে কেন সারা বুকখানা জুড়ে আলোড়ন শুরু হয়ে যায়? কেন সম্পূর্ণ পাল্টে যায় আচার আচরণগুলো, বলতো দেখি? এর কি ব্যাখ্যা দেবে তোমাদের বিজ্ঞানশাস্ত্র? ডক্টর বার্নার্ড, আপনি তো হার্টের বিশ্ববিশ্রুত সার্জন, কিছু হদিস পেয়েছেন কি এসব হৃদয়ঘটিত প্রশ্নের?

জল ঢালতে গিয়ে হঠাৎ গান এল গলায়—

'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে,
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।'

কয়েক মগ জল হুড়হুড় করে মাথায় ঢেলে তাড়াতাড়ি তোয়ালেতে গা মুছে বেরিয়ে এলাম।

খাবার টেবিলে কখন বসলাম আর কখন উঠলাম তা বুঝতে পারলাম না। ভাগ্‌তু তার বাবুজীর ক্রিয়াকলাপগুলো ছোট্ট মাথাখানা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

আমি শোবার ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। আবার দরজা খুলে ভাগ্‌তুর নাম ধরে জোরে ডাক পাড়লাম। ভাগ্‌তু কাছে এলে বললাম, শোন, তুই একবার বাজারে যেতে পারবি?

ভাগ্‌তু মহা খুশি। এতদিন সে নিজে গেছে লুকিয়ে চুরিয়ে, কিন্তু আজ কি সৌভাগ্য তার, বাবুজী নিজের মুখে আদেশ জারি করছে।

ভাগ্‌তু তার ডান কাঁধে বার তিনেক কান আর মাথা ঠুকে সিধে হয়ে দাঁড়াল। ভাবখানা এই, সে যাবার জন্যে তৈরি।

বললাম, এই নিয়ে যা টাকা। লাড্‌ডু কিনে আন। ছেলেগুলো এলে তাদের আজ লাড্‌ডু খাওয়াবি। আর শোন, তোর ঘরে ওদের খেতে দিবি, তারপর সবাই মিলে বাগানে খেলা করবি।

ভাগ্‌তু টাকা নিয়ে ক্র্যাচ বগলে গুঁজে বেরিয়ে গেল। বাগানের বাইরে গাছের আড়ালে গিয়ে সে একটা হাঁক দিলে। বুঝলাম, এতদিনে সে নিজেকে মুক্তপুরুষ বলে মনে করছে। এবার থেকে তার আর চুরি করে বাইরে যেতে হবে না।

এবার ঘর বন্ধ করে বিছানায় এসে বসলাম। বালিশের তলা থেকে খামখানা বের করে ছিঁড়ে ফেলতেই বেশ ক'খানা চিঠি বেরিয়ে এল।

ঝিন্নি প্রতিটি চিঠির মাথায় তারিখ লিখে রেখেছে। দিন রাত্রির কোন বিশেষ বিশেষ লগ্নে সেগুলো লেখা হয়েছে তারও উল্লেখ আছে।

চিঠিগুলো সাজিয়ে নিলাম পর পর তারিখ অনুযায়ী। ঝক্‌ঝকে সাদা কাগজগুলোর কোণায় রং তুলি আর পেনের আঁচড়ে ছোট ছোট ছবি আঁকা হয়েছে।

ছবিগুলো আগে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ লেখার ছত্রে চোখ পড়তেই মনে হল, প্রতিটি ছবির সঙ্গে চিঠির ভাষার মিল আছে।

প্রথম চিঠিতে ঝিন্নি একটা পিঙ্ক ফুলেভরা আপেলের ডাল এঁকেছে।

চিঠি শুরু হয়েছে :

আমার ছোটেসাহেব।

আজ সকালবেলা কি দুষ্টুমি শুরু করলে তুমি। উঠোনে নেমেই দেখি, তোমার গার্ডেন অব ইডেনের সেই আপেল গাছটা একরাশ ফুল ফুটিয়ে ফিক্‌ ফিক্‌ হাসছে। নাগাল যদি পেতাম, তাহলে আচ্ছা করে নাড়া দিয়ে দিতাম। ঐ ডাল থেকেই তো তুমি গার্ডেন অব ইডেনের শেষ আপেলটি উপহার দিয়েছিলে একটি মেয়েকে।

তুমি লিখেছ, তোমার ঠাসা দিনগুলো কেটে যাচ্ছে কাজের ভেতর। আমার কিন্তু অলস অবসরগুলো শুধু একটি ছেলের ভাবনা ভাবতে ভাবতেই কেটে যায়।

যখন তুমি আসনি, তখন দিব্যি একরকম চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ঘরের কাজগুলো গুছিয়ে তুলতেই ফুরিয়ে যেত আমার সময়। এখন সব কাজ এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকে আমার দিকে চেয়ে। প্রয়োজনে অনিচ্ছায় কোনক্রমে সেগুলিকে সেরে তুলি। তুমি কোথা থেকে ডেকে আনলে একটা ঝড়ের হাওয়া। আমার সবকিছু উড়ে এলোমেলো হয়ে গেল।

জান ছোটেসাহেব, ভালবাসতে খু-উ-ব ভালো লাগে, কিন্তু ভালবাসার ভার বইতে বুক ভেঙে যায়। রাতে যখন বিছানায় শুয়ে থাকি তখন ঘুম আসে না চোখে। কেবল মনে পড়ে যায় তোমার হাজারো রকমের আদরের ছবিগুলো। কত দুষ্টুমির খেলা খেলতে তুমি। কত ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর পরিকল্পনা আসত তোমার মাথায়। কেউ যে আর একটি দেহকে নিয়ে খেলতে গিয়ে এমন ছবি আঁকতে পারে, তা তোমার সঙ্গে দেখা না হলে হয়ত কোনদিন জানতে পারতাম না।

অনেক সময় মনে হয় তুমি কতকিছু চেয়েছিলে আমার কাছে, কিন্তু আমি তোমাকে সবকিছু দিতে পারিনি। সে দুঃখ যে আমারও ছোটেসাহেব।

আজকাল আমার কেবলই মনে হয় কুলুর সেই শেষ রাতটার কথা। তুমি কেমন আমার কোলটিতে মাথা রাখতে চাইলে। আমি সারা রাত কাটিয়ে দিলাম তোমার মুখখানার দিকে চেয়ে চেয়ে।

তোমার অনেক আদরের ঝিন্নি।

পরের চিঠিখানা John Dryden-এর একটি উক্তি দিয়ে শুরু :

'Pains of love be sweeter far than all other pleasures are.'

এ পাতাতেও একটি ছবি। সেই ফুলেরই ছবি। বড় বড় পাতা হাওয়ায় ভাসিয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ আকাশ-নীল রঙের ছোট ছোট ফুল ফুটিয়ে জেগে আছে 'ফরগেট মি নট'।

ঝিন্নি লিখেছে : ছোটেসাহেব, আমার কুহলের ধারে গরমের হাওয়া লেগে ফুটেছে 'ফরগেট মি নট' ফুলগুলো।

শুনেছিলাম, কোন এক নাইটের মনোরমা স্ত্রী তাঁর এক দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ একটি স্রোতধারার কাছে ঐ লোভনীয় ফুলগুলো দেখে তিনি তাঁর রক্ষীটিকে পাঠালেন একগুচ্ছ ফুল তুলে আনবার জন্য। দেহরক্ষীটি মনে মনে ভালবাসত তার প্রভুপত্নীটিকে। সে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল ফুল তুলে আনতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, ফুল তুলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেল স্রোতের ভেতর। সাঁতার জানে না, তাই সে তলিয়ে যেতে লাগল জলের গভীরে। শেষবারের মত মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাকুল স্বরে সে বলে উঠল, 'ফরগেট মি নট'।

সেই থেকে ফুলটির নাকি ঐ নাম হয়েছে।

জান ছোটেসাহেব, এই ফরগেট মি নট নামটির ভেতর কোথায় যেন কারো মনের মধ্যে বেঁচে থাকার করুণ একটা আবেদন আছে।

তোমার আদরের ঝিন্নি।

একটি একটি করে সবগুলো চিঠি ওর পড়লাম। চিঠি পড়ে মনে হল, ভালবাসার বর্ষা বসন্ত পাশাপাশি ছুঁয়ে আছে ওর বুকখানা। ওর মনের সেতার এমন করে বাঁধা, যাতে একটুখানি ছোঁয়া লাগলেই বেজে ওঠে।

জানালার বাইরে অন্যমনস্ক চোখ গিয়ে পড়তেই দেখি, হাল্কা নরম ডালের মাথায় ঝুলছে ব্লু-বেল ফুলগুলো। অবিরাম দুলে দুলে ঘণ্টাকৃতি ফুলগুলো যেন একান্ত কোন অন্তরঙ্গজনের আসার কথাটি ঘোষণা করে চলেছে।

ছেলেদের হুড়োহুড়ি কলরব শোনা যাচ্ছে। আজ ওদের খুশিটা যেন উপচে উঠেছে। ওরা কেউ আসছে না এদিকে। ভাগ্‌তু ওদের বাগানের ওপারে ঠেকিয়ে রেখেছে। কিন্তু এলো একজন, যাকে ঠেকিয়ে রাখার ক্ষমতা ভাগ্‌তুর ছিল না। আর ঘরের মালিকেরও নিশ্চয়ই তা নেই।

জুলিয়েন, ডাক্তার, ডাক্তার ডাক দিতে দিতে বাগান পেরিয়ে এসে উঠল দাওয়ায়। আমি ঘরের দরজা খুলে ওর সামনে এসে দাঁড়াতেই ও অবাক চোখে আমার দিকে চেয়ে ঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

আমি হাসছি দেখে সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়েন বলল, দুপুরে শোবার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলে, কি ব্যাপার বলতো ডাক্তার। নিশ্চয় কোন সঙ্গিনী ভেতরে রয়েছে।

আমি জুলিয়েনের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের ভেতর নিয়ে গেলাম।

খুঁজে দেখ, আমার সুইট হার্ট-কে দেখতে পাও কিনা।

জুলিয়েনের চোখ বিছানার ওপর ছড়ানো চিঠিগুলোতে আটকে গেল। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, ভালবাসার গন্ধ পাচ্ছি ডাক্তার।

হেসে বললাম, আশ্চর্য তোমার ঘ্রাণশক্তি। সঙ্গিনী দেখবে বলে ঘরে ঢুকলে, এখন বলছ ভালবাসার গন্ধ পাচ্ছি।

জুলিয়েন হা হা করে হেসে উঠল। হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, আমি প্রেমে পড়ি নি বলে কি প্রেমের গন্ধও আমার নাকে এসে লাগবে না!

Love is like a beautiful flower which I may not touch, but whose fragrance makes the garden a place of delight just the same.

ওর হাত ধরে বিছানার ওপর বসালাম। তারপর একটি একটি করে ঝিন্নির সবকটা চিঠি ওকে পড়ে শোনালাম।

জুলিয়েন গালে হাত রেখে শুনছিল। চিঠি পড়া হয়ে গেলে ওর দিকে চাইলাম। জুলিয়েন মনে হল তন্ময় হয়ে শুনছিল। ওর ঘোর কাটতে একটু সময় লাগল।

একসময় জুলিয়েন বলল, চিঠিগুলো আয়নার মত একটি মনের আসল চেহারাখানা ধরে রেখেছে।

একটু থেমে একেবারে অন্য সুরে বলল, এখন বল তো দেখি ডাক্তারসাব, মেয়েটিকে কবে এখানে আনছ? চাচাজীর কাছে প্রস্তাবটা দেওয়া হয়ে গেছে নিশ্চয়।

বললাম, সবেমাত্র শুরু হয়েছে দুজনের জানাজানি। তৃতীয় আর একজন এখন জেনে ফেলেছে, সে আমার পাশেই বসে। চাচাজীকে বলতে সুযোগ চাই। কারণ লোকাপবাদের ভয় তাঁর বড় বেশি। চাচাজীর যদি মনে হয়, আমাদের বিয়ে হলে লোকে বলবে, নরসিংলাল মালিকের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কাজ হাঁসিল করল, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব নাকচ হয়ে যাবে। তাই ঝিন্নির কাছ থেকে গ্রীন সিগন্যাল না পাওয়া অব্দি চাচাজীর কাছে ব্যাপারটা একেবারেই প্রকাশ করা যাবে না।

জুলিয়েন বলল, এ তো আবার এক ফ্যাসাদ। দেহে মনে মিলে গেল, হাত ধরাধরি করে চলে এলাম, তা নয়। ফাদার, মাদার, গ্র্যান্ড ফাদার-মাদারদের জিজ্ঞেস কর। তাঁরা কৃপা করে অনুমতি দিলেন—ভাল, না হয় বুক চাপড়ে মর।

বললাম, ঝিন্নি তার পিতাজীকে শুধু ভালবাসে না, মা মারা যাবার পর গভীর একটা টানেও জড়িয়ে পড়েছে। তাই পিতাজীকে অস্বীকার করে চলে আসা ওর পক্ষে খুব সহজ নয়।

জুলিয়েন অধীর হয়ে বলল, এ সব যদি জানতে মুখার্জী তাহলে ভালবাসতে গেলে কেন?

হেসে বললাম, Love really has nothing to do with wisdom or experience or logic. It is the prevailing breeze in the land of youth.

জুলিয়েন বলল, দারুণ একখানা কথা বলেছ তো মুখার্জী। ভালবাসাটা তারুণ্যের ধর্ম বলেই দুজনে দুজনকে ভালবাসে। যুক্তিতর্কের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, ভাবনার বিশেষ কোন কারণ নেই জুলিয়েন। ঝিন্নি এ ব্যাপারে সব দায়িত্ব নিজের ওপরেই তুলে নিয়েছে।

জুলিয়েন যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎ চলে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

বললাম, কি হল, এখুনি চলে যাচ্ছ?

জুলিয়েন বলল, হোটেল ছেড়ে একটি ফ্যামিলি আজ যাচ্ছে কুলুর ডাকবাংলোতে। চারটেতে ওদের গাড়ি। হিসেবগুলো বুঝে নিতে হবে।

জুলিয়েন বেরিয়ে গেল। আমি জুলিয়েনের মেজাজ মর্জি সম্বন্ধে মনে মনে আলোচনা করতে লাগলাম। নিজের পছন্দমাফিক কাজ করে জুলিয়েন। প্রকৃতিতে অর্ধ যাযাবর। দুনিয়ায় কারো তোয়াক্কা রাখে না, নিজের বিপদ হতে পারে জেনেও নয়। বন্ধুত্বের টান তার কাছে প্রবল ও অকৃত্রিম।

ভাগ্‌তু এসে দাঁড়াল সামনে। বললাম, কি খবর?

ও বলল, দোঠো লাড্‌ডু বেশি হয়ে গেছে বাবুজী।

বললাম, ও দুটো ভাগ্‌তুরাম খাবে।

ভাগ্‌তুর মুখে খুশি ঝলকে উঠল।

পাহাড়ী ছেলেবুড়ো সবাই দেখেছি, বড় সৎ আর বিশ্বাসী। ও দুটো লাড্‌ডু ভাগ্‌তু নির্বিকার মুখে পুরে হজম করে ফেলতে পারত। কিন্তু যা তার প্রাপ্য নয় তাকে অগোচরে নিয়ে নিতে কোথায় যেন তার স্বভাবধর্মে বেধেছে।

বিকেল চারটে নাগাদ বেড়াতে বেরোলাম টাট্টুতে চড়ে। ক'দিন বেরোন হয় নি। আজ ভেতরের তাগিদেই বেরোতে হল। পকেটে ঝিন্নির চিঠিগুলো পুরে নিয়ে চলেছি। নির্জনে বসে পড়ব। চিঠি নয় এগুলো, একটা মন তার সব দুঃখ সুখ তৃপ্তি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বাঁধা পড়ে আছে এই চিঠির ভেতর। উপকথার পাথরপুরীর অন্তঃপুরে পাথরের মূর্তি হয়ে থাকা মেয়েটির মত। আর একটা মনের ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভাঙবে তার। অমনি ভোরের রোদের মত হেসে উঠবে সে। বৃষ্টির ফোঁটার মত টপ টপ করে ঝরাবে কান্না। আর বাদল দিনের ফোটা কদমের মত শিউরে শিউরে উঠবে তার প্রিয়-মিলন সমুৎসুক দেহ।

টাট্টুটা প্রায় খাড়া পাহাড়ের আঁকাবাঁকা সরু রাস্তাটা ধরে অবলীলায় নেমে এল ভ্যালিতে। ওদের প্রতিটি পদক্ষেপ স্থির নিশ্চিত। দুর্গম পথে ওরাই যথার্থ ভয়কে জয় করেছে। চড়াই উৎরাই করতে গিয়ে এই প্রাণীগুলোর পদস্খলন হয়েছে এমন খবর কোন অশীতিপর বৃদ্ধের মুখেও শোনা যাবে না।

আজ ভ্যালির বুকে ছোট স্রোতধারাটি পেরোতে গিয়ে চোখে পড়ল দুটি ছোট ছেলেমেয়ে গাছের আড়ালে বসে কি যেন করছে। জল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে দেখি, দুটিতে বঁড়শি ফেলে মাছ ধরছে।

কাছে গিয়ে বললাম, কি মাছ ধরলে?

বছর আটেকের মেয়েটি ভারী মিষ্টি দেখতে, অমনি মুখে আঙুল রেখে আমাকে কথা বলতে নিষেধ করল।

নিবিষ্টচিত্ত বছর বারো বয়সের বীর শিকারীটি দেখতে না দেখতে একটি কুনি মাছ গেঁথে তুলল বঁড়শিতে।

এতক্ষণে মেয়েটি তার মাছের সঞ্চয় আমাকে দেখাতে লাগল। গুটিকয় গুলগুলি আর দুটি মাত্র মোরি মাছ ধরা পড়েছে। ঐ ক'টি মাছ নিয়ে মেয়েটির গর্বের যেন আর শেষ নেই। সে তার দাদাটির দিকে আঙুল তুলে বারবার দেখাতে লাগল।

ছোট্ট দাদাটি কিন্তু নির্বিকার। সে তার শিকার সন্ধানে তখনও অনন্যমনা।

বেশি কথা বলে ক্ষুদে শিকারী দুটির নিবিষ্টতা নষ্ট না করে পাইন বনের ভেতর দিয়ে ওপারের পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললাম। নির্দিষ্ট জায়গায় উঠে এসে টাট্টুটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে বসলাম পাথরখানার ওপর।

কিন্তু বসেই মনে হল, ওপরের গম ভাঙানো চাকীর আওয়াজ পাচ্ছি না কেন!

আকাশে তখনও আলোর ফোয়ারা বন্ধ হয়ে যায় নি। স্বাভাবিক কৌতূহলে ওপরের দিকে চাইলাম। চাকী ঘরে দেখি মেয়েটি কুলুপ লাগাচ্ছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে গমের ব্যাগ মাথায় আর একটি মেয়ে। ওদের দুজনের কারো মুখ দেখা যাচ্ছে না।

আমি আবার ভ্যালির দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলাম। এত আলো থাকতে কোনদিনই এখানে আসি নি। আজ যে সব কিছুই ব্যতিক্রম বলে মনে হচ্ছে। বাঁদিকে পীর পাঞ্জালের পাহাড়টা তার বরফের সাদা চাদরখানা অনেক ওপরে তুলে নিয়েছে। নীচে পোড়া ঝামার মত পাথরের গায়ে দেখা যাচ্ছে বার্চ-এর বিচ্ছিন্ন সারি।

নিচের সেই ছোট্ট স্রোতধারাটির দিকে চোখ পড়তেই চোখ দুটো যেন সীমাহীন জ্যোতিতে ভরে গেল। জলের তরল দেহের একটা অংশ লক্ষ্য করে আকাশ থেকে কেউ যেন ছুঁড়ছে ঝাঁক ঝাঁক রূপোলী তীর, ঝিলিক মেরে উঠছে রূপোলী তীরের ঝকঝকে ফলাগুলো। আশ্চর্য এক চোখের উৎসব।

বাবুজী, আপনি একা একা এখানে বসে?

চমকে নদীর জলের থেকে চোখ তুলে চাইলাম, আমার পাশে দাঁড়ান মেয়েটির মুখের দিকে।

আরে তুমি, কি ব্যাপার? গম ভাঙাতে এসেছিলে বুঝি?

মেয়েটি মাথার ব্যাগটা পাথরের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, হাঁ বাবুজী, তবে আজ ভাঙানো হল না।

বললাম, কেন বল তো? আজ দেখলাম চাকী ঘরের ঐ মেয়েটি কুলুপ এঁটে সকাল সকাল চলে গেল।

কম্পাউণ্ডারবাবুর মুখে সে সময় এই মেয়েটির কি যেন একটা নাম শুনেছিলাম, অনেক চেষ্টায় সেটা মনে আনতে পারলাম না।

মেয়েটি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলল, আকাশে আজ ইল্ পাখি উড়ছে দেখছেন না!

আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম, একটা চিল প্রসারিত ডানায় রোদ্দুরের সোনা মেখে ভ্যালির ওপর চক্কর দিয়ে ঘুরছে। কে যেন একটা সোনালী ঘুড়ি ওড়াচ্ছে আকাশে।

বললাম, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

ও বলল, আজ শুক্রবার, এমনিতেই 'গাল লাগ্‌দি', ভায়েদের বিপদের দিন, তার ওপর ঐ অশুভ ইল্ পাখিটা টিকার ঘরে ঘরে ওর ছায়া ফেলে ফেলে উড়ছে।

বললাম, আজকের দিনটা বুঝি ভায়েদের পক্ষে অশুভ ?

ও সঙ্কোচের সঙ্গে নিজের এলোচুল দেখিয়ে বলল, আজ চুল বাঁধতে নেই। এলো চুলেই রয়েছি।

ওর সংস্কার দূর করার কোন চেষ্টাই করলাম না। সীমান্ত অঞ্চলে পাহারায় নিযুক্ত সৈনিক ভাইটির মঙ্গলের জন্যে মেয়েটি তার রেশমের মত নরম বাদামী চুলগুলোকে খোলা রাখে রাখুক।

শুধু বললাম, আজ ইল্ উড়ছে, তাই বুঝি ঐ চাকী ঘরের মেয়েটিও চলে গেল তাড়াতাড়ি ?

ও বলল, আজ বড় কেউ একটা আসবে না, তাই আর বসে থেকে কি করবে। তালা বন্ধ করে চলে গেল। তাছাড়া ইল্ দেখার পর ও নিজেও আর কাজ করতে চাইছে না।

অন্য কথা পাড়লাম, তোমার পিতাজী কেমন অছেন বালু?

হঠাৎ করে ওর নামটা মনে এসে গেল।

মেয়েটি বলল, এখন কিছুটা ভাল আছেন বাবুজী। তবে হাঁটাহাঁটি আর করতে পারেন না।

বললাম, আচ্ছা একদিন পণ্ডিতজীকে দেখে আসব।

বালু হঠাৎ করে বলে বসল, বাবুজী এই টিকা থেকে আমার বাড়ি খুব কাছে। আপনি শহর ঘুরে যান তাই দূর মনে হয়। আজ দয়া করে আপনি কি আমার সঙ্গে আসবেন?

দেখলাম, কথাটা বলে ফেলেই বালু কেমন সংকুচিত হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রত্যাখ্যানের কথা ভেবে হয়তো লজ্জায় ওর মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল।

বালুকে এমন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রোদ্দুরের জলে স্নান করতে কোনদিন দেখি নি। ওর আঠারো উনিশটি বসন্তের ছোঁয়া লাগা মুখখানা বড় সুন্দর, কিন্তু লজ্জা-সংকোচের ছোঁয়ায় সে মুখ অসাধারণ হয়ে উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, বেড়াতে বেরিয়েছি, এখন কাজ তো কিছু নেই, চল দেখা করে আসা যাক্ তোমার পিতাজীর সঙ্গে।

বালুর মুখ থেকে লজ্জার লাল আভাটুকু মিলিয়ে গেল। খুশির ঝিলিক লাগল চোখে মুখে।

বালু চলেছে আগে আগে টাট্টুর লাগাম ধরে টানতে টানতে, পেছনে সরু ভাঙাচোরা পাহাড়ী পথে ওকে অনুসরণ করে চলেছি আমি।

কিছু পথ ওপরে উঠে টিকার শেষ। ওপারের পাহাড়টার সঙ্গে এপারের পাহাড়ের একটা সংকীর্ণ শৈলশিরার মাধ্যমে যোগাযোগ আছে। বালু অবলীলায় পেরিয়ে গেল। নির্ভীক টাট্টু তার পেছন পেছন ঠিক চলে গেল। আমি কখনো বসে কখনো দাঁড়িয়ে দুরু দুরু বুকে পার হলাম। নিচের খাদের দিকে তাকালে এটুকু পথ পার হওয়াও দুঃসাধ্য হয়ে উঠত। ভ্যালির ওপর যে বিরাট বিরাট পাথরগুলো দাঁড়িয়ে আছে তারা যেন এক একটা অন্ধ দৈত্য। কোন জীব ওপর থেকে পিছলে তার ঘাড়ে পড়লেই সে মুহূর্তে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে।

একটা পাহাড়ী বাঁক পেরিয়ে পণ্ডিতজীর ঘরের সামনে এসে পৌঁছলাম।

আমি এই পাহাড়ের পথ ধরে ভ্যালি পেরিয়ে বাজার ঘুরে যাতায়াত করতাম পণ্ডিতজীর অসুখের সময়। বালুদের ছোট্ট ঘরের কাছে পিঠে কোন বাড়ি নেই।

ওপরে তাকিয়ে দেখি উঠোনে সোনালী গম বিছানো রয়েছে। বালু আগে উঠে টাট্টুকে বেঁধে ফেলল একটা পাঙাড় গাছের কাণ্ডর সঙ্গে। আমি উঠোনে উঠেই শুনতে পেলাম তুলসীদাসের রামচরিত মানস থেকে কেউ যেন কিছু পাঠ করছেন। মনে হল পণ্ডিতজীই হবেন।

বালু ঘরের দাওয়ায় তাড়াতাড়ি একখানা পুরানো থোবি পেতে দিল। আমাকে তার ওপর বসতে বলতেই আমি বললাম, বসছি, কিন্তু তুমি এখন ঘরের ভেতর যেও না। আমি বাইরে বসে তোমার পিতাজীর পাঠ শুনব।

বালু আমার একটু দূরে দাঁড়িয়ে মাটির দিকে চেয়ে রইল। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাতে লাগল। সে বোধহয় ডাক্তার মানুষটির খেয়ালীপনায় একটু অবাকই হচ্ছিল। কিন্তু আমার ইচ্ছাকে এড়িয়ে যাবার কোন উপায়ই ছিল না তার।

আমার মাসীদের বাড়ির পাশে থাকত এক রাজস্থানী দোকানদার। রোজ ভোর চারটেতে সেই মানুষটি রামচরিত মানস থেকে কিছু অংশ পাঠ করত। প্রথম প্রথম ভোরবেলাকার ঘুম ভাঙায় বিরক্ত হয়ে উঠলেও পরে রামায়ণ শোনাটা একরকম যেন নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ অনেকগুলো দিনের পরে রামায়ণ-কথা শুনতে পেয়ে মনটা হঠাৎ প্রসন্ন হয়ে উঠল।

পণ্ডিতজী পাঠ করে চলেছিলেন :

মাতু পিতা ভগিনী প্রিয় ভাঈ।
প্রিয় পরিবারু সুহৃদ সমুদাঈ।।
সাসু সসুর গুরু সজন সহাঈ।
সুত সুন্দর সুসীল সুখদাই।।
জহঁ লগি নাথ নেহ অরু নাতে।
প্রিয় বিনু তিয়হি তরনিহু তে তাতে।।
তনু ধনু ধামু ধরনি পুররাজু।
পতিবিহীন সবু সোক সমাজু।।
ভোগ রোগ সম ভূষণ ভারু।
যম জাতনা সরিস সংসারু।।
প্রাণনাথ তুম্হ বিনু জগ মাহীঁ!
মো কহুঁ সুখদ কতহুঁ কিছু নাহীঁ।।
জিয়া বিনু দেহ নদী বিনু বারী।
তৈ সিতা নাথ পুরুষ বিনু নারী।।
নাথ সকল সুখ সাথ তুম্হারেঁ।
সরদ বিমল বিধু বদনু নিহারেঁ।।

এবার পণ্ডিতজী নারীর কাছে পতির মাহাত্ম্য সুন্দর কুলুহী ভাষায় বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। সীতা বনে যেতে চান, কিন্তু রাজবধূর বনবাস যাত্রায় সবাই বাধা দিতে লাগলো। তখন সীতা বললেন, মাতাপিতা গুরু পুত্র পরিজন কাছে থাকলেও স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের কোন কিছুই ভাল লাগে না। ঐশ্বর্য ধন রাজ্য দেহধর্ম ঘর সবকিছুই পতিহীনার কাছে পীড়াদায়ক। একমাত্র স্বামীই নারীকে দিতে পারে সুখ। দেহ থেকে প্রাণ ছেড়ে গেলে কিংবা নদী থেকে জল শুষ্ক হয়ে গেলে যে অবস্থা হয়, পতিহীনা নারীর অবস্থা ঠিক তাই।

আর বেশিক্ষণ বোধহয় বালুকে এমনি চুপচাপ দাঁড় করিয়ে রাখা ঠিক হচ্ছে না ভেবে বললাম, বালু তোমার পিতাজী রোজ এ সময় বুঝি রামচরিত মানস থেকে পাঠ করেন?

বালু একটু এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, ওপারের টিকা থেকে প্রায় রোজ মেয়েরা এ সময় পিতাজীর কাছে রামচরিত কথা শুনতে আসে।

তুমি শোন না?

ও মাথাটা আস্তে কাৎ করে জানাল, সেও শোনে।

বললাম, এ সময় তোমার পিতাজীকে আমার আসার কথা জানানোটা বোধহয় ঠিক হবে না বালু।

সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠল, ওতে কি আছে? আপনি কিছু ভাববেন না। পড়ার মাঝে কাজ পড়লেই পিতাজীকে পড়া ছেড়ে উঠতে হয়। আর তাছাড়া চাকী ঘরে যাবার সময় পাঠ শুরু হয়েছে। এখন পাঠ ভেঙে যাবারই কথা। বেশিক্ষণ পড়লে পিতাজী হাঁপিয়ে ওঠেন। আগের মত দম রাখতে পারেন না।

বলতে বলতেই উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল বালু।

সামান্য সময়ের ভেতর দেখলাম, একটি একটি করে মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের টিকার দিকে চলে যেতে লাগল। যাবার সময় ওরা কোন কথা না বলে আমার দিকে ফিরে একটি করে নমস্কার করে গেল। আমি দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে প্রতি নমস্কার জানাতে লাগলাম।

ওরা চলে গেলে বালু ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, আসুন।

আমি বালুর পেছন পেছন আব্রীতে এসে পড়লাম। শোবার ঘর কাম স্টোররুম এই আব্রী। পাশেই এক চিলতে রসুই ঘর দেখা যাচ্ছে। জানালার ফাঁকে চোখ পড়তেই দেখলাম, ঘোরালের ভেতর একটি গরু দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে।

একটা চারপাইয়ের ওপর থেকে নেমে দুটো হাত জোড় করে নমস্কার করলেন পণ্ডিতজী। আমি প্রতি নমস্কার জানালাম।

লক্ষ্য করলাম, পণ্ডিতজীর দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। পা দুটো কাঁপছে। বৃদ্ধ মানুষটির কাছে গিয়ে হাত ধরে বসালাম চারপাইয়ের ওপর।

বললাম, আমি বাইরে থেকে আপনার রামচরিত পাঠ শুনছিলাম।

উনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বাবুজী, আপনি পাঠ শোনার জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন?

হেসে তাকালাম বালুর দিকে। ও মুখখানা নিচু করে মেঝের ওপর চোখ পেতে দাঁড়িয়েছিল। কোন কথা বলল না।

আমি বললাম, আপনার মেয়ে কিন্তু ভদ্রতার কোন ত্রুটি রাখেনি। আসন পেতে অতিথির বসার সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিল।

তৃপ্তির একটা ছবি ফুটে উঠল বৃদ্ধের মুখে। পণ্ডিতজী হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে আমাকে তাঁর পাশটিতে বসতে অনুরোধ জানালেন।

আমি বসে ওঁর হাতখানা তুলে নিয়ে নাড়ী দেখলাম। হাত নামিয়ে রেখে বললাম, বেশ সুস্থই তো রয়েছেন দেখছি।

পণ্ডিতজী বললেন, রঘুনাথজীর কৃপায় আমার কোন কষ্ট নেই বাবুজী। দেহে যাতনা হলে তাঁর নাম করি। অমনি সব ভুলে যাই।

আমি পণ্ডিতজীর সঙ্গে অসুখের কথা ছাড়া নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম।

ডাক্তারী করতে গিয়ে ধীরে ধীরে একটা অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছি। কোন পরিচিত বাড়িতে বিনা কারণে গিয়ে পড়লেও আর সব কথা বাদ দিয়ে রোগের কথাই উঠবে সেখানে। ডাক্তার ছাড়া মানুষ হিসাবে আমার যেন আর কোন পরিচয়ই নেই। সাধারণ কথার স্বাদ নেবার অধিকার যেন ডাক্তার হয়ে আমি হারিয়ে বসে আছি।

কিন্তু এই একটি জায়গা দেখলাম, বার্ধক্যের সবকটি অসুস্থতা সঙ্গে নিয়েও মানুষটি একবারের জন্য রোগের কথা ওঠালেন না।

কথায় কথায় বললাম, পণ্ডিতজী, আপনারা কি কুলু অঞ্চলেরই মানুষ?

পণ্ডিতজীর মুখে সরল একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। বললেন, কেন বলুন তো বাবুজী?

বললাম, কুলুতে যখন রয়েছেন ঘরবাড়ি করে তখন কুলুর লোক তাতে সন্দেহ কি। তবে আপনার কিংবা আপনার মেয়ের পোশাক পরিচ্ছদে একটু তফাৎ লক্ষ্য করেছি, তাই কথাটা তুললাম।

ঠিক ধরেছেন বাবুজী, বললেন পণ্ডিতজী, আমরা আসলে রাজপুত। জয়পুরে ছিল আমাদের আদি বাস। আমার পিতামহ এসে এখানে বসতি পত্তন করেন।

আপনাদের পৈতৃক কিছু কি ব্যবসা ছিল?

আগে ছিল ক্ষেতখামার, এখন ওসব কিছু নেই বাবুজী। রামজীর কৃপায় দিন চলে যাচ্ছে। সামনে এক চিলতে যে ক্ষেতি দেখলেন, তাতে গম আর মকাই এর চাষ হয়। কোনরকমে দুটো প্রাণীর চলে যায় ওতে।

লক্ষ্য করে দেখছি, বেশ অভাবের ভেতরেই এঁদের দিন গুজরান করতে হয়, কিন্তু একটা পরিচ্ছন্ন আভিজাত্যের ছাপ লেগে আছে এঁদের আচার আচরণে।

আমাদের কথার ফাঁকে বেরিয়ে গিয়েছিল বালু। আমি লক্ষ্য করিনি। আবার যখন আমার চোখের সামনে এসে দাঁড়াল তখন ঝকঝকে কাঁসার থালায় দুটি বেসনের লাড্ডু

আর কটি তিলৌড়ী সাজিয়ে এনেছে। সোনার মত ঝিলিক দেয়া চুমকিতে জল টলটল করছে।

বালু মেঝেতে পিঁড়ি পেতে তার ওপর ওগুলো সাজিয়ে রেখে আমার দিকে তাকাল।

পণ্ডিতজী এতক্ষণ কথায় মেতেছিলেন। এবার জলযোগের থালার দিকে দৃষ্টি পড়তেই আমার হাতখানা ধরে বললেন, সামান্য একটু মুখে দিতে হবে বাবুজী।

আমি উঠে গিয়ে বসলাম মেঝের ওপর পাতা ছাগলোমে তৈরী থোবির ওপর।

তিলৌড়ী মুখে দিয়ে বললাম, এটি খেতে কিন্তু আমি খুব ভালবাসি। তুমি দেখছি মনের কথা জানতে পার বালু!

এবার সলজ্জ হাসি ফুটল বালুর মুখে।

হঠাৎ করে ও ভেতরের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছে দেখে আমি বলে উঠলাম, আর নয় কিন্তু। শেষ বেলায় খাবার অভ্যেস নেই, শুধু তোমার দেওয়া জিনিসগুলোর লোভ ছাড়তে পারছি না বলেই খাচ্ছি।

বালু ফিরে দাঁড়াল।

পণ্ডিতজী বললেন, একটা মকাই খাবেন বাবুজী? বালুর সেঁকা মকাই খেতে খুব ভাল লাগবে। ও বেটী নিমক মরচা মাখিয়ে এমন মকাই সেঁকে দেবে, যার সোয়াদ জিভে লেগে থাকবে বহুৎ দিন।

বললাম, তাহলে খেতে হয়। কিন্তু অসময়ে আবার আগুন জ্বালতে হবে, তার চেয়ে থাক্ অন্য আর একদিন খাওয়া যাবে।

বালু এবার আর আমার কথা শুনল না। রসুই ঘরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি তিল আর মুগের তৈরি মিষ্টি খেয়ে আবার এসে বসলাম চারপাইয়ের ওপর। কিছুক্ষণের ভেতর মকাই সেঁকে একটা পাত্রে এনে আমার হাতে ধরিয়ে দিল বালু।

মকাইএ কামড় দিয়ে মনে হল, জিভের কাছে এর যথেষ্ট অবদান আছে। একটুও বাড়িয়ে বলেননি পণ্ডিতজী।

বললাম, যদি জানতাম তুমি এত ভাল মকাই সেঁকতে পার বালু, তাহলে তোমার পিতাজীর অসুখের সময় ওষুধের দামটাও দিতে হত না। মকাই খেয়ে ও দাম উসুল করে নিতাম।

বালু বলল, আপনি টাকা নিলেন কই। না নিলেন নিজের, না কম্পাউণ্ডারবাবুর। কত ওষুধ ডিসপেনসারি থেকে বিনি পয়সায় দিয়ে দিলেন। বাজার থেকে ওষুধ তো দাম দিয়ে কিনতে হতো বাবুজী।

পণ্ডিতজীর দিকে তাকিয়ে বললাম, আজ তাহলে উঠতে আদেশ করুন পণ্ডিতজী। বেলা পড়ে এসেছে, যেতে হবে অনেকখানি।

পণ্ডিতজী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, বাবুজীকে তুমি বাজারের পথ অব্দি পৌঁছে দিয়ে এসো বালু।

আমার দিকে তাকিয়ে নমস্কার করে বললেন, আসতে বলতে সঙ্কোচ হয় এ ঝোপড়িতে। তবে এদিকে বেড়াতে এলে কৃপা করে আসতে ভুলবেন না বাবুজী।

পণ্ডিতজী চারপাই ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন দেখে ওঁকে হাতে ধরে বসালাম। বললাম, বালুর হাতে তৈরি খাবারের লোভে আবার আসতে হবে আপনার কোঠীতে।

পণ্ডিতজী হাসতে লাগলেন। আমি বালুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি, আকাশ জুড়ে সে এক বিচিত্র ছবি আঁকার খেলা শুরু হয়েছে। সূর্যাস্তের মরা হলুদ আর আবীর রঙে রাঙানো আকাশ। টুকরো টুকরো এক দঙ্গল মেঘ লাল হলুদ জামা গায়ে হামা দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওপরের পাহাড়ের আড়াল থেকে তখনও আধখানা ডুবন্ত সূর্য দেখা যাচ্ছে। এদিকে পুবের আকাশে ঝক্‌ঝকে চাঁদ।

আমি টাট্টুতে না উঠে ঐ দৃশ্য দেখতে দেখতে নিচের ভ্যালির পথে সাবধানে নামতে লাগলাম।

ভ্যালিতে নেমে এসে দেখি, পশ্চিম আকাশে রক্তের ঢেউ ইতিমধ্যে ঘন কালো জমাট হয়ে উঠেছে। পুবের দিকে চেয়ে দেখি চাঁদ থেকে একটা তরল সাদা জ্যোৎস্নার ঢল গড়িয়ে আসছে পাহাড় বনের গা ভাসিয়ে ভ্যালির মধ্যে। দুটো পাইন গাছ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাদা জ্যোৎস্নার ঢেউতে স্নান করার ইচ্ছা নিয়ে।

পাশ ফিরে দেখলাম, বালু মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমার চলার অপেক্ষায়। বললাম, এ পথ আমার অচেনা নয় বালু। তুমি ফিরে যাও, তোমার পিতাজী একলা রয়েছেন।

বালু চমকে মুখ তুলে বলল, না বাবুজী, আপনাকে বাজারের রাস্তায় পৌঁছে না দিয়ে আমি ফিরব না। পিতাজী বলে দিয়েছেন।

বললাম, বাজারের পথ, সে তো অনেকখানি দূর! তুমি একা একা ফিরবে কি করে?

বালু বলল, দরকার পড়লে রাতে ভিতে আমি একাই তো কোঠী থেকে বাজারে যাওয়া আসা করি বাবুজী।

বললাম, তোমার ভয় করে না?

বালু বলল, ডর কিসের বাবুজী, কিছু থেকে আমার ডর নেই।

বালুর সঙ্গে এই আধো জ্যোৎস্নার মায়াময়তায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভাল লাগছিল। বললাম, বালু, তোমার যদি খুব একটা তাড়া না থাকে তাহলে একটুখানি বসবে এখানে?

বালু মাথা নিচু করে কয়েক মুহূর্ত কি ভাবল।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আচ্ছা থাক, অনেক রাত হয়ে যাবে তোমার বাড়ি ফিরতে।

ও মুখ তুলে বলল, না না, আমার তো কোন তাড়া নেই। আসুন না, এই গাছের তলায় পাথরটার ওপর বসি।

বালু গাছের সঙ্গে টাট্টুর লাগাম বেঁধে পাথরের পাশে এসে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। আমি বসে আছি তাই পাশাপাশি সে সংকোচে বসতে পারছিল না।

বললাম, তুমি পাথরের ওপর উঠে বস বালু, সংকোচের কোন কারণ নেই।

ও তবুও অনেক সংকোচে আমার কাছ থেকে বেশ খানিক দূরত্ব বাঁচিয়ে পাথরের ওপর আধবসার ভঙ্গীতে বসল।

কেউ কোন কথা বললাম না কিছুক্ষণ। চাঁদের আলোয় গাছের তলায় ছায়ার ফুল ফুটে উঠেছে।

এক সময় বললাম, বেশ গরম পড়তে শুরু করেছে। কিন্তু দেখ, ভ্যালির ভেতর বাতাসটা কেমন খেলে বেড়াচ্ছে।

বালু বলল, দক্ষিণের পাহাড়ী অঞ্চলে গরমের সময় বেশ কষ্ট হয়, কিন্তু ভ্যালির ভেতর বাবুজী মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা একটা হাওয়ার খেলা চলতে থাকে। এখানকার এই দস্তুর।

বললাম, আজকাল দুপুরে পাহাড়ের মাথাগুলোও কেমন যেন অস্পষ্ট অস্বচ্ছ বলে মনে হয়। দূরের দৃশ্যগুলো ভাল করে দেখা যায় না।

বালু বলল, পিতাজী বলেন, ওটা হালকা ধূলির ওড়না। ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে ওপরে ওঠে। তউন্দির সময় এটা প্রায়ই হয়।

আমার বেশ ভাল লাগছিল। মুখে লজ্জা আর মিষ্টি একটা সারল্য মাখা থাকলেও বালু যে প্রকৃতির লীলারহস্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নয়, একথা জেনে ওকে আরও বেশী ভাল লাগল।

অন্য কথায় এলাম। বললাম, সারাদিন তোমাকে কি কাজ করতে হয়ে বালু?

বালু বলল, আমার সংসার তো দেখলেন বাবুজী, কত ছোট কিন্তু সারাদিন কাজের কি শেষ আছে। এখন গম ঝাড়াই বাছাই-এর কাজ চলছে। আবার যখন শরৎকাল আসবে, তখন মকাই উঠবে ঘরে।

বললাম, আমি যখন প্রথম মানালী আসি তখন মকাই তোলা হয়ে গেছে। পাহাড়ী টিকার প্রায় প্রতিটি ঘরের ছাদে মকাই শুকোচ্ছে। যেদিকে তাকাই সেদিকে পাকা সোনার ঝিলিক। সে ছবি এত সুন্দর যে এখনও চোখের ওপর মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে।

বালু বলল, সারা দেশটা ছবি, বাবুজী। শরৎকালের শেষে গাছ থেকে যে পাতা ঝরবে, তার রঙেও সোনার চমক।

বললাম, তোমরা রাজপুত, তাই না বালু?

ও মাথা নাড়ল।

বললাম, প্রতিটি জাত তাদের নিজের নিজের দলের লোকজন নিয়ে একসঙ্গে থাকে, কিন্তু তোমরা ঐ নির্জন পাহাড়ে দুটি প্রাণী থাক কি করে?

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বালু। এক সময় কিছুটা সংকোচের সঙ্গে বলল, আমরা রাজপুত বাবুজী, তবে পতিত হয়ে আছি?

বললাম, তোমরা পতিত কিসে?

বালু বলল, মিয়ান রাজপুত ছিলাম আমরা। লোকে আমাদেরও এক সময় 'জয় দিয়' বলে চলতে ফিরতে সম্মান দেখাত। কিন্তু আমাদের ক্ষেতিতে এক সময় কাজ করত একটি

মানুষ। তার কাজে সাহায্য করতে আসত তার কিশোরী মেয়েটি। মেয়েটি কৃষক কানেতের বাড়ির হলে কি হবে, রূপ যেন তার পাকা ফসলের মত আলো করে থাকত সারা ক্ষেত।

একটু থেমে চোখদুটো আমার মুখের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে বালু বলল, তিনি আমার মা বাবুজী, আর তাই আমরা এক ধাপ নিচে নেমে গেছি।

বললাম, তোমরা এক ধাপ উঁচুতে উঠে গেছ বালু। তোমার পিতাজী শুধু পণ্ডিতই নন, তিনি সত্যিকারের মানুষ।

বালু উৎসাহে আমার মুখের ওপর তার চোখ রেখে বলল, আমাদের জাতের মেয়েদের পর্দা মেনে চলতে হয় বাবুজী, কিন্তু এখন এক ধাপ নেমে যাওয়ায় আমরা আর ওসব মানি না। পিতাজী মাকে এনে ঐ নির্জন পাহাড়ে সংসার পাতেন। মা মারা গেলে আমার দাদা বাজারে কোঠী বাঁধতে চেয়েছিল, কিন্তু পিতাজী ও জায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে চাননি। শুধু বলেছিলেন, তোমরা নতুন দিনের মানুষ, বাজারের আনন্দে মেতে থাকতে চাইছ, আমি বাধা দেব না। তবে আমি এই ঝোপড়িতে তোমার মায়ের স্মৃতি নিয়ে থাকব শেষ কটা দিন।

বলুন তো বাবুজী, এরপর আমি আমার বুড়ো পিতাজীকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারি? আর তাছাড়া এখন তো উনি একেবারে নড়াচড়ার বাইরে।

বললাম, তোমার দাদা সেই থেকে মিলিটারীতে চলে গেল বুঝি?

বালু বলল, ঠিক ধরেছেন বাবুজী। তারপর থেকে আর এমুখো হয়নি।

বললাম, বালু, তুমি আর কিছু কাজ কর?

ও বলল, মরশুমে আপেল পাকলে আমি আপেল তোলার কাজ করি বেনন সাহেবদের বাগানে। তারপর পথের ধারের দোকানে ফলের রস তৈরি করার কাজে লেগে যাই। ফলের মরশুমে যারা বেড়াতে আসে বাবুজী, তারা আপেলের রস খেতে চায়।

বললাম, জুলিয়েন বেননকে চেন তুমি?

বালু মাথা দুলিয়ে জানাল, জুলিয়েন তার চেনা।

বললাম, কেমন মানুষ?

বালু বলল, বহুৎ খেয়ালী। ওকে বহুৎ ডর করে সব্বাই।

বললাম, খেয়ালী কি রকম?

বালু বলল, আমরা দল বেঁধে ওদের বাগানে আপেল তুলতে যাই। একবার একটা মেয়ে বাগানে ফল তুলতে তুলতে একটা আপেলে কামড় দিয়েছিল। পড়বি তো পড় জুলিয়েন সাহেবের চোখে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চাকরী খতম।

বললাম, ঐটুকু দোষে চাকরী হারাতে হল?

হাঁ বাবুজী, বলল বালু, তবে ও মেয়েটি আবার ভাল কাজ পেয়ে গেছে।

বললাম, কি কাজ?

বালু বলল, তাঁত বোনার কাজ। আর কাজটা ঐ জুলিয়েন সাহেবই যোগাড় করে দিয়েছে।

হেসে বললাম, তাহলে তো দারুণ সাচ্চা মানুষ বলতে হয়।

বালু বলল, কি রকম খেয়ালী জানেন বাবুজী? ঐ মেয়েটাকে কাঁদতে দেখে জোর ধমক লাগিয়ে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিলে। তারপর সন্ধ্যাবেলা ওর বাড়ি বয়ে একঝুড়ি বাগানের সেরা আপেল দিয়ে এল। আবার ভাল চাকরীও জুটিয়ে দিলে, কিন্তু বাগানের কাজে আর ফিরিয়ে আনল না।

বললাম, ও মানুষটা ঐরকমই বালু।

চাঁদের আলোয় দুজনে কতক্ষণ বসে বসে ছোট ছোট সুখ-দুঃখের গল্প করলাম। আমার কাছ থেকে একটুখানি সহানুভূতির ছোঁয়া পেয়ে বালুর মনের রুদ্ধ জানালাটা ধীরে ধীরে অভাবিত এক আলোর দিকে খুলতে লাগল।

এই নির্জন প্রকৃতির বিরাট নৈঃশব্দের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হতে লাগল, বালু ঠিক এই নৈশ প্রকৃতির মতই একান্ত নির্জনে নির্বাসিত। সব ঐশ্বর্য, সব শ্যামল সমারোহ থাকা সত্ত্বেও সে এক মহা গতিহীন অভিশাপে বাঁধা পড়ে আছে। তার ভরাযৌবনের বাসনাগুলো রাতের ঝিঁঝিঁদের মত যেন বুক কুরে কুরে অবিশ্রাম কান্না ঝরিয়ে চলেছে।

কখনো বা উপত্যকার বসন্ত বাতাস পথচলতি বালুকে ছুঁয়ে যায়। লাল ঠোঁটে তোতাপাখি চেরী ফল নিয়ে সবুজ ডানা ভাসিয়ে ওড়ে। ফুলেভরা বন্য আপেলের শাখায় কোয়েল নিজের কালো দেহখানা লুকিয়ে সুরের আগুন জ্বালাতে থাকে। বুকখানাকে একেবারে উদাস করে দিয়ে কখনো বা বৈশাখী দুপুরে দূর বনে ঘুঘু ডাকে। সাদা তগ্‌গর ফুল নাকের কাছে আলতো করে ছুঁইয়ে তার করুণ গন্ধটাকে শুঁকতে শুঁকতে শূন্যে চেয়ে থাকে বালু। যে হিসেব কোনদিন মিলবে না, জীবনের সেই হিসেবগুলো মেলাবার চেষ্টা করতে করতে একসময় একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে হাল ছেড়ে দেয় সে। আবার নিজের কাজ। কাজে বিলম্বের কৈফিয়ৎ মনে মনে খাড়া করতে করতে কঠিন পাথরের পথে আঘাত খেতে খেতে ছুটে চলা।

একসময় যখন বালু তার নিঃসঙ্গ জীবনের অনেক কথা স্বগতোক্তির মত শুনিয়ে গেল তখন আমি এক অবসরে বললাম, একটা ছোট্ট কাজ আছে, করবে বালু।

ও আমার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে তার সম্মতি জানাল।

বললাম, একেবারে সম্মতি দিয়ে দিলে? আগে কথাটা শোন, ভেবে দেখ, পিতাজীর সঙ্গে পরামর্শ কর—তারপর সম্মতি অসম্মতির প্রশ্ন আসবে।

বালু কোন কথা না বলে আমার মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইল।

বললাম, ডেলিভারীর কেস এলে অনেক সময় বড় মুস্কিলে পড়তে হয়। এসব পাহাড়ী অঞ্চলে বড় বেশি সংকোচ আর সংস্কার আছে। আমার হঠাৎ কিছু দরকার হয়ে পড়লে বাড়ির মেয়েদের কাছে সাহায্য পাওয়া দায় হয়ে ওঠে। তোমার যদি এসব কাজে সাহায্য করার ব্যাপারে কোন সংস্কার না থেকে থাকে, তাহলে আমাকে বোলো। এখুনি বলার দরকার নেই, ভেবেচিন্তে বললেই হবে। কাজটা প্রতিদিনের নয় তাই রোজ তোমাকে ব্যস্ত থাকতেও হবে না। দরকার পড়লেই আমি তোমাকে ডেকে নেব।

কথাগুলো বলে প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে চাঁদের আলোয় ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

বালু বলল, আমার কোন সংস্কার নেই। আপনি যদি মনে করেন আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব তাহলে আমি খুব রাজী আছি।

বললাম, তোমার পিতাজীর সঙ্গে একবার আলোচনা করে নাও।

ও বলল, ফিরে গিয়েই পিতাজীকে বলব। তবে উনি কি বলবেন তাও আমার জানা আছে। তাই আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে কথাটা দিতে পারলাম।

রাত সত্যি সত্যি অনেকখানি হয়ে গিয়েছিল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বালুকে বাড়ি ফিরে যাবার জন্যে অনেক বোঝালাম কিন্তু ওর সেই এক কথা—পিতাজী বলেছেন আপনাকে বাজারের রাস্তা অব্দি পৌঁছে দিয়ে আসতে।

সঙ্গে সঙ্গে ঝিন্নির কথা মনে পড়ল। সেও একদিন এমনি পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছিল আমাকে যোগ্নীর হাত থেকে বাঁচাতে।

বালু ফিরে গেল নির্দিষ্ট সীমানা ছুঁয়ে। আমি টাট্টুতে চড়ে বাঁধান রাস্তা ধরে বাজারের পথে এগোতে লাগলাম। রাস্তার ধারে বড় বড় সিডার গাছগুলো পেরিয়ে চলেছি। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে উপত্যকা।

হঠাৎ কি মনে হল, টাট্টু থেকে নেমে দাঁড়ালাম। গাছের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে রইলাম ভ্যালির দিকে।

জ্যোৎস্নায় একটি ছায়ামূর্তি দ্রুতপায়ে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আমি জানি সে বালু। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি ওর নামধাম, পরিচয়ের পার্থিব সূত্রগুলো ভুলে গেলাম। আমার মনে হল সৃষ্টির শুরু থেকে একটি তরুণী কুমারী রহস্যময় জ্যোৎস্নার আলো গায়ে মেখে একাকী অনন্ত পথ পাড়ি দিয়ে চলেছে। সমস্ত বিশ্বচরাচরকে সে তার যৌবনের মহিমায় মূক স্তব্ধ রুদ্ধশ্বাস করে রেখেছে।

রাত তখন প্রায় দশটা। খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে 'দ্য রা-একসপিডিশানস' বইখানার পাতা ওল্টাচ্ছি। কেমন করে পেপাইরাসের তৈরি নৌকোয় আধুনিক যুগের মানুষ দুস্তরসমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে, তার ছবি দেখে রোমাঞ্চিত হচ্ছি। হঠাৎ জানালার বাইরে থেকে লম্বা একখানা হাত ঢুকে আমার বইটা টেনে নিতেই আমি লাফ দিয়ে মেঝেতে উঠে দাঁড়ালাম।

জানালার দিকে তাকিয়ে কিন্তু হেসে উঠলাম।

জুলিয়েন বাইরে থেকে বলল, চটপট ড্রেস করে বাইরে বেরিয়ে এসো মুখার্জী। দরকার আছে।

জুলিয়েনকে কোন প্রশ্ন করা বাহুল্য। ও মর্জি হলে কথার জবাব দেবে নয়ত নিঃশব্দে নেমে চলে যাবে। শুধু বললাম, দরজাটা কি ভেজিয়ে রেখে যাব?

ওপাশ থেকে ভারী গলার শব্দ ভেসে এল, না। ভাগ্তুকে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে বল। আর তুমি যে বাইরে বেরিয়েছ একথা যেন ও কাউকে না বলে।

দশ মিনিটে কাজ শেষ করে বেরিয়ে এলাম। বাইরে নেমে দেখি, চাঁদ ডুবছে পাহাড়ের আড়ালে। চারদিকে ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে।

অস্পষ্ট আলোয় কিন্তু অদ্ভুত দেখাচ্ছিল জুলিয়েনকে। পুলিশ অফিসারের ড্রেস পরে টুপি মাথায় হাতে ব্যাটন নিয়ে দাঁড়িয়ে।

বললাম, এ কি রূপে দিলে দরশন!

জুলিয়েন লম্বা পা ফেলে চলতে চলতে বলল, ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নির্জন পথ। আমরা চলেছি বাজারের দিকে। জুতো থেকে একটা ভেজা সপসপ শব্দের মত আওয়াজ উঠছিল।

বাজারের কাছাকাছি এসে জুলিয়েন বাঁদিকের সিডার জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। আমি ওকে সাবধানে অনুসরণ করে চললাম। অনেকখানি পথ বনের ভেতর ঠাওর করে চলতে কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু চেনা পথ দুজনেরই, তাই একসময় জঙ্গলটা পেরিয়ে আসতে পারলাম।

এখন আমরা নদীর জলধ্বনি শুনতে পাচ্ছি।

হঠাৎ আমার মুখে ওর হাতখানা চেপে ধরে জুলিয়েন চাপা গলায় বলল, খবরদার, শব্দ কোরো না যেন।

তারপর হাত নামিয়ে নিয়ে বলল, ঐ দূরে একটা কিছু দেখতে পাচ্ছ?

অন্ধকারে ততক্ষণে কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। বললাম, বেশ বড় আকারের একটা কিছু দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হচ্ছে।

জুলিয়েন ফিসফিস করে বলল, একখানা লরী। এখন যা বলি, তাই কর। চুপচাপ নদীর ধারের রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও। দেখো, পাথরটাথর গড়িয়ে শব্দ করে বসো না যেন।

আমি জুলিয়েনের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম। নদীর জলপ্রবাহ এত তীব্র আর শব্দতরঙ্গ এত তীক্ষ্ণ ছিল যে একখানা পাথর গড়িয়ে পড়লেও অতিরিক্ত কোন শব্দের সৃষ্টি হত বলে মনে হয় না।

আমি সাবধানে নিচের রাস্তায় নেমে দাঁড়াতে যতটুকু সময় নিয়েছিলাম তারই ভেতর জুলিয়েন নিশ্চয়ই কিছু কাণ্ড করে থাকবে। আমি ঐ লরীর দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি দুটো চোখে আগুন ছড়িয়ে লরীটা আমার দিকে ছুটে আসছে।

আমি রাস্তার ধার ঘেঁষে দাঁড়ালাম। লরীটা আমার পাশে এসে থেমে গেল। জুলিয়েনের চাপা গলার আওয়াজ জলের শব্দকে ছাপিয়ে বেজে উঠলো, উঠে এসো তাড়াতাড়ি।

আমি বাক্যব্যয় না করে গাড়িতে উঠে পড়লাম। আর অমনি লরীখানা বন পাহাড় কাঁপিয়ে ছুটে চলল সামনের পথ ধরে।

জুলিয়েনের মুখে কথা নেই। আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে সে ম্যাজিক কার্পেটের মত গাড়িখানাকে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। বেশ খানিক পথ যাবার পর জুলিয়েনই প্রথম কথা বলল, চোরের ওপর বাটপাড়ি করলাম মুখার্জী।

বললাম, এতক্ষণ গোলকধাঁধায় রয়েছি, এখন দয়া করে ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বল তো দেখি।

জুলিয়েন বলল, নদীর ধারে সরকারী লগ হাউস তৈরি হচ্ছে। মধুর খবর পেয়ে মদনলাল যথারীতি এখানে এসে হাজির হয়েছে। এখন নদীর স্রোতে টিম্বার মার্চেন্টদের যে

লগ ভেসে যাচ্ছে তাই চুরি করে ও ঘর বানাচ্ছে। এদিকে কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে কাঠ সাপ্লাই-এর বিলটা তুলে নিচ্ছে সরকারী তহবিল থেকে।

বললাম, নদীর জলে ভেসে আসা লগগুলো এতদূরে না ধরে লগ হাউসের পাশ দিয়ে ভেসে যাবার সময়ে তো ধরতে পারত। তাহলে কন্ট্রাক্টরের লরীতে ওঠানোর হাঙ্গামা থাকত না।

জুলিয়েন বলল, ওপরের পাহাড়ে এখন বরফ গলছে। জানুয়ারীতে যেখানে জলের অ্যাভারেজ ফ্লো সাড়ে চার হাজার কিউসেক সেখানে এখন প্রায় পনেরো হাজার কিউসেক জল নামছে। ভেবে দেখ, জলেব স্রোত কত প্রবল। লগ হাউসের কাছে নদীর স্রোত ঝড়ো হাওয়ার মুখে ধূলোর মত উড়ে যাচ্ছে। ওখানে লগ ধরে সাধ্য কি। তাই পিছিয়ে গিয়ে নদীর বাঁকে যেখানে লগগুলো মাঝে মাঝে আটকা পড়ে যায় সেখান থেকে লরীতে তুলে নিয়ে পালিয়ে আসছে।

বললাম, গাড়িতে কেউ ছিল না?

জুলিয়েন বলল, আমি যতটুকু ইনফরমেশান পেয়েছিলাম তাতে রাত একটা নাগাদ চাঁদের আলো ফুটলে ওরা মরা জ্যোৎস্নায় নদী থেকে কাঠ তুলে লরী বোঝাই করার তাল করছিল। গিয়ে দেখি, লরীতে শুধু ড্রাইভার ভেজা বেড়ালের মত একলা বসে।

বললাম, পুলিশ অফিসারের পোশাকটা তাহলে অকারণেই চাপালে বল?

জুলিয়েন বলল, নিশ্চয়ই নয়। আমাকে এই পোশাকে দেখেই তো ড্রাইভার লাফ দিয়ে ভেগে পড়ল।

লরী গর্জন করতে করতে এগিয়ে চলেছিল। কোথায় যাচ্ছে কে জানে।

একসময় বললাম, জুলিয়েন, এখন কোথায় চলেছি দয়া করে তার যদি একটা হদিস দাও।

জুলিয়েন বলল, ঐ প্রশ্নটি করলেই কিন্তু গাড়ি থেকে সোজা ঠেলে ফেলে দেব। চুপচাপ বসে থাক। যেখানে নামাবো সেখানে নামবে।

হেসে বললাম, তোমার হাতে যখন পড়েছি তখন চালাও দোস্ত্। যেখানে ঠেকাবে সেখানেই ঠেকব।

রাত প্রায় একটার কাছাকাছি। নদী পাহাড় বন কাঁপিয়ে জুলিয়েনের বাটপাড়ি করা লরী যেখানে এসে দাঁড়াল রাতের অন্ধকারে সে জায়গা আমার অচেনা। জুলিয়েন গাড়ি থেকে নেমে বলল, চিনতে পার জায়গাটা?

বললাম, না।

একেবারেই না?

বললাম, আমার চেনা জায়গা বলে তো মনে হচ্ছে না।

জুলিয়েন বলল, তাহলে গাড়িতে ওঠ। যেখান থেকে এনেছি সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসি।

বললাম, সত্যি জুলিয়েন ধাঁধায় পড়ে গেছি।

জুলিয়েন বলল, কপালে তোমার দুঃখ আছে মুখার্জী।

বললাম, দুঃখ যদি থাকে তবে খণ্ডাবে কে!

জুলিয়েন বলল, চল এখন ওপরে ওঠা যাক্। রাত প্রায় একটা বাজে। চারটের আগেই কিন্তু এখানে ফিরতে হবে। সাড়ে পাঁচটায় কুলু থেকে যে বাস যাবে সেটা ধরতে হবে আমাদের। লরী এখানেই পড়ে থাক্।

জুলিয়েনের হাতে জোরে একটা চাপ দিয়ে মনের আবেগ জানালাম। আমার কাছে সব এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে।

বললাম, তুমি সত্যি নাগ্গরে নিয়ে এলে আমাকে!

মুখার্জী, তোমার ঝিন্নির কাছে নিয়ে এলাম।

আমরা টর্চের আলোয় পথ চিনে ওপরে উঠতে লাগলাম!

নিরন্ধ্র অন্ধকারে নাগ্গর ঘুমিয়ে আছে। ঝিন্নির কোয়ার্টারের সামনে দুজনে এসে দাঁড়ালাম। জুলিয়েন বলল, তুমি আর্ট গ্যালারীর আড়ালে গিয়ে দাঁড়াও। আমি দরজায় নক্ করছি।

আমি গ্যালারীর দিকে চলে গেলাম। কানে এসে বাজতে লাগল জুলিয়েনের দরজা ধাক্কানোর শব্দ।

কে? কে?

ভেতর থেকে ঝিন্নির গলা বেজে উঠল। ঘুমে আর শঙ্কায় জড়ানো সে কণ্ঠস্বর।

জুলিয়েনের গলা শোনা গেল, ভয় নেই, আমি কুলুর পুলিশ স্টেশন থেকে আসছি।

ভেতরে আলো জ্বলে উঠেছে। দরজা খুলে দিয়েছে ঝিন্নি। দূরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, জুলিয়েন কিন্তু তেমনি বাইরে দাঁড়িয়ে।

ঝিন্নি দরজা ধরে বাইরে মুখ বার করে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার বলুন তো?

জুলিয়েন ভারী গলায় বলল, মিস শর্মা, আপনাকে এত রাতে ডিস্টার্ব করার জন্যে সত্যি দুঃখিত, কিন্তু এ সময় ছাড়া সেই ভদ্রলোকের নাগাল পাবার কোন উপায় নেই।

ঝিন্নির গলা জড়িয়ে এসেছে, কি বলছেন আপনি? এখানে দ্বিতীয় কোন মানুষ তো নেই।

ইতিমধ্যে উত্তেজনায় ঝিন্নির হাত লেগে পুরো দরজাটাই খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক আলো আর্ট গ্যালারীর দেয়াল ছুঁয়ে আমার ওপর এসে পড়ল।

ঝিন্নির চোখ মুহূর্তে আমাকে চিনে ফেলল। সে প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, তুমি ওখানে ছোটেসাহেব!

জুলিয়েন হতাশভাবে আমার দিকে চেয়ে বলল, সব প্ল্যানটা ভেস্তে দিলে তো মুখার্জী!

ঝিন্নির দিকে তাকিয়ে দেখি ও ততক্ষণে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলেছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে বললাম, কি হল ঝিন্নি?

ও সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল।

বেশ খানিক পরে নিজেকে স্বাভাবিক করে যখন ও ঘরে ঢুকল তখন মুখে সলজ্জ একটা হাসি লেগে। সে যে দারুণ রকম বোকা বনেছে, চোখে মুখে তারই ছায়া।

জুলিয়েন বলল, আমি অপরাধী, এখন শাস্তিটা আমাকেই দিন।

ঝিন্নি বলল, বসুন। অপরাধটা আমারই। বলতে পারেন অকৃতজ্ঞ আমি। ভাগ্‌তুর অপারেশনের সময় আপনাদের বাড়িতে যাওয়া আসা করেছি কতবার কিন্তু আজ আপনাকে চিনতেই পারলাম না।

জুলিয়েন অমনি বলল, টুপিতে মাথা ঢাকা, পুলিশের ইউনিফর্ম গায়ে, কেমন করেই বা চিনবেন আমাকে।

জুলিয়েন আর বসল না। আমাব দিকে চেয়ে বলল, ঠিক চারটেতে নাগ্‌গরের বাস-রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়াবে, এখন আমি চললাম। ঐখানেই দেখা হবে।

ঝিন্নি বলল, অসম্ভব। রাতে আমার ঘুম ভাঙালেন, এখন আপনাকে ছেড়ে দেব ভেবেছেন। শেষ রাতটুকু গল্প করেই কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

জুলিয়েন বলল, আর একদিন বিরক্ত করব মিস শর্মা, আজ নয়। চোরাই একখানা গাড়ি আছে, রাতে ওটাকে পাহারা দিয়ে আগলে বসে থাকতে হবে। ভোরবেলা ওটাতে কুলু পৌঁছে জঙ্গলে বিসর্জন দিয়ে মানালীর ফার্স্ট বাস ধরেই রওনা দেব দু' বন্ধুতে।

বললাম, তাহলে চল জুলিয়েন আমিও তোমার সঙ্গে যাই। এক যাত্রায় পৃথক ফল ঠিক নয়।

জুলিয়েন বলল, আমার কথার ওপর কথা চালাতে যেও না মুখার্জী, তাহলে মানালীতে তোমার বাংলোয় আর জুলিয়েনকে দেখতে পাবে না।

বললাম, আজ তোমার দিন জুলিয়েন, আমি হার মানছি।

ঝিন্নি বলল, ছেড়ে দেবার আগে আপনাকে অন্তত এক কাপ চা খাইয়ে তবে ছাড়ব।

জুলিয়েন টেবিলের কোণায় উঠে বসে বলল, রাজী।

ঝিন্নি ভেতরে চলে গেল! আমরা গল্প করতে লাগলাম। এক সময় ঝিন্নি এল দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে।

জুলিয়েন টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কাপটা হাতে ধরে নিয়ে চুমুক দিতে লাগল।

ঝিন্নি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলতেই জুলিয়েন বলল, চায়ের কাপ হাতে গল্প শুরু করলে কাল আর বন্ধুকে নিয়ে মানালী পৌঁছতে হবে না। চোরাই গাড়ির খোঁজে পুলিশ আসবে আর দুজন পলাতককে এখান থেকেই অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে। তখন মিস শর্মা আজ রাতের অভিনয়টাই সত্যি হয়ে দাঁড়াবে।

জুলিয়েন তাড়াতাড়ি করে কয়েক চুমুকে চাটুকু গলার ভেতর চালান করে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। আমিও তার সঙ্গে বাইরে আসতে আসতে বললাম, অন্তত নিচের রাস্তা অব্দি তোমার সঙ্গে যেতে দাও।

জুলিয়েন বলল, যেতে আসতে অকারণে আধ ঘণ্টারও সময় কেন মিথ্যে আমার পেছনে নষ্ট করবে মুখার্জী। তোমরা আধ ঘণ্টা বেশি গল্প করলে বন্ধু হিসেবে আমি বরং আরও বেশি খুশি হব।

বিদায় নেবার জন্য জুলিয়েন হাত তুলল, তারপর পথের ওপর টর্চের ঝলক দিতে দিতে নিচের দিকে নেমে গেল।

আমি উঠে এসে দেখি ভেতরের দরজায় হাত রেখে ঝিন্নি দাঁড়িয়ে আছে।

বাইরের দরজা আমিই বন্ধ করলাম। ঝিন্নি কোন কথা না বলে আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি ওর পাশে গিয়ে বললাম, ঝিন্নি কত যুগ তোমাকে দেখি নি।

ও আরও কিছু সময় অন্যমনস্ক হয়ে রইল। এক সময় বলল, এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে ছোটেসাহেব। একটু পরে তুমি যখন চলে যাবে তখন মনে হবে আমি সত্যি স্বপ্ন দেখেছি।

ওর হাত ধরতেই ও আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এক সময় ওর মুখখানা আমার বুকের ওপর থেকে তুলে নিলাম দু'হাতের পাতায়। একটি ফুটে ওঠা ম্যাগনোলিয়া যেন তার অতি কোমল লাবণ্য আর গন্ধ নিয়ে আমার অঞ্জলিতে বাঁধা পড়ল।

ফুলটির দিকে চেয়ে দেখলাম, দু'ফোটা ভোরের শিশির সেখানে টলটল করছে।

ছোট্ট এইটুকু মুখ কিন্তু অনেক সময় মনে হয় সে মুখ এতবড় বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও ধরে রাখা যাবে না। তার আনন্দ তার আকুলতা মহাবিশ্বকে প্লাবিত করে উপছে পড়বে যেন।

আমি ঝিন্নির মুখখানাকে হৃদয়ের গভীরে ধরে রাখতে গিয়ে দেখলাম, আমার সমস্ত মন ভাদ্রের ভরা দীঘির মত টলমল করছে।

ঝিন্নি চোখ তুলে বলল, ছোটেসাহেব, ভেবেছিলাম তোমার সঙ্গে আমি কোন কথা বলব না, তোমাকে কোন চিঠিও লিখবো না কোনদিন।

আমি অবাক হয়ে ঝিন্নিকে টেনে নিয়ে এলাম ওর বিছানার ওপর। ওকে আমার পাশে বসিয়ে বললাম, কি অপরাধ আমি করেছি ঝিন্নি, যাতে তুমি এত বড় শাস্তি দেবে?

ঝিন্নি বলল, তোমার শেষ চিঠিখানা তুমি কেন এমন করে লিখলে? আমার মনটা কি পাষ্থপাদপ যে তুমি ক্রমাগত আঘাত করে যাবে আর আমি বন্যার মত চোখের জল ঝরিয়ে যাব?

আমার মনে পড়ল শেষ চিঠির কথাগুলো। চিঠির একটি অংশে আমি লিখেছিলাম :

আজ আমি একটি তুষারক্ষতে আক্রান্ত পর্বত-অভিযাত্রী তরুণকে ছ'ঘণ্টা অন্তর হেপারিন ইনজেকসান দিচ্ছি। থ্রম্বসিস অথবা গ্যাংগ্রিন হবার সম্ভাবনা আর নেই। রোটাং পেরিয়ে লাহুলের দিকে যাবার সময় হঠাৎ সে ভয়ঙ্কর তুষারঝড়ে পড়ে যায়। রোটাং-এ ইগ্‌লুর মত যে ছোট্ট ঘরখানা রয়েছে, সেখানকার একটি লাহুলী মেয়ে ওকে টেনে নিচের পাহাড়ে নামিয়ে আনে। ভাগ্যিস একটি মিলিটারী জীপ সে সময় এসে পড়েছিল। ওরা তরুণটিকে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে।

শুনলাম রোটাং-এ নাকি গ্রীষ্ম আর শরতের শুরুতে প্রায়ই তুষারঝড় বয়।

ছেলেটি শুয়ে আছে বেডে। ও একটু আগে বলেছিল, ডাক্তার সাব, আর যা করুন দয়া

করে আমার পা-টা কেটে বাদ দেবেন না। তাহলে আর কোনদিন পাহাড়ে চড়তে পারব না!

আমাদের দেশে এমন পাহাড়-প্রেমিক ছেলে আছে জেনে দারুণ ভাল লাগছে।

আজ ওকে ইনজেকসান দিয়ে আমি কিছু সময়ের জন্য ভ্যালির দিকে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। হঠাৎ ঝড় শুরু হল। ভ্যালির ভেতর বয়ে এল একটা কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। অদ্ভুত সাদাটে একটা আলো ছড়িয়ে পড়েছে আকাশ মাটি দিক-বিদিক ছুঁয়ে। চলে আসার জন্যে আমি টাট্টুর লাগামটাও খুলে ফেলেছিলাম, কিন্তু এ দৃশ্য চোখ ভরে না দেখে এক পাও নড়তে পারলাম না।

আমি তাকিয়ে রইলাম দূর তুষার-পাহাড়ের দিকে।

হঠাৎ আমার মনে হল, আমি যেন মেরু-অভিযাত্রী ওট্‌স, ক্যাপটেন স্কটের তাঁবুতে রয়েছি। চারদিকে মৃত্যুশীতল তুষারঝড়ের হাহাকার বাজছে। আমার হাতে পায়ে তুষার-ক্ষত। আমি দ্রুত চলার শক্তি হারিয়েছি। আমাকে ফেলে ক্যাপটেন যেতে পারছে না।

সেই মুহূর্তে আমি কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে এলাম তাঁবুর বাইরে। তীব্র তুষারপ্রবাহের ভয়াবহ মৃত্যুর ভেতর নিজেকে সঁপে দিলাম। হারিয়ে যেতে যেতে আমি বলে উঠলাম, আমি চলে যাচ্ছি, হয়ত আবার কোনদিন তোমাদের ভেতর ফিরে আসব।....

চিঠির কথাটা মনে পড়তেই বললাম, অস্বাভাবিক কল্পনার একটা অসুখ আছে আমার ভেতর। পরে যখন ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করি তখন নিজেকে পাগল ছাড়া কিছু ভাবতে পারি না। তোমাকে যখন ভ্যালি থেকে ফিরে এসে সেদিন চিঠি লিখি, তখনও আমার মনকে ঐ কল্পনার ঘোর পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

ঝিন্নি বলল, বল, তুমি আর কোনদিন এমন চিঠি লিখবে না?

একটু হেসে বললাম, বেশ, তোমার কথাই মেনে চলার চেষ্টা করব।

ঝিন্নি এবার আমার একখানা হাত ওর দু'হাতের ভেতর ধরে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

বললাম, দেখ তো কত সহজে আমাদের সন্ধি হয়ে গেল।

ঝিন্নি আমার হাতখানা ওর মুখের ওপর ঢেকে শুধু খুশি খুশি চাউনি মেলে আমার দিকে চেয়ে রইল। ওকে বুকের কাছে টেনে এনে বললাম, আমার হারিয়ে যাবার এই একটিমাত্র জায়গাই তো আছে।

ঝিন্নি ওর মুখখানা ক্রমাগত আমার বুকে ঘষতে লাগল। কোন কথা বলল না।

এক সময় ও ওর বিনুনী খুলতে শুরু করল। কিছু পরে কি ভেবে আবার খসানো বিনুনী বেঁধে ফেলল।

বললাম, কি হল? চুল নিয়ে হঠাৎ খেলা শুরু করলে?

ও বলল, আর কিছু পরেই তো তোমার সঙ্গে নিচে নামব, তখন খোলা চুল বেঁধে তুলতে অনেক সময় লাগবে। ভেবে দেখলাম, চুল বেঁধে সময় নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নেই।

বললাম, কি করে এখানে এলাম জান ঝিন্নি?

ও অমনি আমার মুখে ওর নরম আঙুলগুলো চেপে ধরে বলল, দোহাই তোমার ছোটেসাহেব, কৃপণের ধনের মত আমার একটুখানি সময় আজ আর কেড়ে নিও না। চিঠিতে সব ঘটনা অনেক বড় করে জানিও, শুধু এই ক'টা মুহূর্ত তোমাকে একটু দেখতে দাও।

ওকে আমার বুকের ভেতর টেনে নিয়ে বললাম, তুমি আমার এই বুকের পাঁজরের ওপর কান পেতে শোন তো ঝিন্নি, কোন শব্দ শুনতে পাও কিনা?

ও কান পাতল। তারপর বলল, তুমি দারুণ লোভী আছ ছোটেসাহেব। খালি তোমার বুক বলছে, দাও দাও দাও দাও।

প্রবল আকর্ষণে ঝিন্নি সেই মুহূর্তে আমার বুকের খাঁচায় একটা ভীরু পাখি হয়ে গেল।

বালু বাড়িতে কিছু কাজ করে দিচ্ছে আমার। কম্পাউণ্ডার ওষুধ তৈরির কাজে ব্যস্ত থাকলে বালু সকালে রোগীর ভীড় ঠেকায়। আমার নির্দেশমত লাইনে দাঁড় করিয়ে পর পর স্লিপ ধরে রোগীদের ডাক দিয়ে আনে আমার কাছে।

এতদিন এ কাজ কম্পাউণ্ডার একাই করত ওষুধ তৈরির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এখন রোগীর ভীড় বেড়েছে তাই বালুর দরকারটা বেশ বুঝতে পারি।

ও বেচারা প্রতিদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে কাজের ধান্দায়। কোথাও কাজ জুটলে ভালো, নয়তো বনে বনে ঘুরে লক্‌ড়ি এক বোঝা পিঠে বেঁধে নিয়ে চলল।

আজকাল আমার কাছে ও প্রায়ই আসে। কাজে যাবার আগে ভোরবেলা একবার হাজিরা দেয় আমার ডিসপেনসারিতে। কোন কথা বলে না ও। আমার রোগী দেখার ঘরে টেবিলের ওপর ফুল রাখার অভ্যেস! বালু ওটা জেনে ফেলেছে। ও দু'একদিন বাদে বাদে ফুলপাতা নিয়ে এসে ফ্লাওয়ার ভাসটা সাজিয়ে দিয়ে যায়। কোথা থেকে যে ও ফুল আনে তা আমি জানি না, তবে আমার বাগানের ফুল তুলে বালুকে কোনদিন ফুলদানি সাজাতে দেখি নি।

আমি ওপরের বারান্দায় বসে আকাশ পৃথিবী জুড়ে ভোরের আয়োজন দেখি। দূরের পাহাড়ের মাথায় যেখানে সিডার বন গহন ঘন হয়ে আছে, তার আড়ালে সিঁদুরের টিপের মত টকটকে লাল সূর্যটা উঁকি দেয়। আমি দেখি বন আর পাহাড়ের মাথায় জমে থাকা দু'এক টুকরো মেঘ হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠছে। আকাশের যেখানে যেখানে মেঘ সেখানে আবির ছড়িয়ে পড়ছে।

বাঁ দিকে নীল আকাশে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পীরপাঞ্জালের তুষারচূড়ো। ভ্যালিতে কুয়াশার চাদর বিছানো। পীরপাঞ্জালের শৈলশিখরে কখন শুরু হয়ে যায় রঙের খেলা! গোলাপী আভা ধীরে ধীরে সোনালী হয়ে ওঠে।

কোন কোনদিন দোয়েলের ঝাঁক তীরের ফলার মত শৈলসম্রাটকে গার্ড অব অনার দিতে দিতে উড়ে যায়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাতের ঠাণ্ডায় ভ্যালিতে জমে যাওয়া মেঘগুলো রোদ্দুরে গা সেঁকার জন্যে ওপরের দিকে উঠতে থাকে।

এবার আমার নিচে নামার পালা। দু'একটি করে রোগী জমতে শুরু করেছে ততক্ষণে।

বালু বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে, কোন কথা বলে না। কোনদিন হয়তো ভাগ্‌তুর সঙ্গে ছোটখাট বিষয় নিয়ে আলোচনা চালাতে থাকে, তাও নিচু গলায়।

আমি নিচে নামি। ও আমার জুতোর আওয়াজ পেলেই বাগানের ছড়ানো মোরামগুলোর ওপর চোখের দৃষ্টি নামায়। আমি ডিসপেনসারির দাওয়া থেকে যদি বলি, আজ তোমার কাজে গিয়ে কাজ নেই বালু, ও অমনি বাকী ইঙ্গিতটুকু বুঝে নেয়। রোগীদের নামগুলো পর পর স্লিপে লিখতে থাকে। ওর খুশি খুশি ভাবটা তখন আমি ওর স্বচ্ছন্দ চলার ভেতর থেকে ধরতে পারি।

ডেলিভারী কল এলে বালু সারাদিন ব্যস্ত থাকে আমার কাজে। আমি যাই টাট্টুতে চড়ে, বালু আগেভাগে আমার ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে চলে যায় পেশেন্টের বাড়ি। পথের লোক, আশপাশের দু'পাঁচখানা টিকার লোক আমাদের চিনে ফেলেছে। বালুকে ব্যাগ হাতে যেতে দেখলেই ওরা জানে এবার টাট্টুতে চড়ে ডাক্তার আসছে। বালুর সঙ্গে আমার অ্যাসোসিয়েশনটা যেন লোকের মনে গাঁথা হয়ে গেছে।

কাজ শিখে ফেলেছে বালু। ও সরল কিন্তু নির্বোধ নয়। বলার চেয়ে চুপচাপ সব শুনে যেতেই ওর আগ্রহ বেশি। তারপর নিখুঁত দক্ষতায় ওর ওপর দেওয়া কাজটুকু করে দিয়েই ও খুশি।

কোন কোনদিন আমাদের দূর টিকা থেকে ফিরে আসতে রাত হয়ে যায়। সেরকম সম্ভাবনা থাকলে টাট্টু নিয়ে বেরোই না। চাঁদের আলোয় অথবা টর্চ জ্বেলে বালু আমাকে পথ দেখিয়ে আনে। যত রাতই হোক আমাকে বাংলোতে পৌঁছে দিয়ে বালু ভ্যালি পেরিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। আমি কোন কোনদিন ওকে এগিয়ে দিয়ে আসার প্রস্তাব তুললে ও দ্রুত মাথা নেড়ে আমাকে বারণ করে।

অনেক সময় বাধা না শুনে আমি এগোই ওর সঙ্গে। গল্প করতে করতে কখন ওর ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। বালু উঠতে থাকে পাহাড়ের ওপর। আমি নিচে থেকে দেখি। একটি নিঃসঙ্গ ছায়ামূর্তি ভাঙাচোরা উঁচুনিচু পাহাড়ী পথ বেয়ে চলতে থাকে! সারাদিনের শ্রান্তির পর সামান্য আহার আর বিশ্রামের জন্যে ঘরে ফেরা। তারপর ভোর না হতেই কাজের সন্ধানে আবার পথ চলা।

পণ্ডিতজীর জন্যে হয়ত শেষরাতে খাবার তৈরি করে রেখে দেয় বালু। কাজে বেরোবার আগে ঘোরাল থেকে গরুটিকে বাইরে এনে বেঁধে খাবার আর জল দিয়ে যায় সে। দুপুরে একবার ফিরে আসে। পিতাজীকে খেতে দেয়, পরিচর্যা করে। সংসারের দুচারটে কাজ করে আবার বেরিয়ে পড়ে।

ফিরে আসতে আসতে ভাবি, কতদিন এমন করে কাটাবে বালু। একদিন হয়ত দেখবে, বুড়ো পিতাজীর সেবা করতে করতে তার জীবনের অনেকগুলো বসন্ত-দিন কখন নিঃশব্দে

পার হয়ে গেছে। তখন কোন প্রিয়জনকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতে গেলেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠে আসবে তার বুক ঠেলে।

কোনদিন ফিরে চলার পথে হঠাৎ পেছনে তাকালে দেখতে পাই, বালু চাঁদের আলোয় উঠোনের সামনে ফসল রাখা পেরুর গায়ে হেলান দিয়ে তাকিয়ে আছে আমারই দিকে। মনে মনে কষ্ট হয়। জীবনের এ সময়টিতে কাউকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাটাই তো স্বাভাবিক। কি পাব আর কি পাব না, তার হিসাব কষে মানুষ কোনদিনই ফাল্গুনদিনের স্বপ্ন দেখে না। বালু হয়ত মনে মনে কোন অতিথি-সমাগমের স্বপ্ন দেখে।

নির্জন পথে দিনের পর দিন চলতে চলতে বালু একসময় আমার মনের কাছে সরে এল। এখন ওকে আর অনেক দূরের মানুষ মনে হয় না। আমরা টুকরো টুকরো কথা বলে নির্জন পথ চলার ভারটুকুকে লঘু করে তুলি।

এক সন্ধ্যায় ভ্যালি পেরিয়ে ওর বাড়ির পথে যাচ্ছিলাম। আমি ঘোড়ার ওপর, বালু ঘোড়ার লাগাম ধরে আগে আগে চলেছে। চাঁদ উঠেছে পাইন গাছের মাথায়। ভরা চাঁদের রাত দেখে টাট্টুটাকে এনেছি সঙ্গে। ফেরার পথে একা যখন ভ্যালি পেরিয়ে যাব, তখন এই অতি বাধ্য জীবটিই আমাকে বহন করে নিয়ে যাবে। আমি চোখ বুজে থাকলেও ও আমাকে অতি বিশ্বস্ত পদচারণে পৌঁছে দেবে আমার বাংলোতে। আমার পথ-পরিক্রমার মানচিত্রখানা ওর যেন মুখস্থ।

আমি বালুর পাশে পাশে হেঁটে যেতেই চেয়েছিলাম, কিন্তু বালু কোন কথা শোনে নি। আমাকে প্রায় জোর করেই টাট্টুর ওপর উঠিয়েছে। আমি টাট্টুতে না উঠলে সে একটি পাও আর নাড়বে না। এই হুঁশিয়ারীকে মান্য করেই আমি টাট্টুতে উঠেছি। বালু নিজের হাতে লাগাম ধরে ভ্যালির সমতলটুকু যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেছে। সারাদিনের ক্লান্তির পর সে যেন মেতে উঠেছে খুশির খেলায়।

এক জায়গায় এসে টাট্টু থেকে নেমে পড়লাম। চড়াইতে লাগাম ধরতে হবে। নেমেই বললাম, বালু এস আমরা এখানটায় বসে একটু গল্প করি।

বালু টাট্টুর লাগাম ছেড়ে দিল। বাধ্য সেবকের মত জীবটি দাঁড়িয়ে রইল একটু দূরে। আমরা একখণ্ড পাথরের ওপর বসে পড়লাম।

বালু হাঁটুতে থুত্নি গুঁজে বসে আস্তে আস্তে শরীরটাকে দোলাচ্ছিল।

বললাম, তুমি এ পাহাড়ী দেশে বিয়ের অনুষ্ঠান দেখেছ নিশ্চয়ই?

বালুর হাল্কা দুলুনিটা থেমে গেল। ও হাঁটুর ওপরে রাখা মুখখানা কাৎ করে আমার দিকে চেয়ে বলল, অনেক।

বললাম, বিয়ের ভেতর তো অনেক অনুষ্ঠান থাকে, কোনটি তোমাকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দেয় বালু?

ও তার হাঁটুতে তেমনি মুখ গুঁজে বসে রইল। সোজা হয়ে বসে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কি বলবে তাই বোধহয় ভাবতে লাগল। এক সময় বলল, বর আসবে, তাই সবাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বর আসছে অনেক দূরের থেকে।

এই সময়টা বাবুজী আমার খুব ভাল লাগে। তারপর বর কাছে এলেই সবাই যখন তাকে ঘরের ভেতর ডেকে নেয় তখন মনে হয় সে মানুষটি যেন বাড়ির সকলের অনেক অনেক দিনের চেনা। এ ব্যাপারটাও বাবুজী আমার কাছে বড় অদ্ভুত লাগে।

হেসে বললাম, এ সবই তো বিয়ের ব্যাপার দেখছি।

বালু বলল, তাহলে শেষের কথা শোনাই। সে বড় দুঃখের বাবুজী। মেয়ে কোঠী ছেড়ে চলে যাচ্ছে এতদিনের সব খেলাধুলো ফেলে। 'বেটী কি বিদাই' শুরু হয়ে গেল। সবার চোখে তখন আঁসু নেমেছে।

বললাম, কি রকম সে অনুষ্ঠান বালু?

ও বলল, মেয়ে তার পিতাজীর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, তোমার ঘরের ভেতর আমার পুতুল ছেড়ে যাচ্ছি।

তেরেয়াঁ মহলাঁ দে অন্দর জী
বাবা মরিয়াঁ গুড়িয়াঁ রহিয়াঁ।

পিতাজী তখন মেয়েকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলেন, তুমি বাড়ি যাও মা, আমি তোমার পুতুলগুলো তোমার নতুন ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসব।

তেরিয়াঁ গুড়িয়াঁ দিংগে পজাঈ
ধীয়ে ঘর জা আপনে।

বললাম, বালু তোমার যখন বিয়ে হবে তখন তোমার পিতাজীকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হবে, তাই না?

ও প্রথমে কোন কথা বলতে পারল না। তারপর এক সময় বলল, বাবুজী, আপনি ডাক্তার, আপনি তো সবই জানেন। পিতাজীকে ছেড়ে কোন জায়গায় যাওয়া আমার পক্ষে কি আর সম্ভব?

কথাটা বলেই ও আবার ওর মুখখানা হাঁটুর ওপর রেখে অন্যদিকে চেয়ে রইল। আমি ওর কথার কোন জবাব দিতে পারলাম না। সহজ লঘু ছন্দে শুরু করেছিলাম কথা কিন্তু কথাটা যে এমন একটা নির্মম সত্যের মুখোমুখি আমাদের দাঁড় করিয়ে দেবে তা ভাবতে পারি নি।

একটি মেয়ে তার অসহায় বাবাকে ছেড়ে চলে যেতে পারছে না, অথচ তার যৌবন স্বামীপ্রার্থনায় কুঁড়ির ভেতর অবরুদ্ধ গন্ধের মত গুমরে গুমরে কাঁদছে, এ ছবি আমাকে বিহ্বল করে তুলল।

এক সময় বললাম, বালু জীবন কখনো সাজানো ছকে ঘর গুনে গুনে চলে না। কোথা দিয়ে কখন কি ঘটে যায় তা কে বলতে পারে। তুমি যা ভেবেছ বা আর কেউ যা ভাবছে, তার সবকিছুকে ভণ্ডুল করে দিয়ে ঐ ওপরওয়ালার ভাবনাই কাজ করে যায়।

বালু আমার দিকে হঠাৎ ওর মুখখানা ফিরিয়ে উদাস চোখে চেয়ে রইল।

আমি পরিস্থিতিটাকে লঘু করে দেবার জন্যে বললাম, দেখি তোমার হাতখানা, বালু।

ও হাঁটু থেকে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসল। আমার দিকে নিঃসংকোচে ওর হাতখানা বাড়িয়ে দিল। আমি ওর হাত ধরেই বুঝলাম, বালু উত্তেজনায় কাঁপছে।

আমি ওর হাতের পাতাখানা আমার হাতের ওপর রেখে চাঁদের আলোয় রেখাগুলো পড়তে লাগলাম। খুব বিজ্ঞের মত অনেকক্ষণ এদিকওদিক মাথা নাড়তে নাড়তে বললাম, হুঁ।

পৃথিবীতে যে ব্যাপারগুলো মানুষের কৌতূহল সবচেয়ে বেশি জাগিয়ে তোলে, তার ভেতর হাতদেখা অদ্বিতীয়। এ ব্যাপারে নারীপুরুষের আগ্রহে কোন ভেদ নেই। তবু আমার কেন যেন মনে হয়, মেয়েদের আগ্রহ এ ব্যাপারে সীমাহীন।

বালু এতক্ষণে একেবারে ঘুরে বসেছে আমার দিকে। আমি হুঁ বলতেই ও ওর বড় বড় চোখের পরিপূর্ণ চাউনি মেলে ধরল আমার মুখের ওপর।

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললাম, কোন সময় একটা বড় রকমের অসুখে পড়েছিলে বালু?

হাঁ বাবুজী।

দেখলাম, বালুর গলা উত্তেজনায় কাঁপছে। আমি যে একজন সত্যিকারের হাত দেখনেওয়ালা তাতে তার মনে কোন সংশয় নেই।

বললাম, তোমার হাতের রেখা তাই বলছে বালু। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই তুমি কোন কঠিন অসুখে ভুগেছিলে।

আপনি ঠিকই ধরেছেন বাবুজী। কি একটা অসুখে ভুগতে ভুগতে আমি প্রায় মরতে বসেছিলাম। এক আঙ্‌রেজ ডাক্তার ছিলেন তখন, তাঁর চিকিৎসায় ভাল হয়ে যাই।

বালুর ছেলেবেলার অসুখের ব্যাপারটা আমি কথায় কথায় একদিন পণ্ডিতজীর মুখ থেকেই শুনেছিলাম। আজ ওটা দিয়ে আমার হাতদেখা বিদ্যেতে পাসমার্ক পেয়ে গেলাম।

আমার দ্বিতীয় কথা আর বালুর অতীতকে নিয়ে নয়, কারণ সেখানে আর কোন পুঁজি নেই আমার। এখন ওর বর্তমানকে নিয়ে বিজ্ঞের মত একটা চাল চেলে বসলাম।

বললাম, বালু, দারুণ একটা অশান্তি আজকাল মাঝে মাঝে তোমার মনটাকে বড় চঞ্চল করে তোলে, তাই না? তার থেকে তুমি বেরিয়ে আসার জন্যে খুবই চেষ্টা কর, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন পথই খুঁজে পাও না।

বালু মাথা নেড়ে বলল, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি বাবুজী আপনার কথা শুনে। আমার মনটা একেবারে আয়না ধরে আপনি দেখে নিয়েছেন।

মেয়েটির যৌবনের পাখিটা রঙীন পাখা মেলে উড়ছে। কোন উত্তপ্ত নীড় থেকে হয়ত তার কাছে আসে আভাসে ইঙ্গিতে আমন্ত্রণ। তার সারা দেহমন সে ডাকে সাড়া দেবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। কিন্তু একটা কঠিন কর্তব্যের সুতো ঘুড়ির মত তার সব ইচ্ছাকে টেনে টেনে নামিয়ে আনে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতর।

বালুর মত তরুণী-মনের অবদমিত ইচ্ছার কথাটা আমার অজানা নয়, তাই ওর বর্তমান নিয়ে ঐ ধরনের একটা মন্তব্য করা আমার পক্ষে কোন ভাবনার ব্যাপারই ছিল না। কিন্তু

বালু! কি সহজ আর গভীর বিশ্বাসে এই মিথ্যাচারী মানুষটার সব কথা নির্ভেজাল সত্য বলে মেনে নিচ্ছে।

এবার ওর ভবিষ্যতের ওপর কিছু বলতে হবে। আমি বালুর ভবিষ্যৎ ভাগ্যের ওপরই কিছু মন্তব্য করতে চেয়েছিলাম। আর তাই ওর বিশ্বাসটাকে পাকা করে নেবার জন্যে অতীত আর বর্তমানের অবতারণা করেছিলাম।

বললাম, বালু, আশ্চর্য তোমার হাতের রেখা। তুমি খুব সুখী হবে একদিন। এখন যত কষ্ট, তখন তত সুখ। চাঁদের আলোতেও তোমার হাতের ভাগ্যরেখাটা তামার তারের মত জ্বলজ্বল করছে।

বালু হঠাৎ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। অমনি আমার মনে হল, তউন্দির দিনে কুলুর পাহাড়ঘেরা তপ্ত ভ্যালিতে হঠাৎ এক একটা হাওয়া কোথা দিয়ে ঢুকে পড়ে। তারপর সেই হাওয়া স্তব্ধ পাইনের পাতা কাঁপিয়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেতে খেতে আবার কোথায় চলে যায়। ক্ষীণ আশার একটা আভাস জাগিয়ে গভীর নিরাশার ভেতর ফেলে দিয়ে যায়।

বালুর দীর্ঘশ্বাসে সেই নিরাশার সুর বেজে উঠল দেখে বললাম, নিজের ওপর বিশ্বাস রেখো বালু। সব হতাশার মেঘ একদিন তোমার বুকের ওপর থেকে কোথায় উড়ে চলে যাবে, তুমি জানতেও পারবে না। আমার কথা মিথ্যে হবে না বালু।

শেষের বাক্যটা আমার মন যেন একটা সত্যের বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করল। আমি বুঝতে পারলাম না, এতক্ষণ মিথ্যার অভিনয় করতে গিয়ে কেন হঠাৎ একটুখানি সত্যের জন্য আমার সমস্ত প্রাণ এমন প্রার্থনার মত বেজে উঠল।

বালু কিন্তু আমার হাত থেকে ওর হাতখানা তুলে নিয়ে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলেছে।

আমি বললাম, কান্নার এতে কি আছে বালু। আমি এ বয়সে যতটুকু দেখেছি, সেই অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, ভাগ্য দীর্ঘদিন কাউকে দুঃখে বা সুখে ফেলে রাখে না।

কিছুক্ষণ পরে আবেগটুকু উপছে পড়ে মনটা যখন স্থির হয়ে এল, তখন জ্যোৎস্নার মত নরম গলায় বালু বলল, বাবুজী, সুখ যদি আসে সে আমার ভাগ্য। তবে সেই দুরাশার ছবি কোনদিনও আমি দেখি না।

আমি বললাম, তুমি যেমন সহজ তেমনি সুন্দর। তাই তোমার চারদিকে বিপদ ওৎ পেতে থাকবে বালু। কিন্তু তুমি তোমার নিজের শক্তিতেই সব বিপদ-আপদের বেড়া ভেঙে বেরিয়ে আসবে।

বালু এ কথার কোন জবাব দিল না। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বুঝলাম, আমার এ ধারণা কত ভুল। একটি মেয়ের সরলতা আর সৌন্দর্য তার কতবড় শত্রু হতে পারে, সে প্রমাণ পেয়ে শিউরে উঠেছিলাম। কস্তুরী হরিণীর মত সে সহজেই শিকার হয়ে পড়ে যে কোন সুচতুর লোলুপ ব্যাধের।

বাহাদুর ভাগ্‌তু একা গিয়েছিল নাগ্‌গরে। ক'দিন কাটিয়ে ফিরে এল। এবার একা নয়, সঙ্গে এলো যে তাকে সন্ধ্যার আবছায়ায় চিনতে পারিনি। সে আপেল গাছের ডালভরা সবুজ ফল আর পাতার তলায় সন্ধ্যার ধূসর আলোয়ানখানা গায়ে জড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইদানীং ডেলিভারী কেসগুলোতে ডাক পড়ছে প্রায়ই। প্রথম প্রথম কিছু কিছু সঙ্কোচ আর সংস্কার ছিল পাহাড়ীদের মনে। এখন বালু সঙ্গে থাকায় সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে আর সময় লাগছে না। তাছাড়া অনিবার্য প্রয়োজন মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার সংস্কারের ঢাকাখানা সরিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়।

আমি বাংলোর পাশ দিয়ে যখন বালুকে এগিয়ে দিতে ভ্যালির দিকে যাচ্ছিলাম তখন আকাশে শেষ আলোর যাই যাই ভাব। বালু আমার টাট্টুর লাগাম ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলেছিল। আমরা কিছু পথ একসঙ্গে গিয়ে আবার বিচ্ছিন্ন হলাম। বালুর হাতে দিলাম আমার টর্চ। ও ভ্যালিতে নেমে গেল, আমি বাঁধান রাস্তা ধরে ফিরে এলাম টাট্টুতে চড়ে।

বাংলোর সামনে টাট্টু থেকে নেমেই যে ছায়ামূর্তি দেখলাম তাকে ঘন সন্ধ্যার আলোয় চেনা সম্ভব ছিল না। সে যে আমার রাঁধুনী মুন্‌নী নয় তা আমি জানতাম। কারণ মুন্‌নী কোথাও দাঁড়িয়ে থাকার মেয়ে নয়। সে স্বভাবে ক্ষিপ্র। দ্রুত কাজ সেরে সরে যায়। একটি পলকও সে কাজের বাইরে তাকিয়ে অকারণে খরচ করে না।

তবে মেয়েটি কে! কোন কথা বলছে না সে। মনে হল আমার দিকেই চেয়ে আছে! আমিও কোন কথা না বলে টাট্টুটাকে টেনে নিয়ে এসে বেঁধে রাখলাম যথাস্থানে।

সামনে এসে দাঁড়াল ভাগ্‌তু। মিঠি মিঠি হাসছে।

বললাম, তুই কখন এলি?

আমার গলার স্বরে আনন্দের উত্তেজনাটুকু চেপে রাখা গেল না। ভাগ্‌তুর উপস্থিতির ভেতর তখন নতুন একটা জগতের ছবি দেখছিলাম আমি।

ভাগ্‌তু বলল, এসেছি সেই দুপুরবেলা। তখন সবে আপনি রোগী দেখতে বেরিয়ে গেছেন।

তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ঢুকে পড়লাম। সারা দুপুরের ক্লান্তির পর আমি একটু বিশুদ্ধ ঝরঝরে হতে চাই। তারপর ভাগ্‌তুকে পাশে বসিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেব আমার ঝিন্নির কথা।

স্নান সেরে পোশাক বদলে বেরিয়ে আসতেই ভাগ্‌তুর মুখোমুখি হলাম।

ভাগ্‌তু বলল, খাবার ঘরে যান, আপনার চা দেওয়া হয়েছে।

ঢুকে পড়লাম ডাইনিং রুমে। টেবিলের ওপর একটা প্লেটে কিছু ডালমুট, দুখানা ক্রিমক্যাকার বিস্কুট। মুখ নিচু করে কাপে চা ঢালছে ঝিন্নি।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম, ঝিন্নি তুমি!

ও মুখ তুলে শান্ত গলায় বলল, এসো, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, কিছু খেয়ে নাও।

আমি পলকে ঝিন্নির পাশে গিয়ে ওকে প্রায় জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছিলাম, ঝিন্নি একটু তফাতে সরে গিয়ে বলল, আঃ কি হচ্ছে, ভাগ্‌তু বাইরে দাঁড়িয়ে না?

চেঁচিয়ে ডাকলাম, ভাগ্‌তু।

ভাগ্‌তু কাছেই ছিল, এসে দাঁড়াল। বললাম, দিদি এসেছে মেঠাই আনিসনি বোকারাম। বুদ্ধি খরচ করে এটুকু তো করতে হয়। যা এখুনি বাজার থেকে নিয়ে আয়।

আমি এই মুহূর্তে ভাগ্‌তুটাকে ঘর থেকে ভাগাতে চাইছি।

কিন্তু এবারও বাদ সাধল ঝিন্নি। বলল, কোন দরকার নেই ওর বাজারে গিয়ে। আমি মেঠাই এনেছি।

ঝিন্নি ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে একটা কৌটো এনে রাখল খাবার টেবিলে। কৌটো খুলে একটা লাড্ডু বের করে আমার প্লেটে রেখে বলল, নাও খাও।

দমে গেলাম। আমি যেন সত্যি লাড্ডু খেতে চাইছি।

বেশ খানিকটা অভিমান নিয়ে ডালমুট চিবুতে চিবুতে আমি চা খাচ্ছিলাম। পাশের একটা চেয়ারে বসে ঝিন্নি তার চায়ের কাপ ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছিল। কোন কথা হচ্ছিল না আমাদের ভেতর। এখন আমি প্রতি মুহূর্তে ঝিন্নির মুখ থেকে কিছু শোনার জন্যে কান পেতে ছিলাম।

ঝিন্নি কথা বলল, আর কিছু দেব?

সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথার উত্তর নিজেই তৈরি করে নিয়ে বলল, এখন বেশি কিছু খেলে তো আবার রাতের খাবার খেতে চাইবে না। তার চেয়ে থাক।

বললাম, আমি যখন বাংলোতে ঢুকি তখন তুমিই কি বাগানের আবছায়ায় দাঁড়িয়েছিলে ঝিন্নি?

ঝিন্নি সঙ্গে সঙ্গে বলল, সে অন্য কোন মেয়ে।

বললাম, কে সে ঝিন্নি?

ও বলল, কি দরকার তার খবর জেনে? তাব খোঁজ নেবার দরকার থাকলে বাংলোতে ঢোকার মুখেই জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে পারতে।

বললাম, ক্ষমা চাইছি ঝিন্নি। আমি অন্ধকারে তোমাকে চিনতে পারিনি।

ঝিন্নি অমনি বলল, বললাম তো আমি নই।

এখন আমার কোন সন্দেহই রইল না যে আপেল গাছটার তলায় সন্ধ্যার আবছায়ায় ঝিন্নিই দাঁড়িয়েছিল। ওকে কোন প্রশ্ন করিনি তখন তাই তীব্র একটা অভিমানে ও নিজেকে কঠিন করে তুলেছে।

আমি চা খাওয়া শেষ করে শুধু বললাম, তুমি আজ তোমার ঘরে এসেছ ঝিন্নি, কারো ডাকের অপেক্ষা রাখনি। তাই বলছি, এ ঘরের সুবিধে অসুবিধে সুখ দুঃখ সবই তোমার।

ঝিন্নি কোন কথা বলল না। কেবল দু-একবার আমার দিকে চোখের কোণে তাকাল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ওর চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় বললাম, আমার আজ উৎসবের রাত ঝিন্নি, তুমি সেই উৎসবের দীপ জ্বালাবে মানালীর বাংলোতে।

কথাটা বলে আমি চলে এলাম আমার বসার ঘরে।

ঝিন্নি একটু পরেই আমার পাশ দিয়ে চলে গেল আমার শোবার ঘরের দিকে।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল, ঝিন্নির আর দেখা নেই।

আমি পায়ে পায়ে শোবার ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়ালাম। আধভেজানো দরজার

ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখলাম, আমার বিছানায় সুন্দর কাজকরা একটি বেডকভার পাতা রয়েছে। বুঝলাম, ঝিন্নির হাত পড়েছে বিছানায়।

ঝিন্নি কিন্তু ওখানে নেই। আমি আস্তে দরজা ঠেলে ঢুকলাম। ঘরের এক কোণে টিপয়ের ওপর রাখা ফুলদানির ফুলগুলো একমনে দেখছে ঝিন্নি।

বললাম, অগোছালো ঘরখানার চেহারা একদম পাল্টে ফেলেছ দেখছি।

ঝিন্নি এবার আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল। আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল, ফুলদানির এ ফুলগুলো কোথায় পেলে? আমাদের বাগানে তো নেই।

বললাম, বালু কোথা থেকে এনে সাজিয়ে রেখে গেছে।

ঝিন্নি ওখান থেকেই বলল, বালু কে ?

বললাম, ভ্যালির ওপারে এক পণ্ডিতজী থাকেন, তাঁরই মেয়ে। বড় অসহায় তাই ডাক্তারখানার কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।

ঝিন্নি পায়ে পায়ে সরে এল আমার পাশে। আমার মুখের ওপর ওর স্থির দুটো চোখের দৃষ্টি ফেলে বলল, তুমি তো কোনদিন বালুর কথা আমাকে জানাও নি।

ঝিন্নির গলার স্বরে কি ছিল আমি জানি না, ঠিক সেই মুহূর্তটিতে আমি কেমন যেন অসহায় বোধ করতে লাগলাম। যাকে ভালবাসা যায় তার কাছ থেকে বুঝি কোন কিছু গোপন করে রাখতে নেই। এই সত্যটা এতদিন মনে জাগে নি বলে দারুণ একটা ক্ষোভ জন্মাল নিজের ওপর। আমি সহজভাবেই বালুর অসহায় অবস্থার কিছুটা সমাধান করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা যে আর একজনকে জানানো দরকার তা আমি কোনদিন ভাবিনি। ঝিন্নির কাছে তাই বালুর প্রসঙ্গ অনুক্তই থেকে গেছে।

ঝিন্নির কথার উত্তর দিতে গিয়ে বললাম, তোমাকে বালুর কথা না জানিয়ে খুব অন্যায় করে ফেলেছি ঝিন্নি। আমি ভাবতেও পারি নি যে এমন একটা তুচ্ছ ঘটনা তোমাকে জানানো আমার উচিত ছিল।

ঝিন্নি বলল, তুচ্ছ ঘটনা বলছ কেন। তোমার আমার ভেতর ছোটবড় বলে তো কিছু থাকতে পারে না। দুজনে আমরা দুজনের কাছে সব কথা খুলে বলব, তা যত তুচ্ছই হোক না কেন।

বললাম, ভুল যদি হয়ে থাকে তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ঝিন্নি।

হয়ত আমার গলার স্বরে একটা অভিমান বেজে উঠে থাকবে, ঝিন্নি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সুইচটা অফ করে দিলে। আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় আমার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম! সেই মুহূর্তে কোন কথা বলে মিথ্যে ওর কান্না থামাতে চেষ্টা করলাম না।

একটা সন্দেহের কীট সূক্ষ্ম কোন ছিদ্র-পথে ঢুকে পড়েছে ঝিন্নির মনের মধ্যে। সে কীট ইতিমধ্যেই তার ধ্বংসের কাজ শুরু করে দিয়েছে। বিশ্বাসের বাতাসে ভরা বুকখানাকে সে কুরে কুরে ঝাঁঝরা করে চলেছে।

আমার কেন জানি না মনে হল দুটি সূত্র থেকে বালুর খবর পেয়েছে ঝিন্নি। ভাগ্‌তু যখন নাগ্‌গরে ছিল তখন কৌতূহলী ঝিন্নি আমার প্রতিদিনের কাজকর্মের হিসেব নিয়েছে ভাগ্‌তুর কাছ থেকে। আর এটাই তো তার দিক থেকে স্বাভাবিক। সরল ভাগ্‌তুর মুখে সহজেই এসে পড়েছে বালুর নাম আর তার প্রতিদিনের ক্রিয়াকর্মের কথা। আমার সঙ্গে কাজের ভেতর দিয়ে তার সংযোগ। ডাক্তারীর ব্যাপারে আমাদের দিনেরাতে একই সঙ্গে বাইরে ঘোরাফেরা।

এই ব্যাপারই ঝিন্নিকে টেনে এনেছে নাগ্‌গর থেকে মানালীর বাংলোতে। এখানে এসে মনে হয় সে দেখেছে বেলাশেষের পথ ধরে বাংলোর পাশ দিয়ে আমাকে আর বালুকে এগিয়ে যেতে।

ঝিন্নিকে বুকে ধরে রেখে বললাম, এক বুকে দুজনের কি করে জায়গা হয় ঝিন্নি?

ও সঙ্গে সঙ্গে আরও জল ঝরাল আমার বুকে। কেঁদে কেঁদে একসময় কিছুটা শান্ত হল। আমি বুঝতে পারলাম দারুণ একটা ব্যথা ও বুকে বয়ে এনেছিল নাগ্‌গর থেকে।

আমি ওর হাত ধরে টেনে এনে বসালাম বিছানার ওপর। বললাম, আসা অব্দি আমার ঝিন্নির মুখখানা ভাল করে দেখতে পাইনি, আমাকে একটু দেখতে দাও।

বলতে বলতে আমি উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে সুইচটা অন করে দিলাম। অমনি ঝিন্নি হাতের পাতায় মুখ ঢেকে ফেলেছে।

ঘরের উত্তর দিকের জানালাটা কেবল খোলা। ওদিকে প্রসারিত ভ্যালি আর তার ঠিক পরেই পাহাড়ের বুকে পাইন সিডারের অরণ্য। সবার পেছনে ঝকঝকে তুষার পাহাড়।

চাঁদ ওঠেনি এখনও। আমি ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঝিন্নির দিকে তাকালাম। ওর মুখখানা ঢাকা। আমি শুধু ওর আলোয় ভাসা আঙুলগুলো দেখতে পেলাম। বালুর সঙ্গে ওর আঙুলের তফাতটা চোখে পড়ে। ঝিন্নি শিল্পী আর বালু কর্মী। সারাদিন কাজের চাকায় ঘুরছে বালুর দুখানা হাত। কিছুটা শক্তির রুক্ষতা সে হাতের আঙুলে। আর ঝিন্নি সব কাজের ভেতর থেকেও শিল্পীর হাতের সুষমাটুকু বাঁচিয়ে চলেছে।

ওর হাতের আংটিতে বড় একটা হলুদ পাথর। আলো পড়ে ভারী কোমল একটা আভা ছড়াচ্ছে। ওর নিটোল কনকচাঁপা রঙের আঙুলগুলো ঠিক যেন জাফরীর মত ঢেকে রেখেছে অন্দরমহলের রহস্য।

আমি ওর কাছে গিয়ে বললাম, তোমার সুন্দর আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে আশ্চর্য লাগছে মুখখানা। ঠিক যেন রহস্যজড়ানো কারুকার্য।

ঝিন্নি আঙুলের ফাঁকগুলো সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় করে ফেলল আর অমনি ওর মুখের কারুকার্যগুলো ঢাকা পড়ে গেল।

ওর পাশে বসে ওকে আমার বুকের ভেতর টেনে নিলাম। ও সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ওপর ওর দু-হাতের আঙুলে দুটো চাঁপাফুল ফুটিয়ে তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখল মুখখানা।

আমি আর ওর মুখ দেখতে চাইলাম না। ওর বাদামী চুলে ভরা মাথার ওপর আমার থুতনিটা আলতো করে চেপে ধরে চুপচাপ ওকে অনুভব করতে লাগলাম।

খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে ভাগ্‌তু বাগান পেরিয়ে চলে গেল বাইরের ঘরে শুতে। আমি শোবার ঘরে আসার পথে দেখলাম, রসুইখানার পাশে আব্‌রীতে আর একখানা বিছানা পাতা। থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, ঝিন্নি কি তাহলে এখানে শোবার আয়োজন করেছে!

ঝিন্নি নিচে গেছে ভাগ্‌তুর সঙ্গে। চাঁদটা কোথায় যেন গাছের ডালে পাতায় আটকে আছে, আর আলো এসে পড়েছে বাগানে। আমি শোবার ঘরে গিয়ে বসলাম। ভ্যালিটা চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছে পাতলা দুধে ভরা। ভ্যালির উত্তরের পাহাড়ের ছবি স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি তখনও। তবে তার ওপারে পীরপাঞ্জালের চূড়োর সাদা বরফ চাঁদের আলোয় বেশ ফুটে উঠেছে।

আমার শোবার ঘরের আলো নেভানো। বারান্দার আলো জ্বলছে। আমি ভ্যালির দিকে চেয়ে বালুর ঘরখানার অবস্থিতি আন্দাজ করার চেষ্টা করছি। কিন্তু অনেক দূরের অতি ক্ষুদ্র একখানা কোঠী দিনের আলোতেই স্পষ্ট দেখা যায় না, রাতের আবছায়ায় সে কোথায় হারিয়ে গেছে।

এখন বালু কি করছে? সারাদিনের শ্রান্তির পর ঘরের মেঝেতে বিছানো খিন্দের ওপর শুয়ে পড়েছে। হয়ত এখন অচেতনে ঘুমোচ্ছে সে। হয়ত বা সে আদপেই ঘুমোচ্ছে না। ঝোরকার রন্ধ্রপথে আমারই মত চেয়ে আছে ভ্যালির দিকে। এমনও হতে পারে আমারই মত বালুও খুঁজছে একখানা ঘর, যে ঘরখানা ভ্যালির রহস্যসাগরের পরপারে।

বালুর ভাবনার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় নেই, তার কাজের সঙ্গে আমার পরিচয়। সে কম কথা বলে। আমার ইঙ্গিতগুলো সে সহজে ধরে নিয়ে কাজ করে যাবার মত বুদ্ধি রাখে। ডাক্তার হিসেবে ওতেই আমি খুশি। কিন্তু একটি তরুণীর ভাবনা কল্পনা নিশ্চয়ই শুধু তার কর্তব্যের সীমানাতেই শেষ হয়ে যায় না, চাঁদের আলোর মত জীবনের রহস্যময় অন্ধকারকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়াতেই তার সুখ-দুঃখ। রাতের একটি তগ্‌গর ফুলের গন্ধ নিতে নিতে কেন সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তা সে জানে না। বসন্তের উতল হাওয়া যখন ফুলেভরা আপেলের ডাল ছুঁয়ে বয়ে যায় তখন কেন সে চলতি পথে স্থির হয়ে দাঁড়ায় তাও তার কাজে অজানা। তবু এই অচেনা আধোচেনা জগতটাই তার ভাবনার রাজ্য। এ রাজ্যের পথে পথে সে উদাসী পথচারিণী। শুধু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া, যেতে যেতে থেমে দাঁড়ানো, এ রাজ্যে চলার রীতি।

আমার ভাবনার পথ কিন্তু এখন একটি নির্দিষ্ট রাজ্যকে সিঁথির মত ভেদ করে চলে গেছে। তার দুধারের শোভা আর সম্পদ আমি আলো আর হাওয়ার মত স্পর্শ করে আছি।

ঝিন্নি কখন এসে আমার পেছনে দাঁড়িয়েছে জানতে পারি নি। হঠাৎ উত্তরের উপত্যকা থেকে বয়ে আসা একটা হাওয়া আমার ভাবনাকে এলোমেলো করে দিয়ে গেল। সেই বাতাসের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠা ওর দোপাট্টার ছোঁয়া লাগল আমার মুখে।

ঝিন্নির দিকে ফিরে বললাম, স্টোররুমে বিছানা পাতা দেখে এলাম! তাই এতক্ষণ তোমাকে দেখতে না পেয়ে ভাবলাম ক্লান্ত হয়ে তুমি বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছ।

ঝিন্নি কোন কথা না বলে ইজিচেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আমার চুলে বিলি কাটতে লাগল।

আবার বললাম, ভাগ্‌তুকে ঘুম পাড়িয়ে এলে নাকি?

ঝিন্নি এবারও কথা বলল না। শুধু চুলগুলো মুঠো করে ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ছেড়ে দিল। বুঝলাম, উল্টোপাল্টা কথা বলার জন্যে ঝিন্নি আমাকে মৃদু তিরস্কার করল।

কয়েক মুহূর্ত পরে ও নিজেই কথা বলল, আমি কাল দুপুরের গাড়িতে চলে যাচ্ছি।

এবার আমি কোন কথা বললাম না।

ও হঠাৎ ওর দুটো হাত শাঁখে ফুঁ দেবার ভঙ্গীতে আমার কানের কাছে ধরে টেনে টেনে বলল, আমি কা-ল চলে যা-চ্ছি।

বললাম, তুমি নিজের ইচ্ছাতেই যখন এসেছ তখন যাবার সময়েও যে নিজের ইচ্ছাতেই যাবে তা তো জানা কথা।

ঝিন্নি বলল, এতক্ষণের ভেতর একটিবারও আমাকে থাকতে বলেছ তুমি?

বললাম, আশ্চর্য কথা বললে ঝিন্নি। তোমার ঘরে তুমি এসেছ, আমি তোমাকে থাকতে বলব কোন দুঃখে। লোকে জানি অতিথিকেই থাকবার অনুরোধ জানায়।

ঝিন্নি বলল, আমার খুব খারাপ লাগছে ছোটেসাহেব। কাল চলে যেতে হবে একথাটা যতবার মনে পড়ছে ততবারই ভীষণ মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, তাহলে সময় নষ্ট না করে চাচাজীকে বলে থাকবার একটা পারমানেন্ট ব্যবস্থা করে ফেল।

ঝিন্নি বলল, চাচাজীকে বলার সময় এখনো আসে নি। অক্টোবরে আপেল তোলা শেষ হয়ে গেলে যখন চাচাজীর মন খুশিতে ভরে উঠবে ঠিক তখনই চাচাজীর অনুমতি চাইব। তারপর ডিসেম্বরের শেষে কোলি-রি-দেয়ালীর দিনে তোমার পথ চেয়ে থাকব। সেদিনটি মনে থাকবে তো?

ওর হাত ধরে নিজের কোলের ওপর টেনে এনে বললাম, সব ভুলে যেতে পারি কিন্তু যে বিশেষ দিনটিতে ঝিন্নির বুকের উত্তাপ প্রথম পেয়েছিলাম সেদিনের কথা কি ভোলবার?

ঝিন্নি আমার কোলের ওপর বসে আমার বুকের ভেতর ওর হাতখানা ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, তুমি রোগা হয়ে গেছ ছোটেসাহেব।

তীব্র প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বললাম, কখখনো না।

ঝিন্নি বলল, সত্যি বলছি, আমার চোখকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। নাগ্‌গর থেকে আসার পর তুমি যেন খুব তাড়াতাড়ি রোগা হয়ে গেলে।

হেসে বললাম, তাহলে নিশ্চিত তোমার ভাবনা ভেবে।

ঝিন্নি আমার হাসিতে যোগ না দিয়ে বলল, বড্ড খাটুনি যাচ্ছে তোমার। রাতদিন পাহাড়ী টিকায় ঘুরে ঘুরে কাজ। ঠিকমত নাওয়াখাওয়ার ব্যবস্থা নেই।

বললাম, এ সব ইনফরমেশন শ্রীমান ভাগ্তুর কাছ থেকে সংগ্রহ করা নিশ্চয়ই।

ঝিন্নি ধমকের সুরে বলল, তুমি আসল কথা বড্ড এড়িয়ে যাও ছোটেসাহেব। আমার কথাটা দয়া করে একটু শোন। দরকার পড়লে লোকেরা রোগীকে বয়ে আনবে হাসপাতালে, তুমি এখানে বসেই চিকিৎসা করবে। কোথাও তোমাকে যেতে হবে না।

বললাম, ছেলেমানুষী করো না ঝিন্নি। সব সময় ঘরে বসে কি ডাক্তারী করা চলে?

ও অমনি বলল, বেশ তুমি যাবে, কিন্তু কথা দাও আমি যতদিন তোমার কাছে না আসি ততদিন একেবারে দরকার না পড়লে ডিসপেনসারি ছেড়ে বাইরে চিকিৎসার জন্যে কোথাও বেরোবে না।

বললাম, কথা দিচ্ছি তেমন দরকার না পড়লে আমি আমার ঝিন্নির কথাই মেনে চলব।

ঝিন্নি চুপচাপ বসে থেকে কি যেন ভাবল। তারপর আমার একখানা হাত তুলে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, অনেক অন্যায় তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চাইছি, তাই না ছোটেসাহেব? মানুষ বিপদে না পড়লে কি কাউকে কখনো ডাকে। ভাগ্তু বলেছিল, পাহাড়ী লোকেরা নাকি তোমার নাম দিয়েছে নরসিং।

বললাম, কথাটা কানে এসেছে আমার কিন্তু এর মানেটা ঠিক বুঝতে পারি নি।

ঝিন্নি আমার কোলের ওপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল বিছানার ওপর। বলল, খেয়ে ঘুমিয়ে শরীরটা বড্ড হেভি হয়ে যাচ্ছে, তাই না।

বললাম, মোটেই না। তোমার শরীর নিয়ে কথা বলে কার সাধ্যি। এমন একখানা দর্শনীয় ফিগার বিশখানা টিকা চুড়লেও মিলবে না।

আমার কথায় ঝিন্নি যে খুশি হয়ে উঠেছে তা বুঝতে পারলাম, ঝিন্নির কথান্তরে যাওয়া দেখে।

ও বলল, লোকে তোমাকে নরসিং বলে কেন জান? নরসিং দেবতা পাহাড়ী মেয়েদের সুস্থ সন্তান দেন আর সব রোগ সারিয়ে তোলেন।

বললাম, তোমাদের হাজারটি দেবতা আর অপদেবতার ঠেলায় গেলাম।

ঝিন্নি আমার মুখে সপ্তপর্ণীর পাতার মত তার হাতখানা চাপা দিয়ে বলল, অ্যাই, দেবতাকে নিয়ে খবরদার কথা বলবে না বলছি।

ও এক সময় হাত নামিয়ে নিলে আস্তে আস্তে বললাম, তুমি অশিক্ষিত পাহাড়ী নও ঝিন্নি। আধুনিক শিক্ষা পেয়েছ, সবকিছু বিচার করে দেখবার ক্ষমতা আছে তোমার। অকারণ কতকগুলো সংস্কার থাকবে কেন তোমার ভেতর?

ঝিন্নি চুপচাপ বসে রইল।

আমি বললাম, কিছুদিন আগের একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি তোমাকে। রোগী দেখে ফিরছিলাম। হঠাৎ একটা টিকার পাশ দিয়ে আসার সময় দেখলাম, অনেকগুলো লোক জড়ো হয়েছে, কান ফাটিয়ে ড্রাম বাজছে। একটা ভেড়াকে চোখের সামনে বলি দেওয়া হল।

টাট্টু থেকে নেমে দাঁড়ালাম।

বলির শেষে বাদ্যি বাজনা থেমে গেল। একটা লোক গড় গড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল :

পর্বত গুফা ওৎ বসে বাপ তেরা
সিন্দু বীর তু হ্যাঁয় ভাই মেরা
উগুর বীর কা পৌত্‌রা
গুরাঁ কা শিখ্ হামারা
সদ্দিয়া আয়ে
হামারা ভেজাইয়া আয়ে
হামারা কম্ সিতাব কর্ আয়ে ....।

আরও অনেক মন্ত্র বলে গেল লোকটা। দ্বিতীয় দিন আমি পেশেন্টকে দেখে ফেরার পথে লোকটাকে ক্রমাগত তেমনি মন্ত্র পড়ে যেতে দেখলাম। বালুর মুখে শুনলাম, লোকটাকে নাকি 'চেলা' বলে। ও সিন্দুবীরের আত্মাকে ডাকছে। রোজ একশো একবার লোকটা ঐ একই মন্ত্র পড়বে। এমনি একুশ দিন মন্ত্র পড়া আর পূজো চলবে। তারপর গাদ্দীর পোশাক পবে হুইসিল দিতে দিতে নাকি সিন্দুবীর আসবেন। তিনি যত নষ্টের দেবতা। তাই তাঁকে শান্ত করার জন্যে এই চেষ্টা।

ঝিন্নি বলল, আমি উগুর বীরের পৌত্র সিন্দুবীরের কথা জানি ছোটেসাহেব।

বললাম, কিন্তু ঐ চেলার পরিণতির কথাটা তুমি জান না।

ঝিন্নি আমার দিকে চেয়ে আছে দেখে বললাম, একদিন একটা লোককে আমার ডিসপেনসারিতে কয়েকজন পাহাড়ী মিলে বয়ে নিয়ে এল। দেখি সেই চেলা, যে সিন্দুবীরের মন্ত্র আওড়াচ্ছিল।

জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, কোন এক টিকায় লোকটা গিয়েছিল গণৎকার হয়ে। সেখানে ওর ওপর নাকি কোন দেবতার আত্মা ভর করে। সঙ্গে সঙ্গে ও নিজের হাতে ধরা লোহার কড়া দিয়ে আঘাত করতে করতে শরীরটাকে রক্তাক্ত করে ফেলে। মুখে কিন্তু ভবিষ্যৎ বাণী উচ্চারণ করে যায়। শেষে ঘণ্টা দুয়েক কাঁপতে কাঁপতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়।

ঝিন্নি বলল, ওর ওপর নরসিং দেবতার ভর হয়েছিল। দেবতার ভর না হলে ওরা কিছু বলতে পারে না। ওদের কাঁপুনি এলেই বুঝতে হবে দেবতার ভর হয়েছে।

হেসে বললাম, ওর ওপর নরসিং দেবতার ভর হয়েছিল কিনা জানি না, তবে আমার ওপর তোমাদের ঐ চেলা পুরো একটি দিন আর একটি রাতের জন্যে ভর করেছিল।

ঝিন্নির চোখে ঔৎসুক্য। বলল, কি হয়েছিল ওর?

বললাম, উদ্দাম নাচ নাচতে নাচতে লোহার কড়া দিয়ে নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করা ওদের অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ঐ করতে গিয়ে লোকটা মরল টিটেনাসে।

ঝিন্নি বিস্ময়ের একটা শব্দ করে বলল, মারা গেল!

বললাম, ওঝার মৃত্যু সাপের হাতে আর এইসব চেলাদের মৃত্যু ওদের নিজেদের তৈরি মন্ত্রতন্ত্র আচার অনুষ্ঠানের হাতে।

দেখলাম, ঝিন্নির ঘোর তখনও কাটে নি। বললাম, চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তখন উপায় বড় একটা হাতে ছিল না। টিটেনাস স্টার্ট করে গিয়েছিল।

ঝিন্নি কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, জানো, আমি বেশ বুঝি এসব বড় পুরনো সংস্কার, এতে মানুষের ক্ষতিই হয়। তবু সংস্কারগুলো পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারি না।

হেসে বললাম, এগুলোও এক ধরনের রোগ ঝিন্নি। তুমি যখন আমার কাছে একেবারে চলে আসবে তখন প্রথমেই তোমার সংস্কারগুলো সারিয়ে নেব। তারপর দুজনে মিলে ঐ সংস্কারগুলোকে সাফ্ করার জন্য টিকায় টিকায় বিজয় অভিযান চালাব।

ঝিন্নি হঠাৎ ওর দু-হাতে আমার মুখ চেপে ধরে নাড়া দিতে দিতে বলল, তুমি দারুণ অবিশ্বাসী ছোটেসাহেব। তোমার কিছু হলে দেখো আমি মরে যাব।

বললাম, তোমাকে মরতে দিচ্ছে কে ? বেকার ডাক্তারী শিখিনি। তাছাড়া অত সহজে তোমার ছোটেসাহেবের কিছু হবে না ঝিন্নি, নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

আমি আলো নিভিয়ে দিলাম। এ জগতে আমি আর ঝিন্নি ছাড়া কেউ নেই এখন। জানালার বাইরে সেই রহস্যময় উপত্যকা চাঁদের আলোয় আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মনে হল, যে তরুণীকে আমি বুকের ভেতর জড়িয়ে বসে আছি, সে ঐ সুপ্রাচীন পর্বতের মতই পুরোনো, ঐ রাতের উপত্যকার মতই চির রহস্যময়।

মনে মনে ভাবলাম, আমরা সকলেই সংস্কারকে দূর করতে চাই, কিন্তু নিজেরা সৃষ্টির শুরু থেকে একটা অচ্ছেদ্য সংস্কারের বাঁধনে বাঁধা পড়ে আছি। তাই আজ এই রাতে ঝিন্নির মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হতে লাগল, ও ঝিন্নি নয়, ও একটি তরুণী, যাকে আমি মনুষ্যসৃষ্টির আদি থেকে বুকে নিয়ে বসে আছি।

ভোরবেলা গা এলিয়ে দিয়েছি ওপরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে। সূর্যোদয়ের মুহূর্তটিকে এইভাবে দেখা আমার এক ধরনের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

নীচের বাগানে ভাগ্তুর সঙ্গে খেলায় মেতেছে ঝিন্নি। একটা বল নিয়ে লোফালুফি খেলছে। কে বলবে কাল রাতে এক পূর্ণ বিকশিত নারীকে আমি বুকের মাঝে টেনে নিয়েছিলাম। আজ ভোরে ঝিন্নি একেবারে মুকুলিকা বালিকা বয়সী। দৌড়ে দৌড়ে খেলছে ও। কানের ঝুমকো এক-একবার দারুণ বেগে দোল খাচ্ছে। বিনুনী কাঁধ টপকে বুকে লাফিয়ে পড়ছে। ভাগ্তুটা সমানে এদিক-ওদিক বল ছুঁড়ে ঝিন্নিকে বিব্রত করে তুলছে। ঝিন্নি কিন্তু বসে থাকা ভাগ্তুর কোলের ওপর নিশানা করে বল ছুঁড়ছে!

আমি ছিলাম ওদের খেলার একমাত্র দর্শক। এখন আমরা তিনজন দেখছি ওদের খেলা। পূবের পাহাড়ে গাছের ডালপাতার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখছে সকালের সূর্য। আর এইমাত্র পাশের আপেল গাছের ডালে তিরতির করে উঠে গিয়ে লেজ তুলে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে একটা কাঠবেড়ালী।

ঝিন্নি নিজের দেহটাকে নিয়ে কি অসম্ভব দ্রুততায় আশ্চর্য ভাঙচুর করতে পারে। আমি ঝিন্নিকে নতুন একটা রূপে দেখছি আজ। সবচেয়ে যেটা আমার চোখ আর মনকে ছুঁয়ে

যাচ্ছে সেটা ঝিন্নির নিজস্ব একটা ছন্দ। সে ছন্দ বারে বারে উচ্ছ্বলিত হয়ে আবার স্বস্থানে ফিরে আসছে।

এক চিলতে ভোরের রোদে ও মাখামাখি হয়ে গেল। ওপর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কতকগুলো গুঁড়ি গুঁড়ি মুক্তোর দানা ওর কপালে ফুটে উঠেছে।

হুড়োহুড়ি করে ঝিন্নি কিছুটা শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। আমার এখুনি ওকে ওপরে ডেকে নেওয়া দরকার। আমার পাশে বসে ও গল্প করবে আর সকালের হাওয়ায় শুকিয়ে যাবে ওর ঘামের কুঁড়িগুলো।

কিন্তু আমি ওকে ডাকলাম না! লোভীর মত ওর শ্রমের মূল্যবান ফসলগুলো আমি কুড়োতে লাগলাম।

হঠাৎ চোখ পড়ল আমার বাগানের রাস্তায়। বালু রোজকার মত উঠে আসছে ওপরে। ও একমনে পথ চলে। এদিক ওদিক বড় একটা তাকায় না। আমি যে এসময় ওপরে বসে থাকি তা ও জানে, তবু সামান্য কৌতূহল নিয়ে ওপরের দিকে একটি দিনও তাকাতে দেখিনি বালুকে।

ওর হাতে ফুল! ভ্যালির মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়, তার থেকে ছোট ডাল সমেত ফুল সংগ্রহ করে আনে ও। তারপর আমার বসার আর শোবার ঘরের ফুলদানিতে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখে ফুলগুলো। ফুল সাজানোতে নিপুণতা আছে বালুর।

বাগানে উঠে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়েছে বালু। একপাক সজোরে ঘুরপাক খেয়ে ঝিন্নি আস্তে বলটা ভাগ্‌তুর কোলে ফেলে দিতেই খিলখিল করে শিশুর মত হেসে উঠেছে ভাগ্‌তু।

ঝিন্নি এখন বালুর মুখোমুখি। দুজনে দেখছে দুজনকে। সোনালী জলে স্নান করে দুটি তরুণী যেন মুখোমুখি সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়েছে। একজনের মুখে রাজপুত তরুণীর আদল, অন্যজনের বিশুদ্ধ নাগরকোটীয় ব্রাহ্মণের চেহারা।

একটু পরেই বালু ঝিন্নির ওপর থেকে তার বিস্ময়ে ভরা চোখের দৃষ্টি তুলে নিয়ে বাংলোর দিকে পা বাড়াল। চোখদুটো পথের ওপর। শান্ত পা ফেলে এগিয়ে আসছে। মুখখানা থমথমে। হঠাৎ ভাবনার একটা ঢেউ লেগেছে।

ঝিন্নি চঞ্চল পায়ে ছুটে এল ওর কাছে।

তুমি বালু?

বালু থেমে গিয়ে অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে মাথা দুলিয়ে জানাল, ওর অনুমান ঠিক।

ঝিন্নি বলল, বাঃ ফুলগুলো তো ভারি সুন্দর। ভায়োলেট রঙের। ডাল ভরে ছড়িয়ে আছে। একদম তাজা।

বালু কি মনে করে ওর হাতে ফুলগুলো তুলে দিল।

ঝিন্নি বলল, চল আমরা দুজনে মিলে সাজাই।

বালু নতুন পরিস্থিতিতে কিছুটা আড়ষ্ট মনে হল। ঝিন্নি কিন্তু খুব স্বাভাবিক আচরণে নিজেকে ফুটিয়ে তুলল।

ওরা ঘরের ভেতর ঢুকে গেলে আমি আর ওদের দেখতে পেলাম না।

নিজেদের ভেতর ওরা কি কথা বলছে আমি জানি না। ঝিন্নি বুদ্ধিমতী আর সম্ভ্রান্ত। তাই সে এমন কথা বলবে না বা এমন আচরণ করবে না, যাতে অন্য একটি মেয়ে আহত হতে পারে।

অন্যদিকে বালু তেমন শিক্ষিত না হলেও আচার-আচরণে একটা সরল স্বকীয়তা বজায় রেখে চলে।

ঝিন্নি এক সময় বারান্দায় আমার পাশে এসে চুপি চুপি বলে গেল, বালু মেয়েটি কিন্তু চমৎকার।

বললাম, এত তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেট পেয়ে গেল? পরীক্ষায় বসতে না বসতেই ডিস্টিংশানে পাশ!

ঝিন্নি চলে যেতে যেতে এক ঝলক চাউনি হেনে বলল, পাবে না? কার শিষ্যা দেখতে হবে তো।

বললাম, আমাকে আর এর ভেতরে টানাটানি কেন? তোমাদের বোঝাবুঝি তোমরাই কর।

খাবার ঘরে ডাক পড়তে দেখি, দুজনের ইতিমধ্যে হোলি অ্যালায়েন্স হয়ে গেছে। চা তৈরি করছে বালু, আর প্লেটে খাবার সাজাচ্ছে ঝিন্নি।

ঘরে ঢুকেই বললাম, আজ কিছু ভালোমন্দ ভাগ্যে আছে বলে মনে হচ্ছে।

বালু মুখ তুলল না, খুললও না।

ঝিন্নি বলল, আজ ভাল যা কিছু লাগবে তা বালুর, আর বিস্বাদ সবটাই আমার।

বালু ঝিন্নির দিকে একবার শুধু অর্থপূর্ণ চোখে তাকাল। তারপর নিজের মনে কাপে চা ঢেলে চলল।

ঝিন্নির পরিচয় আমি বালুর কাছে কোনদিনই দিইনি। অকারণে একটি মেয়ের মনে অন্য একটি মেয়ে সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগিয়ে লাভ কি। তাই ঝিন্নির কথা বালুর কাছে বলার প্রয়োজনই বোধ করিনি।

খেতে খেতে বললাম, জিনিসগুলো যে-ই বানাক, দারুণ রকম মুখরোচক হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অন্তত একটা কিছু খারাপ হওয়ার দরকার ছিল। একটু যে অপবাদ দেব তার আর পথ রাখলে না। এমনি নিশ্ছিদ্র করে মুখ বন্ধ করে দেবার অভিজ্ঞতা আগে আমার কখনো হয়নি।

ঝিন্নি আর বালু একটু দূরে বসে গল্প করতে করতে চা আর খাবার খেতে লাগল। ওরা নিজেদের ভেতর অনুচ্চে কথা বলছিল। আমি দু-একটা ভেসে-আসা টুকরো কথা থেকে ওদের আলাপের বিষয় সম্বন্ধে আন্দাজ করতে পারছিলাম না।

এক সময় ঝিন্নির গলা বেজে উঠল, আজ তোমার চেম্বার খুলবে না ছোটেসাহেব?

দেখলাম, বালু চোখ তুলে ঝিন্নির দিকে চেয়ে রইল। ঝিন্নি আমাকে ছোটেসাহেব বলে

ডেকেছে, তার অর্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা—তাই হয়ত সে খুঁজতে লাগল ঝিন্নির চোখেমুখে।

বললাম, রোববারেও কি একটু জিরোতে পাব না ঝিন্নি। ডাক্তার বলে কি প্রাণটা পেসেন্টের হাতে উৎসর্গ করে দিয়ে বসে থাকব!

ঝিন্নি বলল, অনেক দূর থেকে এসেছি ছোটেসাহেব, চলে যাব দুপুরেই। অন্তত একটা রোগীকে দেখে তোমার নিয়মভঙ্গ হোক। ডাক্তাররা সব সময়েই স্পেশাল কেস কনসিডার করেন।

হেসে বললাম, কর্ম-বিরতির দিনে রোগী দেখতে গেলে কিন্তু ডাবল ফি লাগবে। তাছাড়া আমার অ্যাসিসটেন্টের ফি-ও আছে।

হঠাৎ কথাটার শেষ অংশ নিজের কানেই কেমন ঠেকল। তাকিয়ে দেখি, ঝিন্নির মুখখানায় কে যেন সেই মুহূর্তে এক মুঠো রাঙা আবীর ঘষে দিয়েছে। ওর ঠোঁটে ঠেকানো চায়ের কাপ, চুমুক দিতে ভুলে গেছে ঝিন্নি।

ব্যাপারটা বালুর কাছে পরিষ্কার নয়, তাই সে চুপচাপ বসে রইল।

আমার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, উঠে দাঁড়িয়ে আমি অকারণে একটু যেন রুক্ষ হয়ে উঠলাম। বালুকে লক্ষ্য করে বললাম, আজ তো তোমার কোন কাজ নেই বালু, তুমি বরং আসতে পার। আবার যখন দরকার পড়বে তখন খবর পাঠাব।

বালু কি মনে মনে চমকে উঠল! যে আচরণের সঙ্গে তার একটুও পরিচয় নেই, সেই সম্পূর্ণ অচেনা আঘাতটা কি তাকে আহত করল! সে হয়ত মনে মনে ভেবে পেল না, আমার দিক থেকে হঠাৎ এ ধরনের রূঢ়তা দেখাবার কারণ কি।

বালু উঠে পড়েছে। বালু অভাবী, কিন্তু আত্মসম্মানকে অভাবের কাছে কোনদিন তাকে খুইয়ে দিতে দেখিনি। তাই আমার কথার সূক্ষ্ম আঘাতটুকু হজম করে সে একমুহূর্তও আর বসে থাকতে পারল না।

ঝিন্নি কিন্তু হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলেছে বালুকে।

এখুনি পালাচ্ছ কোথায়? অ্যাসিসটেন্টের ফি-ও ডবল করে দেব, ভয় নেই।

বালুকে এমন করে কাঁদতে আমি কোনদিন দেখিনি। ঠায় দাঁড়িয়ে মাটির দিকে চেয়ে আছে বালু। ফোঁটা ফোঁটা জল মেঝেতে পড়ে বকুল ফোটাচ্ছে।

আমি অপরাধীর মত ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম। আসতে আসতে দেখলাম ঝিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে আহত বালুকে জড়িয়ে ধরেছে।

আমি ওপরে আমার শোবার ঘরে চলে এলাম। সামান্য দুটো কথা দুটি মনে কি অভাবনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে তাই ভাবতে গিয়ে নিজের অবিবেচনায় নিজের ওপরই দারুণ ক্ষোভ হল।

অনেকক্ষণ আমি ঘরের ভেতর বন্দী হয়ে রইলাম, কিন্তু ঝিন্নি অথবা আর কেউ এল না।

হঠাৎ চোখ পড়ল ভ্যালির ওপর। বালু চলে যাচ্ছে। মন্থর পা টেনে টেনে তার কোঠির

পথে চলেছে সে। বিষণ্ণতার একটি মূর্তি যেন আলোকিত পথের ওপর দিয়ে ছায়ার মত সরে সরে যাচ্ছে। চারদিকে চঞ্চলতা। সবুজ বৃক্ষের সমারোহ, কুহলের কুলুধ্বনি, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বরফের ঝকঝকে বিস্তার। তারই ভেতর একটি আহত হৃদয় অন্ধকারের গুণ্ঠনে নিজেকে ঢেকে নিয়ে চলেছে।

দূর থেকে আমার সমস্ত হৃদয় বালুর জন্যে হাহাকার করতে লাগল। আমি কেন তাকে আঘাত দিলাম, নিজে কেন এত ছোট হয়ে গেলাম নিজের কাছে, এই অনুশোচনায় আমার সমস্ত মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

আমি অনুচ্চারিত গলায় বলে চললাম, বালু, তুমি আমার চেয়ে ছোট, তবু আমি নতজানু হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তোমার কাছে। আমি অন্তর থেকে চাইনি তোমাকে আঘাত করতে। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না বালু। তুমি ফিরে এলে বুঝবো তুমি আমার মূঢ়তাকে মাপ করেছ।

ঝিন্নি এসে ঢুকল, শ্যাম্পুর একটা অতি মিষ্টি মৃদু গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে। ওর দিকে চেয়ে দেখি, স্নান সেরে রাত্রির প্রপাতের মত চুলগুলোকে পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে।

আমি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই ও বলল, বালু চলে গেছে।

বললাম, জানি।

ও আমার পাশে এসে বসল, হাতখানা নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, বালুকে তুমি এমন করে আঘাত করলে কেন ছোটেসাহেব! ও বেচারা শুধু কেঁদেই সারা হল।

বললাম, আমি কোনদিন কাউকে আঘাত করতে চাই না ঝিন্নি। কিন্তু আজ সবাইকে আঘাত দিয়ে বসলাম। বালু হয়ত আহত হয়েছে, আর ওকে আঘাত দিয়েছি বলে আমিও কম আহত হইনি।

ঝিন্নি চুপচাপ বসে কিছুক্ষণ আমার হাতের আঙুলগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। একসময় আমার দিকে সোজা ওর চোখের দৃষ্টি ফেলে বলল, একটা কথা আজ আমাকে বলতে দেবে?

বললাম, আজ সবার ভর্ৎসনা কুড়োবার জন্যে আমি তৈরি, বল কি বলবে।

ঝিন্নি বলল, তোমাকে কোন দোষ দেবার কথাই আসছে না, শুধু একটা সত্য তোমাকে জানাতে চাই।

ওর মুখের দিকে চেয়ে বললাম, বল।

ঝিন্নি অত্যন্ত স্পষ্ট গলায় বলল, বালু তোমাকে ভালবাসে।

সমস্ত ঘরের ভেতর ঝিন্নির ঐ কথা বার বার বাজতে লাগল। একসময় আমার মনে হল, ঐ শব্দগুলো এক ঝাঁক তোতার মত উড়ে চলে গেল ভ্যালি পেরিয়ে ওপারের টিলায়, বালুর কোঠি লক্ষ্য করে।

আমি স্তব্ধ গাম্ভীর্যে কিছুক্ষণ বসে থেকে বললাম, কারো ভালবাসার খবর রাখার অবসর আমার খুব কম ঝিন্নি।

ও অমনি হেসে ফেলল। বলল, আমার বেলাতেও তাই নাকি?

বললাম, বালুর কথা বলে তুমি আজ একটা গুরুতর রসিকতা করে বসলে ঝিন্নি। তোমার এ ধরনের কথা শুনব বলে আমি তৈরি ছিলাম না। বালু যদি তোমাকে একথা বলে থাকে, তাহলে তার সাহস সীমা ছাড়িয়েছে বলতে হবে।

হয়ত ঝিন্নি আমার খর উত্তাপে ভরা কথাগুলো শুনে মনে মনে খুশিই হল। আমি যে অন্য নারীকে কোন রকমে প্রশ্রয় দিইনি, এ সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা করতে পেরে নিশ্চয়ই ঝিন্নি আশ্বস্ত হয়ে থাকবে। তবু সে আমার হাতখানা তুলে ওর কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, এত রাগ করছ কেন? তাহলে তো কোন কথাই কোনদিন তোমাকে বলা যাবে না।

আমি চুপচাপ কিছু সময় বসে থেকে বললাম, তোমার এ ধরনের অনুমানের কারণটা আমাকে জানাবে?

ঝিন্নি বলল, বালু এ সম্বন্ধে মুখ ফুটে একটি কথাও বলেনি ছোটেসাহেব। তবে মেয়ে হয়ে জন্মালে নাকি তারা তৃতীয় একটা চোখ পায়। আমি আমার সেই চোখের দৃষ্টি ফেলে ওর বুকের ভেতরটা দেখে নিয়েছি।

এবার হেসে বললাম, কি দেখতে পেলে?

ঝিন্নি গম্ভীর হয়ে বলল, হাসি নয় ছোটেসাহেব, বালুর চোখের জল তার মনের খবর দিয়ে গেছে। যদি তোমার ওপর তার ভালবাসার টান না থাকত, তাহলে কাজ পাবার লোভে অপমান হজম করে মুখে হাসি ফুটিয়ে চলে যেত। নয়ত চোখে ক্ষোভের আগুন জ্বেলে তৎক্ষণাৎ সে নেমে যেত, ফিরে আর তাকাত না।

একটু থেমে ঝিন্নি আবার বলল, তরুণী একটি মেয়ের কান্না শুধু তার ভালবাসার জায়গায় আঘাত লাগলেই ঝরে ছোটেসাহেব।

আমি ঝিন্নির বিশ্লেষণকে এড়িয়ে আর কোন কথা বলতে চাইলাম না। ঝিন্নির কথাগুলো এমন একটা সত্যকে মেলে ধরল, যা আমার চোখের ওপর আগুনের মত জ্বলজ্বল করতে লাগল। যার ওপর কোন আবরণ দিতে গেলেই তা মুহূর্তে পুড়ে মিথ্যে হয়ে যাবে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ঝিন্নি বলল, একটা কথা রাখবে?

ওর দিকে চাইলাম।

ও বলল, মুখ ফুটে বল—রাখবে?

বললাম, রাখব ঝিন্নি।

ঝিন্নি বলল, বালুকে কাছে বেশি আসতে দিও না ছোটেসাহেব। এ আমার ঈর্ষা বলে যদি তুমি মনে কর, তাহলে আমি বড় ছোট হয়ে যাব। তবে আমি নিজেকে দিয়েই বুঝেছি, তোমার কাছে যে একবার এসে পড়বে তার ফিরে যাওয়া শক্ত হবে।

বললাম, একটা অসহায় পরিবারকে আমি কিছু সাহায্য করতে চেয়েছিলাম ঝিন্নি।

ও বলল, অন্যভাবে কর। নিজের কাজের সঙ্গে না জড়িয়েও একটি মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করা যেতে পারে।

বললাম, চেষ্টা করব তাই করতে।

ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যে জীপের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এসেছিল ঝিন্নি, সেই জীপে করেই ফরেস্ট গার্ডের সঙ্গে তিনটে নাগাদ চলে গেল।

যাবার আগে আমার হাতখানা ওর মুখে তুলে বার বার চুমু খেল। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছিল। ওর চোখদুটোতে জলের ছায়া।

বললাম, বড্ড সেন্টিমেন্টাল তুমি ঝিন্নি। এই তো মানালী থেকে নাগ্‌গর। কতটুকুই বা পথ।

ও ধরা গলায় বলল, না এলেই বুঝি ভাল ছিল ছোটেসাহেব। জানি না, এইটুকু বুকের ভেতর এত কষ্ট কোথা থেকে আসে।

ওর মুখখানা আমার হাতের পাতায় তুলে ধরে বললাম, তোমার দুঃখগুলো যদি বইতে পারতাম ঝিন্নি, তাহলে কত সুখী হতাম। শুধু জেনে রেখো, সারা দেশ যদি বরফের তলায় চলে যায় তবু কোলি-রি-দেওয়ালীর দিনে তোমার ছোটেসাহেব তার ঝিন্নিকে চিরদিনের করে আনতে নাগ্‌গরে যাবেই। সেদিন আমাদের সব জমে ওঠা দুঃখগুলোকে ভাসিয়ে দিয়ে আসব বিপাশার জলে।

ঝিন্নি বলল, শুধু সেই দিনটির কথা ভাবতে ভাবতে সারা বছরের সব কাজ আমার ভুল হয়ে যাবে ছোটেসাহেব।

বালু আর এল না। তার অভিমানের দুস্তর সমুদ্রটা সাঁতরে সে আর পার হয়ে আসতে পারল না। আমার ফুলদানি বালুর হাতের ছোঁয়া না পেয়ে শূন্য পড়ে রইল।

রোজ সকালে কম্পাউণ্ডার শিউশরণজীই আবার রোগীদের লাইনে দাঁড় করাবার ভারটা নিলেন। ওষুধ তৈরির ফাঁকে ফাঁকে টিকিট করে ভাগ্‌তুর মারফৎ তিনি পেসেন্টদের ডাক পাঠাতেন। কাজটা অনেক সময় শৃঙ্খলার সঙ্গে হত না। আর ঠিক তখনই বালুর অভাবটা আমার খুব বেশি করে মনে হত।

বাইরের কলে আজকাল আর বড় একটা সাড়া দিই না। অনেক দূরের পথে যাবার ডাক এলে কেমন যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়ি। সঙ্গে বালু থাকলে টুকরো টুকরো কথার ভেতর দিয়ে কখন পথ চলা শেষ হয়ে যেত টেরও পেতাম না। কিন্তু দু-একবার ইতিমধ্যে বাইরের কল থেকে ফিরে এসে কেমন যেন শ্রান্ত বোধ করতে লাগলাম।

বালুর পরিবর্তনটা আমার চোখে ইদানীং যে না পড়ছিল তা নয়, কিন্তু আমার কাছে বালু এমন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল যে ওর ঐ আকর্ষণের ব্যাপারগুলোকে আমি লঘু করে দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

আমার মনের একেবারে গভীরে পাহাড়ে ঘেরা যে সংরক্ষিত সরোবরটি ছিল, যেখানে শুধু আমি আর ঝিন্নি সাঁতার কেটে, ডুবে, জল ছিটিয়ে স্নানের খেলা খেলতাম, সেখানে হঠাৎ যেন কার ছায়া ছায়া উপস্থিতি দেখলাম। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে সে অদৃশ্য হয়ে যায়, আবার ছায়া ফেলে। উঁকি দেয়, আবার সরে যায়। একটা অদম্য কৌতূহল নিয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে

দেখে, কিন্তু ইচ্ছে হলেও নিষিদ্ধ সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জলকে তোলপাড় করে দিতে সাহস করে না।

হঠাৎ ঝিন্নি এসে পড়ায় সব ওলোটপালট হয়ে গেল। কৌতূহলী ছায়া সরে গেল অনেক দূরে।

মনে মনে কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে পড়তে লাগলাম। বালুর অসহায় সংসারের কথা মনে পড়তে লাগল। কি কাজ করছে বালু? সে হয়ত এখন বনে জঙ্গলে ঘুরছে লক্‌ড়ির সন্ধানে। তাই বেচে সামান্য কিছু পয়সা হয়ত সংগ্রহ করে আনছে। অসুস্থ পণ্ডিতজীর সেবা করছে। তাঁর রামচরিত মানসের আনন্দময় জগত থেকে এই নির্মম কঠিন সংসারে বালু তাঁকে নামিয়ে আনতে চায় না।

জুলিয়েন চলে গেছে সারা ভারত ট্যুর করতে। বেড়িয়ে বেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ের কাজটা দেখাশোনা করবে সে, এই প্ল্যান করে মিঃ বেনন পাঠিয়েছেন তাকে। জুলিয়েন কাছে থাকলে তার সঙ্গে কথা বলে, পরামর্শ নিয়ে কিছুটা হাল্কা করে নিতে পারতাম ভারী বুকটাকে।

ঝিন্নি আমার এই অনুক্ত ব্যথার দিনগুলোকে যদি তার চঞ্চল উপস্থিতি দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারত, তাহলে বুকের মধ্যে জমে থাকা সব বরফ গলে খুশির কুহল হয়ে দিকবিদিক মাতিয়ে ছুটে চলে যেত।

এক একসময় মনে হয়, আমাকে নিঃসঙ্গ করে রেখে জুলিয়েন, বালু আর ঝিন্নি যেন কোথায় লুকিয়েছে। আমি কানামাছির চোখবাঁধা মানুষটার মত অসহায়ভাবে ওদের হাতড়ে বেড়াচ্ছি। ওরা রয়েছে এখনও আমার নাগালের অনেক বাইরে।

খবর আনল ভাগ্‌তু। সারা মানালী নাকি ঝাঁক ঝাঁক রঙিন প্রজাপতির মত হিপি আর হিপিনীতে ছেয়ে গেছে। তারা পাইন ফরেস্ট, নদীর তীর থেকে গভর্ণমেন্ট বাংলোতে যাবার রাস্তার দুপাশ অধিকার করে নিয়েছে। কম্বল পেতে পাথরের ওপরেই তৈরি করে নিয়েছে তাদের দিনরাতের আস্তানা।

ওদিকে যাইনি কতদিন। জুলিয়েন বাইরে চলে যাবার পর থেকে বাজারের দিকে যাবার বিশেষ কোন আকর্ষণ বোধ করিনি। বাজার ঘুরে ওদের হোটেলে যাবার যে চার্ম ছিল, সেটা আপাতত আর নেই। এখানে পাহাড়ের ওপর যে মুদিখানা রয়েছে, আমাদের দুতিনটে প্রাণীর প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট। তাছাড়া দোকানীটি ডাক্তার বলে আমাকে দেখা হলেই রোজ নমস্কার করে। আমি ওকে দিয়ে অনেক সময় টুকরো টুকরো প্রয়োজনের জিনিসগুলো বাজার থেকে আনিয়ে নিই।

ভাগ্‌তু সেদিন সন্ধ্যেবেলা আর একটা খবর বয়ে আনল। সিজন টাইমে পথের ধারে ট্যুরিস্টদের জন্যে ছাউনি ফেলে সাময়িকভাবে সস্তা খাবারের যে রেস্তোরাঁগুলো গড়ে ওঠে, তার একটাতে সে বালুকে রান্না করতে দেখেছে।

আমার কাছে এই মুহূর্তে খবরটি দারুণ চাঞ্চল্যকর হলেও ভাগ্‌তুর কাছে মনের উত্তেজনা প্রকাশ না করে বললাম, তুই ঠিক দেখেছিস? কাকে বলতে কাকে দেখেছিস কে জানে!

ভাগ্‌তু বলল, নিজের চোখে দেখেছি সাহেব। ট্যুরিস্ট লোকের সঙ্গে কথা বলছে। হাতে চায়ের কেটলি।

বললাম, তা বেশ করেছিস। যা হোক কোন একটা কাজ করা ভাল।

ভাগ্‌তু চলে গেলে বারান্দায় অন্ধকারে চেয়ার পেতে বসলাম। আলো জ্বালতে ইচ্ছা করছিল না। নিচে—অনেকখানি নিচে বাজার। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে বাজার আর হোটেলের আলোগুলো ঝিকমিক করছে। ওরই ভেতর কোন একটা রেস্টুরেন্টে ট্যুরিস্টদের জন্যে রান্না করছে বালু। এখন তার দম ফেলবার ফুরসৎ নেই। কিছুক্ষণ পরেই খাওয়া শুরু হবে, তখন হয়ত ওকেই পরিবেশনের ভার নিতে হবে। ছোট রেস্টুরেন্ট। বেশি লোক রাখবে কোত্থেকে। কাজের শেষে ও হয়ত ছুটি পাবে সেই এগারোটা নাগাদ।

কিন্তু বালু এত রাতে কি একাই কোঠীতে ফিরবে! এই অন্ধকার ভ্যালি পেরিয়ে একটি যুবতী মেয়ে প্রায় মাঝরাতে ক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে ফিরে যাবে ঘরে! বালু সাহসী, তবু সাহসের একটা সীমা তো থাকা চাই।

নিজের ওপর রাগ হল। আমি বালুর ভালমন্দের কথা ভাববার কে। আমি তো তার খাওয়া পরা ভালোমন্দের দায়িত্ব নিইনি, তবে তার বিপদ-আপদের কথা নিয়ে চিন্তা করার কি অধিকার আছে আমার। জগতে এই শুকনো সহানুভূতির কি দাম আছে। এগুলোকে অক্ষমের আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিই বা বলা যেতে পারে।

ওপরের আকাশের দিকে চোখ পড়ল। রাতের আকাশ ভরে অগণিত নক্ষত্র। কি আশ্চর্য শান্ত আর স্নিগ্ধ। পূর্ব-দক্ষিণের আকাশে জ্বলজ্বল করছে একটি বড় তারা। মনে হল, নাগ্‌গরের অরণ্য আর তুষার পর্বতের ওপরে যে আকাশ, তারই বুকে তারাটা অতন্দ্র জেগে আছে।

অদ্ভুত একটা তৃপ্তি আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হল নাগ্‌গরের অরণ্যবাসে নির্বাসিত ঝিন্নি যেন ঐ তারার চোখে আমার দিকে চেয়ে আছে।

রোজই ভোরবেলা ওঠার অভ্যেস আমার। আগে টাট্টুতে চড়ে অনেকখানি দৌড়ে আসতাম। তারপর ফিরে এসে সূর্যোদয় দেখতাম আমার বাংলোর বারান্দায় বসে। আজকাল ভোরের চক্কর বন্ধ আছে। টাট্টু নিয়ে বেরোই সেই দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্নের দিকে। ভ্যালি পেরিয়ে গিয়ে বসি আমার নির্দিষ্ট জায়গায়।

আজ অনেকদিন পর ভোরবেলা বেরোলাম। টাট্টু রেখে পায়ে পায়ে বেরিয়ে পড়লাম বাজারের দিকে।

পথের ডানপাশে বিচ্ছিন্ন বসতি, আপেলের বাগান। বাঁদিকে দেওদারের জঙ্গল। বড় বড় কাণ্ড অনেক ওপর পর্যন্ত কংক্রিট পিলারের মত উঠে গেছে। তারপর ঝাঁক ঝাঁক সুঁচোলো সবুজ পাতার সমারোহ ডাল ভরে।

বনের ভেতর ঢুকলে ওপরের আকাশ ডালে পাতায় ঢাকা পড়ে যায়। মাঝে মাঝে এক চিলতে ফাঁক দিয়ে নীল আকাশ, সাদা মেঘ উঁকি দেয়। রোদের সোনা ঝর্ণার মত গলে ঝরে পড়ে ঐ ফাঁকে। তখন বনের কোল জুড়ে কি আশ্চর্য সমারোহ। কোথাও সবুজ ঘাসের ওপর সূর্যের কোমল আলো বিছানো। কোথাও বা বড় বড় পাথরের শ্যাওলা-ধরা চাঁই-এর ফাঁকে নাকছবির মত নানা রংয়ের ছোট ছোট ফুলে আলোর ঝিকিমিকি খেলা। সবার ওপর গাছের ডালপালাগুলো সোনালী সবুজ জাজিমে কালো সুতোর এমব্রয়ডারী কাজ দেখিয়ে অবাক করে দেয়।

আমি বহুদিন ঐ সরলবর্গীয় অরণ্যে একা একা ঘুরে বেড়িয়ে এর রোদ জল ঘাস পাতা ফুলে মেশা এক ধরনের অদ্ভুত মিশ্রিত গন্ধ আঘ্রাণ করেছি। কোন কোন দিন শরতের সকালে কিন্নর-কন্যার মত পার্বতী তরুণীদের বাঁশের তৈরি কিলতা পিঠে বেঁধে আপেল বাগিচার দিকে দল বেঁধে যেতে দেখেছি এই বনের পথে। তাদের সরল ভীরু চোখ শুধু চলার পথটুকুর ওপর বিছিয়ে থাকত। ছায়ায় আলোয় তারা চলত ঠিক যেন চঞ্চল চিত্রিত হরিণী।

আমি আজ বাজাবের পথে নেমে আসতে আসতে ঢুকে পড়লাম অনেক দিনের অদেখা দেওদার বনের ভেতর।

খানিক ভেতরে ঢুকে বন্যপ্রাণীর মত কতকগুলো বিচিত্র জীবকে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলাম। বাইরে আলোর উজ্জ্বলতা থাকলেও দেওদার বন তখনও অস্পষ্ট আলোছায়ায় তন্দ্রাচ্ছন্ন। আমি কয়েকটা গাছের আড়াল থেকে এই জীবগুলোকে দেখতে লাগলাম। ধীরে ধীরে ডালপালার অজস্র ঝোরকা পথে আলো এসে পড়তে লাগল। সেই আলোয় দেখতে পেলাম, ঠিক যেন কতকগুলো শ্বেত শূকর ইতস্ততঃ জড়াজড়ি করে ছড়িয়ে পড়ে আছে। কোথাও বা মিট শপের হুকে ঝোলানো ছাল ছাড়ানো ধাড়ি ছাগলের মত পড়ে আছে সারে সারে। অর্ধ উলঙ্গ হিপি তরুণ-তরুণীরা বনের গভীরে এই প্রান্তরটুকুকে তাদের নিশ্চিত বিশ্রামের জায়গা বলে নির্বাচন করে নিয়েছে।

সেই মুহূর্তে একটা ভয় আমার মধ্যে ধীরে ধীরে কুয়াসার মত ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যদি এই মুহূর্তে সেই পাহাড়ী তরুণীরা এসে পড়ে এই পথে! এই আবরণহীন আদিম মানুষগুলোকে যদি ওরা বিকৃত দেহভঙ্গিমায় দেখতে পায়!

আমার আশঙ্কাকে সত্য প্রমাণ করে ওরা এসে পড়ল। ওদের হাতে ধারালো অস্ত্র। কাঠ সংগ্রহের জন্য ওরা চলেছে বনের গভীরে!

ওরা ওদের পথ ধরে চলতে চলতে থমকে দাঁড়াল। শায়িত মানুষগুলোকে এক ঝলক দেখে নিয়ে দ্রুতগতি পাহাড়ী জলধারার মত পেরিয়ে চলে গেল!

কিন্তু আমি যে আশঙ্কা করেছিলাম ঠিক তাই ঘটল। দলটি বনের গভীরে ঢুকে থমকে দাঁড়িয়েছে। পেছন ফিরে আমারই মত গাছের আড়ালে নিজেদের ঢেকে ওদের দেখছে।

প্রথমে কৌতূহল। তারপর তরুণী নাভী থেকে কস্তুরীর গন্ধ উঠে আসবে ধীরে ধীরে।

সে গন্ধের টানে পা টিপে টিপে শুধু শিকারী জন্তুগুলোই আসবে না, নিজেদের গন্ধের সন্ধান পেয়ে নিজেরাই একদিন পাগল হয়ে উঠবে ওরা।

নিঃশব্দে পা ফেলে ফেলে ফিরে এলাম বাজারের পথে।

হঠাৎ সরকারী অ্যালুমিনিয়াম হাট-এর সামনে বিরাট বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে গেল : বিদেশী ট্যুরিস্টরা আমাদের সম্মানীয় অতিথি, তাঁদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

বাজার থেকে টুকিটাকি কেনাকাটা করে ফিরতে কিছু দেরী হল আমার। উঠে আসছিলাম, বাঁদিকে ট্যুরিস্ট লজের পথটার ওপর চোখ পড়ল। সাময়িক তাঁবু ফেলে রেস্টুরেন্ট তৈরি করা হয়েছে। কটা হিপি বসে চা খাচ্ছে। জায়গাটা খোলামেলা, তাই পরিবেশনকারিণীকে চিনতে আমার একটুও দেরি হলো না।

ঝকঝকে পোশাক আর হাসিতে বালু ঝলমল করছে। বালু আমাকে দেখছে না, কারণ মেন রোডের দিকে তার চোখ নেই। অতিথিরাই তার সব নজর কেড়ে নিয়েছে। গরমের দিনে রোদ এতখানি অল্‌টিচিউডেও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। বালুকে দেখে মনে হল, রোদের সব তীক্ষ্ণতাটুকু যেন ও ওর সর্বাঙ্গে মেখে নিয়েছে।

আমি বালুর দৃষ্টিসীমা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বাংলোর পথে পা বাড়ালাম।

গাছের আড়ালে যখন রেস্টুরেন্টটা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন কেমন যেন এক ধরনের অপরাধবোধ আমাকে আহত করতে লাগল। বালুর এই পরিণতির জন্যে কি আমি দায়ী নয়? তার সহজ জীবনযাত্রায় ভাঙন ধরানোর জন্যে আমার অবিবেচনা কি কাজ করে নি?

হঠাৎ মনে হল, বারবার আমি নিজেকে অপরাধী ভাবছি কেন? আমি তো কোন অন্যায় করিনি। বালু আমার সঙ্গে পরিচয়ের আগেও তার নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই পথ চলেছে। আজও সে সংসার চালানোর জন্যে যে পথ বেছে নিয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ তার নিজেরই দায়িত্বে। আমি শুধু অকারণ নিজেকে দোষী ভেবে দুঃখ পাচ্ছি।

কথাগুলো মনে মনে আবৃত্তি করে নিজেকে অনেকখানি হাল্কা মনে হল। দ্রুত পা চালিয়ে চলে এলাম আমার বাংলোয়।

রোগীরা দাঁড়িয়ে আছে লাইনে। আমি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ওরা আমাকে নমস্কার করল। মনে মনে লজ্জিত হলাম। অসুস্থ মানুষগুলিকে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখে গেছি। মনে মনে বললাম, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর, আমিও অসুস্থ। দারুণ একটা মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়েছিলাম আমি।

রোটাং থেকে কুলু অব্দি, বিপাশার উৎস থেকে বিস্তার পর্যন্ত উড়ে বেড়াল বুভুক্ষু পঙ্গপালের দল। প্রায় একটি মাস পূর্ণ করে মত্ত পঙ্গপালগুলো আবার উড়ে চলে গেল অতিথিবৎসল ভারতের অন্য কোন নগরে।

ভাগ্‌তুই খবর বয়ে এনেছিল। ভোরের গাড়িতে ফিরে গেছে বিদেশী ট্যুরিস্টরা। আরও খবর, পথের ধারের রেস্টুরেন্টগুলোর সব সাজসরঞ্জাম দুপুরেই তুলে নেওয়া হয়েছে।

ভাগ্‌তুর হাতে একখানা ফটো দেখে কৌতূহলী হলাম, দেখি ওটা কি ?

ভাগ্‌তু বোধহয় আমাকে দেখাতেই চেয়েছিল, তাই বলা মাত্র দারুণ খুশি হয়ে হাতের ফটোটা মেলে ধরল।

ছবিতে ভাগ্‌তু দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় কাপড়ের একখানা পাগড়ি বাঁধা, হাতে লাঠি।

বললাম, কোথায় ছিল এ ফটো?

ভাগ্‌তুর গলায় এবার গর্ব ফেটে পড়ল, সাহেব তুলে দিয়েছে।

হঠাৎ বিশ্রীরকম রাগ চেপে গেল। বললাম, ফ্যাল ফটো। তাই বুঝি ঘন ঘন বাংলোর বাইরে বেরিয়ে যাওয়া হত। ফ্যাল বলছি।

মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে ভাগ্‌তুর! সে আত্মরক্ষার জন্য শেষ অবলম্বনটি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করল এবার।

কেন, বালুদিদির ফটোও তো তুলে দিয়েছে সাহেব। বালুদিদি আমাকে দিয়েছে একখানা।

ভাগ্‌তুর কুর্তার পকেট থেকে আর একখানা ফটো বের করে তুলে ধরল আমার চোখের সামনে। এক ফলন্ত আপেল গাছ ব্যাক্‌গ্রাউন্ডে রেখে রাজপুতানীর পোশাক পরা বালু সহাস্যে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ওর হাত থেকে ছবিখানা নিয়ে দেখতে লাগলাম। এ কে ? এই যুবতীটিকে তো কোনদিন আমি দেখেছি বলে মনে আনতে পারছি না! বালুর চোখ কি এমন করে কোন পুরুষের দিকে উচ্ছল ইঙ্গিতে ঝলসে উঠত ? চাপা ঠোঁটের হাসিতে কি কোনদিন ফুটে উঠত এমনি আকুলকরা আমন্ত্রণ!

আমি ভাগ্‌তুর হাতে ফিরিয়ে দিলাম ঐ যুবতী মেয়েটির ফটোখানা।

হাওয়ায় ক্যালেণ্ডারের পাতা পত্‌ পত্‌ করে উড়ছে। আজ সতেরোই জুন। ছোটি বরসাত্‌ শুরু হয়ে গেছে। হাল্কা ধোঁয়ার মত পাত্‌লা পাত্‌লা মেঘ উড়ে চলেছে উত্তরের পাহাড় নিশানা করে। শোবার ঘরে বসে ভ্যালির ওপর চোখ পেতে আছি। ঝর্‌রি বরসাতের ঝিরঝিরে চিক দমকা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। ওপারের পাহাড়ের বারাণী খিল্লীতে কটা পুতুলের মত লোক ঘুরে ঘুরে বতর চাষে মেতেছে। ঐ সব বন্ধ্যা বাদামী রঙের পাহাড়গুলোতে লাঙ্গলের ফাল চলে না, তাই বীজ ছড়িয়ে দিয়েই ওরা চলে যায়। প্রকৃতির খেয়ালে যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

কিছু সময় ঝিম্‌ঝিম্‌ বৃষ্টি ঝরে আকাশটা ঝকঝকে হয়ে গেল। মেঘগুলো তাল তাল ময়লা তুলোর মত তুষার পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে। নীল নীল আকাশটা পাটভাঙা বেনারসীর মত ঝলকাচ্ছে! পাইনের সবুজ পাতাগুলো ঝলমল করছে। প্রেমিকার মানভাঙা মিষ্টি হাসির মত হলুদ রোদ্দুরটা চোখ জুড়িয়ে একেবারে বুকে এসে লাগল। সারা দেশের চেহারাটা মনে হল আমূল বদলে গেছে।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ থেকেই অঝোরে বর্ষা শুরু। বন্ধ কাচের সার্সি উল্টোদিকের

বৃষ্টির রেণু মেখে ভ্যালির দৃশ্যটাকে ঢেকে ফেলছে বারবার। আমি মাঝে মাঝে জানালা খুলে ওপারের কাচটা মুছে নেবার চেষ্টা করছি। অমনি এপার ওপারের হু হু হাওয়া আমার চাদরখানাকে উড়িয়ে নিয়ে বিছানাকে বে-আব্রু করে দিচ্ছে। দুটো দেয়াল-ক্যালেণ্ডার ভয়পাওয়া পাখির মত সাদা পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে কতকগুলো মাসের পাতা ফর্‌ফর্‌ করে উড়িয়ে দিয়ে আবার থেমে গেল।

আমি বন্ধ কাঁচের জানালায় মুখ ঠেকিয়ে চোখ পেতে বসে আছি। মেঘে মেঘে বিজলীর চক্‌মকি খেলা শুরু হয়ে গেছে। বাজের আওয়াজ পাচ্ছি মাঝে মাঝে। এখানে মেঘের ডাক বড় অদ্ভুত বাজতে থাকে। মেঘ ডাকলে আমি জানালার পাল্লা একটুখানি খুলে কান পেতে রাখি। শব্দটা একবার বেজে উঠলেই হল। তারপর পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে, গিরিগুহার ভেতরে ভেতরে সেই গম্ভীর আওয়াজটা বাঘের গর্জনের মত হুঁশিয়ারি দিতে দিতে ফিরতে থাকবে। কতক্ষণ পরে হাঁকতে হাঁকতে শব্দটা চলে যাবে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে।

একটা বাজ পড়তেই দারুণ আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কুরুল পাখি ভ্যালির বুকে বয়ে যাওয়া ছই বা স্রোতোধারাটির তীর থেকে লম্বা পাখা বৃষ্টিতে ভাসিয়ে উড়ে গিয়ে আবার একটু দূরে বসল।

ভাগ্‌তু এসে জানাল, এ বৃষ্টিতে ক'টি পেসেন্ট আমার ডিস্‌পেনসারির দাওয়ায় বসে অপেক্ষা করছে।

নীচে নেমে এলাম। চাষাভূষো কটি কানেত শ্রেণীর লোক গুটিসুটি মেবে বসে আছে। একটি লোক তো হি হি কাঁপুনি কাঁপছে।

বর্ষা শুরু হলেই দারুণ মশার উপদ্রব চলে। সারা আবাদী টিকাগুলো যেন তাদের দখলে। চাষাভুষোদের চাষের জো নেই। হুল ছুঁইয়ে দেওয়া মানেই শুইয়ে দেওয়া। বর্ষায় সারা অঞ্চলটার চাষী মানুষগুলোর অর্ধেক ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছে।

ওষুধ দিয়ে ওদের বিদেয় করলাম। যে লোকটা ম্যালেরিয়ার কাঁপুনিতে কাহিল হয়ে পড়েছিল, সে কাঁপুনি না থামা পর্যন্ত বসে রইল। ভাগ্‌তু তার সামনে কয়লার উনুনখানা বসিয়ে দিলে। লোকটা আগুন পেয়ে যেন বর্তে গেল।

একটু অবস্থাপন্ন বামুন ক্ষেত্রীশ্রেণীর লোকেরা বর্ষায় ধানক্ষেতের পাশ দিয়েই হাঁটবে না। তাদের ধারণা, মশা কামড়াক আর নাই কামড়াক ধানক্ষেতের হাওয়া গায়ে লাগলেই নির্ঘাৎ ম্যালেরিয়াতে পেড়ে ফেলবে।

এই বর্ষার ভেতর ক'দিন রোগী দেখতে বেরোতে হল। পাহাড় থেকে জলধারাগুলো যেন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে হার্ডল রেসে মেতেছে। জহরু, কুহল, নালা, নালু, ছই—সবরকমের ছোটবড় খাদ বেয়ে জল চলেছে তোড়ে পাক খেতে খেতে। গড়িয়ে পড়ছে ছোটবড় শিলা। আঘাতে আঘাতে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। সব নদী যেমন সমুদ্রে মেশে, এখানকার সব ক'টি জলস্রোত মেশে বিপাশায়।

আমার টাট্টুর নাম রেখেছি, চৈতক। বড় প্রভুভক্ত। প্রভুকে পিঠে নিলে সে অতি

সন্তর্পণে পা ফেলে চলে। বিপদের আঁচ পেলেই সে থমকে থেমে দাঁড়াবে। ভাঙনের পথে কখনও পা বাড়াবে না!

বর্ষার ভেতর পথ চললে ভারী সুন্দর একটা ছবি চোখে পড়ে। প্লাবিত ক্ষেতের ধারে মেয়েরা গায়ের কাপড় ভিজিয়ে রুহনী চাষে মেতেছে। হাঁটুর একটু নিচের থেকে অনাবৃত পাগুলো ফিকে হলুদ মোমের মত মনে হয়। পায়ের গোছ কাদায় ডুবিয়ে মাথা নুইয়ে ধানের চারা রোপণ করে। গলায় বাজে একটানা পাহাড়ী সুরের গান। বড় মিঠে সে সুর। বৃষ্টির সরোদ, মেঘের মাদলের সঙ্গে সে গানের সুর আশ্চর্য সঙ্গতি রেখে বাজতে থাকে।

রোপণের কাজটা মেয়েরাই করে। ওরা যখন কাজের ফাঁকে উঠে দাঁড়ায়, তখন ওদের রঙীন ভেজা কাপড়গুলো যৌবনের উদ্ধত শিখর আর উপত্যকাগুলোতে লেপ্টে থাকে। ঠিক মনে হয়, রেনোর অয়েলে আঁকা এক একটি ন্যুড স্টাডি।

আমি যখন টাট্টুতে চড়ে ওদের পাশ দিয়ে যাই তখন ওরা নিচু হয়ে থাকে না, উঠে দাঁড়িয়ে মিষ্টি হাসি আর চাহনি উপহার দেয়। অন্য কোন পাহাড়ী যুবক গেলেই তার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করে আর জল কাদা ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে। আমি দূরে চলে যেতে যেতেও ওদের হাসির জলতরঙ্গ বারবার বেজে উঠতে শুনি।

এ দুটো মাস পাহাড়ী দেশটাতে যেন বিপ্লব হয়ে গেল। পথঘাট, কাঠের ব্রীজ ধ্বসে ভেঙে ভেসে গেল জলে। রোগী নেই ডাক্তারের। বেড়িয়ে বেড়ানোর সুযোগও নেই। ঘরের ভেতর বসে বসে কুঁড়ে হয়ে গেলাম। এ সময়গুলোতে ঝিন্নিকে কাছে পেতে দারুণ ইচ্ছে করে। মাঝরাতে পশলা বৃষ্টির আওয়াজে যখন ঘুম ভেঙে যেত, তখন জানালার কাছে উঠে গিয়ে বসতাম। মনে হত, এমন দিনগুলোতে ঝিন্নি থাকলে পেছন থেকে গলা জড়িয়ে আমার কাঁধের ওপর ওর থুত্নি রেখে আমারই মত জানালা দিয়ে চেয়ে থাকত বাইরে। আলোর তন্তু ছড়িয়ে যখন বিদ্যুৎ চমকাত, তখন ও সজোরে আমাকে জড়িয়ে ধরে মুখ লুকোত আমারই মুখে।

চিঠি লিখতে আর ভাল লাগে না। শুধু, তুমি নেই, বলতে বলতে ডজন কয়েক প্যাডের কাগজ উড়ে গেল। কোনদিন বেলা শেষে মেঘের ফাঁকে হঠাৎ মোলায়েম হলুদ আলোটুকু ফুটে উঠলে আমি বাগানে নেমে গিয়ে ঐ আলো গায়ে মেখে নিতাম। রঙটা আবরণ খসা ঝিন্নির বুকের বড়ো কাছাকাছি। একটা রোমাঞ্চ আমার সারা শরীরে হেমন্তের ভোরবেলাকার বাতাসের মত শিউরে উঠত।

জলের স্রোত খর থাকলেও আজকের যাত্রায় আমার চৈতক অতি সাবধানে পাথরের ওপর পা রেখে স্রোতের বেগ ঠেলতে ঠেলতে ওপরে গিয়ে উঠল। তারপর ভ্যালি পেরিয়ে অনেকদিনের পরে পৌঁছলাম আমার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে।

ওপরে গমভাঙা কলের আওয়াজ পাচ্ছিলাম। শব্দটা অনেকদিন পরে শুনছি, তাই কানে বেশ মিষ্টি লাগল। চৈতককে বেঁধে রেখে বসলাম আমার নির্দিষ্ট আসনে। পাথরটা সারা

বর্ষা ধোলাই হতে হতে কেমন যেন চক্‌চকে হয়ে গেছে। পাথরের তলা থেকে ক'টি ফুল উঁকি দিচ্ছিল। আমি বসে বর্ষাশেষের অপরাহ্ণ-প্রকৃতিকে দেখতে লাগলাম।

হঠাৎ কার সাড়া পেয়ে পেছন ফিরে দেখি, একটি মেয়ে আমার চৈতকের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। আমি পাশ থেকে মেয়েটিকে চিনতে পারলাম না। ওর পাশে বসানো একটি থলেতে বোধহয় পেষাই করা গম রয়েছে।

মেয়েটি চৈতকের গা থেকে হাত নামিয়ে থলেটা তুলে নিতে যেই মুখ নামাল, অমনি আমি চম্‌কে উঠলাম।

বালু! এমন চেহারা হয়েছে বালুর! চেনাই যাচ্ছে না। শীর্ণ রক্তশূন্য একটি অচেনা মেয়ে যেন আমার একটু দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বালু চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, চলে যাচ্ছ বালু?

বালু থামল। তারপর মুখখানা নিচু করে পায়ে পায়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

বললাম, কতদিন তোমাকে দেখি নি বালু। সেই যে তুমি বাংলো থেকে চলে গেলে, আর একটিবারও এলে না।

বালু চোখদুটো পথের ওপর পেতে রেখে পায়ের আঙুল ঘষতে লাগল।

আবার বললাম, ভুল যদি আমি কিছু করে থাকি তাহলে সেটাই কি চিরকাল মনে করে রেখে দেবে বালু? এতদিন একসঙ্গে যে কাজ করলাম, পথ চললাম, তার কি কোন দাম নেই?

বালু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বললাম, সেদিন আমি তোমাকে আঘাত দিয়েছিলাম বালু, কিন্তু তুমিও আমাকে কম আঘাত দাও নি।

বালু আমার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে ভেজা চোখে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, আমাকে আমার ভুলটুকু শুধরে নেবার সুযোগ তুমি দিলে না। এতে আমি কম আঘাত পাই নি।

বালু ক্রমাগত মাথা দোলাতে লাগল। সে যে মনেপ্রাণে আমাকে আঘাত দিতে চায় নি, তাই বোধহয় বোঝাতে চাইল মাথা দুলিয়ে।

এক সময় বালু বলল, আমার ভাগ্য বাবুজী। আমি আপনার কাছে ফিরে গেলাম না, তাই নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

বললাম, শরীরটা তোমার বড় ভেঙে গেছে বালু। কাল থেকে তুমি চলে এসো ডিস্‌পেনসারিতে। কাজ যেমন করছিলে তেমনি করবে। শরীর মন দুটোই ভাল থাকবে।

বেলা পড়ে আসছিল। বালুকে বললাম, নীচের ছইয়ের স্রোত এখন খুব বেশি। টাট্টু নিয়ে সন্ধ্যায় পেরোনো ঠিক হবে না। আমি আজ চললাম, কাল সকালে যেন তোমাকে চেম্বারে দেখতে পাই।

বালুর ভিজে চোখে ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠল।

আমি চৈতকের বাঁধন খুলে নিয়ে চেপে বসলাম। পাহাড়ী পথে ঘুরে ঘুরে নামছি আর

মাঝে মাঝে মুখোমুখি হচ্ছি বালুর। ও ঠায় দাঁড়িয়ে আছে আমার দিকে চেয়ে। কেমন যেন বিষণ্ণ ধূসরতার মূর্তি বলে মনে হয়।

বালু এখন আগের মত কাজে যোগ দিয়েছে। ছেঁড়া তারটা পরিয়ে তানপুরোটাকে বেঁধে নিয়ে যেন রোজকার রেওয়াজ শুরু হয়েছে! কোথাও কিছু অপূর্ণতা নেই।

ঝিন্নির একটি অনুরোধই শুধু রেখেছি। আমি আর বালুকে নিয়ে বাইরের কলে বেরোই না।

দেখতে দেখতে আরও দুটো মাস কেটে গেল। সেপ্টেম্বরের শেষে চাচাজী এলেন ফলের বাগিচার তদারকির কাজে।

বালুকে বললাম, এবার আর মিঃ বেননের বাগানের কাজে গিয়ে তোমার দরকার নেই বালু। তুমি ইচ্ছে করলে আমার বাগিচায় কাজ করতে পার। আমি চাচাজীকে বলে দেব।

বালু মাথা নেড়ে সায় দিল, আর আমি চাচাজীকে বালুর জন্যে অনুরোধ জানিয়ে কথা আদায় করে নিলাম।

পুরো সেপ্টেম্বর আর অক্টোবর ফল সংগ্রহ আর প্যাকিংয়ের কাজে মেতে রইল মানালীর তরুণী মেয়েরা। আর ঠিক অক্টোবরের শেষেই অভাবনীয় ঘটনাটা ঘটে গেল।

একদিন বাগিচা থেকে নিচে নামছিল বালু, হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় ধরাধরি করে নিয়ে এল আমার চেম্বারে।

বালুকে পরীক্ষা করে আমি চম্‌কে উঠলাম। কি সর্বনাশ, বালু সন্তানের মা হতে চলেছে! আমি ডাক্তার হয়েও এতকাল ধরতে পারিনি ওর দেহের পরিবর্তন! ওর পোশাকের আড়ালে ও নিজের ভুলের ফসলকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এতকাল! আর আমি গভীর আকর্ষণে অসহায় ভেবে মেয়েটিকে আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু বেশি কিছু ভাবার সময় নেই তখন। জরুরী একটা অপারেশনের জন্যে তৈরি হলাম। তাড়াতাড়ি অপারেশন না করলে রোগীকে বাঁচানোই দায় হয়ে উঠবে। যত বড় অপরাধ করুক বালু তার বিচার এই মুহূর্তে নয়। সব বিচারের চেয়েও বড় কথা এখন ডাক্তারের কর্তব্যটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাওয়া।

ভাগ্‌তুকে পাঠিয়ে দিলাম পণ্ডিতজীর কাছে। বলে পাঠালাম, একটু সুস্থ হলেই মেয়ে যাবে তাঁর কাছে। চিন্তিত হবার কিছু নেই।

এদিকে কম্পাউণ্ডার শিউশরণজীর সাহায্য নিয়ে শেষ করলাম অপারেশনের কাজ। বালু বেঁচে গেল এ যাত্রায়। নির্জীবের মত বেডের ওপর পড়ে রইল সারারাত।

আমি আলো জ্বেলে বসে আছি বালুর মাথার কাছটিতে। ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে। শিউশরণজীকে পাঠিয়ে দিয়েছি তাঁর কোঠিতে। একবার শুধু চাচাজী এসে দাঁড়ালেন দরজার বাইরে। যতটুকু আলো বাইরে পড়েছিল তাতে দেখলাম, একটি থমথমে গম্ভীর মুখ ঘরের ভেতরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মুহূর্তে সে মুখ দরজার কাছ থেকে সরে গেল।

সম্ভবত চাচাজী কম্পাউণ্ডার শিউশরণজীর কাছ থেকে ঘটনাটা জেনে থাকবেন।

রাতে বসে বসে আর কোন কথা মনে এল না। বালুর করুণ মুখখানা শুধু চোখের ওপর বারবার ভেসে উঠতে লাগল।

অপরাধ করেছে বালু? না কোন অপরাধ সে করেনি। যা করেছে তাকে বড় জোর একটা বড় রকমের ভুল বলা যেতে পারে।

বালুর সঙ্গে বহুদিন আগে ভ্যালিতে বসে চাঁদের আলোয় ওর হাত দেখার মিথ্যে অভিনয় করেছিলাম। সে রাতটার কথা মনে পড়ল। বালুর বিয়ের প্রসঙ্গ তুলেছিলাম সেদিন। সঙ্গে সঙ্গে তরুণী মনের গভীর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠেছিল। পঙ্গু পিতাজীকে নিঃসঙ্গ ফেলে রেখে স্বামীর ঘরে কি করেই বা সে চলে যাবে।

তার তরুণী মনের দমিত ইচ্ছাগুলো হয়ত মুকুলিত হচ্ছিল আমাকে কেন্দ্র করে। প্রকাশের সাহস তার হয়নি কোনদিন। শুধু কাজের ঘূর্ণিতে ঘুরেছে আমাব সঙ্গে দেহলগ্ন ছায়ার মত।

তাই কোন কোনদিন ওকে কোঠিতে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে আমি চাঁদের আবছা আলোয় ভ্যালি থেকে মুখ ফেরালেই দেখেছি ও তেমনি আমার চলার পথের দিকে চোখ পেতে চেয়ে আছে। এর অর্থ একটিই মাত্র হতে পারে। একটি হৃদয়ের উত্তাপের জন্য তরুণী মনের অনুচ্চারিত প্রার্থনা।

বালুর ওপর আমার সহানুভূতির অন্ত নেই। কিন্তু আমার সারা বুক ভরে রয়েছে ঝিন্নি। সেখানে কোন প্রতারণার খেলা চলে না।

ঝিন্নি যেদিন এল, সেদিন বালু নিশ্চয়ই মেয়েদের বিশেষ ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে বুঝতে পেরেছিল তার স্থান আমার কাজের ভেতর থাকলেও হৃদয়ের ভেতর নেই। সে নীরবে হয়ত স্বীকার করে নিত তার ভাগ্যকে, কিন্তু আমার কাছ থেকে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আঘাত পেয়ে তার ছোট বুকখানা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

তার রেষ্টুরেন্টের কাজ নেওয়ার ভেতরেও নিজেকে যে কোন কাজে যুক্ত করে রেখে আগের কর্মজীবনটাকে ভুলে যাবার তাগিদ থাকতে পারে।

তারপর মাঝরাতে যখন সে ফিরে গেছে ভ্যালির পথে কোঠীর দিকে, হয়ত কোন লোভী ট্যুরিস্ট তাকে সঙ্গ দিয়েছে। রাতের পর রাত নির্জন পথে দুটি তরুণ তরুণীর চলার ভেতর দিয়ে বুঝি ঘটেছে তাদের নিবিড়তা। বালুর অবদমিত বাসনা হয়ত তার বিদেশী বন্ধুর আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে পারেনি। তারপর জীবন বয়ে গেছে প্রকৃতির স্বাভাবিক খাতে। বিদেশী পাখি কখন উড়ে চলে গেছে অসমাপ্ত বাসাখানা আবর্জনার মত ফেলে রেখে।

বালুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, একটা অসহায় বেদনার ছবি ফুটে আছে সেখানে।

ভোরবেলার দিকে আমি টেবিলের ওপর মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে দেখি বালু অনেক স্বাভাবিক চোখে তাকাচ্ছে, শুধু নিদারুণ একটা সংকোচ তার সারা মুখখানাকে রক্তিম করে তুলেছে।

বাইরের দাওয়ায় বেরিয়ে এলাম। বেলা অনেকখানি বেড়ে গেছে। ইতিমধ্যে ভাগ্‌তুও সকালের ভ্রমণ সেরে ফিরে এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও কি নিয়ে যেন আস্ফালন করছিল। একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাচাজী আর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে কম্পাউণ্ডার শিউশরণজী। চাচাজীর মুখখানা কেন যেন পাথরের মত শক্ত দেখাচ্ছে।

শুনলাম, ভাগ্‌তু তার ক্রাচ্‌খানা পাথরের ওপর ঠুকে ঠুকে বলছে, না এলো ভারী বয়েই গেল। যতক্ষণ ভাগ্‌তুর হাত আছে ততক্ষণ সে কাউকে ডরাবে না।

বললাম, কি হল, এমন চেঁচাচ্ছিস্ কেন?

ভাগ্‌তু বলল, মুন্‌নী সাফ জবাব দিয়েছে সে আর রান্নার কাজে আসবে না।

একটু অবাক হলাম বৈকি। কারণ মুন্‌নীর মুখেই শুনেছি, এ তল্লাটের লোকেরা নাকি বলে ডাক্তারবাবুর মত মনিব পাওয়া ভার।

বললাম, তুই কি ওর কাছে গিয়েছিলি? কেন আসবে না কিছু বলল?

ভাগ্‌তু বলল, বেলা বাড়ছে দেখে ওকে ডাকতে গিয়েছিলাম। ও বলল কি, তোর ডাক্তার বদ্ লোক আছে, ও বাংলোতে আর কোন মেয়ে নোক্‌রি করতে যাবে না।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা তাহলে এতদূর গড়িয়েছে! বালুর এই স্খলনের পুরো দায়িত্বটা ওরা তাহলে আমার ওপরেই চাপিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত এসব রটনা কম্পাউণ্ডার শিউশরণজীর। তাঁর রাজ্যে বালুর প্রবেশকে তিনি কোনদিনই সুনজরে দেখেন নি। আবার এমনও হতে পারে, কাল যখন আপেল বাগিচার মেয়েরা বালুকে অচৈতন্য অবস্থায় বয়ে আনে তখনই ব্যাপারটা ওদের কাছে আর গোপন থাকে নি!

বালু দীর্ঘদিন আমারই কাছে কাজ করেছে। দু'পাঁচখানা টিকার মেয়ে পুরুষে জানে, ডেলিভারী কেসে বালু আমাকে সাহায্য করে। অতি কৌতূহলী কেউ বা রাতের বেলা আমাদের নির্জন ভ্যালি পেরিয়ে যেতে দেখে থাকবে। তাই কি আমাকে বালুঘটিত অঘটনের আসামী ভেবে নিয়েছে ওরা!

ভাগ্‌তুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে বললাম, তুই কাজে যা।

ভাগ্‌তু চলে যাবার আগেই দেখলাম, শিউশরণজী আর চাচাজী আউট হাউসের দিকে সরে গেলেন।

আমি আবার ফিরে এলাম বালুর কাছে। বাইরের কথাগুলো অবশ্যই ঘর পর্যন্ত পৌঁছে থাকবে, তাই বালুর গাল বেয়ে দেখলাম ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে।

আমি তোয়ালে দিয়ে ওর মুখ চোখ মুছে দিলাম। ভেবেছিলাম আমার ছোঁয়া পেয়ে বালু হয়ত আরও চোখের জল ফেলবে, কিন্তু তা ও করল না। ওর চোখে মুখে কেমন যেন ভয়ের ছায়া ফুটে উঠতে দেখলাম। বুঝলাম, ও অনুশোচনায় কাঁদছিল, পরে ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়েছে।

বললাম, নিশ্চিন্তে শুয়ে থাক বালু, কোন ভয় নেই। তোমার পিতাজীর জন্যে ভাবনা করো না, তাঁর ব্যবস্থা আমি করছি।

এবার বুঝি অসীম কৃতজ্ঞতায় বালুর চোখ দিয়ে জল উপচে পড়তে লাগল। বুক ঠেলে যে কান্নার শব্দটা বেরিয়ে আসতে চাইছিল, অধর দংশন করে তাকে প্রাণপণে ঠেকাবার চেষ্টা করল সে। তারপর একসময় যখন সব চেষ্টা ব্যর্থ হল তখন দুটো হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল বালু।

শরতের অর্ধেক ফসল আর ঘরে এল না। আমার ফলের বাগিচায় মানালীর কোন মেয়ে আর কাজ করতে আসেনি। চাচাজী বালুর ঘটনার পরের দিনই কুলু চলে গিয়েছিলেন। যাবার সময় শুধু বলেছিলেন, দাদাজীর কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব বাবুজী! আপনার কাজ আজকে আপনি সমঝে নিন।

কথাটা বলেই দুটো হাত ওপরের দিকে তুলে বোধ করি আমার পরলোকগত পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করেছিলেন!

আমি কোন কথা বলি নি। প্রতিবাদ নয়, থেকে যাবার জন্যে অনুরোধও নয়। শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

ডিসপেনসারিতে রোগীর ভীড় কমে গেছে। মেয়েরা আসে না রোগ দেখাতে। সারাদিন বাংলোর ভেতর কেটে যায়। শুধু দুপুরে অব্যাহত আছে পাহাড়ী ছেলেগুলোর হুটোপুটি খেলা। ওদের এখন দিয়ে দিয়েছি ফলের বাগানের পুরোপুরি অধিকার। সেলফিশ জায়েন্টের পাঁচিল উঠে গেছে। এখন আমার বাগানের গাছে গাছে নিষ্পাপ শিশুদের দুরন্ত কলরোল।

বালু সুস্থ হয়ে উঠলে ওকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম ওর কোঠীতে। আশেপাশের মেয়েপুরুষ আগে আমাকে পথ চলতে দেখলেই সম্ভ্রমে মাথা নোয়াতো। কখনো বা তরুণী মেয়েরা মিষ্টি হাসি উপহার দিত। মায়েরা তাদের শিশুদের হাতজোড় করে নমস্কার করতে শেখাত।

কিন্তু বালুর সঙ্গে আমাকে পথে বেরোতে দেখে উঠোন থেকে মেয়েরা ঘরের ভেতব গিয়ে ঢুকল। চলতি পথের লোকেরা একবার তাকিয়ে পাশ কাটিয়ে হনহন করে চলে গেল।

আমি কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বালুর সঙ্গে গল্প করতে করতে এগিয়ে চললাম।

বালু পথের ওপর চোখ পেতে চলছিল। আমি এ ক'দিন অনেক বুঝিয়ে ওর মনের ওপর থেকে অপরাধবোধের কালো দাগটা অনেকখানি মুছে ফেলতে পেরেছিলাম, কিন্তু স্বাভাবিক সংকোচে চোখ তুলে কথা বলার শক্তি ও হারিয়েছিল।

আবার সেই পুরোনো ভ্যালিতে আমরা দুজনে পাশাপাশি চলেছি। পূর্ণ চাঁদের রূপোলী থালাখানা পাহাড়ের মাথায় পাইন গাছেব ডালে তেমনি আশ্চর্যভাবে আটকে আছে! বালুর পাশাপাশি চলতে চলতে গভীর এক আত্মতৃপ্তিতে আমার মন ভরে উঠেছে। হয়ত এটা যৌবনেরই ধর্ম। পরিণত বয়সে যাকে বিচার করে আমরা বাতিল করে দিই, যৌবনে তাই আমরা ধুলি ঝেড়ে তুলে নিই অনেক সমাদরে।

বালুর কোঠীতে ঢোকার আগে শুধু বললাম, কোন গ্লানি মনে রাখতে নেই বালু। মনে রাখা মানেই তাকে পুষে রাখা। মনের পাপ মনই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেবে। মাথা উঁচিয়ে পথ চলবে।

বালু হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। আমার সামনে নতজানু হয়ে বসে আমার হাতখানা টেনে নিয়ে ওর কপালে ছুঁইয়ে নিলে।

নাগ্‌গর থেকে চিঠির আশা করছিলাম কিন্তু কুলুর স্ট্যাম্প লাগানো চিঠি এল আমার হাতে। অবশ্য চিঠি যে ঝিন্নির তা ঠিকানার লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছিল।

চিঠি পড়ার আগে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম। আমি জানি না চিঠিতে কি আছে তবু মনে হল একটা অভাবিত কিছু আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে এ চিঠিতে। আমি যেন ভাগ্যের পাশা হাতে তুলে নিয়ে বসে আছি, কি দান পড়বে তা একেবারে আমার অজানা। কিন্তু এই শেষ দানটিতেই নির্ভর করছে আমার নিশ্চিত হারজিৎ।

চিঠি খুললাম। তার আগেই মনকে আমি প্রস্তুত করে নিয়েছি।

প্রথম সম্বোধনের ভাষাই পালটে দিয়েছে ঝিন্নি :

শ্রদ্ধাভাজনেষু

রিপ ভ্যান উইঙ্কল-এর মত দীর্ঘদিন একটা আশ্চর্য ঘুমের জগতে কাটিয়ে হঠাৎ জেগে উঠে দেখি আমার চারদিকের সবকিছু পাল্টে গেছে। কতকগুলো অদ্ভুত স্বপ্ন আমি দেখেছিলাম। আর স্বপ্নগুলোকে সত্যি বলে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে ভেবে বসেছিলাম। ঘুম ভেঙে দেখি তারা কখন নিঃশব্দে সরে গেছে, কিন্তু আশ্চর্যভাবে পাল্টে দিয়ে গেছে আমার পুরোনো জগতটাকে।

স্বপ্নের স্মৃতিগুলো নিয়ে এই মুহূর্তে আমার কোন কান্না নেই। তবে আমি এতকাল যে জীবনটাকে ভুলেছিলাম, তাকে আবার কে আমার কাছে ফিরিয়ে এনে দেবে?

আমার পা দুটো আড়ষ্ট হয়ে আসছে যখন ভাবছি আবার ক'দিন পরে নাগ্‌গরের চড়াই ভেঙে আমাকে ওপরে উঠতে হবে। আবার ঢুকতে হবে আমার ঐ কোয়ার্টারে। যেখানে একদিন আমি আমার সব খুইয়েছি, সেখানে জানি না কোনদিন আর নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারব কিনা। প্রতি রাতে দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠে আমাকে সব হারানোর কান্না কাঁদতে হবে। আমার বিভীষিকার সে রাতগুলো কতদিন আমাকে কাটিয়ে যেতে হবে তা কে বলে দেবে?

আজ কারো ওপর কোন অভিযোগ আমার নেই, যদি থাকে সে শুধু নিজের ওপর। জীবনে সরল বিশ্বাসে সবকিছুকে মেনে নিলে যে কোন মুহূর্তে সর্বস্ব হারানোর সম্ভাবনা থাকে। পরিতৃপ্ত সুখী জীবনের স্বপ্ন বোধহয় দেখতে নেই, তাহলে ওটা চিরদিন স্বপ্নই থেকে যায়।

জীবন নিয়ে যে বেপরোয়া জুয়া খেলে যেতে পারে হয়ত কোনদিন তারই জেতার সম্ভাবনা থাকে। অন্তত হারলে তার বুকখানা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় না। কারণ সে জানে সে খেলোয়াড়। ভালবাসার খেলায় এক জায়গায় হারলে অন্য জায়গায় জেতার জন্যে তাকে লড়াই করে যেতে হবে।

নাগ্‌গরের ফরেস্ট গার্ডের ছোট্ট কোঠীতে আমি ইদানীং প্রায়ই পড়ে থাকতাম দেখে বুড়ো গার্ড হেসে বলত, আমার তো ছুটির সময় হয়ে এল, এবার চাকরিটা তুই নিয়ে নে বেটী, তাহলে এ কোঠীও তোর হয়ে যাবে।

এবার ফিরে গিয়ে যখন আর ওপথে পা মাড়াব না, তখন বুড়োই হয়ত আসবে নীচে। জিজ্ঞেস করবে আমার না যাবার কারণ। ওর প্রশ্নের জবাব আমি আর কোনদিনও খুঁজে পাব না।

ভাগ্যের সবচেয়ে বড় কৌতুক, যখন সব দোর ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ আমি চাচাজীর কাছে গৃহ-প্রবেশের জন্য আকুল আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি।

শুধু অনুরোধ, আমার সঙ্গে তোমার পরিচয়ের স্মৃতিগুলো আব কোনদিন কোনভাবেই আমাকে মনে করিয়ে দিও না।

আমাকে আমার দুঃখগুলো আমার মত করেই বইতে দাও।

একটি অতি নির্বোধ মেয়ে।

চিঠিখানা বিকেলের ডাকে এসেছে। পশ্চিমের জানালা দিয়ে শেষবেলার রোদ এসে পড়েছে বিছানায়, চিঠির পাতায়।

কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আমার নেই। বড় ক্লান্ত লাগছে। নির্জনে একদিন খেলা শুরু হয়েছিল, সমস্ত মন নিবিষ্ট হয়ে সে খেলা খেলে চলেছিল। কিন্তু হঠাৎ বাঁশি বেজে উঠতেই চমকে উঠলাম, ভুল তো আমি কিছু করিনি। তবে হুইসল্‌টা বাজল কেন? প্রশ্ন নয়, অদৃশ্য পরিচালকের ভুল একটা বাঁশির সংকেতে আমি হেরে গেলাম। এবারের মত খেলা আমার শেষ।

বসে আছি উত্তরের ভ্যালির দিকে চোখ পেতে! ছোট্ট স্রোতোধারাটি বুক ভরে জল নিয়ে ছুটে চলেছে। পাইনের সবুজ পাতাগুলো হাওয়ায় কাঁপছে তিরতির করে। পীর পাঞ্জালের মাথায় শেষসূর্যের সোনা গলে ঝরে পড়ছে। কত যুগ ধরে প্রকৃতির বুকে চলেছে এমনি নিরন্তর খেলা। এরা কেউ তো সরে যায় নি খেলার আসর থেকে। আমাকেই শুধু সরে যেতে হল।

যার হৃদয় আছে, যার অভিমান আছে সেই শুধু পারে না উঁচু গলায় প্রতিবাদ জানাতে। সে জানে জীবনের এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রতিবাদ চলে না। প্রতিবাদ সেখানে শুধু নিজের কাছেই হার মানা।

জীবনের মুখোমুখি যখন আর একটি মানুষ এসে দাঁড়ায়, তখন তাকে মুহূর্তেই চিনে নিতে হয়। সেই প্রথম দেখায় যদি ওকে চেনা না যায় তাহলে সারাজীবন ধরে মোটা মোটা সাইকোলজির বই উল্টে পরীক্ষা চালালেও তাকে আর চেনা যাবে না।

ঝিন্নি যদি নাগ্‌গরের মৃত্যুশীতল পাহাড়ের কোলে আমার ছড়ানো উত্তাপ তার বুকের মধ্যে ভরে নিতে না পেরে থাকে তাহলে সূর্যের সমস্ত উত্তাপ ঢেলে দিলেও তাকে হয়ত আর কোনদিন উত্তপ্ত করে তোলা যাবে না! বুকের ভাষা কেউ কাউকে শিখিয়ে দিতে পারে না, নিজেকেই তার পাঠোদ্ধার করে নিতে হয়।

এই মুহূর্তে কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে, যে ঘরে আমি বসে আছি সেটা আমার ঘরই নয়। আমি এই পাহাড়ী দেশে বেড়াতে এসে উঠেছি এই হোটেলে। এর পাহাড় পর্বত

নদী অরণ্য মানুষ সবই দেখা হল, এখন সব পাওনা চুকিয়ে দিয়ে বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে নিজের ফেলে আসা পুরাতন আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া।

অসংলগ্ন ভাবনার ভারে আমার দিনগুলো যখন এমনি মন্থর আর রাতগুলো বড় ক্লান্ত তখন এক সন্ধ্যায় ঝড়ের মত আমার ঘরে এসে ঢুকলো জুলিয়েন।

আমার সেই মুহূর্তে মনে হল ও যেন বদ্ধ ঘরের ভেতর একরাশ প্রাণের হাওয়া বইয়ে দিলে। আমি বিষণ্ণতার অন্ধকারে দম বন্ধ হয়ে তিলে তিলে ব্যথার প্রহর গুনছিলাম, ও যেন এসে সব ক'টা জানালা খুলে দিয়ে বলল, নাও কত হাওয়া নেবে।

বেশ কিছুক্ষণ দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকার পর ও হঠাৎ বলে উঠল, অসম্ভব, এ কখ্খনো হতে পারে না মুখার্জী!

ম্লান হেসে বললাম, দাঁড়িয়ে রইলে যে, বোসো।

ও বসলে আবার বললাম, কি হতে পারে না জুলিয়েন?

জুলিয়েন হাত নেড়ে বলল, আমি বাস থেকে নেমেই মদনলালের মুখোমুখি হয়েছিলাম। স্কাউন্ড্রেলটা সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে জড়িয়ে বালুর সম্বন্ধে একটা কেচ্ছা আমাকে শুনিয়ে দিলে। ওর নাক আমি উড়িয়ে দিতাম। ব্যাটা পালিয়ে বেঁচেছে।

বললাম, ঠিকই শুনেছ।

জুলিয়েন প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, থামো। ডাক্তার মুখার্জীকে চিনতে আমার আর বাকি নেই। তুমি আর নতুন করে আমাকে চেনাতে এসো না।

সেই মুহূর্তে গভীর একটা ব্যথা আমি বুকের ভেতর বোধ করতে লাগলাম। জুলিয়েনের চোখ যে সত্যকে মুহূর্তে চিনে নিল, আমার ঝিন্নির চোখ ঝাপসা হয়ে গেল সেখানে।

বললাম, ঝিন্নিও আমাকে যেখানে অপরাধী সাব্যস্ত করল সেখানে তুমি আমাকে বেকসুর মুক্তি দিতে চাও!

জুলিয়েন মুখ নীচু করে রইল কতক্ষণ। একসময় বলল, তোমার মুখ থেকে সবটুকু ঘটনা আমি জানতে চাই মুখার্জী।

বালুঘটিত সমস্ত ঘটনা পরপর সাজিয়ে শোনালাম জুলিয়েনকে। সঙ্গে সঙ্গে বালু সম্বন্ধে আমার ধারণার কথাও জানিয়ে দিলাম। এখনও যে বালুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে সেটুকুও মনে কোনরকম দ্বিধা না রেখেই বলে গেলাম।

জুলিয়েন বলল, বালু হঠাৎ একটা ভুল করে ফেলতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন আমি ওকে দেখেছি আমার বাগানের কাজে। এমন একটা সাচ্চা মেয়ে আমার চোখে খুব কমই পড়েছে মুখার্জী।

বললাম, তোমার ধারণার সঙ্গে আমার সবকিছু আশ্চর্যভাবে মিলে যাচ্ছে জুলিয়েন।

প্রস্তাবটা এল জুলিয়েনের মা মিসেস বেননের কাছ থেকে। সব শুনে আমি স্তম্ভিত। চায়ের নিমন্ত্রণে ডেকে জুলিয়েন আমার সঙ্গে কি রসিকতা শুরু করলে! একটু দূরে বসে জুলিয়েন চোখ টিপে টিপে হাসছিল।

মিসেস বেনন প্রথমেই আরম্ভ করলেন, ডাক্তার, আমি খুবই দুঃখিত যে জুলিয়েন না থাকায় বালুর ব্যাপারে সব দোষটা তোমার ওপরেই পড়েছে।

আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম।

আবার মিসেস বেনন তাঁর কথার জের টেনে বললেন, জুলিয়েন আমাদের ব্যাপারটা যদি আগে জানাত, তাহলে আমরা বালুকে ঐ অবস্থায় ঘরে এনেই রাখতাম। ও ট্যুর থেকে ফিরে এলে ব্যবস্থা করতাম বিয়ের। তুমি জানো মুখার্জী, আমার নব্বুই বছরের শাশুড়ী এ দেশেরই মেয়ে।

আমার বিস্ময় তখন চরমে উঠেছে। বালুঘটিত সব দোষটাই জুলিয়েন নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে কখন। সে ইতিমধ্যে তার পরিবারকে রাজী করিয়েছে। শুধু তাই নয়, আমার ওপর যে মেঘ জমে অজস্র বর্ষণ আর বিদ্যুতে আমাকে বিব্রত করে তুলেছিল তাকে বিপরীত হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছে।

আমি বললাম, বালুকে কি আপনার বেনন পরিবারের একজন করে নিতে চান?

মিসেস বেনন বললেন, নিশ্চয়ই। অন্যায়কে বাড়তে দেওয়া ঠিক নয় বাবা।

এই প্রথম মিসেস বেনন আমাকে 'মাই সন' বলে সম্বোধন করলেন। তিনি এবার বললেন, তুমি জুলিয়েনের বন্ধু, তাই বালুর পিতাজীর কাছ থেকে তোমাকেই সম্মতিটা আদায় করে আনতে হবে। আর তোমাকে একটা কথা বলে রাখি বাবা, বালু তার বাবাকে যাতে নিজের কাছে রেখে সেবা করতে পারে সে ব্যবস্থাও আমি করে দেব।

বললাম, এ ব্যাপারে আশা করি পণ্ডিতজীর মত পেতে বিশেষ অসুবিধে হবে না।

বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি আর জুলিয়েন। ওদের কোয়ার্টারের আড়ালে এসেই ওকে ধরলাম, ভেতরে ভেতরে প্ল্যানখানা এতদূর গড়িয়ে নিয়ে গেছ। বালুর ঐ অবৈধ ছেলেটিকেও নিজের বলে চালিয়ে দিতে বাধল না?

জুলিয়েন বলল, ঐ হিপি ব্যাটাচ্ছেলেটাকে যদি পেতাম, তাহলে বাচ্চাসমেত বালুকে ওর ঘাড়েই চাপাতাম। ওর ভবঘুরেগিরি ঘুচিয়ে বালুর কোঠীর ঘোরালে ওকে গরু বাঁধার দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দিতাম।

আমি ওর কথা শুনে অনেকদিন পরে প্রাণ খুলে একচোট হেসে নিলাম।

জুলিয়েন বলল, তুমি তো আমাকে চেন না মুখার্জী, আমি ঠিক তাই করতাম। ব্যাটা এতদিনে নিশ্চয়ই ইণ্ডিয়ার বাইরে চলে গেছে। ওকে খুঁজে পাওয়াই দায় হবে। তাই মেয়েটার ভার নিজেই বইব ঠিক করলাম।

পণ্ডিতজী সঙ্গে সঙ্গেই মত দিলেন। বললেন, আমার বালুর মা কানেতের মেয়ে বাবুজী। আমার মেয়ে বেনন পরিবারে গেলে আমার চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না। ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে রোজ আমি চোখের জল ফেলতাম, আর রঘুনাথজীর কাছে প্রার্থনা জানাতাম যেন অতি দ্রুত আমার দিন ফুরিয়ে আসে। আমি এই দুনিয়া ছেড়ে সরে না গেলে আমার বালু কোনদিন সংসারী হতে পারবে না।

বললাম, আপনাকে এ পৃথিবী থেকে না সরিয়ে রঘুনাথজী নতুন একটা পথ তৈরি করে দিলেন।

পণ্ডিতজী পাশে পড়ে থাকা রামচরিত মানসখানা মাথায় ঠেকিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

মুশকিল হয়েছিল বালুকে নিয়ে।

ওকে ভ্যালিতে ডেকে এনে সব বুঝিয়ে বললাম।

বালু সব শুনে বলল, জীবনে একটা ভুল করেছি ঠিক কিন্তু কোন মানুষকে তো আমি ঠকাই নি বাবুজী। জুলিয়েন সাহেবকে আমি জান গেলেও ঠকাতে পারব না।

বললাম, ঠকানোর কথাই উঠছে না বালু। জুলিয়েন সব জেনেই তোমাকে বেনন পরিবারে নিতে চাইছে।

বালু বলল, মানুষ যদি অন্যায়ের জন্যে আঘাত করে বাবুজী, তাহলে তাকে সহ্য করা যায়। কিন্তু কৃপা করলে তাকে সইতে পারা যায় না।

বললাম, জুলিয়েন অন্য ধাতের মানুষ বালু। ওর খেয়ালের সঙ্গে তোমার কিছুটা পরিচয়ও আছে। কিন্তু ও এমন বড় একটা হৃদয় নিয়ে জন্মেছে, যার নাগাল আমরা কেউ কোনদিন পাবো না। ও মানুষকে দূরে ঠেলে ফেলে দেবে, কিন্তু কৃপা দেখাবে না। আর হাত যদি সে বাড়ায় একবার, তাহলে তার ঐ চওড়া বুকের মাঝখানেই টেনে নেবে।

মানালীর অপূর্ব আলোকিত একটি সন্ধ্যা। বেনন পরিবার আজ জুলিয়েনের বিয়েতে পার্টি দিচ্ছেন। ছোট্ট টাউনের প্রায় সকলেই নিমন্ত্রিত। মদনলালকে জুলিয়েন নিজে গিয়ে ওয়েডিং কার্ড দিয়ে এসেছে। মদনলাল এসেছে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে। না এসে জুলিয়েনকে অপমান করবে, ঘাড়ে এমন অতিরিক্ত মাথা কার কটা আছে।

লোকটা এখন বসে বসে রোস্ট্ চিবোচ্ছে আর দামী মদ গিলছে। মাঝে মাঝে আমার দিকে চাইছে পিটপিট করে।

মিঃ লী সপরিবারে কুলু থেকে এসেছেন। তিনিও মিঃ বেননের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অতিথিদের আপ্যায়ন করছেন। অতি অন্তরঙ্গ দুই পরিবার। নিমন্ত্রণ পত্র কুলুতে চাচাজীর কাছেও নাকি পাঠানো হয়েছিল। তিনি নিজে আসতে পারলেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছেন এবং নবদম্পতির জন্যে উপহার পাঠিয়েছেন বাহকের হাতে।

এক সময় আমার কাছে এসে মিঃ লী বললেন, ডাঃ মুখার্জী, আমার উপহার দেওয়া টাট্টু তোমাকে অসুখী করেছে কি ?

বললাম, আপনার দেওয়া উপহারে শুধু আমিই নই, মানালীর বহু লোকই উপকৃত হচ্ছে।

মিঃ লী হেসে বললেন, তাহলে বলো ইয়াং ম্যান, উপহার নির্বাচনে আমারও কিছুটা কৃতিত্ব আছে।

হেসে বললাম, হাজার হাজার বার।

মিস লী এক ফাঁকে এলেন আমার সামনে। মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে বললেন, চিনতে পারছেন।

বললাম, সম্মানীয় লী পরিবারের মানুষজনকে কি এত সহজে ভোলা যায়। তাঁদের শিল্পবোধ, সম্ভ্রান্ত আচরণ মনে গাঁথা হয়ে আছে।

মিস লীকে কেউ চাপা গলায় ডাকতেই উনি চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন। যাবার সময় আস্তে বললেন, মিঃ মুখার্জী, যদি কিছু মনে না করেন তো একদিন আমাদের ওখানে উইক এণ্ড কাটালে দারুণ খুশি হব।

হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম।

সবাই উঠে দাঁড়ালাম। সজ্জিত গেটের ভেতর দিয়ে ব্যাঙ্কোয়েট হলের দিকে এগিয়ে আসছে বর-বধূ। জুলিয়েন পরেছে এ দেশীয় কুলুবাসীদের পোশাক। জরির কাজ করা কুর্তা, সাদা পাজামা, মাথায় টুপি।

সুদেহী জুলিয়েনকে মনে হচ্ছে কুলুর সম্রাট ! পাশে নতমুখী বালু। আমি তাকে আর চিনতে পারছি না। সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ওয়েডিং ড্রেসে বালুকে কোন রাজ পরিবারের উপযুক্ত বধূ বলে মনে হচ্ছে।

ওরা পরস্পর ওদের জাতীয় পোশাক বদলে নিয়েছে এই বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

বালুর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, আড়ষ্টতার কোন চিহ্ন নেই। একটা কৃতজ্ঞতা-ভরা মিষ্টি হাসি ওর মুখে চোখে মাখানো।

আমি মনে মনে বালুকে শুভ কামনা জানালাম।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অনুষ্ঠান শুরু হল। মিঃ আর মিসেস বেনন দুদিকে ধরে নব-দম্পতির সামনে হাজির করলেন নব্বুই বছরের বৃদ্ধা জুলিয়েনের পিতামহীকে। ধবধবে সাদা চুল পরিপাটি করে বেঁধে তার ওপর সোনালী স্কার্ফ জড়ানো। ঘাগরা, চোলি আর সুথানে ঝলমল করছে ছোট্ট দেহটি।

বৃদ্ধা সবার সামনে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করলেন। ওরা নত হয়ে ওঁর পা স্পর্শ করল।

আজ থেকে সত্তর পঁচাত্তর বছর আগের একটি ছবি আমার চোখের ওপর ভেসে উঠল। ক্যাপ্টেন বেনন আজকের জুলিয়েনের মতই তরুণ। তিনি পনের বিশ বছরের একটি সুন্দরী তরুণীকে তাঁর পাশে নিয়ে এমনি ব্যাঙ্কোয়েট হলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

পার্টি ভেঙে গেলে আমি জুলিয়েন আর বালুর কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বালুর চোখ দুটো আমার দিকে চেয়ে অসীম কৃতজ্ঞতায় করুণ।

আমি বাইরে এসে বাংলোর দিকে পা বাড়িয়েও থেমে গেলাম। আজ এখুনি ওখানে ফিরতে কেন জানি না ইচ্ছে করল না। আমি মানালসু নদীর ধারে চলে এলাম। কাঠের পুলের ওপর দাঁড়িয়ে আবছা আলোয় নদীর জলপ্রবাহের দিকে চেয়ে রইলাম।

আমি বিশেষ কোন একটি কথা ভাবছিলাম না। অনেকগুলো এলোমেলো টুকরো কথা মনে জেগে উঠে আবার হারিয়ে যাচ্ছিল। কথাগুলোর ভেতর অর্থের কোন মিল ছিল না, কিন্তু সবগুলোর ভেতর কেমন যেন একটা বিষণ্ণতার সুর বাজছিল।

কতক্ষণ এমনি দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ কাঁধের ওপর কার ছোঁয়া পেয়ে চম্‌কে ফিরে দাঁড়ালাম।

জুলিয়েন!

ও পোশাক বদল না করেই চলে এসেছে। বলল, অনুষ্ঠান এই মাত্র শেষ হল। তোমার খোঁজে বাংলোতে গিয়ে দেখি, তুমি নেই। ভাবলাম, তুমি নিশ্চয়ই তাহলে নদীর ধারে এসেছ, তাই এখানেই চলে এলাম।

বললাম, আজ এভাবে চলে এসে ভাল করো নি জুলিয়েন। অনুষ্ঠানের প্রথম রাতটি পুরোপুরি বালুর জন্যে রাখা উচিত ছিল তোমার।

জুলিয়েন বলল, থামো মুখার্জী, মুরুব্বিয়ানা দয়া করে আর কোরো না। সামনের অনেকগুলো রাত বালুর জন্যে জমা রইল আমার, কিন্তু আজকে তোমার এই নিঃসঙ্গ রাতে কেউ তোমার পাশে থাকবে না, এ হতেই পারে না। তোমার ভাবনার কারণ নেই, আমি বালুর অনুমতি নিয়েই এসেছি।

এতক্ষণ শুধু বিষণ্ণতার শিকার হয়েছিলাম, এই মুহূর্তে একটা ব্যথার ঢেউ আছড়ে পড়ল আমার হৃদপিণ্ডের ওপর। এ ব্যথার জন্ম বন্ধুর হৃদয়ের উত্তাপে।

আমি শুধু জুলিয়েনের হাতখানা আমার হাতের মুঠোয় ধরে রইলাম।

আমরা কতক্ষণ দুজনে নদীর তীর ধরে ঘুরে বেড়ালাম। কেউ কোন কথা বলছিলাম না। জীবনে এমন কতকগুলো অনুভূতি আছে যা কথায় প্রকাশ করলে ফিকে হয়ে যায়, যাকে স্তব্ধ হয়ে শুধু অনুভব করে যেতে হয়। আমরা তেমনি পরস্পরকে নীরবতার ভেতর দিয়ে স্পর্শ করছিলাম।

একসময়ে একখণ্ড শিলার ওপর আমরা বসলাম। পায়ের তলায় মানালসু নদীর জলধারার ছুটে চলার শব্দটা বাজছিল। ওপারে সিডারের ঘন বনে চাঁদের আলো আর অন্ধকার দুটি প্রেমিকের মত নিভৃতে মাখামাখি হয়ে আছে।

জুলিয়েন বলল, আমি যদি দিক ভুল না করে থাকি তাহলে শুকতারাটা জ্বলছে নাগ্‌গরের আকাশে, তাই না মুখার্জী?

নরম ক্ষতস্থানটায় আচমকা আঘাত লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ঝরতে লাগল সেখান থেকে। আমি কোন কথা বলতে পারলাম না।

জুলিয়েন আমার দিকে চেয়ে আছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি তার কথার একটা উত্তর দেওয়া এই মুহূর্তে দরকার, তবু কোন কথা এল না মুখে। বোধহয় স্বাভাবিক ভদ্রতায় আমার মথাটা নড়ে উঠল ওর কথার উত্তরে।

আবার জুলিয়েন ঐ প্রসঙ্গ টেনে আনল। এবার আরও সোজাসুজি। বলল, ঠিক এই মুহূর্তে ঝিন্নি কি করছে তা তুমি অনুমান করতে পার?

প্লিজ জুলিয়েন, এমন একটা রাতে আমাদের দুজনের মাঝখানে আর কাউকে টেনে এনো না।

জুলিয়েন হঠাৎ আমার একখানা হাত ওর দুটো হাতের পাতায় ভরে নিয়ে বলল, আমি তোমার বন্ধু মুখার্জী, কিন্তু জীবনের সবটুকু উত্তাপ তো কোন বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।

ওর কথার অর্থ ধরতে না পেরে আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

জুলিয়েন আবার নিজের কথাটাকে পরিষ্কার করার জন্যে বলল, দেহ আর মন নিয়ে একটা পুরো মানুষ মুখার্জী। দেহ আর মনের উত্তাপ যার কাছ থেকে পাওয়া যায় সে তোমার লাভার বা ওয়াইফ।

আমি এবার কেন জানিনা হেসে উঠলাম। হাসি থামলে হঠাৎ যেন রাতটা আরও বেশি নিঃশব্দ হয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে আমার মনে হল পায়ের তলায় মানালসুর আঁকাবাঁকা জল খল খল শব্দে আমার হাসির প্রতিধ্বনি তুলল।

জুলিয়েন আমার হাতখানা মনে হল আরও একটু জোরে চেপে ধরেছে।

বললাম, আমি তোমার কথা পুরোপুরি মেনে নিচ্ছি জুলিয়েন। আর বালুর সৌভাগ্যের জন্যে মনে মনে ঈর্ষাবোধ না করে পারছি না।

জুলিয়েন অমনি বলল, তা হলে মুখার্জী, নিজের দিকটা ভেবে দেখছ না কেন?

বললাম, আমি বনের ভেতর পথ হারিয়ে ফেলেছি, তাই যেদিকে দুটো পা চলছে সেই দিকেই চলেছি। এখন ইচ্ছা, চেষ্টা বলে কোন বস্তু আমার ভেতর নেই।

জুলিয়েন বলল, অতশত হেঁয়ালি আমি বুঝিনে মুখার্জী। তোমরা দুটিতে মিলে আমাকে দেখছি ভাবিয়ে তুললে। আর তুমি ভাল করেই জান ভাবাভাবির ভেতর আমি কস্মিনকালেও যেতে চাই না।

আবার আমি হেসে ওর হাতে নাড়া দিয়ে বললাম, তবে কেন খামোকা ভাবতে যাচ্ছ জুলিয়েন। ওসব ব্যাপার চুকেবুকে গেছে।

জুলিয়েন বলল, মুখার্জী, তুমি নিজেও কষ্ট পাচ্ছ আর মেয়েটাকেও কষ্ট দিচ্ছ। কেন, ওকে নিয়ে এসোনা নিজের কাছে?

বললাম, প্রেমিকা যদি ভোগ্যপণ্য হত তাহলে বিক্রেতাকে দাম চুকিয়ে দিয়ে ঘরে বয়ে আনতাম।

জুলিয়েন বলল, আবার হেঁয়ালি করছ। বলেছি না আমি সোজা কথার কারবারী। শোন, আমি নিজে আমার বিয়ের কার্ড নিয়ে কুলুতে গিয়েছিলাম।

আমি একটু চমকে ওর দিকে চাইলাম। রাতের আবছায়ায় ও আমার পরিবর্তনটা লক্ষ্য করল না।

জুলিয়েন বলে চলল, প্রথমে মিঃ লীর কোয়ার্টারে গিয়েছিলাম। মিস লী খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। ঘুরেফিরে তোমার কথাই জানতে চাইল।

বললাম, অশেষ কৌতূহল তাঁর। নিজেকে দারুণ রকম ভাগ্যবান মনে হচ্ছে।

জুলিয়েন বলল, তোমার সম্বন্ধে মিস লীর কৌতূহলটা কে বাড়িয়েছে জান?

বললাম, ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল আগেই।

জুলিয়েন বলল, তুমি কিচ্ছু জাননা মুখার্জী, ঝিন্নি ওকে তোমার কথা বলেছে। এখন মিস লী প্রায়ই ঝিন্নির বাড়ি আসাযাওয়া করে।

মনে মনে দুঃখ পেলাম। এ দুঃখ কাউকে বুঝিয়ে বলার নয়। যে ভালবাসা একটা মিথ্যে সন্দেহে শেষ হয়ে যায় তাকে নিয়ে পাঁচজনের কাছে ফলাও করে বলার কি অর্থ হতে পারে।

বললাম, জুলিয়েন, এ প্রসঙ্গের এইখানে শেষ হোক। ওকে একটুও ছোট করে ভাবতে আমার এখনও কষ্ট হয়। ও যদি আমাদের পুরানো জীবনের কথা কাউকে বলে শান্তি পায় তো পাক, শুধু আমি ওগুলো শুনতে চাই না।

জুলিয়েনের ভারী গলা হঠাৎ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল, ঝিন্নিকে ভুল বুঝনা মুখার্জী। মিস লীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আছে ঠিক, তোমার প্রসঙ্গও সেখানে ওঠে, কিন্তু তোমাকে ছোট করে কিংবা তোমার অতীত ভালবাসাকে টেনে এনে নয়।

বললাম, মনে হচ্ছে তুমি অনেক কথাই জেনে এসেছ জুলিয়েন?

জুলিয়েন জোর গলায় বলল, এসেছি বইকি। পুরো দুটো দিন আমি কুলুতে এমনি বসে থাকিনি মুখার্জী। সবগুলো পাথরই উল্টেপাল্টে নেড়ে চেড়ে দেখে এসেছি।

হেসে বললাম, তুমিও কিন্তু হেঁয়ালীতে কথা বলছ জুলিয়েন।

যদিও হেসে কথাটা বললাম, তবু সারা মন আমার উৎসুক হয়ে রইল কুলুর পরিস্থিতি জানার জন্যে।

জুলিয়েন বলল, কোন ধাঁধা নেই এর ভেতর। তোমাদের ভালবাসার ভেতর বরং যে ধাঁধাটা জটিল হয়ে উঠেছিল তার সলিউশনের একটা পথ খুঁজছিলাম।

আমি আর কোন কথা বললাম না। এই মুহূর্তে দুঃখ সুখের অতীত একটা অনুভূতির ভেতর আমি আচ্ছন্ন হয়ে রইলাম।

জুলিয়েন একটুখানি থেমে বলল, কুলুতে দুদিন ছিলাম, আর তার প্রায় পুরো সময়টাই কেটেছে ঝিন্নির মুখোমুখি।

আমার ভেতর থেকে আবার সেই অদম্য ঔৎসুক্যটা ধীরে ধীরে মাথা তুলতে লাগল।

বললাম, চাচাজীর খবর অনেকদিন পাইনি। কেমন আছে ওঁর শরীর"

জুলিয়েন বলল, ভালই তো মনে হল, তবে তোমার বাংলো থেকে বেশ খানিকটা দুরে ছোট্ট নতুন একটা ডেরায় রয়েছেন দেখলাম।

বললাম, আমাকে চিঠি লিখেছিলেন কুলুর বাংলোর ভার নিতে। হিসেব-নিকেশও একটা করতে চেয়েছিলেন। আমি শুধু দুচার ছত্রের একটা উত্তর দিয়েছিলাম।

জুলিয়েন আমার দিকে চেয়ে আছে দেখে বললাম, কটা লাইনেই ছেদ টেনে দিলাম। লিখে জানালাম, চাচাজী, বাগানবাগিচা আর বাংলো আমার তৈরি নয়। ওতে আমার চেয়ে আপনার দাবীই বেশি, তাই ওর বিলি-ব্যবস্থা যা খুশি করুন, আমি ওর ভেতর নেই।

জুলিয়েন বিজ্ঞের মত গলা করে বলল, তুমি কি লিখেছ তাও আমার অজানা নয় মুখার্জী। আমি চাচাজীর কাছেই তোমার চিঠি দেখেছি।

একটু বিস্মিত হলাম বইকি! তবে এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে জুলিয়েন কুলুতে গিয়ে অনেক কিছুই নেড়েচেড়ে দেখে এসেছে।

বললাম, চাচাজী যদিও বা থাকতেন আমার বাংলোতে কিন্তু আমি জানতাম ঝিন্নি আমাকে চিঠি লেখার পর একটি দিনও আর ওখানে থাকতে চাইবে না।

জুলিয়েন এবারও বিজ্ঞের গলায় বলল, তোমার অনুমান মিথ্যে নয় মুখার্জী। ঝিন্নিই জিদ ধরে নরসিংলালজীকে তোমার বাংলো থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এখন এতো বড় ফাঁকা বাংলোতে একজন চৌকিদার মোতায়েন রয়েছে দেখলাম।

আমি আর কোন কথা বললাম না। আমার দিক থেকে বলার কিছু ছিলও না। শুধু মনে হল, কি পরিমাণ ক্ষোভ ঝিন্নির মনের ভেতর জমে উঠেছিল, যে জন্যে সে পোড়ো বাড়ির মত পরিত্যাগ করে গেল কুলুর বাংলো।

জুলিয়েন আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, আমি মিস লীর কাছ থেকেই ওদের ঠিকানাটা জোগাড় করি। ওখানে গিয়ে প্রথম আমার দেখা ঝিন্নির সঙ্গে, চাচাজী তখন বাড়ির বাইরে।

একটু থামল জুলিয়েন। আমার কাছ থেকে হয়ত কিছু একটা সাড়া শব্দ আশা করল। কিন্তু আমি সামনের অন্ধকারের মত চুপচাপ আছি দেখে বলল, আমি ঝিন্নির হাতেই আমার ওয়েডিং কার্ডখানা ধরিয়ে দিলাম। ও আমাকে একেবারেই ওখানে আশা করেনি। প্রথমে কেমন যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ খেয়াল হতেই ঘরের ভেতর ডেকে নিয়ে গিয়ে বসাল। বলল, বসুন, চাচাজী এখুনি এসে পড়বেন।

ঝিন্নি কার্ডখানা নিয়ে ঘরে ঢুকল। আবার বেরিয়ে এল কিছুক্ষণ পরে। হাতে কার্ড নেই, মুখখানাতে কেমন এক ধরনের বিস্ময় থমকে আছে।

জুলিয়েন একটুখানি থামলে বললাম, চাচাজীর ফিরতে বুঝি খুব দেরি হল?

জুলিয়েনের গলায় এবার ধমকের আওয়াজ বেজে উঠল, তুমি একটু থামবে মুখার্জী। কথার মাঝে এমন করে ছেদ টেনে দিলে কথা বলার কোন মানেই হয় না।

বললাম, অপরাধটা স্বীকার করে নিচ্ছি জুলিয়েন, যত পার কুলুর কথা বলে যাও। আমি চুপচাপ শুনে যাব।

জুলিয়েন কথার খেইটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, ঝিন্নি আমার কার্ড পেয়ে যে বিস্ময়ে কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে তা বুঝতে পারলাম। সমস্ত ব্যাপারটা যে তার মনের ভেতর দারুণ রকম একটা ঝড় তুলেছে তাও লক্ষ্য করলাম।

ঝিন্নি একটু দূরে আমার মুখোমুখি একটা কুর্শিতে বসল। তার চোখ কিন্তু আমার দিকে ছিল না। বোধহয় সেই মুহূর্তে তার চোখের দৃষ্টি একমাত্র নিজের মনের ভেতরে ছাড়া অন্য কোন দিকেই ছিল না।

চাচাজী এসে পড়ার আগেই আমি আমার কুড়িয়ে পাওয়া সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করতে চাইলাম। ঝিন্নির দিকে চেয়ে বললাম, বালুকে নিশ্চয়ই তুমি চেন, মেয়েটি সম্বন্ধে তোমার কি রকম ধারণা বল?

ঝিন্নি কোন কথা না বলে মাথা নাড়ল। বোঝাতে চাইল বালু ভাল মেয়ে।

বললাম, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেই বললাম, বালু যতটা ভাল আমি কিন্তু ততটা নই মিস শর্মা।

ও আমার দিকে চেয়ে এবার বলল, একথা কেন বলছেন?

বললাম, সে আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। শুধু এটুকু বলতে পারি, বালুর সঙ্গে আমার এনগেজমেন্টের কথাটা আমার ফ্যামিলিতে না জানিয়ে বাইরে চলে যাওয়ার জন্যে একটা অঘটন ঘটে গেল। আর সেজন্যে পুরোপুরি দোষটা কিন্তু আমারই! মানে আমার অবিবেচনাটাই দায়ী। এ ব্যাপারে বালু আমাকে ক্ষমা করলেও আমি নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না।

কথাটা বলেই আমি তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইলাম তোমার ঝিন্নির মুখের দিকে।

এই মুহূর্তে আমি জুলিয়েনকে কথার মাঝে বাধা দিয়ে বললাম, আমার ঝিন্নি কথাটাতে আমি আপত্তি জানাচ্ছি।

জুলিয়েন অমনি তার স্বভাবসিদ্ধ গলায় বলল, থামো। দেহের ছায়াকে ইচ্ছে করলেই কি মুছে ফেলতে পার?

আমি জুলিয়েনকে ক্ষেপিয়ে দেবার জন্যে আর কোন কথা বললাম না।

জুলিয়েন বলল, আমার কথা শুনে ঝিন্নির চোখ দুটো কেমন যেন ছোট হয়ে এলো। ও ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, আপনি অনেক অনেকদিন বাইরে ছিলেন মিঃ বেনন। কিন্তু কেন?

হেসে বললাম, জানেন তো সারা পরিবারে আমার বাউন্ডুলে বলে সমাদর। তাই বিয়ের আগে কাজের মানুষ বলে পরিচয় দেবার জন্যে ব্যবসার ব্যাপারে বাইরে চক্কর দিয়ে এলাম।

ঝিন্নি বলল, কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা জানতে চাই।

বললাম, একটা কেন, কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করলেও কিছু মনে করার নেই।

ঝিন্নি বলল, আপনি বাইরে যাবার কতদিন আগে বালুর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল?

বললাম, তা প্রায় পাঁচ ছ বছর আগে থেকেই ওর সঙ্গে আমার পরিচয়। ও আগে আমাদের বাগানেই কাজ করত। বিয়ে করব বাগানের একটা মেয়েকে, হয়ত লোকের চোখে খারাপ ঠেকবে, তাই ওকে পাঠালাম ডাক্তার মুখার্জীর কাছে কাজ করতে।

ঝিন্নি বলল, মুখার্জীসাহেব আপনার ঘনিষ্ঠতার কথা জানতেন?

বললাম, জানতেন মানে, নাড়ীনক্ষত্র সবই ওর জানা। তবে প্রমিস ছিল, আমাদের সিক্রেট ও ডিসক্লোজ করবে না। কোন অজুহাতেই না।

আমি এবার জুলিয়েনের ওপর রাগ করেই বললাম, তুমি আমার জন্যে এতগুলো মিথ্যার আশ্রয় নিতে গেলে। ভালবাসার ব্যাপারে আমি মর্যাদায় বিশ্বাসী, ভিক্ষেয় নয়।

জুলিয়েনের গলা নরম হল। বলল, ভুল সব মানুষই করে মুখার্জী তা বলে তোমাদের এত বড় একটা ভালবাসাকে তুমি অস্বীকার করবে!

বললাম, আমি তো অস্বীকার করিনি। তবে বলতে পার, যে অস্বীকার করেছে, জোর করে তার স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করিনি।

জুলিয়েন বলল, একেবারে ভুল বোঝাবুঝির ওপর দুজনেই দাঁড়িয়ে রইলে। এখন যদিও বা ঝিন্নির ভুল ভাঙল, তুমি দেখছি অনড়।

বললাম, চাচাজীর সঙ্গে কি কথা হল বল?

জুলিয়েন বলল, অনেক কথাই হয়েছে ওঁর সঙ্গে। নিজের ভুল বুঝতে পেরে উনি লজ্জায় সংকোচে একেবারে এতটুকু হয়ে গেছেন।

বললাম, আর ঝিন্নি?

জুলিয়েন বলল, ঝিন্নির মর্যাদাবোধ তোমার চেয়ে কম নয় মুখার্জী। ও বলল, অন্যায় করেছি, সারা জীবন প্রায়শ্চিত্ত করে যাব।

জানো মুখার্জী, ও আমাকে তোমাদের বাংলোতে নিয়ে গেল। তুমি যেখানে শুতে, যেখানে ওর সঙ্গে প্রথম ভালবাসার বিনিময়, সবই আমাকে দেখাল। এমনকি বনের ভেতর যে ঝর্ণার ধারে শেষবেলার আলো মেখে তোমরা বসে থাকতে সেখানেও নিয়ে গিয়েছিল।

জুলিয়েন একটু থেমে বলল, আমি এমন করে কোন মেয়েকে স্মৃতির জায়গাগুলোতে দাঁড়িয়ে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখিনি।

বললাম, ঐখানেই তো মেয়েদের জিৎ জুলিয়েন। আঘাতে আঘাতে ক্ষত সৃষ্টি করা আর তাকে চোখের জলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া, এ কেবল মেয়েরাই পারে।

জুলিয়েন বলল, আমি তা বুঝি না মুখার্জী, তবে দুটো দিনের ভেতর যতটুকু চিনেছি, তাতে মনে হয়েছে ঝিন্নির সঙ্গে তুলনা করার মত মেয়ে সব সময় চোখের সামনে পাওয়া যায় না।

আমি এবার আর কোন কথা বলতে পারলাম না। বোধহয় ঝিন্নি সম্বন্ধে জুলিয়েনের এই ব্যাখ্যা আমার চেয়ে সত্য করে কেউ জানে না। আমি ঝিন্নিকে আজও ভালবাসি, না হলে ওর প্রসঙ্গ উঠলেই আমার হৃৎপিণ্ড থেকে এমন করে রক্ত চুইয়ে পড়ে কেন। তবু, শুধু ভালবাসার মর্যাদা রাখার জন্যেই আমার মনে হল, অনাহূতভাবে আমি একতরফা এগিয়ে যেতে পারি না। মনে হল, সত্যকে যদি ঝিন্নি স্পষ্ট করে দেখতে পেয়ে থাকে তাহলে সব সংকোচ কাটিয়ে ওরই এগিয়ে আসা দরকার।

আমার ভাবনার প্রসঙ্গ ধরেই জুলিয়েন বলল, মুখার্জী, সব ভুলে তুমি মেয়েটির হাত ধরে কাছে টেনে আনতে পার না?

বললাম, জীবনের সব ক্ষেত্রেই মোটামুটি একটি নিয়ম মেনে চলতে হয়, ভালবাসার ক্ষেত্রেই বা তাকে ভাঙব কেন। ভুল বুঝেছে যে, ভুল ভাঙার কাজে তারই তো এগিয়ে আসার কথা।

জুলিয়েন বলল, ঝিন্নিকে আমি বলেছিলাম, ভুলটাকে মেনে নেওয়া কোন হার নয়. বরং স্বীকার করার ভেতর একটা জয় আছে। ভুল স্বীকার করে একখানা চিঠি লিখতেও বলেছিলাম। দেখলাম, ওর চোখ দুটোতে জল এসে গেল। ও মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল, ও

লিখতে পারবে না। পরে এক সময় শান্ত হয়ে বলেছিল, আমার ভুলটা আপনার বন্ধু মেনে নিল, কিন্তু ভাল যদি সত্যিই বেসে থাকে তাহলে ভুলটা শুধরে দেবার জন্যে এগিয়ে এল না কেন? আমাকে ভুলের ভেতর ফেলে রেখে যদি সে শাস্তি দিতে চায় তাহলে সেটাকেই আমার প্রায়শ্চিত্ত বলে মেনে নেব।

বললাম, জুলিয়েন, ঝিন্নিকে আমি শাস্তি দিতে চাই একথা তুমিও কি বিশ্বাস কর?

জুলিয়েন বলল, এটা ঝিন্নির অভিমান মুখার্জী। সব মেয়েরই বোধহয় এমন ধরনের একটা অভিমান থাকে।

বললাম, শুধু পুরুষেরই অভিমান থাকতে নেই, তাই না জুলিয়েন? অভিমান না থাক, আত্মসম্মান বোধটা নিশ্চয়ই তাদের থাকা উচিত।

আমার কথার কোন প্রতিবাদের পথ খুঁজে পেল না জুলিয়েন। সমাধানের কোন সূত্র না পেয়ে গালে হাত ঠেকিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

ঝিন্নি সম্বন্ধে আমার আহত আত্মসম্মান জুলিয়েনকে নতুন কোন পথের আলো দেখাতে পারল না। ইতিমধ্যে পুবদিক আলোয় ভরে দিয়ে ভোরের সূর্য জেগে উঠল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, জুলিয়েন, বিয়ের ব্যাপারে ভোরবেলা কিছু অনুষ্ঠান থাকতে পারে, এখন তোমার একবার কোয়ার্টারে ফেরা দরকার। আর আমার ব্যাপারটা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাতে যেওনা, ওটা সময়ের হাতে ছেড়ে দাও। স্রোতের মত যে সময় আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে তারই টানে একদিন হয়ত আমরা দুজনের কাছাকাছি আসতে পারব। শুধু প্রতীক্ষা করে থাকা আর সময়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে যাওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না জুলিয়েন।

জুলিয়েন আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল। হাতে হাত রেখে কোয়ার্টারের দিকে চলতে চলতে বলল, একটা ভাঙা ব্রীজ শ্রম আর চেষ্টায় জোড়া দেওয়া যায় মুখার্জী, কিন্তু ভালবাসার ভাঙন বোধহয় আপনি না জুড়লে চেষ্টা করে জোড়া যায় না।

এখন রোগী ভেঙে পড়ছে আমার চেম্বারে। দূর দূর থেকে আসছে নানা ধরনের রোগী। সার্জারীতে এম. এস. ডিগ্রিটা রয়েছে, তাই মানালীর মত ছোট্ট টাউনেও অপারেশনের পেসেন্টের ভীড় ঠেকান দায় হয়ে উঠেছে।

মানালীর ভ্যালীতে বসে মাঝে মাঝে ভাবি, কি বিচিত্র মানুষের মন। যে মানুষগুলো একদিন মিথ্যা সামাজিক অপরাধের অজুহাতে আমার ছায়া অব্দি মাড়াত না, আজ তারাই সম্ভ্রমে মাথা নুইয়ে রেখেছে।

জুলিয়েন আর বালু তো উঠে পড়ে লেগেছে। রোজ আমার চেম্বারে আসা চাই। জুলিয়েন হয়েছে আমার পাবলিশিটি অফিসার। সারা কুলু ভ্যালীর প্রান্তে প্রান্তে সে ছড়িয়ে দিয়েছে আমার নাম।

বালু আমার সঙ্গে আগের মত বাইরের কলে অ্যাসিস্ট করুক, এ ইচ্ছে একদিন জুলিয়েন প্রকাশ করতেই আমি তাকে বাধা দিলাম। বললাম, বালুকে এখন একটু সংসার করতে দাও

জুলিয়েন। অনেক কষ্ট পেয়েছে ও। তোমার কাছে এসে ও সব কষ্ট ভুলেছে। এখন ওর মনটাকে আর বিক্ষিপ্ত করে দিও না। তাছাড়া আমার অপারেশনের কাজে ওই তো প্রধান সাহায্যকারিণী।

জুলিয়েন বলল, তুমি যা ভাল বোঝ তাই হবে মুখার্জী। বালুর ব্যাপারে তোমার ডিসিসানই তো ফাইনাল। ওখানে আমার কোন কথাই চলতে পারে না।

আমি হেসে বললাম, এতটা ক্ষমতা দিও না, হয়ত কোনদিন তার অপব্যবহার করে ফেলব।

জুলিয়েন আমার হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, তাহলেও জেনো, জুলিয়েনের কাছ থেকে কোন প্রতিবাদই আসবে না।

ওরা দুটিতে প্রায় সারাক্ষণই যেন আমাকে আগলে রেখেছে। আমি বেশ বুঝতে পারি, ওরা আমার নিঃসঙ্গতাকে ওদের উপস্থিতি আর উত্তাপ দিয়ে ভরিয়ে তুলতে চায়।

কিন্তু রাতে সব কাজ যখন শেষ হয়ে যায়, গল্পের শেষে কোয়ার্টারে শুভরাত্রি জানিয়ে ফিরে যায় জুলিয়েন তখন কেমন এক ধরনের শূন্যতা আমার বুকের ভেতরে বাসা বাঁধতে থাকে। আমি তাকে ইচ্ছে করলেও সরিয়ে দিতে পারি না। একটা নিঃসঙ্গ পাখির মত সে আমার বুকের ভেতর তৈরি করা বাসায় বসে বহু দিনের বহু ব্যথায় ভরা স্মৃতির সুর তোলে। সে এমন করে গান গায় যেখানে ব্যক্তিগত দুঃখগুলো ধীরে ধীরে সারা নিসর্গে ছড়িয়ে পড়ে একটা চিরন্তন ব্যথার রূপ নেয়। আমি সে সময় শুধু অসহায় দর্শকের ভূমিকা নিয়ে বসে থাকি। ভোর হলেই সে শূন্যতার পাখিটা গহন কোন অরণ্যের গোপনে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু গভীর রাতে সে আবার ফিরে আসে আমার বুকের বাসায়।

অনেক সময় রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমার মনে হয় আমি কুলুর বাংলোতে আমার বিছানায় শুয়ে আছি। মাথার দিকে জানালা। আমি অনুভব করি জানালার বাইরে আকাশে করুণ মমতার মত কটি তারা চেয়ে আছে। হঠাৎ কানে এসে বাজে চাপা ঘুঙুরের আওয়াজ। আমি মোহাচ্ছন্নের মত বিছানার ওপর উঠে বসি। প্রতীক্ষা করতে থাকি ঝিন্নির। কিন্তু সে প্রতীক্ষার পথ পার হয়ে কেউ আর আমার অন্ধকার ঘরে ঢুকে চোখে চাঁপার আঙুল বিছিয়ে দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলে না, বলতো কে ?

আমি আবার বিবশ দেহখানাকে এলিয়ে দিই আমার সঙ্গীহীন শয্যায়।

ক'দিন ধরে আমার বাংলোতে রয়েছে একটি মেয়ে। সিজারিয়ান অপারেশনের পর মা আর বাচ্চা দুটিতেই সুস্থ হয়ে উঠেছে। আমি অনেক সময় চেয়ে চেয়ে দেখি পাহাড়ী তরুণী মা কি গভীর চোখে তার প্রথম আলোয় আনা শিশুটির দিকে চেয়ে থাকে। মাতৃত্বের একটা আশ্চর্য অনুভূতি ছড়িয়ে পড়তে দেখি তার সারা দেহে-মনে।

আজ দুপুরে মেয়েটি বাচ্চা নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। বালু ক'দিন বাচ্চাটাকে নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করেছে। তাই যাবার আগে বালু তার কোয়ার্টার থেকে একখানা বেবি ব্ল্যাঙ্কেট এনে বাচ্চাটাকে জড়িয়ে বুকে তুলে নিল। দেখলাম, বালুর চোখ দুটো ছল ছল করছে। আমি

ওপরের বারান্দায় বসেছিলাম, বালু নীচের বাগানে হেমন্তের মিঠে রোদ্দুরে বাচ্চাটার কচি গালে গাল ঠেকিয়ে দেহটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

হঠাৎ আমার চোখের ওপর সব ছবিটাই পাল্টে গেল। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম কলুতে গাদ্দান মেয়েটার বাচ্চাকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে ঝিন্নি চলে যাবার আগে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

আমি এমনি এক্সাইটেড হয়ে পড়েছিলাম যে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ দুটো ভাল করে মুছে নিলাম। আবার তাকাতে গিয়ে দেখি ঝিন্নির জায়গায় বালু দাঁড়িয়ে আছে।

আজকাল আমার কেন এমন হচ্ছে আমি জানি না। স্মৃতির সামান্যতম সাদৃশ্য থাকলেই ঝিন্নি এসে দাঁড়াচ্ছে আমার সামনে। আমি যতই দরজা জানালাগুলো ভেজিয়ে রাখার চেষ্টা করি না কেন, সে কখন নিঃশব্দে এসে দুহাতে সব ঠেলে সরিয়ে চলে আসছে একেবারে অন্তঃপুরে।

কাজের ভেতর নিজেকে ডুবিয়ে রাখলে একরকম থাকি, কিন্তু নির্জনে কখনো ভ্যালিতে এসে বসে থাকলে মনের অনেক গভীর থেকে একটা ব্যথার ঢেউ উপত্যকা থেকে উঠে আসা কুয়াশার মত আমার চেতনার চারদিকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সূর্যের শেষ আলোটুকু তুষার পাহাড়ের চূড়া থেকে আবীর রঙ মুছে নিয়ে চলে যায়। ধূসর ছায়া নামে দিগন্তে। আর তখন আমাকে ঘিরে এক আশ্চর্য করুণ রাগিণী বাজতে থাকে। পৃথিবীতে যত ব্যথার রাগরাগিণী আছে, তারা যেন একই সঙ্গে বেজে বেজে ওঠে। আমি তার একমাত্র শ্রোতা। ইচ্ছে করলেই উঠে আসতে পারি না।

কোন কোন দিন আমার চোখের ওপর কান্তিময়ী কুলুর পটভূমিতে অভিনীত হয় আমার জীবনের আশ্চর্য সব সুখ দুঃখ মিশ্রিত নাটক। স্মৃতির গ্রীনরুম থেকে পাত্রপাত্রীরা মঞ্চে এসে অভিনয় করে যায়। আমি একা দর্শকের আসনে বসে সুখদুঃখের দোলায় দুলতে দুলতে সেইসব অভিনয় দেখি।

নাটক শেষ হলে সম্মোহিতের মত বিষাদ সাগরের ঢেউ দুহাতে সরাতে সরাতে ঘরে ফিরে এসে অবশ দেহটা বিছানায় ছড়িয়ে দিই।

মনে বারবার একটা প্রশ্ন নাড়া দিতে থাকে, আচ্ছা, ঝিন্নিও কি এমনি করে আমার মত কষ্ট পাচ্ছে? তার রাতের বালিশটি কি চোখের জলে ভিজে ওঠে না? আমি তো এখন কুলু থেকে অনেকখানি দূরেই রয়েছি, কিন্তু তাকে তো কুলু আর নাগ্গরের যন্ত্রণাময় স্মৃতির পথগুলো প্রতিটি দিন পার হতে হচ্ছে। কি ভাবছে সে? অতীতকে ভুলে থাকার কোন মন্ত্র কি সে মনে মনে প্রতি মুহূর্তে উচ্চারণ করে চলেছে?

একদিন স্বপ্নে দুজনের দেখা। কোন বিচ্ছেদ যে কোনদিন ঘটেছে তার চিহ্ন ছিল না আমাদের আচরণে। আমরা অদ্ভুত একটা ছেলেমানুষীর খেলা খেলছিলাম। বিপাশার জল খল খল খুশিতে ছুটে চলেছে, আর আমরা তার ওপর পড়ে থাকা বড় বড় নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে লাফ দিতে দিতে চলেছি। ঝিন্নি আমাকে ফেলে অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

আমি ঝিন্নির নাম ধরে ডাকতে লাগলাম, কোন সাড়া নেই। হঠাৎ মনে হল, ও কি স্রোতের ভেতর পড়ে গেল নাকি ! সারা শরীরে বিদ্যুতের একটা শক্ খেলাম। আমি ছুটতে লাগলাম সামনের দিকে। বুঝতে পারিনি কতখানি এগিয়ে গিয়েছিলাম, আচমকা পেছন থেকে ঝিন্নির ঘুঙুর বাজান হাসির শব্দে থমকে পেছন ফিরলাম। ও অমনি আঁজলা ভরে বিপাশা থেকে একরাশ মুক্তো কুড়িয়ে আমার চোখে মুখে ছুঁড়ে মারল। তারপর একটা বড় পাথরের পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বউকে ছেড়ে পালানোর পুরস্কার।

দাঁড়াও, আমি তোমার পুরস্কারটা দিয়ে দিচ্ছি,—বলে নিচু হয়ে এক আঁজলা জল তুলে সামনে তাকিয়ে দেখি, কেউ কোথাও নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেতারের দ্রুত তানের মত একটা হাসি, বিপাশার জল ছুঁয়ে, পাইনের সরু তারের মত পাতাগুলো কাঁপিয়ে, দূরের তুষার ঝক্‌ঝক্ পাহাড়গুলোর বুকে ধাক্কা খেয়ে বাজতে লাগল।

দুপুরের ঘুমটা ভেঙে গেল। জানালার বাইরে চোখ পড়তেই দেখি, কটি পাহাড়ী তরুণ তরুণী আমার বাগানের সর্ট কাট্ পথ ধরে মানালসু নদীর দিকে চলেছে। তারা পরস্পর পরিচিত একটা গানের কলি ফিরে ফিরে গাইছে, আর মাঝে মাঝে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে।

বরফ বরফ আর বরফ। কদিন ধরে সমানে বরফ পড়ছে। পাইন আর সিডারের বনে উঠেছে হাওয়ার হাহাকার। আমি যখন নিঃসঙ্গ বাংলোতে বসে থাকি, তখন কান পাতলে বুকের ভেতর শুনতে পাই এমনি একটা গোঙানির শব্দ। ঝড়ের একটানা বিনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ।

গত ডিসেম্বরের এমন দিনগুলোতে আমি ছিলাম কুলুতে। রাতের ঘরগুলো ঝিন্নি উত্তপ্ত করে রাখত রুমহিটারটা জ্বালিয়ে দিয়ে। তারপর সারারাত ধরে বসে বসে আমরা কথা বলতাম। সে অসংলগ্ন কথায় জগতের কোন ধর্মশাস্ত্র বা মহাকাব্য রচনা করা যায় না, কিন্তু দুটি হৃদয়কে একমাত্র সেই যোগসূত্রহীন কথাই কাছে টেনে এনে বেঁধে দিতে পারে।

ক'দিন কোলি-রি-দেয়ালির সুর লেগেছে হাওয়ায়। পাহাড়ী দেশের টিকায় টিকায় চলেছে নাচের মহড়া আর দীপ জ্বালানোর আয়োজন। টাট্টু নিয়ে পথে বেরোলেই গানের কলি কানের ভেতর দিয়ে একেবারে বুকে এসে বাজছে।

হঠাৎ একদিন কি হল আমার, আমি অনেক বুঝিয়েও নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। ভাগ্‌তুকে ক'দিন বাইরে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে পড়লাম আমার টাট্টু চৈতককে সঙ্গী করে। আমি পথে বিশ্রাম নিতে নিতে, কখনো বিপাশার কূল ধরে কখনো বা পাহাড়ের কোল বেয়ে এগিয়ে চলতে লাগলাম। শেষে কোলি-রি-দেয়ালির দিনটিতে এসে পৌঁছলাম নাগ্‌গরের দেওদার বনে ঘেরা পাহাড়ের প্রান্তে।

আমি দূর থেকে দেখলাম মেলার আয়োজন। দোকানপাট, লোকজনের মিছিল। সারা দুপুর ঘুরলাম নদীর বাঁকে বাঁকে। দেখা হল সেই গান্ধী পরিবারের সঙ্গে। গান্ধীরা আমার

দিকে কলি এগিয়ে দিলে আর গাদ্দানরা উপহার দিলে চোখের চাউনি। আমি ওদের সঙ্গে পুরো একটি বছর পরে গাদী ভাষায় কথা বলতে ওরা খুব খুশি হয়ে উঠল। আমাকে ছাড়তেই চায় না। তবু আমাকে চলে আসতে হল।

ওদের কাছে আমি সে রাতের মত রেখে এলাম আমার চৈতককে।

অপরাহ্নের হলুদ·আলোয় আমি সেই আশ্চর্য পাহাড়ে উঠে এলাম। ঝোরার স্রোত তেমনি বেরিয়ে আসছে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে। আমি পাহাড়ের নিচে হলুদ সবশোনের ক্ষেত দেখলাম। ঝোরার জল অঞ্জলি ভরে হাতে তুলতেই মনে হল ঝিন্নির গলায় কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। আমাকে বারণ করল সে জল খেতে।

আমি চমকে পেছন ফিরে কাউকে দেখতে পেলাম না।

এবার কে যেন আমাকে ইশারা করল ঐ গুহার ভেতর থেকে। আমি অন্ধকার গুহার ভেতর ঢুকে জলের ধারায় পা ডোবাতে ডোবাতে এগিয়ে চললাম।

সেই শিলাটি তেমনি পাতা আছে, যেখানে আমি আর ঝিন্নি বসেছিলাম গত ডিসেম্বরে। আমি বসলাম। মনে হল আমার কম্বলখানার ভেতর ঢুকে পড়েছে ঝিন্নি। আমার সারা শরীরে তার উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে।

এক সময় উঠে দাঁড়ালাম। আরও অনেকখানি এগিয়ে আলো দেখতে পেলাম। ঐ তো সেই মেলা। ঐ তো নাচের আসর। সাদা পোশাকে সজ্জিত পুরুষেরা বৃত্ত রচনা করে ঢেউ তুলে বৃত্তের মাঝে এগোবার চেষ্টা করছে, আবার ফিরে আসছে। বৃত্তের কেন্দ্রে রঙীন পোশাকে ফুলের পাপড়ির মত ফুটে আছে মেয়েরা।

কে যেন আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলল, তোমাকে না এতখানি এগিয়ে যেতে বারণ করেছি।

আমি পিছিয়ে এলাম। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম গুহা থেকে।

গত ডিসেম্বরের মত এবার কোলি-রি-দেয়ালিতে কিন্তু ঝড় উঠল না।

সন্ধ্যার আগেই মেলা ভেঙে গেল। ছায়া ঘনিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শীত যেন পাহাড়ের গুহা গহ্বর থেকে বেরিয়ে এল হায়েনার কামড় নিয়ে।

আমি রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারীর পথে উঠতে লাগলাম। আমার বিশেষ শীত বোধ হচ্ছিল না। মনে হল আমি আমার কথা রাখতে এসেছি।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালাম। পথের ওপর একফালি আলো এসে পড়েছে। কাঠের কেল্লা। খোলা জানালার পথে দেখা যাচ্ছে মদনলাল তেমনি ড্রিঙ্ক করে চলেছে। একটু পরে সম্ভবতঃ মদনলালই কেল্লার মন্দির থেকে হাউই ছাড়ার নির্দেশ দেবে।

আমি দু'একটা কুহলের শব্দ শুনতে শুনতে উঠে এলাম ঝিন্নির কোয়ার্টারের কাছাকাছি। আমি জানি, একটা নেশার ঘোরে আমি নাগ্‌গরে চলে এসেছি। ঝিন্নি নেই, জনপ্রাণী নেই, কেউ থাকতে পারে না। তবু এসে দাঁড়ালাম ওর কোয়ার্টারের মুখোমুখি।

একি ! এক টুকরো আলো বন্ধ ঘরের রন্ধ্র দিয়ে সোনার কাঠির মত এসে পড়েছে পথে।

আমি নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে চোখ পাতলাম সেই রন্ধ্রপথে।

ঝিন্নি, আমার ঝিন্নি বসে আছে!

আমি চীৎকার করে ডেকে উঠলাম, ঝিন্নি ঝিন্নি ঝিন্নি।

আশ্চর্য, আমার গলা দিয়ে এক বিন্দু স্বর বাইরে বেরিয়ে এল না।

ঝিন্নি তেমনি ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বেলে বসে আছে। প্রপাতের মত খোলা চুলে তার মুখ আর হাতের অনেকখানি ঢাকা।

আমি মুখে একবার উচ্চারণ করতে চেষ্টা করলাম, আমি আমার কথা রেখেছি ঝিন্নি। কোলি-রি-দেওয়ালির দিনে নাগ্‌গরকে আমি ভুলি নি।

হঠাৎ হাউই উঠল আকাশে। ঝিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ঠেলে খুলে দিল জানালাটা। অমনি উঠোনে ডানা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই সোনার ঈগল।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ঝিন্নির দৃষ্টি থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমি সেই আলোর সীমানাটুকু দ্রুত পার হয়ে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে নামতে লাগলাম।

হঠাৎ মনে হল দূরাগত ধ্বনির মত একটা শব্দ বেজে উঠল, ছোটেসাহেব, ছো-টে-সা-হে-ব!

এ কি ঝিন্নির কণ্ঠস্বর! আরও দ্রুত আমি নিচে নামতে লাগলাম। বড় বিপদজনক পথ। আমার আত্মাভিমান সমস্ত বিপদকে উপেক্ষা করে আমাকে উৎরাইয়ের পথে টেনে নিয়ে চলল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! শব্দটা কি এগিয়ে আসছে আমাকে অনুসরণ করে? সে ডাক কি সারা পাহাড় জুড়ে কান্নার মত ছড়িয়ে পড়ছে? ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে? কোন্‌দিকে পালাব কিছু বুঝতে না পেরে আমি বিহ্বলের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

সে ডাক একসময় অনেক কাছে এগিয়ে এল। মনে হল একেবারে আমার বুকের ভেতর বাজছে।

উপত্যকা থেকে অজস্র আলোর রেখা টেনে অন্ধকার আকাশের বুকে উঠে আসছে হাউই। আকাশ ভরে আলোর ফুল ফুটছে, আবার ঝরঝর করে ঝরে পড়ছে পাপড়িগুলো। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে এই উৎসব দেখতে লাগলাম।

●

নির্ঝরের গান
দ্বিতীয় পর্ব

দেখলাম ঝিন্নি খেতে খেতে থামল। মুখখানা ঈষৎ কাৎ করে অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কোন শব্দকে ধরার চেষ্টা করছে বলে মনে হল। আমিও কান পাতলাম। কিন্তু কোন কিছু আওয়াজ এই রাতের অন্ধকার ভেদ করে আমার কানে এসে পৌঁছুল না। আমি চোখে মুখে প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে ওর দিকে তাকালাম। ও কোন কথা না বলে থালি থেকে হাতখানা তুলে নিয়ে ক্ষিপ্র পায়ে বেরিয়ে গেল।

দারুণ খেয়ালী ঝিন্নি। কোনদিনই আমি খুব পরিষ্কার করে ওর মনের নাগাল ধরতে পারি না। ও যখন কিছু একটা করে তখন ওকে যেন কেমন একটা রহস্য ঘিরে থাকে। শত চেষ্টাতেও সহসা সে রহস্যটুকু ভেদ করা যায় না। কিন্তু মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ করে চাঁদের বেরিয়ে আসার মত ওর আসল রূপটা আবছায়া থেকে ঝিলিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

ঝিন্নি অনেক দূরের জিনিস যেমন স্পষ্ট দেখতে পায় তেমনি অনেক দূরের শব্দও আশ্চর্যভাবে ওর কানে এসে বাজে। আমি এই প্রথম ও দ্বিতীয় ইন্দ্রিয় দুটির ব্যাপারে রোজই প্রায় ঝিন্নির কাছে হেরে যাই।

ঝিন্নি এখন নীচের পথে ছুটে নামছে বলে মনে হল। আমি ভেতরে থেকে ওর পায়ের সাড়া পাচ্ছিলাম। অন্ধকারে চড়াই উৎরাই করতে ওর একটুও অসুবিধে হয় না। নাগ্‌গরের প্রতিটি পথ, প্রতিটি কুহল আর গাছপালা ওর চোখের ওপর ছবি হয়ে আছে।

আমিও কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

এখন আমি শুনতে পাচ্ছি একটা শব্দ। তাও একটানা নয়। একটা ভোমরা কানের কাছে বোঁ বোঁ আওয়াজ তুলে একবার দূরে সরে যাচ্ছে আবার ধেয়ে আসছে আরও জোর শব্দ করে।

হঠাৎ পাহাড়ী বাঁক ঘুরতেই আলোর ঝলক চোখে পড়ল। একটা গাড়ি উঠে আসছে।

এত রাতে কে আসে! দিল্লী থেকে কোন ভি. আই. পি এল কি? তাহলে তো আগে ভাগেই ঝিন্নি জানতে পারত।

গাড়িখানা পথের মাঝে একবার দাঁড়িয়ে গেল। তারপর এগিয়ে এসে থামল একেবারে ঝিন্নির কোয়ার্টারের সামনে। আমি ততক্ষণে হেড লাইটের আলোয় স্নান করে গেছি।

ঝিন্নি গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে আমার পাশে ছুটে এসে দাঁড়াল। আমার চোখের ওপর দুটো হাতের পাতা আড়াল করে বলল, একদম দেখবে না। চুরি করেও না। এখন বল কে এসেছে?

তোমার চাচাজী যে নয় তা জোর দিয়ে বলতে পারি।

ঝিন্নি আমার মৃত বাবাকে বলত পিতাজী আর নিজের বাবাকে ডাকত চাচাজী বলে। ঝিন্নির অন্তর থেকে এ ডাকটি উঠে আসত।

তুমি দারুণ চালাক ছোটেসাহেব! চাচাজীর সামনে যে আমি তোমার সঙ্গে এমন করে কথা বলব না, তা তুমি জান।

তাহলে হেরে গেলাম।

ঝিন্নি অমনি বলল, শুধু হেরে গেছি বললে চলবে না মশাই, ভাল একটা খানার দাম দিতে হবে।

রাজি।

ঝিন্নি আবার জীপের কাছে ছুটে গেল। জীপের হেড লাইট ততক্ষণে নেভান। অস্পষ্ট তারার আলোয় জীপটাকে একটা বৃহদাকার ভালুক বলে মনে হচ্ছিল।

ঝিন্নি এবার হাত ধরে টেনে আনল একটি মেয়েকে। মুখখানা তার অস্পষ্ট হয়ে গেছে অন্ধকারে।

আবার ঝিন্নি প্রশ্ন করল, বল এবার কাকে এনেছি তোমার কাছে?

সত্যিই চিনতে পারিনি। অনুমানেও না। বললাম, এখনও জয়ের মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

তুমি চিরদিনের হেরো। কোনদিনই আর জয়ী হতে পারলে না। এই আমার কাছ থেকেই তোমার হারের শুরু।

কথা বলতে বলতে ও মেয়েটিকে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, এবার ছুঁয়ে দেখ চিনতে পার কি না?

সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিগুলো যেন প্রখর হয়ে উঠল। বললাম, সত্যি বালু এত রাতে তুমি আসবে ভাবতেই পারিনি।

আমিও এসেছি ডাক্তার, বউকে একা পাঠাতে ভরসা পাইনি।

বলতে বলতে হেডলাইটটা মুখের ওপর ফেলল জুলিয়েন।

বললাম, আমি কিন্তু বেননের আপেল বাগিচায় আমার বুলবুলকে একা ছেড়ে দিতে ভয় পাই না। সে যা হোক, এখন স্টার্ট বন্ধ করে আলোটি নিভিয়ে নেমে এস। এদিকে রাতের খাবার প্রায় নিঃশেষ।

জুলিয়েন হাসতে হাসতে গাড়ি থেকে নেমে এল।

আমরা অন্ধকারে পরস্পরকে জড়িয়ে ঢুকলাম বসার ঘরে। বালু আর ঝিন্নি গেল অন্দরে। সম্ভবতঃ পোশাক বদল আর রাতের খানার তদারকীতে।

হঠাৎ এসে পড়ে খুব চমকে দিলাম, তাই না ডাক্তার?

চমক বলে চমক, এখনও ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। এই সারপ্রাইজটা কি যে ভাল লাগছে কি বলব।

এখন অনুমান কর তো দেখি, কেন এলাম?

কারণ ছাড়া জুলিয়েন কি আর আসবে?

শক্ত হাতে আমার হাতখানা চেপে ধরে জুলিয়েন বলল, উইথড্র, না হলে এখুনি কিন্তু চলে যাব।

আমি কৌতুক করে বললাম, তুমি একাই যাবে না বালুকেও সঙ্গে নেবে?

হেসে আমার হাতটা ছেড়ে দিল জুলিয়েন। বলল, তুমি কি সত্যিই মনে কর ডাক্তার, আমি বালুকে তোমার কাছে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারব না?

আমি হেসে উঠলাম, এখন বালুর প্রসঙ্গটা চাপা থাক। আগে বল তো দেখি কদিনের ছুটি নিয়ে এসেছ?

জুলিয়েন বলল, এমন চমৎকার জায়গায় তোমার বউ যদি আমাদের দুজনের থাকার একটু ব্যবস্থা করে দেয় তাহলে না তাড়ান অব্দি থেকে যেতে পারি।

বাজে কথা রাখ, সত্যি করে বল কেনন কদ্দিন থাকছ?

কালই চলে যাচ্ছি।

আমার খুব খারাপ লাগল কথাটা শুনে, তাই চুপচাপ বসে রইলাম।

আমার মনের অবস্থা অনুমান করে জুলিয়েন বলল, প্রিয় ডাক্তার, বিশ্বাস কর আর না কর পরশু আমাকে জরুরী কাজে সিমলা বেরিয়ে যেতে হবে।

তবে এ রকম কয়েক ঘণ্টার জন্যে সরাইখানায় ঘুমুতে আসার মানে?

জুলিয়েন অন্দরের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, এ প্রশ্নটা তোমার খেয়ালী অ্যাসিস্ট্যান্ট বালুকেই কর। হঠাৎ সন্ধ্যায় মার্কেট থেকে ফিরে আসতেই বলল, চটপট পোশাক বদলে কিছু খেয়ে নাও, এক জায়গায় যেতে হবে।

বললাম, জায়গাটার নাম জানতে পারি কি?

ও অমনি বলল, না জানলে বুঝি যাবে না?

তা কেন, তুমি বলছ যখন নিশ্চয়ই যাব। আমি এখুনি আসছি।

ও বলল, ঝিন্নিকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে।

আমি অমনি বললাম, তাহলে যাব না। ঝিন্নির বরকে দেখতে ইচ্ছে করছে বললে বিবেচনা করে দেখতে পারি।

ও মস্ত বড় কীল তুলে তাক করছে দেখেই আমি সরে পড়লাম।

জুলিয়েনের কথায় দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলাম। হাসির মাত্রা বোধ করি একটু উঁচু পর্দায় চড়ে গিয়ে থাকবে, ওরা দুজন ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল।

ঝিন্নি জুলিয়েনকে লক্ষ্য করে বলল, সামান্য যা আছে ভাঁড়ারে ত'ই সাজিয়ে দেব। বলতে পারেন, একজনেরই মত। আপনাদের ভেতর কে খাবেন ফয়সালা করে নিন।

জুলিয়েন অমনি বলল, বালু কি বলে?

ঝিন্নি বলল, বালু আপনাকেই প্রশ্নটা করেছে।

জুলিয়েন এবার বালুর দিকে তাকিয়ে বলল, দুজন এক সঙ্গে বসলে কেমন হয়। বন্ধুদের দেওয়া জিনিসের সামান্য এক কণাও অসামান্য হয়ে উঠবে। একজনের খাবারে ঠিক দুজনের হয়ে যাবে।

খাবার টেবিলে বসল ওরা। ঝিন্নি কিন্তু আয়োজনের কোন ত্রুটিই রাখেনি। আমি জানি, ঝিন্নির ভেতর তারিফ করার মত গৃহিণীপনা আছে। সব কিছুকে গুছিয়ে পরিচ্ছন্ন করে প্রকাশ করাটাই তার স্বভাব।

জুলিয়েন বলল, এতক্ষণ বিনয় করছিলেন কেন ম্যাডাম? এ যে আপনাদের হিন্দু এপিকের রাজসূয় যজ্ঞের ব্যাপার।

ঝিন্নি বলল, আমাদের এপিক, মিথলজি সবই দেখছি আপনার পড়া।

খেতে খেতে জুলিয়েন বলল, আমার ঠাকুরমা যে আপনাদেরই ঘরের মেয়ে। তাই তাঁর কোলে বসেই আমরা খুব ছোটবেলা থেকে হিন্দু মিথলজির অনেক গল্প শুনেছি।

বললাম, আচ্ছা বেনন, তোমাদের ফ্যামিলির সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে নিতে তোমার ঠাকুরমার কোন কষ্ট হয়নি?

আমাদের পরিবার ঠাকুরমাকে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিল ডাক্তার। তাই সারাক্ষণ তাঁর অসুবিধেগুলোর দিকে সকলেরই সজাগ দৃষ্টি ছিল। মায়ের কাছে এসব কথা শুনেছি। ঠাকুরমার ব্যক্তিত্ব আর স্নেহ সকলের শ্রদ্ধার কারণ হয়েছিল। এখনও ঠিক তাই।

ঝিন্নি বলল, আপনার ঠাকুর্দার পর আপনিই নতুন করে এ দেশের সঙ্গে রক্তের যোগ ঘটালেন।

জুলিয়েন খাওয়ার প্লেট থেকে হাতটা তুলে নিয়ে বলল, দেখুন, যে দেশে কয়েক পুরুষ ধরে আমরা বাস করছি সে দেশের মাটি, মানুষ সবই তো আপনার জন। আজ বালু আমার কাছে এসেছে ঠিক কিন্তু ভেবে দেখুন আপনার প্লেট থেকে যে খাবারটুকু আমি খাচ্ছি আর যা আমার দেহে রক্ত তৈরী করছে তার সঙ্গে কি আমার কোন রক্ত-সম্পর্ক নেই?

বললাম, সাবাস জুলিয়েন, উত্তরটা দারুণ দিয়েছ।

জুলিয়েনের কথা তখনও শেষ হয়নি। সে বলে চলল, আমাদের আপেল বাগান থেকে যা কিছু রোজগার হয় তা এ দেশেই থাকে। আমরা যেমন নিজেরা টাকার অংশ নি, ঠিক তেমনি বাগানে যারা কাজ করে তারাও অংশ পায়।

একটু থেমে হালকা সুরে বলল, এ দেশের কাঠবেড়ালীগুলোও আমাদের বাগানের ফলের অংশীদার।

বলেই জুলিয়েন আবার প্লেটে হাত ঠেকিয়ে খেতে শুরু করল।

ঝিন্নি বলল, আপনি যে খোদ এ দেশীয় বনে গেছেন তার আর একটা প্রমাণ এখুনি দিতে পারি আমি।

সবাই আমরা ঝিন্নির মুখের দিকে তাকালাম।

ঝিন্নি বলল, আপনি কাঁটা চামচ ছেড়ে আমাদের মত হাতে তুলেই খাবার খাচ্ছেন।

ওটা কেবল মা ছাড়া আমাদের বাড়ির সকলেরই অভ্যেস হয়ে গেছে। বিশ্বাস করুন, হাতে তুলে খেতে আমরা একটু বেশি তৃপ্তিই পাই।

খাওয়া শেষ হলে আমরা ড্রইং রুমে এসে বসলাম। গরমকালে হাওয়ায় উপভোগ্য ঠাণ্ডা আমেজ। এদেশের মানুষ এই গ্রীষ্মকালকে বলে তউন্দি। নীচের উপত্যকা এ সময় বেশ খানিক গরম হয়ে ওঠে। উঁচু পাহাড়ের মাথাগুলো মধ্যদিনে একটা অস্বচ্ছ আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। তখন দূরের পার্বত্য ছবিগুলো অস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বললাম, অর্চার্ডের খবর কি জুলিয়েন? ফল কেমন ধরেছে?

জুলিয়েন মনে হল বালুর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে একটুখানি হাসির রেখা ফোটাল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বালুকে জিজ্ঞেস কর ডাক্তার।

হেসে বললাম, বালু যে আপেল বাগিচার খুঁটিনাটি সব কিছুই জানে একথা আমার অজানা নয়। কিন্তু তুমি যে বাগানের পুরো দায়িত্ব ওর হাতে আজকাল ছেড়ে দিয়েছ তা আমি জানতাম না।

বালু বলল, ওর কথা আপনি একটুও বিশ্বাস করবেন না দাদাজী। বাগান ওর প্রাণ। পুরো তদারকী ওর হাতে।

আবার হাসির রেখা ফুটল জুলিয়েনের মুখে। বলল, বাগান তৈরি অব্দি আমার কাজ কিন্তু গাছের ফল, তার পরিচর্যা আর রক্ষার ভার বালুর হাতে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, ডাক্তার, বাগানে ফল তো ভালই ধরেছে কিন্তু তার বিপর্যয়ের কথাটা তোমার অজানা নয়। হঠাৎ ঝড়ো হাওয়া, ফ্লাইং ফক্সের উৎপাত, বরফপাত এসব দুর্যোগ কাটিয়ে উঠলে তবেই তো কুলুর গোল্ডেন অ্যাপেলের স্বপ্ন সার্থক হবে।

হেসে বললাম, কথাটা ঠিক। তোমার চেয়ে আমার অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে অনেক কম।

জুলিয়েন আমার পিঠে চাপড় মেরে বলল, ধীরে ধীরে এ বিষয়ে তুমিও একদিন অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে ডাক্তার।

আমাদের কথার ফাঁকে দেখলাম বালুর হাত ধরে ঝিন্নি শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। যাবার আগে অবশ্য জুলিয়েনের কাছ থেকে তার বউকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে অনুমতি চেয়ে নিল।

আমরা টুকরো টুকরো কথা বলছিলাম। রাত বাড়ছিল।

জুলিয়েন এক সময় বলল, মানালীর ডিস্পেনসারীতে কবে ফিরছ ডাক্তার?

কেন বল তো? আমার ডিস্পেনসারীতে কি খুব বেশি রোগীর ভীড় দেখেছ?

একা কম্পাউণ্ডার শিউশরণজী কি তোমার সব কাজ চালাতে পারবে?

হেসে বললাম, সত্যি ডাক্তারী পড়ে কি হালই না আমার হল। দুদিন নির্ভাবনায় যে বউ-এর কাছে কাটাব তার উপায় নেই।

বউকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাও।

তাহলে রোয়েরিখ সাহেবকে দেখবে কে?

জুলিয়েন বলল, সত্যি এক আশ্চর্য মানুষ এই রোয়েরিখ সাহেব। আমি শুনেছি, আমার বাবা মাঝে মাঝে আপেলের টুকরী নিয়ে আসতেন রোয়েরিখ সাহেবের কাছে। ভারী খুশি হতেন তিনি গোল্ডেন অ্যাপেল পেয়ে। রোয়েরিখের একটি আশ্চর্য সুন্দর ছবি আমার ঘরে আছে। বাবাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন।

বললাম, ছবিখানা কি নিয়ে আঁকা?

তাঁর জীবনের একটি অদ্ভুত অনুভূতির অভিজ্ঞতা নিয়ে।

একটু থেমে জুলিয়েন বলল, একবার নিকোলাস রোয়েরিখ হিমালয় পরিভ্রমণ করছিলেন। রাতে তুষার পর্বতের নীচে তাঁবুতে কাটিয়েছেন। ভোরবেলা সূর্যোদয়ের আগে

চিরদিনের অভ্যেস মত শয্যা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তখন পুরোপুরি ডন। উনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন, উপত্যকা থেকে সাদা মেঘগুলো রাতের ঘুম ভেঙে ওপরে উঠছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হল, ওগুলো যেন মেঘ নয়। বিরাট উপত্যকাটি আশ্চর্য এক সরোবর। তার থেকে সাদা পাপড়ি মেলে জেগে উঠছে একটি পদ্ম। কিছু পরে সূর্যোদয় হল। তার আলো এসে পড়ল ঐ পদ্মের ওপর। শ্বেত পদ্মের পাপড়িগুলো ধীরে ধীরে রক্তবর্ণ হয়ে গেল। ছবিতে তাঁর এই অনুভূতিকেই তিনি রূপ দিয়েছিলেন।

বললাম, এ ছবির কথা আমি জানতাম না, তবে তাঁর আর একখানা ছবি ঝিন্নি আমাকে দেখিয়েছিল। সেখানেও বিরাট এক স্বপ্ন-দর্শনের কথা আছে।

জুলিয়েন জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে দেখে আমি বললাম, এ ছবিখানার বিষয়বস্তু— রামায়ণের মহাকবি।

পার্বত্য পরিবেশের মাঝখানে বসে আছেন কবি বাল্মীকি। তাঁর আয়ত চোখের দূরনিবদ্ধ দৃষ্টি স্বপ্নময়। অদূরে অস্পষ্ট কুহেলিকার ভেতর থেকে জেগে উঠেছে অযোধ্যা নগরী।

জুলিয়েন বলল, দারুণ। শোন ডাক্তার, শিল্পীর একটা উক্তি শোন। আমি বাবার ডায়েরীতে নিকোলাস রোয়েরিখের কয়েকটি উক্তি পেয়েছিলাম :

'Bring art to the people where it belongs. We should have not only museums, theatres, universities, public libraries, railway stations and hospitals, but even prisons decorated and beautified. Then we shall have no more prisons.'

আর একটা মনে পড়ছে —

'Above all confusions the Angels sing of peace and good will. No guns, no explosives can silence these choirs of heaven.'

বললাম, নিকোলাস জন্মেছেন রাশিয়ান হয়ে, কিন্তু মনে প্রাণে তিনি ছিলেন ভারতীয়। আর তাঁর বিশ্বমানবতাবোধ তাঁকে মহান বিশ্বনাগরিকের গৌরব দান করেছে।

আমরা প্রায় মধ্য রাত অব্দি এই আশ্চর্য ঋষিতুল্য শিল্পীর বিচিত্র জীবন সাধনার কথা নিয়ে আলোচনা চালালাম। সেই মানুষ যিনি এই নাগ্গর পাহাড়ের ওপর তাঁর সাধনার আসন পেতেছিলেন এবং যাঁর শেষ নিঃশ্বাসও পড়েছিল হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে, তাঁর কথা ভেবে রোমাঞ্চিত হলাম।

দারুণ খেয়ালী জুলিয়েন। বলল, চল ডাক্তার বাইরে একটু ঘুরে আসি।

বললাম, চল, কিন্তু মধ্যরাত্রি পার হয়ে যাচ্ছে।

জুলিয়েন কোন কথা না বলে আমার দিকে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিল। আমি ওর হাতে হাত রেখে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বেশিদূর ও গেল না। একজোড়া পাইন গাছের তলায় এসে আমরা দাঁড়ালাম। নীচের আশ্চর্য কুলু উপত্যকা গায়ে একখানা কালো র‍্যাপার জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিপাশা তাকে ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে চলেছে। ওদিকে পীরপাঞ্জালের তুষার চূড়া অন্ধকার যবনিকার আড়ালে স্থির হয়ে আছে। কেবল সামনের পাহাড়ে পাইনগাছের ডালের ফাঁকে শীর্ণ চাঁদটা আটকে পড়েছে। সহস্র তারার চোখ মেলে কৌতূহলী আকাশটা তাই দেখছে।

জুলিয়েন বলল, চিন্তা করে রোমাঞ্চিত হতে হয়, নিকোলাসের মত একজন পুরুষ এই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে কুলু উপত্যকা আর হিমালয়কে দেখতেন। আমরা তাঁর সাধনার একেবারে পীঠভূমিতে দাঁড়িয়ে আছি।

বললাম, এই গাছের পাতার ধ্বনি তিনি শুনেছেন। ঐ কুহলটার ঝরে পড়ার গান তাঁকে মুগ্ধ করেছে। কত সন্ধ্যা কত প্রভাতের রঙমাখা পীরপাঞ্জালের ছবি প্রতিবিম্ব ফেলেছে তাঁর চোখের ওপর।

ঝিন্নি অন্ধকারে আমাদের ঠিক খুঁজে বের করল।

বালুর ঘুম পেয়েছে বেনন সাহেব।

জুলিয়েন সত্যি সত্যি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, অনেক রাত হয়ে গেছে মিসেস মুখার্জী। আমরা সত্যিই দুঃখিত।

ঝিন্নি বলল, সারা রাত গল্প করলেও আমার ক্লান্তি আসবে না। কিন্তু বেচারা বালু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ও আবার সবাই না ঘুমুলে একা একা ঘুমুবে না।

আমরা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘরের ভেতর এলাম। ঝিন্নি ড্রইংরুমে ওদের শোবার পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থা করে রেখেছে। বালু একটা সোফায় গা এলিয়ে বসে আছে। আমাদের দেখে মুখে মিষ্টি একটুখানি হাসি টেনে সিধে হয়ে বসল। চোখদুটোয় ভরা আছে ঘুমের আমেজ।

ঝিন্নি জুলিয়েনের দিকে ফিরে বলল, বেচারাকে আর জাগিয়ে রাখবেন না যেন। আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ুন। শুভরাত্রি।

বিছানায় শুয়েই ঝিন্নি আমার মুখের ওপর তার মুখখানা ঠেকিয়ে বলল, কিছু বুঝলে?

কিসের?

এই যে আপেল বাগান সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নের উত্তরে জুলিয়েন যা বলল।

ও তো ঠিকই বলেছে। ফল ভাল ধরেছে। উৎপাতের হাত থেকে বাঁচাতে পারলে ঠিক সময়ে সোনা ফলবে।

অন্ধকারে ঝিন্নি বোধহয় আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। একটু পরে চাপা তিরস্কারের ভঙ্গীতে বলল, সত্যি ছেলেরা কত বোকা হয়। তুমি যে কি করে ডাক্তারী পাশ করলে, কি করে মানালীতে এত পশার জমালে, ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

আমিও ঝিন্নির কথা শুনে অবাক, কেন বল তো? আমার বোকামিটা দেখলে কোথায়?

ও হঠাৎ আমার নাকটা ওর দুটো আঙুলে চেপে ধরে নাড়া দিয়ে বললে, খুব চালাক তুমি, ঘুমোও।

সত্যি কি হল, বল না?

ঝিন্নি আমার কপালে ওর থুত্নি ঠেকিয়ে বলল, আপেলের গাছ মা হয় কখন? যখন তার ফল ধরে। বালু মা হতে চলেছে।

আমি বিছানার ওপর উঠে বসে ঝিন্নিকে দুহাতে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে বললাম, সত্যি আমি একেবারে নির্বোধ। বালু মা হতে চলেছে, দারুণ খবর। জুলিয়েনকে কাল পাকড়াতে হবে। ওকে কিছুতেই যেতে দেওয়া হবে না। ফিস্ট চাই, ফিস্ট। দারুণ রকম একটা ফিস্ট। ও দিতে না চাইলে ওর হয়ে আমরাই দিয়ে দেব, কি বল?

একি! ঝিন্নি আমাকে জড়িয়ে আছে, মুখ তুলছে না কেন? আমি ওর মুখখানা তুলে ধরতে গিয়ে দেখি ও আমার বুকের মধ্যে জোর করে মুখখানা চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কি হল ঝিন্নি?

আমি সত্যি এবার বোকা বনে গেলাম। এতক্ষণ একটি নারীর মাতৃত্বকে নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে গিয়ে আর এক বঞ্চিতাকে কতখানি ব্যথা দিয়ে ফেললাম তা বুঝে উঠতে পারিনি।

বললাম, তুমি তো অবুঝ নও সোনা। আমাদের বিয়ের দুটো বছর এখনও পূর্ণ হয়নি।

ঝিন্নি আমার বুক থেকে মুখখানা সরিয়ে নিয়ে সম্ভবতঃ চোখ মুছল। একসময় আমার বুকে ওর একটা আঙুল দিয়ে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে বলল, শোন, আমাকে তুমি খুব ছোট ভেবেছ, তাই না?

একটুও না।

ঝিন্নি আবার বলল, বিশ্বাস কর, আমি বালুর ছেলে হবার কথা শুনে খু-উ-ব খুশি হয়েছি। ও আমার কাছে খবরটা দেবে বলেই ছুটে এসেছে। আমি ওকে জড়িয়ে ধরে আদর করেছি ছোটেসাহেব। কিন্তু হঠাৎ কেন আমার চোখ ভরে জল নামল তা নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। খুব অন্যায় হয়ে গেল, তাই না ছোটেসাহেব?

ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আমার ঝিন্নি কোনদিন কোন অন্যায় করতে পারে না।

ও বলল, জান ছোটেসাহেব, আমার মাঝে মাঝে কেমন ভয় করে।

কিসের ভয় ঝিন্নি?

কিছু না, বলে ঝিন্নি আবার আমার বুকে মুখ গুঁজল।

অন্ধকারেই আমি ওর মুখখানাকে দু হাতের পাতায় তুলে ধরে বললাম, বল কিসের ভয়?

আমি ওর মুখখানা দেখতে না পেলেও জানি, ও দুটো চোখ বন্ধ করে আছে। আমি যখনই ওকে স্পর্শ করি তখনই ও ঠিক এমনি করে।

ও বেশ কিছুক্ষণ আমার কথার কোন উত্তর দিল না। একসময় চাপা একটা শ্বাস ফেলে বলল, যদি আমি মা হতে না পারি?

ওকে জড়িয়ে আদরে আশ্লেষে ভরে দিয়ে বললাম, আমার ঝিন্নির সেরকম কোন সম্ভাবনা নেই।

তবু ভয় যায় না ঝিন্নির, তুমি কি করে বুঝলে?

ডাক্তার বলে।

আমি জানি, পরীক্ষা না করে ওসব ব্যাপারে কোন কিছু বলা সম্ভব নয়, তবু ঝিন্নির অকারণ ভয় ভাঙাতে কথাটা জোর দিয়ে বললাম।

ঝিন্নি ভীরু পাখির মত আমার বুকে মাথাটা ঠেকিয়ে পরম নির্ভরতায় বসে রইল।

ওর খোলা চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বললাম, এমন অদ্ভুত সব ভাবনা তোমার ভেতর আসে কি করে ঝিন্নি? আমি তো এসব নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাই না।

ও একটু নড়ে-চড়ে আবার বুকের ওপর মাথাটা ঠেকিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল।

একসময় বলল, তুমি তোমার রোগীদের সুখদুঃখ নিয়ে থাকবে, আমি কি নিয়ে থাকব?

ওর গভীর ভাবনাগুলোকে হাল্কা করে দেবার জন্য কৌতুক করে বললাম, আপাততঃ বুড়ো রোয়েরিখ সাহেবের পরিচর্যা করে কাটাও, পরে একটা পুতুল এনে দেব। তাকে নিয়ে যত খুশি খেলবে।

ও এবার বালিশখানা টেনে নিয়ে বুকের মধ্যে গুঁজে শুয়ে পড়ল।

আমি এবার ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, কোন্ পুতুল চাই বললে না তো? মেয়ে না ছেলে?

ও এবার মুহূর্তে চিৎ হয়ে শুয়ে আমাকে প্রশ্ন করে বসল, তোমার কোন্ পুতুলটা চাই বল?

হঠাৎ মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল, আমার কোন পুতুল চাই না।

ঝিন্নি যে পাশ ফিরে বালিশে মুখ গুঁজেছে তা অন্ধকারেও বুঝতে পারলাম।

এবার ঝিন্নি ডুকরে কাঁদতে লাগল।

আমি সত্যিই বোকা। বউ-এর মন বুঝে কখন যে কি বলতে হয় তা জানি না।

ওকে জড়িয়ে ধরে নানাভাবে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।

একসময় ওর কান্না থামল। আমার কাতর অবস্থা দেখে ও নরম হল। অনুযোগের সুরে বলল, তুমি কেন এমন করে বললে বল? তুমি পুতুল না চাইলে আমি পুতুল পাব কি করে?

বললাম, আমার এক আধখানা পুতুলে চলবে না, অন্তত এক ডজন চাই।

অমনি ঝিন্নি তড়াক করে বিছানার ওপর উঠে বসে আমার পিঠে কয়েক ঘা কিল কষিয়ে দিয়ে বলতে লাগল, খুব খেলোয়াড় হয়েছ দেখছি। একটা পুতুলই জোটে না, বারোটা নিয়ে খেলার শখ।

ভোরে ঘুম ভাঙলে দেখি সোনার আলোর মুকুট পরে বসে আছে পীরপাঞ্জাল। নীচের উপত্যকার সবুজ সমারোহের ভেতর দিয়ে শুভ্র উপবীতের মত বয়ে চলেছে তরঙ্গিনী বিপাশা।

জুলিয়েনের গলা শোনা যাচ্ছে বাইরে থেকে, ডাক্তার, বিয়ের পর ঘুমের মাত্রা এত বাড়ালে বেচারী রোগীরা যে তোমার ডিস্পেনসারিতে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবে।

জুলিয়েনের কথায় বালু আর ঝিন্নি হেসে উঠল। জুলিয়েন আমার উদ্দেশ্যে কথাগুলো বললেও আমি যে জেগে উঠেছি তা সে জানতে পারেনি।

ঝিন্নির মন্তব্য শোনা গেল, একদিন রিপ ভ্যান উইংক্‌ল্-এর মত লম্বা ঘুম থেকে জেগে উঠে বউকে আর দেখতেই পাবে না।

জুলিয়েন অমনি যোগ করল, তখন লতাগুল্মে জটিল হয়ে উঠেছে চারদিক, ডাক্তার বন চিরে সামনে বেরিয়ে এসে হঠাৎ ভেড়ার পালের পেছনে একটি গাদ্দী রমণীকে দেখে জিজ্ঞেস করে বসবে, তোমরা আমার ঝিন্নিকে দেখেছ? বলতে পার সে কোন পথে গেছে?

আমি চোখে মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। ঝিন্নিকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে বললাম, আমি কি কানা যে ঝিন্নিকে খুঁজে নিতে পারব না। এই তো আমার ঝিন্নি।

ঝিন্নি তখন সত্যিই অপ্রস্তুত, ও কি হচ্ছে ছোটেসাহেব, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও প্লিজ।

জুলিয়েন বলল, এতে লজ্জার কি আছে ম্যাডাম। আমরাও বউয়ের সঙ্গে এমনি ব্যবহার করে থাকি।

বালু কিল দেখিয়ে বলল, খু-উ-ব ভাল কাজই কর।

ঝিন্নি বলল, তা বলে প্রকাশ্যে নয়।

বললাম, অন্তরালে তো অনেক কিছুই ঘটে, প্রকাশ্যে ঘটুক না এটুকু নির্দোষ আমোদ।

ঝিন্নি বালুর হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল, এখানে বসে থাকলে আরও যে কি দৃশ্যের অবতারণা হবে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে চল ব্রেকফাস্টের জোগাড় দেখি।

বললাম, বেড-টির কি হল?

ঝিন্নি ঘরের ভেতর থেকে বলে উঠল, এক রাউন্ড হয়ে গেছে। এতক্ষণ বিছানায় পড়ে পড়ে স্বপ্ন দেখব আবার বেড-টিও চাই, তা হয় না মশাই।

তুমি পুতুল পুতুল করে বায়না ধরলে, আমি তাই স্বপ্নের দেশে পুতুল খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।

ঘরের ভেতর থেকে ঝিন্নি ছুটে এসে জুলিয়েনের আড়ালে দাঁড়িয়ে মিনতির ছবি ফোটাল চোখে মুখে। তার মুখখানাতে তখন অসহায় লজ্জার একটা ছবি। সে যেন বলছে, প্লীজ ছোটে ঠাকুর, দয়া করে পুতুল খেলার গল্পটা আর ফাঁস করে দিও না।

জুলিয়েনরা লাঞ্চের পর চলে গেল। ঝিন্নি আর আমি, ওদের গাড়ি একেবারে পাহাড়ের নীচে না নেমে যাওয়া অবধি দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে লাগলাম। বালু গাড়ির বাইরে মুখ বের করে সমানে মাথার স্কার্ফটা নাড়ছিল।

কত পরিবর্তন হয়ে গেছে বালুর। একেবারে নতুন জন্ম। পণ্ডিতজীর সহায় সম্বলহীন মুখচোরা মেয়েটি আজ ঘটনাচক্রে কুলুর অন্যতম ধনী বেনন পরিবারের সম্মানীয় বধূ। কি বিরাট মাপের হৃদয় ঐ জুলিয়েনের। যখন শুনল, পথভ্রষ্ট হয়েছে বালু আর তাকে নীচে টেনে নামিয়েছে একজন বিদেশী ট্যুরিস্ট, তখন কোনদিকে না তাকিয়ে অসহায় বালুকে গ্রহণ করতে সে এগিয়ে এল। তাছাড়া কত বড় অপবাদের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছে জুলিয়েন। যখন সবাই ভেবে বসেছে, বালু আর ডাক্তার মুখার্জী অচ্ছেদ্য বাঁধনে বাঁধা, তখন জুলিয়েন সব মানুষের সন্দেহকে চুরমার করে দিয়ে বালুকে নির্দ্বিধায় ঘরে তুলেছে।

আজ আর ওদের দুজনের কারো মুখেই অনুশোচনা কিংবা গ্লানির কোন চিহ্নই নেই। মেঘমুক্ত ভোরের পীরপাঞ্জাল যেন ঝক্ঝকে নির্মল হাসি হাসছে।

কি ভাবছ এত ছোটেসাহেব, ওরা তো এখন কদ্দূর চলে গেছে।

আমি ওদের কথাই ভাবছিলাম ঝিন্নি। কত বড় মাপের মানুষ ঐ জুলিয়েন, তাই ভেবে মনটা ভরে উঠছিল।

ঝিন্নি আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, আর আমার মনটা যে কত সংকীর্ণ তা নিশ্চয়ই সেইসঙ্গে মনে পড়ছিল তোমার?

একটুও না।

তাবলে ভালবাসা দিয়ে তো আর তোমার ঝিন্নির অপরাধকে ঢাকতে পারবে না ছোটেসাহেব!

আজ আর সেসব কথা নয় ঝিন্নি। ভুল বোঝাবুঝি মানুষের ভেতরই হয়ে থাকে।

জান ছোটেসাহেব, তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম একসময়, একথা মনে পড়লেই বুকে দারুণ একটা যন্ত্রণা হয়। চোখ ছাপিয়ে জল নেমে আসে।

কথাগুলি বলতে গিয়ে ঝিন্নির গলা ধরে এল। সত্যিই ছলছলিয়ে উঠল তার চোখ।

আমি ওকে ধরে নিয়ে ঘরে ঢুকে এলাম।

ঝিন্নির স্বভাবটা ঠিক শরৎ প্রকৃতির মত। এখুনি রোদের ঝিকিমিকি, এখুনি বৃষ্টির ঝির ঝির।

ঘরে ঢুকেই আমাকে জড়িয়ে ধরে সুন্দর দুটো খুশি খুশি চোখ তুলে বলল, বালুকে একটা জিনিস দিয়েছি।

হেসে বললাম, দেয়ার হেতুটা কি, আগে তাই বল?

বাঃ, ও এতবড় একটা আনন্দের খবর এতদূর থেকে বয়ে নিয়ে এল আর আমি ওকে কিছু না দিয়ে শুধু হাতে ফেরাব!

এখন বল, কি দিলে?

ওটা তুমি বলবে।

আমি তো হাত গুণতে জানি না।

অনুমান কর।

একটা পুতুল।

এখানে পাব কোথায়?

তাহলে ভাবী ছেলের জন্যে একখানা কাঁথা।

ধ্যাৎ, আমি কি আগে ভাগেই কাঁথা তৈরি করে রেখেছি নাকি।

আরে নিজেরটির কথা ভেবেও তো করে রাখতে পার।

আবার আমার মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছ ছোটেসাহেব।

হেরে গেলাম, এবার তুমি বল?

একটা সোনার গিনি আগাম দিলাম ওর ছেলেকে দেবার জন্যে।

তুমি দারুণ খেয়ালী।

খুশি হওনি?

খু-উ-ব খুশি হয়েছি।

ঝিন্নি বলল, জান ছোটেসাহেব, ওটা আমার মুখ দেখে খুশি হয়ে আমার দিদিমা দিয়েছিল।

স্মৃতির জিনিসটা হাতছাড়া করলে?

যারা আমার কাছে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, তাদের সর্বস্ব দান করেও আমার শান্তি নেই ছোটেসাহেব।

হেসে বললাম, দোহাই তোমার, দান করতে করতে হরিশ্চন্দ্রের মত আমাকেও দান করে বোসো না যেন।

শেষবেলায় কেল্লার পাশ দিয়ে দুজন হাঁটতে হাঁটতে নিচে নেমে যাই। একটা পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে বসি। বিপাশা বয়ে চলেছে। তার এপারে চলাচলের রাস্তা, ওপারে পাহাড়ের কোলে কোলে গমের ক্ষেত। গম প্রায়ক্ষেত্রেই তোলা হয়ে গেছে। একেবারে নিচের উপত্যকায় একমাস আগেই গম তোলার কাজ শেষ। ওপরের পাহাড়গুলোতে দেরীতে ফসল কাটা হয় কারণ এখানে শীত বেশি বলে গম বাড়তে দেরি হয়। এখনও যে সব ক্ষেতে ফসল তোলার কাজ বাকি সেগুলোর রূপ চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। এক একটি পাহাড়ের ঢাল সোনালী বাদামী ডোরা কাটা। ঠিক যেন ডোরা কাটা বাঘ শুয়ে শুয়ে রোদ্দুর পোহাচ্ছে।

কৃষকের বাড়িতে ঝাড়াই-মাড়াই আর ফসল ঘরে তোলার কাজ প্রায় শেষ। ওরা বাঁশ ছিলে বাতা দিয়ে পেরু তৈরি করবে। ঐ পেরুর ভেতর রাখবে ওদের সারা বছরের সঞ্চিত ফসল।

দূরে দূরে পাহাড়ী টিকা বা গাঁ দেখা যাচ্ছে। ঐ টিকার কোঠী থেকে হাল্কা নীলরঙের ধোঁয়া উঠছে। ক্ষেতখামারে কাজ করে সন্ধ্যায় যারা কোঠীতে ফিরবে তাদের খাবার তৈরির তোড়জোড় চলছে ঘরে ঘরে।

ঝিন্নি আমার পাশ থেকে কখন উঠে গিয়েছিল। ও এখন আমাকে পেছন থেকে 'কু' দিয়ে ডাকতে শুরু করল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। পেছনে একটা কুহলের নিরন্তর ঝরে পড়ার শব্দ। ঐ কুহলটা আরও নিচে দৌড়ে গিয়ে বিপাশায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমি পেছনে উঁচুনীচু পাহাড় ডিঙিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ওর সুন্দর সুরেলা ডাক উঠলেই আমি সচেতন হয়ে সেদিকে তাকাই। কিন্তু কোন শিলাস্তূপের আড়ালে যে ঝিন্নি নিজেকে গোপন রেখে লুকোচুরি খেলছে তা বুঝে ওঠা ভার।

একসময় স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবকন্যার মত ঝিন্নি আমার সামনের টিলায় আবির্ভূত হল। শেষবেলার সোনাটুকু এসে পড়েছে তার গোল্ডেন অ্যাপেলের মত মুখখানার ওপর। নীল রঙে সুথানের ওপর সোনালী ঘাগরা। কাজকরা চোলি। মাথায় বেঁধেছে লাল রঙের দো-পাট্টা। সে এক মহিমময় মূর্তি। ঝিন্নি বলে ওকে চেনাই যাচ্ছে না। নাগরকোটীয় ব্রাহ্মণের আভিজাত্য যেন চোখেমুখে ফুটে উঠেছে।

কি ছোটেসাহেব, ধরতে পারলে না তো?

মনে মনে বললাম, তোমাকে ধরতে পারে এমন সাধ্য কার, তুমি নিজে না ধরা দিলে।

মুখে বললাম, তোমাকে দেখে আর চেনা যাচ্ছে না ঝিন্নি। শেষ সূর্যের সোনালী জলে স্নান করে তুমি অনেক অচেনা হয়ে গেছ। যেন অন্য কোন লোক থেকে নেমে এলে।

ও তরুণী হরিণীর মত লাফাতে লাফাতে নেমে এল নীচে। আমার হাত ধরে বলল, চল তোমাকে একটা জায়গা দেখাই। দারুণ আবিষ্কার করেছি।

আমরা পেছনের দু'একটা শিলাস্তূপ পেরিয়ে যে জায়গায় এসে হাজির হলাম, সেখানে যে প্রকৃতি এমন সুন্দর একটা ছবি এঁকে রেখেছে তা কে জানত।

কুহলটা কুল্ কুল্ শব্দ করে পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেখানে দু'চারটে পাইনগাছ দাঁড়িয়ে। জায়গাটা মনোরম। আমরা দুজনে একটা নিচু পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে কুহলের জলে পা বাড়িয়ে দিলাম। ঠাণ্ডা হিমেল জল, কিন্তু গরমের দিনে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল কি তৃপ্তিকর একটা অনুভূতি। ঝট্পট একটা আওয়াজ হতেই দেখি, দুটো চটি-পিন্ঝা পাখি গাছের এক ডাল থেকে আর এক ডালে পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করে ফিরছে।

ঝিন্নি জলের থেকে সুন্দর অনাবৃত দুটি পা তুলে নিতেই ওর পায়ের ঝাঁঞ্জর ঝুম্ ঝুম্ করে বেজে উঠল। কি যে ভাল লাগল আমার রূপোর নূপুরের সেই মিষ্টি আওয়াজ!

ঝিন্নি বলল, চল না ছোটেসাহেব আমরা আজ এই পেছনের টিলাগুলো পেরিয়ে পেরিয়ে কেল্লার রাস্তায় উঠি।

বললাম, বাঁধাধরা পথের বাইরে চলতে আমারও খুব ইচ্ছে করে ঝিন্নি।

দুজনে নতুন পথ ধরে চলতে শুরু করলাম।

ঝিন্নি আমার হাত ধরে বলল, তা বলে বউয়ের হাতের বাঁধন খুলে নতুন পথে চলার চেষ্টা কর না যেন।

আমি হেসে বললাম, আমার হাতের সবটুকু জোর দিয়েও কি আর তোমার তৈরি বাঁধন খুলতে পারব ঝিন্নি।

ও হাসতে হাসতে ছুটল। আমিও ছুটলাম ওকে অনুসরণ করে।

পারব কেন আমি ওর সঙ্গে। এ দেশে ওর জন্ম, উঁচু নীচু পাহাড়ে অবলীলায় ওঠা নামা করতেই ওরা অভ্যস্ত। আমি সমতলভূমির মানুষ, পাহাড়ে উঠতে গেলেই হাঁফিয়ে উঠি।

ঝিন্নি কিন্তু বিবেচক। আমার অবস্থাটা ও ভাল করেই বুঝে নিয়েছে। তাই এক একবার পিছিয়ে এসে ও আমাকে হাত ধরে ওপরে টেনে তুলছে।

আমরা এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে গেলাম। সামনে কয়েকটা কুইল গাছের তলায় একটা ছোট কোঠী। তার ডাইনে এক চিলতে জমিতে সাদা আর গোলাপী রঙের পপি হয়েছে। কাছে গিয়ে দেখলাম, সিল্কের মত পাপড়ি। এক একটি ছোট কাপ যেন কেউ হাওয়ায় ভাসিয়ে রেখেছে। পাতাগুলো সুন্দর ধূসর সবুজ। এই পপি গাছের কাঁচা নরম অপক্ক বীজের ঘন রস শুকিয়ে আফিং তৈরি হয়।

ঝিন্নি বসে পড়ে ফুলগুলোতে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, এত সুন্দর ফুল, ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, মনে হচ্ছে এইখানেই বসে থাকি।

বললাম, পপি আর ঝিন্নির ভেতরে যে অসম্ভব মিল রয়েছে।

ও বসে থেকেই ওর শাঁখের মত ঘাড়টা ঘুরিয়ে বলল, কি রকম।

পপির পাপড়ির মত কোমল আর মসৃণ আমার ঝিন্নির শরীর। সাদা আর গোলাপী ফুলের মিশ্রণে তৈরি তার রং। আর ....।

কথাটা শেষ না করে চুপ করে গেলাম দেখে ঝিন্নি বলল, আর কি ?

নিতান্তই শুনতে যদি চাও তাহলে বলি, আর ওর সান্নিধ্যে আফিং-এর মাদকতা।

ঝিন্নি মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে আসছিল আমার দিকে, কিন্তু কোঠী থেকে এক ঝলক হাসির শব্দ বাতাসে ভেসে এল। অমনি ও ফিরে দাঁড়াল। আমার দৃষ্টিও কোঠীর দিকে গিয়ে পড়ল।

কোঠীর দাওয়ায় এসে দাঁড়িয়েছে একটি তরুণী মা, তার এতটুকু বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে। ঝিন্নির কাণ্ড দেখে সে হেসে উঠেছিল, এখনও সে হাসি তার চোখে মুখে লেগে আছে।

ঝিন্নি গতি পরিবর্তন করল। সে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে তরুণী মায়ের বুক থেকে বাচ্চাটাকে আমার কাছে নিয়ে এসে বলল, কি সুইট। আমার ভীষণ চটকাতে ইচ্ছে করছে।

বললাম, প্লিজ, ওটুকু বেবীকে চটকাবার চেষ্টা করনা, ময়দার তাল বনে যাবে। দেখছ না চোখ দুটো প্রায় বুজে আছে, নাকটা ছোট্ট একটা মার্বেল। ওর পুরো ফর্মটাই এখনো আসেনি।

ঝিন্নি ফিরে গেল বাচ্চার মায়ের কাছে। বাধ্য হয়েই যেন ফিরিয়ে দিতে হল। পারলে মাথার দো-পাট্টায় জড়িয়ে পিঠে বেঁধে নিয়ে চলে যেত।

পথে চলতে চলতে এবার গম্ভীর হয়ে গেল ঝিন্নি। বেশ বুঝলাম, ঐ ক্ষুদে বাচ্চাটা ওর মনে এখন তোলপাড় তুলেছে।

আমরা এখন আর আবিষ্কারের আনন্দে চলছি না, কোনরকমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে ওঠার আগে কেল্লার পথটা পেয়ে যাবার চেষ্টা করছি।

কোয়ার্টারে ফিরে দেখলাম ভাগ্‌তু দাওয়ার ওপর তার ক্র্যাচটা ফেলে রেখে বসে আছে।

হৈ হৈ করে উঠল ঝিন্নি, কিরে ভাগ্‌তু তুই! হঠাৎ এখানে চলে এলি যে বড় ? ডাক্তার সাহেবকে কটা দিন না দেখে মন কেমন করল ?

সেই বালক ভাগ্‌তু আজ পরিণত কিশোর হয়ে গেছে। লী-সাহেবের বাংলোতে পাথর পড়ে বেচারার পাটা থেঁতলে গেল। তারপর অপারেশন করে বাদ দিতে হল পা। গাদ্দী মা বাপের সে কি ক্ষোভ, পাটাই যদি বাদ চলে যায় তাহলে কি লাভ বেঁচে থেকে। ভেড়া চরিয়ে যাকে নিয়ে যেতে হবে লাহুল, স্পিতি আর কুলু থেকে কাংড়া তার কি খোঁড়া হয়ে বসে থাকলে চলে।

মনে মনে ভাবলাম, ভাগ্যিস ভাগ্‌তুটার প্রতিপালনের ভার নিয়েছিলাম আমি। আজ ভাগ্‌তু ছাড়া আমার ডিস্পেনসারী অচল।

লাজুক মুখে কথা নেই ভাগ্‌তুর। সে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়েছে।

ঝিন্নি ছাড়ার পাত্রী নয়। সে ভাগ্‌তুর পাশে বসে পড়ে বলল, ঠিক করে বল ভাগ্‌তু, তুই তোর দিদিকে বেশি ভালবাসিস না সাহেবকে ? আমি কিচ্ছু মনে করব না।

আগে হলে সাদাসিধে ভাগ্‌তু মনে যা আসত তাই বলে ফেলত, কিন্তু এখন বয়েস যত বাড়ছে, লোকজনের সঙ্গে যত মেলামেশা করছে, তত বুদ্ধিটাও খুলছে।

ভাগ্‌তু অনেক আস্তে বলল, দুজনকে।

ঝিন্নি অমনি বলল, শুনছ কি বলছে, আমাদের দুজনকে নাকি ও সমান ভালবাসে। বড্ড বুঝদার হয়ে গেছে আজকাল ভাগ্‌তু। কাউকে দুঃখ দিতে চায় না।

ঝিন্নি ঘরের ভেতর ঢুকে বাইরের আলোটা জ্বেলে দিল।

আমার চোখ হঠাৎ গিয়ে পড়ল ভাগ্‌তুর পায়ের ওপর। বোধহয় পায়ের ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে পরিচয় বলেই আমার চোখটা ওখানে গিয়েই পড়ে। দেখলাম, ভাগ্‌তুর আস্ত পাটাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, ব্যাণ্ডেজ ভেদ করে রক্ত চুঁইয়েছে। তবে ভাগ্‌তু ঐ পায়ে ভর রেখে যখন বাস থেকে নেমে এতটা ওপরে উঠে আসতে পেরেছে তখন আঘাতটা নিশ্চয়ই গুরুতর নয়।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে ওখানে? ব্যাণ্ডেজ কেন?

ও স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে জানাতে চাইল, ওটা এমন কিছু নয়।

ধমকে উঠলাম, বল্ ঠিক করে?

ভাগ্‌তু ধীরে ধীরে যা বলল, তার মর্মার্থ এই, মে'র ট্যুরিস্টরা এসে গেছে মানালীতে। হঠাৎ মেয়েদের সামনে হিপিরা অশ্লীল ইংগিত করেছিল বলে পাহাড়ী ছেলেরা ক্ষেপে যায়। তারা পাথর ছুঁড়তে থাকে। হিপিরা সঙ্গে সঙ্গে মদের বোতল ছোঁড়ে। সেই বোতলের ভাঙা কাঁচে ভাগ্‌তুর পা কেটে যায়।

বললাম, তুই মারামারিতে যোগ দিতে গিয়েছিলি?

ভাগ্‌তু মাথা নেড়ে জানাল, সে যায়নি।

তবে তোর পায়ে কাচ লাগল কি করে?

ভাগ্‌তু বলল, আমি বাজার থেকে ফিরছিলাম, ভাঙা বোতলটা ছিট্‌কে এসে পায়ে লাগল।

এ. টি. এস. নিয়েছিস?

শিউশরণজী দিয়ে দিয়েছেন।

ব্যাণ্ডেজ করার আগে ভাল করে পরিষ্কার করা হয়েছিল?

হ্যাঁ।

তুই ব্যথা পা নিয়ে এতটা পথ এসেছিস কেন?

এবার চুপ। আর কোন কথা বলে না ভাগ্‌তু।

বললাম, আঙুল-টাঙুল উড়ে যায় নি তো?

ভাগ্‌তু মাথা নেড়ে জানাল আঙুলগুলো তার আস্তই আছে।

খুব ডিপ্ হয়েছিল নাকি?

এবার ভাগ্‌তু বলল, শিউশরণজী বলেছে, এবার আর কোন ভয় নেই।

তাই তুমি চলে এসেছ বাঁদর। একটুও ভয়ডর নেই।

ভাগ্‌তু মাথা নীচু করে বসে রইল।

আমি জানি, আমি ওখানে না থাকলে ভাগ্‌তুর একটুও ভাল লাগে না। তাই খোঁড়া পা-খানা টেনে টেনে ও ছুটে এসেছে আমার কাছে।

ভেতরে গিয়ে ঝিন্নিকে ভাগ্‌তুর কীর্তিকলাপ সব বললাম। ঝিন্নি বাইরে এসে ভাগ্‌তুকে খুব একচোট বকুনি আর আদর করে দিয়ে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে গরম দুধ আর বিস্কুট নিয়ে এল ভাগ্‌তুর জন্যে। ওকে আমাদের বসার ঘরে রাখার ব্যবস্থা হল। রাতে যদি ব্যথা বাড়ে তাই একটা ট্যাবলেটের ব্যবস্থা করে দিলাম। ঝিন্নি সারাক্ষণ লেগে রইল ওর সেবায়।

পরদিন ভোরবেলা উঠে দেখি ভাগ্‌তু ক্র্যাচ ঠুকতে ঠুকতে মর্ণিং ওয়াক সেরে চড়াই ভেঙে আসছে।

দারুণ রাগ হল। এখুনি ব্লিডিংটা আবার শুরু হয়ে যাবে। পরক্ষণেই মনে হল, ও মেষচারক গাদ্দীদের ছেলে। কপাল দোষে এখানে বন্দী হয়ে থাকলে কি হবে, রক্তের ভেতর ঘোরার নেশাটা ওকে অস্থির করে তুলেছে।

ঝিন্নি চা নিয়ে এল। জানালার বাইরে আঙুল তুলে দেখালাম।

অমনি ঝিন্নি চায়ের কাপ টিপয়ের ওপর বসিয়ে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে আমার চোখের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ও নামল উৎরাই-এর পথে। একটা পাহাড়ী ঢল যেন দ্রুতলয়ে নাচের ছন্দে নেমে যাচ্ছে। আমি এখন ওপর থেকে ঝিন্নিকে দেখতে পাচ্ছি।

অনেক ভোরে ওঠার অভ্যেস ঝিন্নির। সে পরিচ্ছন্ন হয়ে চুল বেঁধে, পোশাক পরে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসে। আমাকে বেড-টি সার্ভ করে, বিছনার এক প্রান্তে বসে নিজের চায়ে চুমুক দিতে দিতে গল্প করে।

আজ টুকিটাকি গল্প করার সুযোগ পেল না সে।

এখন ঝিন্নি ভাগ্‌তুর পিঠে হাত রেখে চড়াই ভাঙছে। বক্ বক্ করে তার বেপরোয়া ঘোরাফেরার জন্য শাসন করছে। অবশ্য ভাগ্‌তুকে চড়াই ভাঙার ক্ষেত্রে সে কোন বাড়তি সাহায্য করছে না, আর উঠে আসতে সাহায্য করা সম্ভবও নয়। যে উঠবে সে তার ক্রাচখানা নিজের বশেই তুলে তুলে আসবে। তবু ভাল লাগছে ভাগ্‌তুর পিঠে ঝিন্নির এই হাতটুকু রাখা।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি ঝিন্নির বুকের মধ্যে মমতার একটা প্রস্রবণ আছে। সে যেখানে শূন্যতা দেখে সেখানেই জলের ধর্মের মত মমতা দিয়ে পূর্ণ করে দেবার চেষ্টা করে।

আপেল বাগিচায় অনেক দিন থেকে যে মেয়েরা কাজ করতে করতে বুড়ো হয়ে গেছে, নরসিংলালজী স্বাভাবিক কারণে তাদের কাজ থেকে ছুটি করে দিয়েছেন। কিন্তু তাদের একেবারে ছুটি করে দিতে পারেনি ঝিন্নি। সে আমার কাছে একদিন আবেদন নিয়ে মানালীতে এল।

ছোটেসাহেব আবেদন আছে।

হেসে বললাম, এমন করে কথা বললে আবেদন মঞ্জুর হবে না।

তুমি মালিক, সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আবেদন জানাতে হবে।

খুব কষ্ট পাই ঝিন্নি, যদি তুমি এমন করে কথা বল।

আচ্ছা, তবে আসল কথাটা বলি। এ আবেদন আমি জানাচ্ছি তাদের হয়ে যারা এতদিন তোমার ফলের বাগানে কাজ করেছে।

কি হল তাদের? আর ফলের বাগানের আবেদন আমার কাছে কেন, চাচাজীর কাছে কর গিয়ে।

ঝিন্নি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, চাচাজী তাদের বরখাস্ত করে দিয়েছেন।

ঝিন্নি এবার অন্য দিক থেকে তার কেসের স্বপক্ষে প্লীড করা শুরু করল।

আচ্ছা, ছোটেসাহেব তোমার মা আজ বুড়ো হয়ে যদি বেঁচে থাকতেন, তুমি তাঁকে অক্ষম বলে তোমার সংসার থেকে বের করে দিতে পারতে?

হো হো করে হেসে উঠে বললাম, বুঝেছি, আর ভণিতা করতে হবে না। ওদের জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা তোমার চাচাজীই করতে পারতেন। এ ব্যাপারে তুমি জান, ওঁর ওপরেই সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া আছে।

ঝিন্নি বলল, সেজন্যেই চাচাজী কিছু করতে পারছেন না। তোমার ব্যবসার লোকসান করে উনি অন্যের উপকার করবেন না।

বললাম, আমার হয়ে এবার তুমিই ডিসিশানটা নাও।

ওরে ব্বাস, অসম্ভব। আমি কারু অধিকারে ভাগ বসাতে পারব না। এটা যে যার নিজস্ব এক্তিয়ার।

বললাম, বেশ তাই হবে। আমার পৈতৃকসূত্রে যখন বাগানটা পাওয়া তখন আমাকে ডিসিশানটা নিতে হবে বৈকি।

আমার গলায় বোধকরি ক্ষোভ ও বেদনার মিশ্র একটা সুর বেজে উঠেছিল। বুদ্ধিমতী ঝিন্নির কান এড়াল না।

আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে ও বলল, রাগ করছ কেন ছোটেসাহেব। তোমার ঝিন্নি মনে মনে তাদের জন্যে একটা ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছে।

আমি তো আমার ঝিন্নির মুখ থেকে এতক্ষণ এই কথাটুকুই শুনতে চেয়েছিলাম।

চঞ্চল ঝিন্নি এবার আমার মুখোমুখি স্থির হয়ে বসল। বেশ বিবেচকের মত মুখখানা দেখতে হয়েছে এখন ঝিন্নির।

ছোটেসাহেব, আমাদের কুলু আর মানালীর দুটো বাগানেই বেশ কিছুটা করে খালি জায়গা আছে। ওখানে যদি আমরা কিছু খরচ করে দুটো বড় শেড্ তুলে দি তাহলে বুড়ো বয়সে আমাদের বাগানের বরখাস্ত মেয়েকর্মীরা মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই পায়।

বললাম, উত্তম প্রস্তাব।

ঝিন্নি বলল, এখানেই শেষ নয় কিন্তু আমার কথা। এখন বাকী রইল ওদের ভরণপোষণ সমস্যা।

বল, আমরা কিভাবে এ সমস্যার সমাধানে এগোতে পারি?

ঝিন্নি বলল, এ ব্যাপারে আমাকে কিছুটা করতে দাও। আমি যেটুকু সরকারী কাজ করে রোজগার করি, তার বেশকিছু অংশ আমি ওদের পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্রের জন্য খরচ করতে চাই।

ঝিন্নিকে আর বেশি কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললাম, বাকী পরিকল্পনাটা আমাকে করতে দাও ঝিন্নি।

বল কি করতে চাও?

বললাম, আমার ফলের বাগান থেকে লাভের একটা অংশ অক্ষম কর্মহীন মেয়েদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। ওতে তাদের দুবেলা খাবার ব্যবস্থাটা হয়ে যাবে।

দারুণ পরিকল্পনা ছোটেসাহেব।

বললাম, সবাই কিন্তু তোমার ঐ অভয়াশ্রমে থাকতে নাও চাইতে পারে। তারা ছেলেমেয়ে নাতিনাত্নীর সঙ্গ চাইবে।

ঝিন্নি বলল, তাদের জন্যে কিছু মাসোহারার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।

উত্তম।

ঝিন্নি বলল, তোমার অভয়াশ্রমের মেয়েরা একেবারে অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত কিছু কাজকর্মও করতে পারে।

যেমন?

এই ধরো ফলের গুটি বেরুবার মুখে কিংবা পাকার সময় উড়ুক্কু কাঠ বেড়ালী কিংবা পাখপাখালি যেরকম হামলা করে, ওরা হাতের কাছে রাখা দড়ি টেনে গাছে বাঁধা ক্যানেস্তারাগুলো বাজিয়ে ওদের রুখবে।

খুব ভাল পরিকল্পনা। শেষ অব্দি কাজ করে ওরা দয়ার দানে না বেঁচে আত্মসম্মান বজায় রাখার সুযোগ পাচ্ছে।

নরসিংলালজীর কাছে কথাটা পাড়তেই উনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, একদম দাদাজী কা মাফিক তোমারা খেয়াল বাবুজী। যো আচ্ছা লাগে করো।

এরপর উৎসাহে ঝিন্নি টগবগিয়ে ফুটে উঠল। ছুটির দিনগুলোতে শুরু হল ঘর তৈরির কাজ। এখন ছুটি ফুরিয়ে যেতেই নাগ্‌গরে ফিরে এসেছে নিজের কাজে। সারা ছুটি কুলুর বাগানে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তৈরি করিয়েছে পরিকল্পনা মাফিক ঘর। শেষ কাজটুকু নরসিংলালজীর হাতে ছেড়ে দিয়ে এসেছে। আসার সময় বলে এসেছে, দেখো চাচাজী, যেন আমার প্ল্যান মাফিক কাজটা হয়।

এসব ব্যাপারে ভারী খুঁতখুঁতে ঝিন্নি। প্রতিটি কাজে শিল্পীর হাতের ছোঁয়া থাকা চাই।

ও কদিন আগেই আমাকে বলেছে, জান ছোটেসাহেব, মানালীতে যখন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হবে তখন তুমি আমি দুজনে দাঁড়িয়ে থেকে কাজটা করব। তোমার ডিস্পেনসারীর যত কাজ থাক, আমার জন্যে কিছুটা সময় তোমায় দিতেই হবে।

ঝিন্নি ঢুকল ঘরে। বাইরের দাওয়ায় একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে এসেছে ভাগ্‌তুকে। আমি ঘরে বসেই নিশ্চিত করে বলতে পারি, শেষ ধমকের সঙ্গে সঙ্গে বেড-টীও পরিবেশন করা হয়ে গেছে।

ঝিন্নি ঘরে ঢুকতেই আমি বললাম, চা-টা যে তোমার বিপাশার শীতল সলিল হয়ে গেল।

ঝিন্নি বলল, হোকগে, ওতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু ছোটেসাহেব 'সলিল' কাকে বলে?

হেসে বললাম, আমার পিতাজী বেঁচে থাকতে তোমাকে যে বাংলার পাঠ দিয়েছিলেন, এখন বোঝা যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ হয়নি।

ও কথা বল না ছোটেসাহেব। পিতাজী কত যত্ন করে আমাকে কাছে কাছে রেখে বাংলা শেখাতেন। তাছাড়া একটা বাংলা অভিধান আমার জন্য উনি আনিয়েছিলেন।

বললাম, 'সলিল' মানে জল। সারা অভিধানটা মুখস্ত করে রাখা হয়ত সম্ভব হতে পারে কিন্তু তার কোন দরকার নেই ঝিন্নি।

ও ঐ ঠাণ্ডা চাটুকু চুমুক দিয়ে খেতে খেতে বলল, ভাগ্‌তু কোথায় নেমে গিয়েছিল বলত ?

আন্দাজ করতে পারি, কিন্তু সঠিক বলতে পারব না।

তবু বল?

এই কেল্লার ধারে হয়ত একবার চক্কর দিয়ে আসতে।

উদ্দেশ্য?

অকারণে।

অকারণে ভাগ্‌তু যাবে!

যেতেও পারে।

ঝিন্নি বলল, হল না। ঐ তোমার পি. ডব্লিউ. ডি-র গেস্ট হাউস দেখতে আর যে যাক, ভাগ্‌তু যাবে না। ও গিয়েছিল বিপাশার জল মাথায় নিতে।

হঠাৎ ভোরবেলা বিপাশার জল নেবার ধুম পড়ল কিসে?

ঝিন্নি বলল, ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং, আমার খুব ভাল লাগল। ওর মা বাবা এবার শীতকালে যখন ওকে দেখতে আসে তখন ওর কানে দুটো রিং পরিয়ে দিয়ে যায়। সেইসময় ওকে নাকি বলে যায়, প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম পূর্ণিমায় ও যেন বিপাশার জল মাথায় ছিটিয়ে নেয়।

বললাম, উদ্দেশ্য?

ঝিন্নি বলল, খোঁড়া ছেলের জন্যে মায়ের মঙ্গল কামনা। তুমি জান শীতকালে ওপরের পাহাড়ে বরফ পড়ে যায় বলে গাদ্দীরা (মেষচারক) তাদের ভেড়া নিয়ে নীচে ভ্যালিতে নেমে আসে। ওরা নীচু 'ব্যান' অঞ্চলে চরে বেড়ায় তখন। ঘাস নেই কোথাও প্রায়, তাই ওরা খায় বিল, কেম্বল, গার্ণা, খইর গাছের পাতা। তারপর শীত কেটে গেলে ওরা আর ভ্যালিতে থাকতে চায় না। তখন হাজার হাজার ভেড়ার পাল নিয়ে ওরা উঠতে থাকে ওপরের পাহাড়ে। শেষ গ্রীষ্মে ওরা ছাড়িয়ে যায় বার্চ, পপলার আর রোডোডেনড্রনের সীমারেখা। তখন শুধু স্নো-লাইনে ভেড়ারা ঘোরে। ওখানে ঘাস জন্মায়, সেই নীরু ঘাস খেয়ে দারুণ পুষ্ট হয় ভেড়াগুলো।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল ঝিন্নি।

কি হল, থামলে যে?

ঝিন্নির মুখে চোখে সলজ্জ একটা ছাপ। বলল, দেখত কি বলতে গিয়ে আলতু ফালতু কত কি গাইছি।

বললাম, দারুণ ইন্টারেস্টিং! থিসিসের সাবজেক্ট।

ঝিন্নি এবার তার আসল চরিত্রে ফিরে এল, শোন এখন ভাগ্‌তুর মায়ের কথা। ও ছেলেকে বলে দিয়েছে, জ্যৈষ্ঠের প্রথম পূর্ণিমায় ওরা ভেড়া নিয়ে প্রতি বছরই থাকে রোটাং পাশের কাছাকাছি। এবার থেকে ওরা ফি বছর রোটাং-এ বিপাশার উৎস মুখে ছেলের জন্য মঙ্গল কামনা করে জল স্পর্শ করবে। আর ভাগ্‌তুও যেন তাই করে।

থামল ঝিন্নি। এতক্ষণে বিপাশা রহস্যটি ভেদ করা গেল।

ঝিন্নি উঠে গেল কাজে। আমি বসে বসে ভাগ্‌তুর কথা ভাবতে লাগলাম।

এখনও 'লী' সাহেবের উপহার দেওয়া টাট্টুটি আমার বাহন হয়ে আছে। সেই যে কুলুতে 'লী' সাহেবের বড়দিনের উৎসবে ছোট্ট ভাগ্‌তুটার পায়ে পাথর পড়ে গেল, আর ডাক পড়ল আমার। ভাগ্‌তুর পায়ে অপারেশন করা হল। বলতে গেলে সেই অপারেশনে পুরস্কার দিলেন মিঃ লী একটি সুন্দর জাতের টাট্টু।

কিন্তু ভাগ্‌তুর মা বাপ কেঁদে কেটে সারা হল। তাদের খোঁড়া ছেলে এখন কি কাজে লাগবে। তারা গাদ্দী পহাল : ভেড়া নিয়ে চম্বা, কাংড়া, কুলু, লাহুল, স্পিতি ঘোরাঘুরি করাই তাদের কাজ। পাহাড়ে পাহাড়ে তাদের চলা, তাদের বিশ্রাম। অগত্যা আমাকে নিতে হল ভাগ্‌তুর প্রতিপালনের ভার। ওরা প্রতি বছর শীতের মরশুমে একবার করে ভেড়া নিয়ে নামে কুলু ভ্যালিতে। ছেলের সঙ্গে সে সময় দেখা করে। হাতে বোনা উলের পোশাক দিয়ে যায় ভাগ্‌তুকে। আমাদের প্রতি বছর উপহার দিয়ে যায় একটি করে কম্বল।

আমি একবার ওর বাবাকে বললাম, তোমার ছেলেকে আমি একখানা ছোট্ট কোঠী তৈরি করে দেব। ও আমার ফলের বাগানের তদারকী করবে আর ভালো মাসোহারা পাবে।

ভাগ্‌তুর বাবার উত্তরটি ভারী সুন্দর। সে বলেছিল, তোমরা দেবতাকে কোঠীর ভেতর বন্দী করে রাখ। আর আমাদের দেবতা 'বানবীর', 'কেহ্‌লুবীর', 'গুগা', 'বাতাল', সব ঘুরে বেড়ান বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, নদী আর কুহলের স্রোতে স্রোতে। তাঁরা কেউ বসে থাকেন না বাবুজী। গাদ্দীরা যে সারাক্ষণ চলে, তাই তাদের দেবতাও চলছেন। আমার বাচ্চাটাকে তোমরা ঠাকুর বানিয়ে দিলে। ও বাঁধা কোঠীতে থেকে গেল। আকাশের মহিমা দেখল না। পাহাড়ের বরফ ছুঁয়ে দেখল না। বনের ভেতর ঢুকে গান শুনল না।

একটু থেমে একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলল, বাবুজী, ও ব্যাটা গাদ্দী না।

ভাগ্‌তুর বাবা 'গদী' ভাষায় কথা বলেছিল। ঝিন্নি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল ভাষান্তর করে।

সত্যি আশ্চর্য একটা স্রোত আছে এই গাদ্দীদের জীবনযাত্রার ভেতর। 'তউন্দি' বা তপ্তঋতুতে পাহাড়ী কুহল আর ঝোরাগুলি শুকিয়ে যায়। আবার যখন 'বরসাত্‌' শুরু হয় তখন ঘুমন্ত ঝোরাগুলো প্রাণ পেয়ে লাফিয়ে ওঠে। তারা সারা পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গা থেকে এঁকে বেঁকে লাফাতে লাফাতে নীচের উপত্যকায় নেমে আসে।

শীতের সময় ভ্যালিতে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের দিকে তাকালেই বর্ষার দিনে ঝরে পড়া ঝর্ণাগুলোর মত একটা ছবি চোখে পড়বে। মনে হবে এখানে ওখানে পাহাড় থেকে সাদা ফেনা তুলে নেমে আসছে অগণিত স্রোতধারা। আসলে ওগুলো গড্ডলিকা প্রবাহ। গাদ্দীরা দলে দলে ওপরের পাহাড় থেকে নেমে আসছে তাদের সাদা সাদা ভেড়ার পাল নিয়ে উপত্যকায়।

ওরা সারা শীতকালটা চরে বেড়াবে কুলুর উপত্যকাগুলোতে। উঁচু পাহাড়ে তখন প্রচণ্ড বরফ পড়া শুরু হয়ে যাবে। হাওয়ায় হাওয়ায় চলবে শীতের তীক্ষ্ণ করাত। মনে হবে হাড়ের ভেতর সে করাতের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

ঝিন্নি নাস্তা নিয়ে এল ঘরের ভেতর। প্লেটখানা হাতের পাতায় রেখে হাতটা ওপরের দিকে তুলে দাঁড়িয়ে রইল একটি সুন্দর মডেলের মত। মুখখানাতে মিষ্টি হাসি।

বললাম, তুমি যে শিল্পী তা তোমার দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখেই বোঝা যায়।

আগে বল, আজ কি খাবার তৈরি করে এনেছি তোমার জন্যে?

বললে কি দেবে?

তোমার খালি, চাই চাই চাই। দাও দাও দাও। তুমি একটি পাক্কা চব্বীয়াল বিজনেসম্যান।

বললাম, আচ্ছা, কিছু চাইব না, এমনি বলছি। তুমি মোহনভোগ তৈরি করে এনেছ।

ও সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে প্লেটটা নামিয়ে রাখল টিপয়ের ওপর। সত্যিই প্লেটে মোহনভোগ।

ও বলল, তুমি অবাক করলে ছোটেসাহেব। আচ্ছা, আমার দিকে চেয়ে সত্যি করে বলতো, তুমি কোন ফাঁকে রসুইখানা ঘুরে দেখে আসনি?

বিশ্বাস কর, আমি এখানেই বসে।

তাহলে কি করে তুমি এত বড় একটা আন্দাজ করলে?

আমার থার্ড আই আছে ঝিন্নি, আমি ইচ্ছে করলে সবকিছু দেখতে পাই।

ঝিন্নি এবার আমার কাছে এসে গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, সত্যি করে বলনা গো ছোটেসাহেব? আমি তো আগে কোনদিন মোহনভোগ করে তোমাকে খাওয়াইনি।

বললাম, আমি এখানে বসেই ঘি, সুজি, চিনি, দুধের মিষ্টি গন্ধ পেয়েছিলাম। তেজপাতা, কিশমিশ, বাদামের মিশ্রিত গন্ধটাও আমার চেনা। আমাদের মাসীর বাড়িতে প্রায়ই মোহনভোগ সকালের জলখাবার হত। মাসী বলতেন, এ খাবারটা আমার মা নাকি অনেক ভাল তৈরি করতেন।

ঝিন্নি বলল, আমি পিতাজীর কাছ থেকে এ খাবার তৈরির প্রসেসটা শিখেছি। তিনিও এ খাবার তৈরির ব্যাপারে মাতাজীর কথা বলেছেন।

বললাম, ঝিন্নি, আমার নাকটি কিন্তু ভীষণ জাগ্রত। অনেক দূরের গন্ধ ও সহজেই বুঝে নিতে পারে। আর আমার ঝিন্নি যেখানেই থাক তার সুন্দর শরীরের মিষ্টি গন্ধটা আমি পাবই।

ঝিন্নিকে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে এনে তার চোলির মাঝে নাক মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইলাম।

ঝিন্নি দাঁড়িয়ে, আমি বিছনায় বসে। ও আমার মাথার চুলে তার পাঁচখানা আঙুলই চালাতে চালাতে বলল, তুমি এখনও সেই আগের মত পাগল আছ ছোটেসাহেব। তোমার চিকিৎসার দরকার।

ওর কোমরখানা তেমনি জড়িয়ে ধরে বুকের থেকে মুখটা একটু তুলে ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, আমার এ রোগের চিকিৎসক তাবৎ বিশ্বে তুমিই একমাত্র আছ ঝিন্নি।

ও আমার মাথাটা দুহাতের পাতায় চেপে ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বলল, বিশ্বের একমাত্র ডাক্তারের ফিটাও কিন্তু অনেক বড় রকমের ছোটেসাহেব।

পুঁজি আমার খুবই কম। তবু সবটুকু পুঁজি তোমাকে উজাড় করে দিতে রাজি আছি ঝিন্নি।

ও এবার আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে প্লেটটা নিজের হাতে তুলে নিল। চামচেয় খানিকটা খাবার নিয়ে ও আমার মুখে পুরে দিয়ে বলল, ডাক্তার নিজের হাতে খাইয়ে দিচ্ছে তার পেসেন্টকে, কেমন লাগছে?

বললাম, শুধু ডাক্তার নয়, লেডি ডাক্তার। স্বাদটা তাই দ্বিগুণ বেড়ে গেছে।

ঝিন্নির হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যেতেই সে প্লেটটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, লক্ষ্মীটি, নিজে নিজে খেয়ে নাও। আমি আসছি।

বলতে বলতেই ছুটল ও ভেতরে। রসুইখানা থেকে আবার দ্রুত বেরিয়ে গেল।

খেতে খেতে মনে হল, চারদিকে নজর ঝিন্নির। বাইরে যে ভাগ্‌তু বসে আছে, তাকে যে নাস্তা দেওয়া দরকার যথাসময়ে, সেটুকু বিবেচনা স্বামী-স্ত্রীর উপভোগ্য আনন্দের মাঝেও সে হারায়নি।

দুদিন যেতে না যেতেই শ্রীমাণ ভাগ্‌তু চঞ্চল হয়ে উঠল। ঝিন্নির ওপর তার যে গভীর একটা আকর্ষণ আছে তা আমাদের কারোরই অজানা নয়। আর ঝিন্নি তাকে যে শাসনে সোহাগে একেবারে শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে তা কুলু আর মানালীর তাবৎ পরিচিত লোকেরাই জানে।

তবু আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি, ভাগ্‌তুর রক্তে একটা ঘূর্ণি আছে। সে খুব বেশি সময় কোথাও স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। সে যে সবার মত স্বাভাবিক সুস্থ শরীরের অধিকারী নয় তা সে প্রাণপণ শক্তিতে অস্বীকার করার চেষ্টা করে। আমি এ ব্যাপারে তাকে মনে মনে সাপোর্ট করলেও ডাক্তার হিসেবে বাইরে অনেক সময় কঠিন হতে হয়।

দুপুরে খাবার পর একটা কি উইকলির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ কাদের যেন জোরে জোরে কথাবার্তায় আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। আমি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে কান পাতলাম।

ভাগ্‌তুর গোয়ার্তুমী আর ঝিন্নির ধমক চলছিল ঘন ঘন।

চেয়ার থেকে উঠে উঁকি দিলাম। বারান্দায় বসে দুজনে। ঝিন্নি একটা আধবোনা ডিপ মেরুন রঙের সোয়েটার নিয়ে ভাগ্‌তুর গায়ে বারে বারে ঠেকিয়ে বলছে, হাঁদারাম দেখ রঙখানা কিরকম খুলেছে।

ভাগ্‌তু সমানে গা ঝাড়া দিয়ে ঐ রঙটা সম্বন্ধে তার প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে।

বুঝলাম, ভাগ্যবান ভাগ্‌তুর আগামী শীতের পোশাক তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে।

উভয়পক্ষের মতবিরোধ যখন দেখলাম তুঙ্গে তখন আমি অন্তরাল ছেড়ে সশরীরে মঞ্চে প্রবেশ করলাম।

আমাকে দেখেই উভয়পক্ষ চুপ করে গেল।

আমি যেন হঠাৎ দেখতে পেয়েছি ঝিন্নির হাতের সোয়েটারখানা, এমনি ভাব দেখিয়ে বললাম, দারুণ সোয়েটারখানা তো। তুমি যে আমার জন্য বোনা শুরু করে দিয়েছ তা তো জানাওনি।

ভাগ্‌তু দেখলাম অমনি তাকাল ঝিন্নির মুখের দিকে। তার সোয়েটারে যে অন্যে ভাগ বসাচ্ছে এটার প্রতিবাদ ঝিন্নি কি'ভাবে করে তাই সে এখন দেখতে চায়।

ঝিন্নি তার সুন্দর চোখের কোণ একটু উঁচিয়ে তাকাল আমার দিকে।

সত্যি তোমার খুব পছন্দ হয়েছে?

দারুণ। এ রঙটা আমার গায়ে কেমন মানায় দেখি একবার।

আমি ঝিন্নির হাত থেকে সোয়েটারটা টেনে নিয়ে আমার অনাবৃত হাতের ওপর চাপিয়ে দু'একবার ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় কাৎ করে দেখলাম। তারপর মুখে তারিফের একটা হাসি ফুটিয়ে বললাম, আমার তো দারুণ লাগছে, কিন্তু সাইজ দেখে মনে হচ্ছে আমার গায়ের মাপের আন্দাজ তুমি করতে পারনি।

ঝিন্নি ধরতে পারেনি আমার কৌশল। সে অমনি বলল, তোমার যখন ভাল লেগেছে তখন আমি খুলে ফেলে আবার বুনে ফেলব।

আমি আর একবার নিজের হাতের ওপর ওটাকে ফেলে দেখলাম। মুখে বললাম, রঙটা সত্যিই আমাকে ভাল মানাবে।

সোয়েটারটা ঝিন্নির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আমি নীচের লনে নেমে আর্ট গ্যালারীর প্রান্তে ফারগাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। যাবার সময় আড়চোখে ভাগ্‌তুর মুখের চেহারাখানা দেখলাম। মনে হল, ওষুধ ধরেছে।

পেছন থেকে ঝিন্নি আর ভাগ্‌তুর কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু কথার অর্থটা কানে এসে পৌঁছচ্ছিল না।

আমি বেশ খানিকটা সময় ওদের বোঝাপড়ার সুযোগ দিলাম।

পীরপাঞ্জালের বরফ দেখছিলাম এমন সময় হাতে ছোঁয়া লাগতেই পেছন ফিরলাম।

ঝিন্নি দাঁড়িয়ে আছে দেখে বললাম, কি, ভাগ্‌তু সাহেবের পছন্দ হল রঙটা?

ঝিন্নির চোখে মুখে বিস্ময়, তুমি জানলে কি করে সোয়েটারটা ভাগ্‌তুর?

আগে বল, রঙটা এখন ভাগ্‌তুর পছন্দ হয়েছে কিনা?

ঝিন্নি একমুখ হাসি হেসে বলল, তুমি চলে আসার ঠিক পরেই ভাগ্‌তু আমার হাত থেকে সোয়েটারখানা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে বলল, এ সোয়েটার আমার। ডাক্তারসাবকে তুমি আলাদা সোয়েটার বানিয়ে দেবে।

আমি বললাম, তুমি কি আমাকে ভাগ্‌তুর মত ছেলেমানুষ পেলে নাকি।

কেন বলতো?

আমার ঐ রঙের সোয়েটার পরতে হলে আবার জন্মাতে হবে।

ঝিন্নি আমার হাতখানা নেড়ে দিয়ে বলল, ছোটেসাহেব আমার বুড়ো হয়ে গেল। এখন বুড়ো বরের জন্য আমি কি রঙের সোয়েটার বুনি?

তুমি তো সোয়েটারে সোয়েটারে আমার বাক্স প্যাটরা সব ভরে দিয়েছ। এখন আবার সোয়েটার বানাবার আগে নতুন আর একখানা বাক্স কিনে দিও।

ঝিন্নি বলল, এখন বল, তুমি কি করে জানলে আমি ভাগ্‌তুর জন্যেই সোয়েটারটা বানাচ্ছি?

ঘরের ভেতর থেকে তোমাদের বাদপ্রতিবাদ শুনছিলাম। তাই তোমাকে রক্ষা করার জন্য একটুকরো অভিনয় করলাম।

দারুণ অভিনয় করেছ ছোটে সাহেব, নইলে ঐ গোঁয়ারকে বোঝান দায় হত। আর আমার এত দামের উলটা একেবারে বরবাদ হয়ে যেত।

বললাম, তোমার এত উপকার করলাম, এখন আমাকে একটুখানি সঙ্গ দাও।

ঝিন্নি বলল, এখানে বেড়াবে, না ফরেস্ট বাংলোতে যাবে?

অনেকদিন ওখানে যাইনি। চল দুজনে একটু ওপরের পাহাড়টা ঘুরে আসি।

ঝিন্নি আর আমি পাহাড়ের গায়ে পাইন অরণ্য পেরিয়ে উঠতে লাগলাম। দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসা একটা ধ্বনির মত পাতায় পাতায় হাওয়ার শব্দ বাজছিল।

আমরা একসময় ঘন বনের মাঝখানে এসে গেলাম। বাইরে থেকে কেউ আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। আমরা কিন্তু গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছিলাম। অনেকখানি নীচে বন, বসতি, বিপাশা নিয়ে আশ্চর্য সুন্দর কুলু উপত্যকা। আর বেশ খানিক ওপরে আলো ঝলমল পীরপাঞ্জালের তুষার মহিমা।

আমরা সেই মুহূর্তে গভীর বনের মাঝে থমকে দাঁড়ালাম। আমাদের সামনে দিয়ে হাসি ছড়াতে ছড়াতে ছুটে পালান দুষ্টু মেয়ের মত একটা কুহল শব্দ তুলে নেমে যাচ্ছিল বিপাশা লক্ষ্য করে। এই ঝর্ণাটা আবার শীতকালে রূপোর কাঠির ছোঁয়ায় নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কত সকাল কত সন্ধ্যায় আমরা দুজনে ঐ কুহলের পাশে উঁচু পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে কত কথা বলে গেছি। কি মিষ্টি দুষ্টুমির হাসি হেসেছে ঐ কুহল আমাদের কথা শুনে। আবার আমরা ওর শীতের ঘুম ভাঙাতে ওর গায়ে আঙুলের ছোঁয়া দিয়ে গান গেয়েছি। আমি গেয়ে গেছি রবীন্দ্রনাথের গান, আর ঝিন্নি গেয়েছে ওর কুলুহী ভাষার লোক-সঙ্গীত।

আমি গীতবিতানের বেশ কিছু গান জানলেও তেমন ভাল একটা গাইতে পারি না। কিন্তু ঝিন্নির গলা বড় মিষ্টি, একেবারে লোক-সঙ্গীতের জন্যে যেন তৈরি। ও কিন্তু আমার গানের দারুণ ভক্ত। মোটামুটি বাংলা ভাষায় বলতে কইতে আমার বাবা ওকে শিখিয়েছিলেন, তবে গুরুদেবের গানের কথার গভীরে সবসময় ও ডুব দিয়ে মুক্তো সঞ্চয় করতে পারত না। তাই ওকে আমি গান শোনাবার আগে ধরে ধরে সূক্ষ্ম ভাবগুলো ব্যাখ্যা করে দিতাম।

ও অনেক সময় আমার গলায় গলা মিলিয়ে গীতবিতানের গানগুলো গাইবার চেষ্টা করত, কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গায়কী কোনভাবেই ফুটে উঠত না ওর গলায়। বড় উৎসাহী ও। কি গভীর মনোযোগ দিয়ে ও সব কিছু শেখার চেষ্টা করে। ওর তন্ময় ভাবটি কত মিষ্টি। টলটলে ছোট্ট পুকুরে অপরাহ্নের লাবণ্যময় আলো এসে পড়লে যেমন সৌন্দর্যের সঙ্গে গভীরতার যোগ হয়, ঝিন্নির মিষ্টি মুখখানা সময় সময় তেমনি গভীর হয়ে ওঠে।

কি ভাবছ ছোটেসাহেব?

ঝিন্নির ডাকে আমি চমকে তাকালাম।

ও এসে আমার হাতখানা ধরে মুখের দিকে তাকাল।

বললাম, তোমার কথা ভাবছিলাম ঝিন্নি।

ও ছেলেমানুষের মত করে বলল, কি কথা বল না?

সব কথা কি বলা যায়?

কেন যায় না ছোটেসাহেব?

বললাম, এমন অনেক ভাল লাগার অনুভূতি আছে যাকে কথা দিয়ে সাজান যায় না।

ও আমার গায়ের কাছে আরও নিবিড় হয়ে দাঁড়াল। এক সময় আমার বুকের মধ্যে কান চেপে দাঁড়িয়ে রইল।

হেসে বললাম, কি খেয়ালে তোমায় পেল ঝিন্নি?

ও আমার দিকে ওর হলুদ পাতার মত হাতখানা তুলে কথা বলতে বারণ করল।

এক সময় আমার বুক থেকে কানটা সরিয়ে নিয়ে বলল, তোমার সব কথা জেনে নিয়েছি ছোটেসাহেব।

হেসে বললাম, স-অ-ব কথা!

ও বলল, সব।

তাহলে বল, কি জেনেছ?

ঝিন্নি অমনি বলল, অনুভব করেছি সব, ভাষায় তো প্রকাশ করতে পারব না।

ঝিন্নিকে দুহাতে ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললাম, এত দুষ্টু হয়েছ তুমি, আমার কথায় আমাকে ঘায়েল!

ও আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে কুহলটার ধারে চলে গেল। অঞ্জলিতে জল তুলে নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে একাদশী বালিকার মত খেলা করতে লাগল।

মেয়েদের মনে কখন যে কি ভাবের উদয় হয় তা বোঝা ছেলেদের পক্ষে বড় মুশকিল। আর ঐ না বোঝাটুকু আছে বলেই মেয়েদের ঘিরে ছেলেদের এত বিস্ময়, এত রোমাঞ্চ।

ঝিন্নি এবার অঞ্জলি ভরে জল তুলে নিয়ে আমার কাছে এসে বলল, হাতে নিয়ে দেখ, সমস্ত মনটা জুড়িয়ে যাবে।

আমি ঝিন্নির হাত থেকে জলটুকু ধরে নিয়ে আচমকা ওর মুখে মাখিয়ে দিয়ে বললাম, আঃ, প্রাণটা একেবারে জুড়িয়ে গেল।

ও আমার হাতখানা ধরে আমার মুখের দিকে চোখ মেলে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, অপূর্ব সুন্দর একটা জিনিস আমি দেখতে পাচ্ছি।

আমি মুখ নীচু করে বললাম, কি দেখতে পাচ্ছ?

ঝিন্নি সঙ্গে সঙ্গে কান্নার গলায় চেঁচিয়ে উঠে বলল, কি হচ্ছে ছোটেসাহেব, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। একটুও মাথা নাড়িও না।

আমি আদেশ প্রাপ্ত সৈনিকের মত স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ও আমার গালে ওর দুটো হাত চেপে ধরে একটু এদিক ওদিক ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এইভাবে দাঁড়িয়ে থাক। একটুও নড়াচড়া কর না যেন।

এবার আমি মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তরীভূত একটি প্রাণীর মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

ও অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, তুমি রাজা হবে ছোটেসাহেব। তোমার কপালের মাঝখানে এসে পড়েছে গোল একটি আলোর তিলক।

একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে বললাম, আমি রাজা হতে যাব কোন দুঃখে ঝিন্নি? সারা দুনিয়া থেকে যেখানে রাজতন্ত্র মুছে দেবার চেষ্টা হচ্ছে সেখানে এই নির্জন অরণ্যে তুমি আমাকে রাজা বানাবার চেষ্টা করছ!

ঝিন্নি বলল, আমার রাজা মানুষের হাতের তৈরি কোন সিংহাসনে বসে থাকে না, সে প্রতিটি মানুষের অন্তরের আসনে প্রিয় অতিথি হয়ে বসে।

একটু থেমে ঝিন্নি গম্ভীর হল, জান ছোটেসাহেব, আমার ঠিকই মনে হচ্ছে ঈশ্বর ঐ একবিন্দু আলোর তিলক তোমার কপালে মিথ্যা এঁকে দেননি।

বললাম, সব জিনিসকে এমনি সিরিয়াসলি নাও কেন ঝিন্নি?

দোহাই তোমার ছোটেসাহেব, আমার ধারণাকে এমন করে আঘাত কর না। আমি ঈশ্বরের মহিমাতে বিশ্বাস করি। কোন পথ দিয়ে যে তাঁর করুণা নামে, কাকে যে সে করুণা কখন স্পর্শ করে যায়, তা কে বলতে পারে।

আমি ঝিন্নির সহজ অন্তরের গভীর বিশ্বাসটুকুর মর্যাদা দিলাম। বললাম, আমিও ঈশ্বরে বিশ্বাসী ঝিন্নি। তবে হয়ত তোমার মত গভীর করে কখনো তাঁকে অনুভব করিনি।

ঝিন্নি আমাকে বাধা দিয়ে বলল, তোমার ভেতর ভগবানের যে কতখানি দান রয়েছে তা তুমি বুঝবে না। এত মানুষের ভালবাসা তুমি পেয়েছ, এত রোগী, দুঃখী তোমাকে দেবতার মত ভক্তি করে, ঈশ্বরের করুণা না থাকলে সে কি সম্ভব হত। তুমি রাজা নয়ত কে রাজা ছোটেসাহেব?

ঝিন্নির হাত ধরে বললাম, চল, আমরা আরও ওপরে যাই। সেখান থেকে দিনান্তের ছবিটা দেখব।

ঝিন্নি আর আমি ওপরে উঠলাম। অনেকখানি ওপরে উঠে ফরেস্ট বাংলো। সেখান থেকে হিমালয়ের দৃশ্য মনোরম।

ফরেস্ট বাংলোতে তালা দেওয়া। একটু তফাতে চৌকিদারের ডেরা।

ঝিন্নি আর আমি বাংলোর সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। একটা সুন্দর স্মৃতি হালকা কুয়াশায় মেঘের মত উঠে এসে আমাদের আচ্ছন্ন করে দিয়ে যেতে লাগল।

বিয়ের আগে যেবার প্রথম কোলি-রি-দেওয়ালির উৎসব দেখতে নাগ্‌গরে এসেছিলাম, ঝিন্নির সঙ্গে সেবার এই বাংলোতে এসেছিলাম একটি রাত কাটাতে।

ডিসেম্বরে ওপরের পাহাড়ের গায়ে ধবধবে সাদা আলোয়ান চাপানো। নীচের পাহাড়গুলো গরীব লোকের মত সাদা আলোয়ান গায়ে দিলেও মাঝে মাঝে ফুটোর ভেতর দিয়ে গা দেখা যাচ্ছে। সবুজ সতেজ তরুণ দেওদার আর পাইন গাছগুলো যেন রাতারাতি বুড়ো হয়ে গেছে। ডালপালা পাতাপত্র সব সাদা। প্রকৃতির রঙ-মিস্ত্রি ওপর থেকে সাদা রঙের পোঁচ মেরে ধীরে ধীরে নেমে গেছে নীচে। ভ্যালিতে ধুলোর মত গুঁড়ো বরফ। কেবল এখানে ওখানে পাহাড়ী টিকার কোঠী থেকে উঠছে নীলাভ ধোঁয়া। আকাশ নীল। আর নীল, বিপাশার চলমান জলপ্রবাহ। এতখানি সাদার ভেতর ধোঁয়া, আকাশ আর জলের নীল চোখ জুড়িয়ে দিয়ে যায়।

আমি আর ঝিন্নি সারাদিন এইসব ছবি দেখে, মেলায ঘুরে ঘুরে, গাদ্দীদের সঙ্গে মিশে, হলুদ সরশুনের ক্ষেতের পাশ কাটিয়ে পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পথে ঢুকে কত আনন্দ করেছিলাম। তারপর রাতে কেল্লা থেকে রোশনাই দেখব বলে আশ্রয় নিয়েছিলাম এই বাংলোয়। খালি বাংলো পড়ে আছে ডিসেম্বরে, কেউ কোথাও নেই। সব নেমে গেছে ছুটিতে। ঝিন্নির কাছে ডুপ্লিকেট চাবি রেখে গিয়েছিল বুড়ো ফরেস্ট গার্ড। তাই দিয়ে ঘর খুলে রাতের মত থাকার আস্তানা পেতেছে ঝিন্নি। দুজনের নির্জন-নিবাসে সে রাতে শুধু অন্ধকার আকাশ জুড়ে কোলি-রি-দেওয়ালির রোশনাই দেখা আর প্রচণ্ড শীতল ঝড়ের গান শোনা। খোলা চুলে ফায়ারপ্লেসের ধারে বসে টুকরো টুকরো কাঠ আগুনে ফেলে দিচ্ছিল ঝিন্নি। আমি চেয়েছিলাম ওর দিকে। দুজনের মনের গভীরে কি অশান্ত উত্তেজনার ঢেউ। কেউ কিন্তু প্রথমে অতিক্রম করতে চাইছিল না সংযমের অদৃশ্য সীমারেখাটুকু।

সেদিন ঝিন্নিকে আমার সবচেয়ে রহস্যময়ী নারীর মূর্তি বলে মনে হয়েছিল। আমি ডাক্তার। নারী পুরুষের দেহ নিয়ে আমার নিত্যদিনের কাজ। আমার কাছে মানুষের শরীরের কোন অংশই অজ্ঞাত বা অনাবৃত নয়। তবু সেই প্রচণ্ড শৈত্য-ঝড়ের গভীর অন্ধকারে ঐ ফায়ারপ্লেসের ধিক্‌ধিক্ আগুনের সামনে বসে থাকা ঝিন্নিকে আমার মনে হয়েছিল, বিশ্বের প্রথম রহস্যময়ী রমণী-মূর্তি, যাকে অবাক চোখে দেখছে পৃথিবীর প্রথম পুরুষ।

নারীকে আবিষ্কারের ভেতর যে রোমাঞ্চ তা বুঝি কোনদিনও কাটবার নয়।

ঝিন্নি প্রথম কথা বলল, ছোটেসাহেব, কত যুগ পরে আমরা এখানে এলাম।

মনে হচ্ছে আমাদের সেদিনের খেলা যেন আজই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

ঝিন্নি এবার আমার দিকে পুরোপুরি ফিরে বলল, তুমিও সে দিনটির কথা ভাবছ?

মৃদু হেসে বললাম, এতদিন পরে এখানে এলাম, দুজনের ভাবনা কি আলাদা হতে পারে ঝিন্নি।

ও আমাকে একটুখানি দাঁড়াতে বলে কয়েকটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। রোগী দেখতে বেরিয়ে পাহাড়ী টিকায় ঘুরতে ঘুরতে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে। পাহাড়ী মেয়েরা চোখ নামিয়ে শান্তভাবে কথাগুলো শুনে নেয়, তারপর মুহূর্তে আশ্চর্য একটা চাঞ্চল্য আসে তাদের ভেতর। কাজটুকু করার জন্যে চলমান ঝর্ণার স্রোতের মত তারা ছন্দিত লয়ে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়! ঝিন্নিও ঠিক তেমনি দ্রুত লয়ে চলে গেল।

একটু পরে ফিরে এল হাতে একগোছা চাবি নাচাতে নাচাতে। ঘর খুলে ঢুকতে ঢুকতে বলল, বাংলোর চৌকিদারের কাছ থেকে চাবিটা চেয়ে আনলাম।

তোমার সঙ্গে বুঝি চৌকিদারের ভাল রকমই জানাশোনা?

জানাশোনা মানে। সেই যে বুড়ো ফরেস্ট গার্ডের সময় আমরা প্রথম এসেছিলাম, তারই নাতি। এখন তার কাছ থেকেই তো নিয়ে এলাম।

বললাম, চৌকিদারটিকে কোনদিন আমি দেখি নি।

ঝিন্নি ঘর খুলে ততক্ষণে ঢুকে পড়েছে। আমার কথা শুনে পেছন ফিরে বলল, বরটিকে দেখনি, কিন্তু বউটিকে আগে ভাগেই দেখে ফেলেছ।

কি রকম?

কি রকম আবার কি। পেছনের লহরীতে (সবজীবাগান) এসে সকাল বেলা দুধের ঘটি নিয়ে যে মেয়েটি বসে থাকে তাকে কি চুরি করেও এক ঝলক দেখনি ছোটেসাহেব?

ঘরের ভেতর ঢুকে ঝিন্নির হাত ধরে বললাম, চুরি করে দেখার যে একটা রোগ আমার আছে, তা আমি একবারও অস্বীকার করব না। তবে আমি যেখানে সেখানে চুরি করি না। রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারিতে একটি তরুণী কাজ করে। তার কাছে বিপুল ঐশ্বর্য আছে। সেদিকেই সারাক্ষণ চোরটির চোখ পড়ে রয়েছে।

ঝিন্নি বলল, আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি, সে এখন তরুণী নেই।

দরজাটা পা দিয়ে ঠেলে ভেজিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, ঝিন্নি ঐ চোরের দৃষ্টিতে আগেও তরুণী ছিল, এখনও রয়েছে, পরেও থাকবে।

ও আমার দুহাতের বাঁধন ছাড়িয়ে নেবার কোন চেষ্টাই করল না। আমার মুখের দিকে ওর বড় বড় দুটো চোখ মেলে তাকাল। ওর চোখে বন্ধ ঘরের আবছায়ায় আমি যেন জলের আভাস দেখলাম। ও এমনি কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, সত্যি করে বল ছোটে সাহেব, আমি কি এখনও তোমার চোখে সেই তরুণীটি রয়েছি?

কেন জানি না সেই মুহূর্তে আমারও বাক্‌রুদ্ধ হয়ে আসছিল। আমি সেই রুদ্ধপ্রায় গলায় বললাম, বিশ্বাস কর, চাচা নরসিংলালজীর সঙ্গে প্রথম কুলুর কোঠীতে এসে বেলাশেষের আলোয় যে তরুণীকে দেখেছিলাম, আজও সে তেমনি ঔৎসুক্যের বাতি জ্বালিয়ে রেখেছে আমার মনে। তাকে আমি ভুলব কেমন করে ঝিন্নি। সেদিনের দেখা তরুণীটি শুধু একটি দেহধারী নারী ছিল না, আমার প্রথম ভাল লাগার ছোঁয়ায় সে সেদিন চিরকালের তরুণীতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

ঝিন্নি আমাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল। সে এখন ধীরে ধীরে তার হাত দুটো শিথিল করে নিজের চোখ দুটো ঢেকে ফেলল। আমি বুঝলাম ঝিন্নি তার উদ্‌গত অশ্রুকে মুছে ফেলছে।

ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, তুমি বড় সেন্টিমেন্টাল ঝিন্নি। তুমি এমন খুশির মুহূর্তে চোখের জল ঝরালে।

তুমি এত ভালবাস তোমার ঝিন্নিকে তাই চোখের জল চেপে রাখতে পারলাম না।

আমি নিজে কতটা ভালবাসতে পারি তা জানি না তবে তুমি আমার বুকে যে ভালবাসার ঝড় তুলেছিলে, আজও সে ঝড় থামেনি।

আমি ঝিন্নিকে জড়িয়ে ধরে পায়ে পায়ে ঘরের ভেতর ঢুকলাম। সাজানো বাংলো। পর্দা থেকে বিছানার চাদর, সবকিছু ঝক্‌ঝক্‌ তক্‌তক্‌ করছে। ফরেস্ট অফিসার কিংবা বিশিষ্ট অতিথি যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে, তাই সারাক্ষণ ছিমছাম।

ঝিন্নি বলল, থাকবে আজ রাতে এখানে?

যদি কোন অফিসার এসে পড়ে রাতে, তখন?

ঝিন্নি বলল, আমরা তো জলে পড়ে নেই, বনের ভেতর দিয়ে দশ মিনিট হাঁটলেই কোয়ার্টারে পৌঁছে যাব।

গ্র্যান্ড আইডিয়া, কিন্তু ভাগ্‌তু? ও যে জানবে না।

ঝিন্নি বলল, অত ভাবছ কেন, ভাগ্‌তু আমার হেঁসেলের খবর ভাল করেই জানে। আমি চৌকিদারের বউকে দিয়ে খবর পাঠাচ্ছি। ও আমার তৈরি করা খাবারগুলো খেয়ে একটা রাত কোয়ার্টারে দিব্যি ঘুমিয়ে থাকবে।

সেই ব্যবস্থাই ঠিক রইল। চৌকিদারটি এল একটু পরে। ঝিন্নির সঙ্গে ঘরের বাইরে তার কিছু কথা হল। সে চলে গেলে কিছুক্ষণের ভেতরেই এল তার বউ। ঝিন্নি তাকে নীচের পাহাড়ে তার বাংলোতে পাঠিয়ে দিলে।

সব ব্যবস্থা পাকা করে ঝিন্নি এসে দাঁড়াল আমার পাশে।

আজ ছোটে সাহেব, এখানে আমাদের সেদিনের সংসার পাতা হল।

বললাম, একটা হারিয়ে যাওয়া রাতকে আবার ফিরে পাওয়া যাবে।

এটা কিন্তু ডিসেম্বরের রাত কিংবা কোলি-রি-দেওয়ালির উৎসবের দিন নয়।

বললাম, সেই ঝিন্নি কিন্তু উপস্থিত রয়েছে এখানে। আর সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত নায়িকার উপস্থিতিই সূচনা করছে সেদিনের উৎসব।

ঝিন্নি আমার বুকে তার বাঁ গালখানা আলতো করে ছুঁইয়ে রেখে বলল, আর আমার ছোটেসাহেবও রয়েছে আমার পাশে।

বললাম, রাতের খাবার কি চৌকিদারের বউ বানাবে?

ঝিন্নি এখন সহজ হয়ে গেছে। সে বলল, কেন, সেই প্রথমবারের রাতে কি চৌকিদারের বউ তোমার রাতের খাবার বানিয়ে দিয়েছিল?

কিন্তু ঝিন্নি, তুমি খাবার বানাবার কাজে যদি রান্নাঘরে ঢোক তাহলে আমরা গল্প করব কখন?

কেন, সে রাতে কি আমরা খাইনি না গল্প করিনি?

বেশ, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা হোক্‌।

ঝিন্নি চটপট চলে গেল রান্নাঘরখানা পরীক্ষা করে দেখতে। আমি জানি ইতিমধ্যেই খাদ্যবস্তু সংগ্রহের ভার ঝিন্নি চৌকিদার কিংবা তার বউকে দিয়েছে।

আমি ড্রইংরুমে গিয়ে বসলাম। একটি রাতের সংসারের কথা ভেবে আমার দারুণ ভাল লাগছিল। স্মৃতির একটা গন্ধ ঘরের চারদিকে বহমান বাতাসের মত আমার অনুভূতিতে এসে লাগছিল।

এখান থেকে কেল্লার একটা দিক পরিষ্কার দেখা যায়। সামনের জানালার ধারে বসে সেবার আমি কোলি-রি-দেওয়ালির আতসবাজির খেলা দেখছিলাম।

একটা ঘটনার কথা বিদ্যুৎ-চমকের মত মনে পড়ল। সেবার উৎসব শেষ হয়ে গেলে তরুণী ঝিন্নি খাবার নিয়ে এসে দাঁড়াল সামনে। টেবিলের ওপর খাবার দিয়ে ঝিন্নি দাঁড়িয়ে পরিবেশন করছে দেখে বললাম, একটা অনুরোধ রাখবে?

ঝিন্নি আমার দিকে ঘাড় কাৎ করে তাকাল।

বল রাখবে?

বলুন।

হেসে বললাম, তুমি খুব হুঁশিয়ার মেয়ে ঝিন্নি, অনুরোধটা রাখবে কিনা স্পষ্ট করে বললে না।

ও অমনি বলল, রাখব, এবার বলুন।

আমি থালা থেকে একখানা পকৌড়া তুলে নিয়ে ঝিন্নির দিকে হাত উঁচিয়ে বললাম, এটুকু বিনা প্রতিবাদে খেতে হবে। আর তোমার খাবারও আন এখানে, একই সঙ্গে বসে খাব।

ঝিন্নি হাত বাড়াল পকৌড়াটা নেবার জন্যে। অমনি আমি হাত সরিয়ে নিলাম।

উঁহু ওটি হবে না, আমার হাত থেকেই খেতে হবে।

ঝিন্নি মনে হল দারুণ বিব্রত হয়ে পড়েছে। ও হঠাৎ বলল, আমি আসছি, খাবারটা নিয়ে আসছি।

মুহূর্তে ও অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝলাম, আমার বৈপ্লবিক প্রস্তাবটা একেবারে মেনে নেবার আগে একটুখানি ভেবে নেবার সুযোগ নিল ঝিন্নি।

এক সময় একটা থালা হাতে বেরিয়ে এলো ও। চেয়ারখানা আমার টেবিলের সামনে টেনে এনে বসল। তারপর নিজের থালায় হাত দিয়ে বলল, বাব্বা কি ভীষণ লোক আপনি। এই বসলাম একসঙ্গে খেতে, হল তো?

আমি কোন কথা না বলে বসে রইলাম। হাতে আমার পকৌড়াটা তেমনি ধরা রইল।

ও আমার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ নিজের খাবারগুলো নাড়াচাড়া করল। তারপর আমার দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ বলল, দিন।

ওর মুখে 'দিন' শব্দটা অনেক দূরের থেকে ভেসে এল।

আমি হাত বাড়াতেই ঝিন্নি আমার হাতটা ওর দুটো হাতে চেপে ধরল, তারপর মুখখানা আমার হাতের ওপর ছুঁইয়ে পকৌড়াটা তুলে নিয়েই ঘরের ভেতর দৌড়ে পালাল।

আমার সারা শরীরে তখন আশ্চর্য এক উত্তেজনার খেলা শুরু হয়ে গেছে। একটি অনাঘ্রাতা কন্যা আজ তার দুটি ঠোঁটের স্পর্শ রেখে গেছে আমার করতলে। আমি ওকে

প্রলুব্ধ করেছি, ও সাড়া দিয়েছে সে প্রলোভনে। যৌবনের ধর্মে আমরা আকৃষ্ট হয়েছি পরস্পরের দিকে। এবার আমরা পরিপূর্ণ মিলনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হব।

আমি চুপচাপ বসে আছি, কিন্তু ঝিন্নি আর ফিরে আসছে না। ভোরের শিশিরে ভেজা আধফোটা একটা গোলাপের স্পর্শ নিয়ে আমি রোমাঞ্চিত।

এক সময় উঠে দাঁড়ালাম। পায়ে পায়ে পাশের ঘরে গেলাম। আমার পা দুটো কাঁপছিল। ও-ঘরে আলো ছিল না। বাইরের ঘরের আলোর সামান্য রশ্মি পড়েছিল ভেতরে।

আমি দেখলাম, ঝিন্নি একটা শূন্য চার-পাই-এর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ও মাথা তুলল না। আমি আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম ওর চুলে ভরা মাথায়।

কতক্ষণ পরে ও একটু শান্ত হল। আমি ওকে চারপাই-এর ওপর তুলে বসালাম। ও কিন্তু ওর মুখখানা দুটো হাতের পাতা অঞ্জলিবদ্ধ করে ঢেকে রাখল।

আমি ওর পাশে বসে হাত দুটো মুখ থেকে সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ঝিন্নি কিন্তু শক্ত করে মুখের ওপর চেপে রাখল ওর হাত।

বললাম, একটা দুর্বল মুহূর্তে তোমাকে দিয়ে যা করিয়ে নিলাম, তার জন্যে ক্ষমা চাইছি ঝিন্নি। তোমার সেবার বিনিময়ে আমি তোমাকে অপমান করে বসলাম। আমি তোমার যোগ্য অতিথি নয়।

মুখ থেকে দুটো হাত সরে গেল ঝিন্নির। আমি অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম, ঝিন্নি আমার দিকে স্থির দুটো চোখ মেলে চেয়ে আছে।

আমরা কেউ কারো মুখের ভাষা পড়তে পারছিলাম না।

ও কথা বলল, আপনি এমন কথা বললেন কেন বলুন?

তুমি কাঁদলে যে!

ঝিন্নি বলল, আপনি কাঁদালে কাঁদব না!

বললাম, তাই তো তোমার কাছে যে হাত দিয়ে অন্যায়টা করলাম, সেই হাত জোড় করে এখন ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

ঝিন্নি হঠাৎ এক কাণ্ড করে বসল। ও নীচু হয়ে আমার হাত দুটো তুলে নিয়ে ওর মুখ ঢেকে ফেলল।

আশ্চর্য একটা শিহরণ আমার রক্তের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ইতিমধ্যেই চা করে এনেছে ঝিন্নি। পাতলা ধোঁয়া উঠছে কাপের থেকে।

আমার হাতে কাপটি ধরিয়ে দিয়ে বলল, কি ভাবছ এত ?

হেসে বললাম, বল তো কি ভাবছি?

আমাদের এখানে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা।

বললাম, প্রায় ঠিকই ধরেছ, তবে অভিজ্ঞতা নয়, রোমাঞ্চের কথা।

ঝিন্নি বলল, দাঁড়াও আমার চা-টা নিয়ে আসি।

ও চায়ের কাপ নিয়ে আবার ফিরল। ফিরতে ফিরতেই বলল, কি বিচ্ছুই না তুমি ছিলে!

এখন আর বিচ্ছু নই, তাই না ঝিন্নি।

ও কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে চুমুক দিয়ে বলল, স্বভাব কি আর যায়।

হঠাৎ একটা দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় এসে গেল। বললাম, আর একটুখানি চিনি মিশিয়ে দেবে ঝিন্নি?

ও হাতের কাপ আমার সামনের টেবিলে রেখে ছুটল চিনি আনতে। আমি সেই সুযোগে বদল করে নিলাম ওর কাপখানা।

ও এসে আমার হাতে ধরা কাপে এক চামচ চিনি গুলে সরবত বানালে। আমি ঝিন্নির কাপে চুমুক দিতে দিতে বললাম, অসাধারণ।

ও বলল, কি অসাধারণ ছোটেসাহেব?

এই যে তোমার চায়ের গন্ধ আর স্বাদ ঠিক যেন সেই প্রথম দিনটির আঘ্রাণ বয়ে আনে।

তুমি সেদিনের কথা একেবারেই ভুলতে পারনি, তাই না?

তুমি পেরেছ ঝিন্নি?

বোধহয় চেষ্টা করলেও পারা যায় না ছোটেসাহেব।

ঝিন্নি হঠাৎ নিজের হাতের কাপটা দেখতে লাগল।

আরে, এ যে তোমার কাপ ছোটেসাহেব। আমার কাপের গায়ে ছিল পিঙ্ক রোজের ছবি আর তোমারটাতে ছিল পিঙ্ক কসমস। কি করে এমন হল!

হেসে বললাম, রঙটা যে এক। দুটোই পিঙ্ক।

ঝিন্নি কান্নার গলায় বলল, তুমি দুষ্টুমি করে কাপ বদল করে নিয়েছ ছোটেসাহেব। আমি যে চুমুক দিয়ে রেখে গিয়েছিলাম।

বললাম, তাই তো বদল করে নিলাম। নিরামিষ বিশুদ্ধ কাপ হলে কি আর বদলাবদলি করতাম।

আমার খুব খারাপ লাগছে।

আমার ভারী ভাল লাগছে। তবে বিশ্বাস কর, আমার কাপে আমি ঠোঁটই ঠেকাই নি।

আচ্ছা, তোমার কি ঘেন্না বলে কিছু নেই ছোটেসাহেব? একজনের এঁটো চা খাচ্ছ।

দুবছর বিয়ে হল ঝিন্নি, এখনও কি আমরা বিশুদ্ধ হয়ে আছি, এঁটো হয়ে যাইনি!

কাপটা টেবিলের ওপর বসিয়ে রেখে আমার মাথার চুলগুলো মুঠো করে ধরে নাড়া দিতে দিতে বলল, ভারী অসভ্য হয়ে গেছ তুমি ছোটেসাহেব। মুখে তোমার একটুও কিছু আটকায় না।

চা-পর্বের পর আমরা বেরুলাম সূর্যাস্ত দেখতে। বাংলোর পেছনে পাশাপাশি দুটো দেওদার গাছ নীল আকাশের বুকে সবুজ পাতার সমারোহ মেলে ধরেছে। নীচে ছোট্ট এক টুকরো ভ্যালি। তার ওপর পাশাপাশি দুটো পাহাড়। মাথার দিকে দুটি পাহাড়ই বিচ্ছিন্ন হয়ে মাঝখানে একটা 'ভি'-এর আকার সৃষ্টি করেছে। ঠিক ঐ 'ভি'-এর ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে পীরপাঞ্জালের চূড়া। ঝক্ ঝক্ করছে সাদা তুষার শৃঙ্গটি। তার ওপর পাতলা ধোঁয়াটে এক টুকরো মেঘ আটকে আছে। পাহাড়ের সারা দেহ জুড়ে থরে থরে পাইনের সবুজ সমাবেশ।

আমরা মসৃণ একটা শিলাখণ্ডের ওপর পাশাপাশি বসলাম। এমন কতদিন কত নিভৃত জায়গায় আমরা পাশাপাশি বসেছি। নীল নির্জন পরিবেশে হাতে হাত রেখে কোন কথা না বলে প্রকৃতিকে দেখেছি। দ্যুলোক ভূলোকের অমৃত পাত্র থেকে চুইয়ে চুইয়ে ভরে তুলেছি অনুভূতির অদৃশ্য পাত্রখানি। আমরা যখন উঠে দাঁড়িয়েছি তখন কানায় কানায় পূর্ণ দুটি হৃদয়।

আমরা কতক্ষণ কোন কথা বলিনি। কারণ পৃথিবীর কোন ভাষায় তখনকার অনুভূতি প্রকাশ করা যায় না।

আমি কয়েকবারই লক্ষ্য করে দেখেছি, মানালীর ভ্যালির ওপারে যখন চাঁদ উঠত আর ভ্যালির থৈ থৈ অন্ধকারের জলটাকে ধীরে ধীরে পাতলা দুধের মত সাদা করে তুলত, তখন চোখ উপচে জল গড়িয়ে পড়ত ঝিন্নির। আমি জানতাম, ওর অসহ্য ভাললাগার প্রকাশ এমনি করেই ঘটে। আর আমার ভাললাগার অনুভূতি এক ধরনের রোমাঞ্চের ভেতর দিয়ে। মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরটা অদ্ভুতভাবে শিউরে শিউরে উঠত। আমরা দুজনে পাশাপাশি হেঁটে হেঁটে আসতাম বাংলোতে। পারতপক্ষে কেউ কোন কথা বলতাম না।

যখন বরসাত শুরু হয়ে যেত প্রবলভাবে, আর পাহাড় ভেঙে নেমে আসত ক্ষুদ্র বৃহৎ স্রোতধারা, রাতে বিদ্যুতের চমকে, বজ্রের গর্জনে পার্বত্য-প্রকৃতি আলোকিত, শব্দিত হত তখন জানালার ধারে ঘন হয়ে বসে আমরা ভ্যালির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ঝিন্নি এ সময় মাঝে মাঝে একটি অনুরোধ রাখত আমার কাছে, তোমার ভাষায় বর্ষার গান গাও।

আমি গীতবিতান উজাড় করে গাইতাম। ঝিন্নি শ্রোতা, আমি গায়ক, মাঝে কোন সমালোচক নেই। ও নিবিড় হয়ে আমার গায়ে গা ঘেঁষে বসে বসে গান শুনত আর সামনের ভ্যালিতে নিশীথ-বর্ষার উত্তাল সমারোহ দেখত।

বজ্রের সে কি গর্জন! একবার বজ্র পড়লে কিংবা মেঘ ডেকে উঠলে সে ডাক সহজে থামত না। ভ্যালির চারদিকের পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ঘুরত। কতক্ষণ পরে কোন গিরিপথের ফাঁকে বুঝি সে শব্দ বেরিয়ে যেত।

'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি' কিংবা 'বজ্র মাণিক দিয়ে গাঁথা আষাঢ় তোমার মালা', এই দুটো গান বর্ষার এ ধরনের শব্দিত সমারোহে ঝিন্নির বড় ভাল লাগত। গান শুনতে শুনতে কখনও বা ঝিন্নি তার হাত দিয়ে আমাকে নিবিড় বাঁধনে বেঁধে রাখত।

আবার আসত ফলের প্রাচুর্য নিয়ে শরৎ। ঝিন্নি কুলু কিংবা মানালীর বাগানে আসত সে সময় প্রতি শনিবার সন্ধ্যায়। ওকে অদ্ভুত সুন্দর দেখাত, যখন ও পিঠে 'কিলতা' (তিন কোনা কাঠের বাক্স) বেঁধে বাগানের ফলসংগ্রহকারিণীদের সঙ্গে আপেল তুলত।

ও কোনদিনই ওর কোন কর্মচারীর সঙ্গে পার্থক্য রেখে চলত না। হাসি, গল্পে, গানে ও সবার সখি, সবার প্রিয়।

সেবার ভারী সুন্দর একটি আয়োজন করেছিল ও। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে ট্যুরিস্টরা আসে কুলুমানালী বেড়াতে। ওরা পথের ধারে ফলের দোকান থেকে ফলের রস কিনে খায়। ঝিন্নি সবকটি দোকানকে সেবার সংঘবদ্ধ করল। কুলুমানালী'র শুধু বাজার অঞ্চলে নয়, সবকটি ট্যুরিস্ট স্পটে ছড়িয়ে দিল ছোট ছোট ফলের দোকান। ফল খাও, রস খাও, ঝুড়ি বন্দী করে নিয়ে যাও।

সবকটি দোকান নিজেই ঘুরে ঘুরে, সুন্দর করে সাজাল। এ কাজে তার প্রধান সমর্থক ও সাহায্যকারী জুলিয়েন। সে তার জিপে ঝিন্নি আর বালুকে নিয়ে দিনরাত ঘুরে বেড়াল দোকান সাজাতে। আমি সাহায্যের প্রস্তাব দিতে গিয়ে ধমক খেলাম। ওদের কথা হল, যে যার কর্ম করে যাও। জুলিয়েন পুরোপুরি ফলের ব্যবসায়ী আর ঝিন্নি শিল্পী, সুতরাং এই নতুন পরিকল্পনায় থাকবে দুজনের সমন্বয়। অন্যে নাক গলাতে এলে কুঁচ করে কেটে নেওয়া হবে তার নাকটি। অবশ্য নাকটি কেটে নেওয়ার পরিকল্পনা ঝিন্নির এবং সে তা কেবলমাত্র আমার কাছেই প্রকাশ করেছিল। ডিমনস্ট্রেশান সহযোগে।

ফলের ছোট ছোট ঘরগুলিতে রইল টিপিক্যাল কুলুর পোশাক পরা একটি করে মেয়ে আর একটি করে ছেলে। দূর থেকে রঙীন কাঠ আর তাঁবুর তৈরি ঘরগুলো ট্যুরিস্টদের চোখকে দারুণভাবে আকর্ষণ করেছিল। ঝিন্নি অক্লান্ত পরিশ্রমে রাতদিন ছবি এঁকেছিল। দোকানের সামনের প্যানেলে আপেলের ফুলন্ত ডাল। সাদা আর পিঙ্ক ফুলে ভরা বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপ। তারপর শরতের ফল সম্ভার দুটি ক্যানভাসের পার্শ্ব প্যানেলে চিত্রিত। জননী সন্তানকে তুলে ধরেছে ঊর্ধ্বে। শিশু উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে হাতটি প্রসারিত করেছে ফলের দিকে।

একটি রুচিসম্মত চিত্রিত বুকলেট ছাপা হয়েছে ইংরাজীতে। কুলুতে আপেল চাষের ইতিহাস।

১৮৭০ সালে বানড্রোলে ক্যাপটেন লী-র প্রথম আপেল বাগান। তারপর এলেন ক্যাপটেন বেনন ১৮৮৪ সালে। তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন 'সান-সাইন-অর্চার্ড'। ইংলিশ ভ্যারাইটির ফল পাবার জন্যে রোপণ করলেন চারা। গন্ধে বর্ণে আকারে উৎকৃষ্ট হল কুলুর আপেল। বিশেষ করে কুলুর 'গোল্ডেন অ্যাপল' হল ভারতবিখ্যাত।

এমনি অজস্র সমাচারে পূর্ণ ঐ পুস্তিকাটি। পাতায় পাতায় আপেলের ফুল ফল আর আপেল সংগ্রহকারিণীদের ছবি।

সত্যি চোখে পড়ার মত রূপসজ্জা।

ঝিন্নির ডাকে চমকে তাকালাম। এতক্ষণ আমি মগ্ন হয়ে কুলু আর ঝিন্নিকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করছিলাম।

ঝিন্নি বলল, সামনের ঐ মেঘের তালটা শেষ সূর্যের রঙ লেগে কেমন গোলাপী হয়ে উঠেছে দেখ।

আমাদের চোখের সামনেই আকাশের বুকে যেন বিরাট এক গোলাপী আভার খরগোস গুঁড়ি মেরে বসে আছে।

ওদিকে উঁচু পীরপাঞ্জালের তুষার চূড়োয় তখনও সোনার ঝলমলানি।

'মধুর তোমার শেষ যে না পাই'—গানটি প্রাণের থেকে বেরিয়ে এল কণ্ঠে। কিছুটা গেয়ে নিয়ে ওকে 'দিনান্তের এই এক কোণাতে, সন্ধ্যামেঘের শেষ সোনাতে। মন যে আমার গুঞ্জরিছে কোথায় নিরুদ্দেশ'—এই কথাগুলো ব্যাখ্যা করে বোঝাতে গেলাম। ঝিন্নি অমনি ইঙ্গিতে বলল, গেয়ে যাও, বোঝাতে হবে না।

সব গানটুকু গাওয়া শেষ হলে ধীরে ধীরে আকাশ থেকে রঙের খেলা মুছে গেল। আমরা পাশাপাশি কথা না বলে কতক্ষণ বসে রইলাম।

একসময় ঝিন্নি নীরবতা ভেঙে বলল, তোমার ঐ গানের সুরই আমাকে সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিল। কথার অর্থের কোন দরকার হয়নি আমার।

বললাম, যাঁর গান, তিনি কথাকে যেমন মর্যাদা দিয়েছেন, সুরকেও ঠিক তাই। সুর আর কথাকে একটু আলাদা করে রাখেননি বলে তুমি সুর শুনেই কথার ভাবটিকে ধরে নিয়েছ।

ঝিন্নি বলল, শিল্পী রোয়েরিখ আর টেগোরের কয়েকখানা চিঠি আমি পড়েছি। দুজন মহান পুরুষ যেন মুখোমুখি বসে ভাব বিনিময় করছেন। আমার মনে হয় রোয়েরিখ যদি রবীন্দ্রনাথের গান শুনতেন তাহলে তিনি টেগোরের আর একটি বিস্ময়কর পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হতেন।

বললাম, রবীন্দ্রনাথের গান প্রতিটি জীবনের সুধারস।

সন্ধ্যায় বাংলোতে ফিরে এলাম। বাংলোর ধার ঘেঁষে সেই কুহলটা কলকল আওয়াজ তুলে ছুটে চলেছে। ঝিন্নি কুহলে পা ডুবিয়ে এল।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঝিঁঝির ডাক বাড়ছে। পাহাড়ী ঝিঁঝির অদ্ভুত ডাক। মনে হয়, অবিকল একটা ট্রেন দূর থেকে শব্দ করতে করতে আসছে।

চৌকিদারের বউ কিছুতেই শুনল না। সে রসুইখানায় ঢুকে ঝিন্নিকে খানা তৈরির কাজে সাহায্য করতে লাগল।

একসময় ঝিন্নি এসে আমার কানে কানে বলল, বউটির বড় কৌতূহল হয়েছে, আমরা কোয়ার্টার থাকতে এখানে এসেছি কেন?

বল গিয়ে দুটো পাগল আমাদের কোয়ার্টার থেকে তাড়া করে এখানে এনেছে। রাতটা গা ঢাকা দিয়ে ভোরবেলা নীচে নেমে যাব।

ঝিন্নি বলল, তাহলেই হয়েছে আর কি। ভয়ে চেঁচিয়ে বন চিরে ফেলবে।

তবে হানিমুনে এসেছি বলে বল।

অ্যাদ্দিন পরে!

বল বিবাহ-বার্ষিকী।

ও একটুখানি ভেবে নিয়ে বলল, তা বলা যায়। যদিও বার্ষিকী নয়, তবু এটাই আমাদের প্রথম মিলনের জায়গা।

তাহলে বরং বল স্মৃতিবাসর।

ঝিন্নি আমার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলল, নামকরণে দেখছি ওস্তাদ।

আমি ওর হাত ধরে ফেলে বললাম, আমার চুল কিন্তু চিরুণী চালিয়ে ঠিক করে দিয়ে যেতে হবে, নাহলে তোমাকে ছাড়ছি না।

ঝিন্নি হাতটা টানতে টানতে বলল, হাত না ছাড়লে আমি কেমন করে চিরুণী চালাব। ছাড় হাত।

আমি হাত ছাড়তেই ও পেছন ফিরে পালাবার চেষ্টা করল। আমি দৌড়ে গিয়ে ওকে জাপটে ধরলাম। ও অমনি চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, আঃ ছাড়, রান্নাঘর থেকে চৌকিদারের বউ উঁকি দিচ্ছে।

আমি জানি এটা ঝিন্নির দুষ্টুমি। কেউ কোথাও উঁকি দিচ্ছে না। আরও জোরে ওকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, আমি তো পরের বউকে ধরিনি, ধরেছি বিয়ে করা নিজের বউকে।

ঝিন্নি বলল, দারুণ সাধুপুরুষ তুমি। নিজের বউ ছাড়া কোন মেয়ের মুখ দেখ না, কথা শোন না, স্পর্শ কর না।

বললাম, ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জীকে হয়ত তা করতে হয় কিন্তু রোয়েরিখ আর্ট গ্যালারীর কেয়ারটেকারের স্বামী কখনও তা করে না। সে সেদিক থেকে তার স্ত্রীর কাছে শুধু নয়, নিজের কাছেও ষোল আনা সাচ্চা।

তুমি এমন সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ কেন ছোটেসাহেব?

আমি ততক্ষণে আমার হাতের বাঁধন শিথিল করে দিয়েছি।

এবার ঝিন্নি আমাকে নিজেই জড়িয়ে ধরল, সত্যি তুমি রাগ করলে আমার কথায়?

আমি একটুও রাগ করিনি, তবু গম্ভীর হবার ভাণ করে বললাম, এখন ছেড়ে দাও, চৌকিদারের বউ হয়ত এসে পড়বে।

আসুক। ও আরও ঘনিয়ে দাঁড়াল। তারপর একখানা হাত তুলে আমার বুকের কাছে ধীরে ধীরে ঘষতে লাগল।

ওর মুখখানা ঘরের মেঝের দিকে। আমি জানি ঝিন্নির অভিমানের ছবিখানা। খুব একটা দুঃখ বা অভিমান প্রকাশ করতে হলে ও কাছ ঘেঁষে দাঁড়ায়, কিন্তু তাকায় না।

এবার আমি ঝিন্নিকে ধরে আস্তে নাড়া দিলাম। বাতাস যেমন করে পাতার কিনারা থেকে বর্ষার জমে থাকা জল ঝরিয়ে দেয় তেমনি করে আমার নাড়া খেয়ে ঝিন্নির চোখের জল ঝরল মাটিতে। আমি অমনি ওর পানপাতার মত মুখখানাতে নিজের মুখ ঠেকিয়ে বললাম, ছোটি বরসাত যেমন ছিঁচ্‌কাঁদুনে, আমার ঝিন্নিও হয়েছে ঠিক তেমনি।

মুখ সরিয়ে নিতে গেলেও ও আরও নিবিড় বাঁধনে জড়িয়ে পড়ল।

বললাম, আমার কাছ থেকে কতদূরে পালাবে তুমি? পারবে তোমার ছোটেসাহেবকে ছেড়ে থাকতে ?

ঝিন্নি এবার কথা বলল, তুমি আমার দুর্বলতাটুকু জান, তাই তুমি আমাকে কাঁদাও।

আমি তোমাকে কাঁদাই কেবল?

কাঁদাও না তো কি ? আমি কি ইচ্ছে করে কাঁদি?

ওকে হাতের বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে বললাম, বেশ, এবার থেকে তোমাকে কাঁদাব না। আমি কথা দিচ্ছি।

ঝিন্নি এবার নিজেই আমার হাত চেপে ধরে রইল।

বললাম, আজ পুরনো স্মৃতির জায়গায় এসে দুটো মনকে বিষণ্ণ নাই বা করে তুললাম আমরা। এসো বিবাদ মিটিয়ে ফেলি।

ওর মুখখানা হাতের পাতায় তুলে ধরতেই ও চোখ বন্ধ করল। মুখখানাতে ফুটে উঠল নবীন ভোরের মিষ্টি সোনালী এক টুকরো হাসি।

আমি আমার ঝিন্নিকে আদরে সোহাগে ভরে দিলাম।

একসময় ও নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বলল, রসুই ঘরে বসে রয়েছে চৌকিদারের বউ। আমি গেলে রান্না চাপাবে। মনে হয় বসে বসে ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

বললাম, এখুনি যা খাওয়া গেল, এর চেয়ে ভাল খাবার কি আজ তুমি আমাকে দিতে পারবে?

ও কীল দেখিয়ে বলল, দারুণ অসভ্য তুমি ছোটেসাহেব। অসভ্যদের জন্যে এটাও একটা খাবার।

ঝিন্নি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি আলো নিভিয়ে জানালার ধারে বসলাম।

মনে হল আজ চাঁদ উঠবে আরও পরে। কৃষ্ণপক্ষ, তবে তিথির হিসেব রাখিনি। কয়েক দিনের অনুমানে তাই মনে হচ্ছে।

জানালার ফাঁকে চোখ ফেললাম। সামনে পাইন আর দেওদারের অরণ্য। অন্ধকারে মুছে গেছে সব আকার। কেবল কীটপতঙ্গের সম্মিলিত শব্দে অরণ্যভূমির অস্তিত্ব ঘোষিত হচ্ছে। পাশের কুহলটিও কলহাস্যে নীচে নেমে যেতে যেতে বলছে, ঝিন্নি আর তোমার স্মৃতিভরা রাতটি শুভ হোক।

জানালার বাঁয়ে চোখ ফেললাম। কেল্লার আলোটা দেখতে পাচ্ছি। তার পাশ দিয়ে দৃষ্টি আরও নীচে নেমে গেল। এখন আমার চোখ অন্ধকারে উপত্যকা, বিপাশা, বনভূমি, ক্ষেতি, পাহাড়ী টিকা, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু দেখতে পাচ্ছে একটি অপরূপ জিনিস। কুলু উপত্যকায় ছড়ান জনবসতি এলাকার কোথাও কোথাও আলো জ্বলছে। দূর থেকে সে আলোগুলি জড়োয়ার অলঙ্কারে বসান মূল্যবান পাথরের মত ঝলমল করছে।

আমি কতক্ষণ এই দৃশ্য দেখলাম। এসব দৃশ্য ঝিন্নির নিশ্চয়ই দেখা। তবু আজ এই অন্ধকারের ভেতর ওকে আমার একান্ত পাশে বসিয়ে এই দৃশ্যটুকু দেখাতে ভারী ইচ্ছে করছে।

আশ্চর্য! ঠিক এই মুহূর্তটিতেই ও ঘরে ঢুকল। আমি ওকে কাছে ডাকলাম। পাশেই আর একখানা বসার আসন।

ও বলল, আলো জ্বালি?

না।

বড় অন্ধকার যে।

আমার গলার শব্দ ধরে চলে এস।

যদি অজানা কিছুতে আছাড় খাই?

খরগোসের মত না দৌড়ে কচ্ছপের মত গুটি গুটি পায়ে চলে এস।

ভীষণ জেদী তুমি।

এতক্ষণ ভীষণ অসভ্য ছিলাম, এখন পদোন্নতি হল বলে মনে হচ্ছে।

ঝিন্নি আর কোন কথা বলল না। সে অন্ধকারে এখন সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। ঘরখানা বেশ বড় এবং নানা ধরণের আসবাবে ভরা। নিশ্চয় ধীরে, অতি সাবধানে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে। ওর আর আমার ভেতর যেন কানামাছি খেলা শুরু হযেছে!

আমি ছোট্ট করে একটা চুম্বনের আওয়াজ তুললাম। ও সাড়া দিল না।

একটার পর একটা আমি দিয়েই চললাম। ওর কোন সাড়াই পেলাম না।

ওকি ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল নাকি।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে ঝিন্নি আমার গায়ে তার হাত ঠেকিয়ে বলল, আমার মানুষটিকে চিনে আমি কি আর এইটুকু পথ আসতে পারব না।

আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আমার ঝিন্নি ঘরের বাইরে চলে গেছে।

ও বলল, যদি কোনদিন ঘর ছেড়ে পালাই তাহলে নিজের মানুষকে সঙ্গে নিয়েই পালাব।

বললাম, জানালা দিয়ে ভ্যালির দিকে চেয়ে দেখ একবার।

ঝিন্নি জানালার ধারে না এসেই বলল, আলোর জোনাকীর কথা বলছ তো?

তুমি কি করে বুঝলে?

অন্ধকারে চেয়ে থাকার ঐ তো একটিই অর্থ আছে এখন।

বললাম, তোমার দেশের অনেক কিছুই তুমি একেবারে শৈশব থেকে দেখছ ঝিন্নি, কিন্তু আমার কাছে আজও এই কুলু উপত্যকার বহু জিনিসই বিস্ময়।

আমার দেশ বলছ কেন, এটা কি এখন তোমার দেশ নয়?

বললাম, ঝিন্নি আর তার ছোটেসাহেব যেখানে অভিন্ন সেখানে দুজনের দেশটাও এক বই কি। তবে তুমি এখানে জন্মেছ বলে আমার চেয়ে অনেক বেশিই জানো।

আমরা অন্ধকারে পাশাপাশি বসলাম। ভ্যালিতে দেখলাম সেই জোনাকীর ঝিল্‌মিল্‌।

ঝিন্নি আলো দেখে দেখে আন্দাজ করে বলতে লাগল পাহাড়ী টিকা বা গাঁয়ের নামগুলো।

বললাম, কি করে শিখলে এত ?

বুড়ো ফরেস্ট গার্ডই আমাকে টিকার নামগুলো বলে বলে ওপর থেকে সব চিনিয়ে দিয়েছিল।

বনের মধ্যে পোকারা ডাকছে। কখনও আলাদা, কখনও মিশ্রিত স্বর। ঝিন্নি কয়েক ধরনের পোকার নাম করে গেল। আমাকে তার একান্ত কাছে টেনে নিয়ে এক একটা ডাকেব অর্থ বোঝাতে লাগল আর সেই ডাক সৃষ্টিকারী পোকার পরিচয় দিয়ে গেল।

আমি একসময় বিস্ময় চেপে রাখতে না পেরে বললাম, তুমি এমন কীটপতঙ্গ বিশারদ হলে কি করে ঝিন্নি?

এটা আমার চাচাজীর শিক্ষা ছোটেসাহেব। কীট-পতঙ্গ, পশুপাখি, লতাপাতা, ফুল, গাছগাছালি, সবই ছোটবেলা থেকে তিনি আমাকে চিনিয়ে চিনিয়ে বেড়াতেন। তাঁর ধারণা হল, দেশকে চিনতে হলে এসব জিনিসকে ছেলেবেলা থেকে চেনা চাই।

চাচাজীর ওপর আমারও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ঝিন্নি। এসব আজকাল কোন অভিভাবকই তাঁদের ছেলেমেয়েদের শেখান না। হয়ত তাঁরা নিজেরাও অনেক কিছু জানেন না।

ঝিন্নি হঠাৎ আমার মুখখানা অন্ধকারে তার মুখের ওপর চেপে ধরে বলল, আমার ছোটেসাহেবের ছেলেকে আমি সবকিছু শিখিয়ে দেব।

ওর হাতের বাঁধনের ভেতরে থেকেই বললাম, ও ছেলেটা বুঝি তোমার ছোটেসাহেবের খালি, তোমার নয়?

ঝিন্নি অদ্ভুত গম্ভীর গলায় বলল, আমার বললে যদি সে না আসে, তাই আমার ছোটেসাহেবের বললাম।

আমি জোর দিয়ে বললাম, একশোবার ও ব্যাটা তোমার আর আমার, আসবে না মানে? ওকে আসতেই হবে।

ওরকম করে কথা বল না, ছোটেসাহেব। শিশু তো মানুষ নয়, দেবতা। ভগবান ওদের আপনার ঘর খালি করে পাঠিয়ে দেন।

রাতে বিছানায় আমি আগেই শুয়ে পড়েছিলাম, ও বেশ খানিক পরে চারদিক বন্ধ করে এল।

বললাম, তোমার রসুইখানার কাজ সারতে একটু বেশি দেরি হল বলে মনে হচ্ছে?

ঝিন্নি বলল, ওদের পাত পেড়ে বসিয়ে খাওয়াতে হল না?

ওরা কারা? কাজ তো করছিল শুধু চৌকিদারের বউ।

বাঃ, বউটিকে খাওয়ালে তার বর আর বাচ্চা দুটোকে খাওয়াতে হবে না?

তোমার সামান্য রান্নায় এতজনের হয়ে গেল?

ঝিন্নি যেন এক মহা অবুঝের সঙ্গে কথা বলছে, সামান্য রান্না তোমাকে কে বলেছে। আমি আগেই ওদের হিসেব না ধরে কি রান্না চাপিয়েছি।

আমাকে ভুল বুঝ না ঝিন্নি। আমি শুধু সবটুকু কথা জানতে চেয়েছিলাম। ওদের খাওয়ানোতে আমি খুব খুশি হয়েছি।

ঝিন্নি বলল, থাম তো মাস্টারজী, আমার ছোটেসাহেবের মন কি রকম তা আমাকে আর চেনাতে হবে না।

রাতে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে শুরু হয়ে গেল সেই ছেলের গল্প।

আচ্ছা, ছোটেসাহেব, তোমার ছেলে পছন্দ, না মেয়ে?

আমি ছেলেমেয়ে দুটোই পছন্দ করি।

তার ভেতর কার ওপর তোমার টানটা বেশি, বলই না?

বলেছিই তো ছেলে মেয়ে দুটিতেই আমার সমান আসক্তি। একসঙ্গে দুটো মুখ দেখতে পেলে আমি সবচেয়ে খুশি হব।

ঝিন্নি আমার শেষ কথাটুকু নিয়েই বলল, দুটো মুখ একসঙ্গে আবার কোথায় পাব?

সঙ্গে সঙ্গে ওকে জড়িয়ে ধরে বললাম, কেন, যমজ উপহার দিয়ে।

ও আমার বুকে সঙ্গে সঙ্গে কিল উপহার দিলে।

বললাম, ছেলেমেয়ের জন্যে তোমার এত কান্না, সে কান্না একেবারে থেমে যেত দুটিকে একসঙ্গে কোলে নিয়ে। তারপর তোমার হাসি হাসি গরবিনী মুখের কালার ছবি তুলে ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর বিজ্ঞাপন ছেপে দিতাম।

ও চুপ।

বললাম, কথাটা ঠিক বলিনি?

কোন সাড়া নেই।

ওকে নাড়া দিয়ে বললাম, কি হল আবার?

ঝিন্নি দুহাতে মুখখানা ঢেকে পাশ ফিরল।

বললাম, একটুতেই তুমি এমন গম্ভীর হয়ে গেলে কিংবা কান্নাকাটি করলে কোন কথাই তো তোমাকে বলা যাবে না আর।

ঝিন্নি কান্না ভেজা গলায় বলল, আমি তোমাকে সুখ দিতে পারিনি, সন্তান দিতে পারিনি, তাই কাঁদি।

গভীর আবেগে বললাম, আমি কোন সন্তান চাই না, শুধু আমার ঝিন্নি, সারাক্ষণ আমার বুকের ভেতর জেগে থাক।

ঝিন্নি অন্ধকারে দ্রুত তার হাতখানা আমার মুখে চাপা দিয়ে বলল, ও কথা বলতে নেই ছোটেসাহেব, এমন করে বললে ওরা আর আসতে চাইবে না। ওদের সমস্ত অন্তর দিয়ে ডাকতে হয়, তবেই ওরা ঘর আলো করে ছুটে আসে।

অনেক রাত অব্দি আমরা কথা বলতে লাগলাম।

ঝিন্নি তার নিজের জন্যে একটা স্টুডিও করতে চায়। যেখানে সে বসে বসে ছবি আঁকবে।

আমি ওকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, স্টুডিওটা তুমি মানালীতে করলেই আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব।

কেন বল তো?

বললাম, নাগ্‌গরের এই স্পটে তো কোন জমি নেই। থাকলে তা কিনে তোমার জন্যে একটা স্টুডিও বানিয়ে দিতাম।

তা ঠিক। এক চিলতে জায়গা আর এখানে নেই।

বললাম, তুমি কি কুলুতে স্টুডিও করতে চাও?

না, মানালীতেই একটা ছোট্ট স্টুডিও করে দিও। আমি সারাদিন ছবি নিয়ে মেতে থাকব,

আর তুমি থাকবে তোমার ডিসপেনসারী নিয়ে। রাতে কাজ থেকে ছুটি পেলে তুমি চলে আসবে আমার স্টুডিওতে।

ওখানে তোমার সারাদিনের রঙ তুলির কাজ দেখব। সমালোচনা করব। অবশ্য যদিও এ ব্যাপারে আমার মন্তব্য হবে একেবারে আনাড়ী।

তা কেন, ছবির ব্যাপারে সমঝদারের মূল্য অনেক বেশি মানি, কিন্তু প্রিয়জনের মন্তব্যের দাম তার চেয়ে একটুও কম নয়।

বললাম, রাতের থাকা খাওয়া আমাদের কোথায় হবে?

ঝিন্নি বলল, কখনো স্টুডিওর ছোট্ট ঘরে, কখনও বা আমাদের কোয়ার্টারে।

আমাদের ছেলেমেয়ে তখন কি করবে? আয়ার কাছে রাখতে হবে?

ঝিন্নির গলায় বিস্ময়, কেন?

বললাম, তুমি আমি দুজনেই ব্যস্ত থাকব কাজে।

ওরা অন্য পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের মত বাগানে, পথে খেলে বেড়াবে। কুলুর আর পাঁচটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে যে তাদের কোন তফাৎ নেই এটা প্রথম থেকেই তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

আমার এতে একটুও অমত নেই।

ঝিন্নি বলল, আমার কাছেও থাকবে। স্টুডিওতে এলে ওদের বড় বড় কাগজ আর রঙ তুলি দিয়ে ছবি আঁকতে বসিয়ে দেব। ছোটবেলা থেকে রঙ দেখুক, রঙ চিনুক।

আমার ছেলেমেয়েরা তাদের মায়ের মত শিল্পী হোক এই আমি চাই।

না, তারা তাদের বাবার মত ডাক্তার হবে।

কেন, শিল্পী হলে ক্ষতি কি?

ডাক্তারীতেই বা তোমার আপত্তি কেন?

একটা সমাধানের সূত্র টেনে বললাম, আচ্ছা বেশ, ছেলে হলে তোমার কথা রইল, সে ডাক্তারী পড়বে।

অমনি ঝিন্নি বলল, মেয়ে হলে ওকে আমি মনের মত ছবি আঁকা শিখিয়ে শিল্পী করে তুলব।

এখন আমরা দুজনে ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম।

আমরা স্থির হতেই রাতের শব্দগুলো প্রাধান্য পেল। কুহলের খলখল, কীটপতঙ্গের উচ্চরোল রাতের কালো পর্দাটাকে নাড়া দিতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা শব্দ মাঝে মাঝে কানে এসে বাজছিল। আমি ঝিন্নির দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করতে ও বলল, অনেক আগে থেকেই ঝড়ের হাওয়া বইছে, তুমি কি শুনতে পাওনি?

কথার ভেতর আমি খেয়াল করিনি ঝিন্নি। তাছাড়া শব্দ চেনা আর ধরার ব্যাপারে অসাধারণ তোমার কান।

ঝিন্নি বলল, জান, আমি যখন আর্ট কলেজে পড়তাম তখন অনেক দূরের থেকে মাস্টারমশায়দের পায়ের আওয়াজ শুনে বলে দিতে পারতাম, কে আসছেন। আমার ক্লাশের বন্ধুরা অবাক হয়ে দেখত আমার কথা আশ্চর্যভাবে ফলে গেছে।

এ এক ধরনের অদ্ভুত ক্ষমতা ঝিন্নি। চোখের দৃষ্টিও কারু কারু এমনি প্রখর হয়।

আমাদের কথার ভেতরেই ঝড়ের একটা ঝাপটা ঘরে ঢুকে পড়ল। জানালার কটা পর্দা আক্রান্ত মুর্গীর পাখা ঝাপটের মত শব্দ করে উড়তে লাগল। বনের কীটপতঙ্গ এখন একেবারে চুপ।

বললাম, বেশ বড়রকম ঝড় এল ঝিন্নি।

ও বলল, দেখবে ঝড় ? চল জানালার ধারে যাই।

আমরা একখানা বড় লাহুলী থুলমার ভেতর ঢুকে শুয়েছিলাম। এগুলো বড় আকারের কম্বল। বস্তার মত ঢুকে পড়ে আরামে শুয়ে থাকা যায়।

আমি থুলমার থেকে আগে বেরুলাম। ঝিন্নি তার সুথান আর চোলি ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল বেরিয়ে আসার আগে। ও বলে উঠল, খবরদার, পাট্টু গায়ে না জড়িয়ে জানালার কাছে যেও না ছোটেসাহেব।

আমি দুষ্টুমি করে থুল্‌মা সমেত ঝিন্নিকে জড়িয়ে ধরে বললাম, এর চেয়ে গরম আর কোন কিছুতেই হবে না। বুকে করে তুলে নিয়ে যাই জানালার ধারে, কি বল ঝিন্নি?

ও তখন থুল্‌মার ভেতর বন্দী হয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে আর বলছে, দারুণ ডাকাতের পাল্লায় পড়েছি যা হোক! ছাড় ছাড় ছোটেসাহেব, আমাকে দয়া করে বেরুতে দাও।

বললাম, দয়াটয়া নেই আমার। শুধু একটি শর্তে ছেড়ে দিতে পারি।

কাতর গলা ঝিন্নির, বল?

যখনই চুমু খেতে চাইব বারণ করতে পারবে না।

আহা মরে যাই। ছোটেসাহেবের বলিহারি খেয়াল।

জোর করে জড়িয়ে ধরে স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করতে লাগলাম। ঝিন্নি সমানে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালিয়ে গেল।

এক সময় থুল্‌মা ছেড়ে দিয়ে বললাম, বেশ, কিছুই চাইব না তোমার কাছে।

ঝিন্নি এবার নিজের পোশাক আসাক ঠিকঠাক করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে বলল, চাইলেই কি সব কিছু পাওয়া যায় ছোটেসাহেব, না চাইলেই অনেক বেশি পাওয়া যায়।

বললাম, বেশ এখন থেকে মুখ বুজে থাকব, দেখি কত বড় দাতা তুমি।

ও আমার গায়ে একখানা পাতলা ধরণের পাট্টু (কম্বল) জড়িয়ে দিয়ে বলল, এখন লক্ষ্মী ছেলের মত ঝড় দেখতে চল তো খোকন।

আমরা দুজনে একটা ডিভান টেনে নিয়ে বসলাম খোলা জানালার ধারে। আমার পাট্টুর ভেতর ওকে ঢুকিয়ে নিয়ে দুজনে জড়িয়ে বসলাম।

ঝড়ের সঙ্গে এখন চিক্‌কুর হানছে ঘন ঘন। পাহাড়ী ঝড়ের চরিত্র হল দ্রুত গতিতে ঘনিয়ে ওঠা। গাছপালার আর্ত হাহাকার শোনা যাচ্ছে। ঝড়ের নির্মম শাসনে পাইন বন ক্ষতবিক্ষত।

মেঘ মুহূর্মুহু ডাকতে লাগল। শব্দে প্রতিশব্দে নৈশ প্রকৃতির বুকে সে কি বিপুল হুঙ্কার।

বৃষ্টি এল। তবলার লহরার মত বাংলোর ছাদে বেজে উঠল প্রথম বৃষ্টির পশলা। তারপর হাওয়ার দমকে বৃষ্টির মেজাজ বদলাতে লাগল ক্ষণে ক্ষণে।

ঝিন্নি দারুণ খুশি হয়ে উঠেছে। আমার কোমর জড়িয়ে ধরে পাট্টুতে সর্বাঙ্গ ঢেকে খালি মুখখানা বের করে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে ঝিন্নি। এক সময় বলল, এরই ভেতর ছোটি-বরসাত শুরু হয়ে গেল ছোটেসাহেব!

বললাম, এবার সামান্য আগে হল।

সাধারণতঃ কুলু ভ্যালিতে পনেরই জুন নাগাদ ছোটি-বরসাত শুরু হয়। মাঝে মাঝে দু'এক পশলা বৃষ্টি, আবার আকাশ ঝকঝক। শেষে জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ থেকে নামে বর্ষণ। আসল বরসাতের শুরু এই সময় থেকে।

বেশ খানিক সময় ধরে বনের গাছপালা আর পাহাড় পর্বতকে স্নান করিয়ে দিয়ে বৃষ্টি থামল। বাতাসের সেই বৃষ্টি তাড়িয়ে বেড়ানোর রাখালিয়া খেলা আর নেই। গাছপালা স্থির। কীটপতঙ্গ চুপ। একটা ধূর্ত চিতার মত গুঁড়ি মেরে মেরে এগিয়ে আসে শীত। পাট্টুর ভেতরে থেকেও তা অনুভব করতে পারছি।

ঝিন্নি বলল, কেল্লার আকাশটার দিকে একবার চেয়ে দেখ ছোটেসাহেব।

তাকালাম। নিষ্প্রভ একটা বিদ্যুৎ তিরতির করে কাঁপছে। ভুবনজোড়া অন্ধকারের পটভূমিতে দিগন্তের কোণায় ঐ একটুকরো কম্পমান বিদ্যুতের শিখা অদ্ভুত একটা অনুভূতির সৃষ্টি করছিল।

মনে হচ্ছিল আমি আর ঝিন্নি চলেছিলাম অন্ধকার সমুদ্রের বুকে নৌকো ভাসিয়ে নিরুদ্দেশের পথে। হঠাৎ ঝড় উঠেছিল। দুলিয়ে কাঁপিয়ে দিয়েছিল চরাচর। আমরা দুটি যাত্রী পরস্পরকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বসেছিলাম সেই তরণীতে। এখন বৃষ্টি থেমে প্রশান্ত সে সমুদ্র। বহু দূরের কোন বাতিঘর থেকে যেন চোখে এসে পড়ছে অনুজ্জ্বল এক আলোর ইশারা।

ঝিন্নি আর আমার জীবনে আরও একটি বছর পার হয়ে চলে গেল। নাগ্‌গর থেকে কাজ ছেড়ে চলে এসেছে ঝিন্নি মানালীতে। ইতিমধ্যে ভ্যালি আর পীরপাঞ্জালের দিকে মুখ করে তৈরি হয়েছে ঝিন্নির বহু আকাঙ্ক্ষিত স্টুডিও।

বসন্তকাল। সেই সাদা আর গোলাপী আভার ফুলে ভরা ডাল। ঝিন্নি এখন নাওয়া-খাওয়া ভুলে পাগলের মত রঙের সাগরে চোখ ডুবিয়ে বসে আছে। ছবির পর ছবিতে ভরে যাচ্ছে স্টুডিও। নানা মিডিয়ামে নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা। একটি ছবি শেষ হবার আগে কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি না। ঝিন্নির পেছনে দাঁড়িয়ে একদিন আমি ওর ছবি আঁকা দেখছিলাম। কি তদ্‌গত হয়ে ও ছবি আঁকছিল! যখন ছবিখানা সামনের দেয়ালে রেখে ও ধীরে ধীরে পেছিয়ে আসতে আসতে নিজের সৃষ্টিকে দেখছিল তখন হঠাৎ আমি পেছন থেকে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। ও দারুণ চমকে উঠেছিল। আমার মনে হল ও নিজের মধ্যে এমন করে ডুবেছিল বলেই এতখানি চমক লেগেছিল ওর।

ও ধাতস্থ হয়ে নিয়ে বড় বড় দুটো চোখ আমার চোখে রেখে বলল, তুমি কোনদিন আমার ছবি শেষ না হলে দেখবে না ছোটেসাহেব। কথা দাও, দেখবে না?

বললাম, কেন ঝিন্নি? আমার ওপর এ শাস্তির ব্যবস্থা কেন?

যে কোন সৃষ্টিকে কখনো সম্পূর্ণ না হলে দেখতে নেই। অবশ্য একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া।

আর কিছু বলার ছিল না, তবু বললাম, বিশ্বস্রষ্টা ফুলের কুঁড়িটি যখন সৃষ্টি করেন তখন কিন্তু তাঁর সৃষ্টির সবেমাত্র শুরু। তাকে তো তিনি আড়াল করে রাখেন না দর্শকের চোখের সামনে থেকে।

ঝিন্নি আমার বুকে মৃদু একটা চাপড় মেরে বলল, তুমি কি বোকা ছোটেসাহেব। কুঁড়ি অসম্পূর্ণ সৃষ্টি হতে যাবে কেন? কুঁড়ি তো কুঁড়ি হিসেবেই সম্পূর্ণ। তখন নাই বা ফুটল সে। আচ্ছা শোন, বিয়ের আগে পিন্‌ঝি বলে মেষপালক গাদ্দীদের একটি মেয়ের ডেলিভারী করেছিলে, নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার?

থাকবে না কেন।

তুমি যখন টাট্টু নিয়ে পাহাড়ে বেড়াচ্ছিলে তখন পিন্‌ঝি বাচ্চাটাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে পাহাড়ী চড়াই ভাঙছিল। তুমি ফিরে এসে বলেছিলে, মা আর শিশুর ঐ ছবি অসাধারণ। ওখানে কি মিষ্টি বাচ্চাটা সম্পূর্ণ নয়?

হার মানছি ঝিন্নি।

ও অমনি হেসে বলল, অত তাড়াতাড়ি হার মেনে নাও কেন ছোটেসাহেব?

আমিও হেসে বললাম, বিজ্ঞানের ছাত্র আমি, যুক্তি অকাট্য হলে মাথা পেতে স্বীকার করে নিই। সেখানে হেরে গিয়ে দুঃখ নেই।

ও আমার বুকে (জামার ওপরেই) একটা চুমু খেয়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, তুমি কি ভাল। ঠিক এই জন্যেই তোমাকে এত ভালবাসি।

এত ভালবাস, তবুও তোমার অসম্পূর্ণ ছবি দেখাবে না?

তোমাকে ভালবাসি বলেই তো দেখাব না। ঠাকুরঘরে ফুল, চন্দন, নৈবেদ্যের সব আয়োজন সম্পূর্ণ করে তবেই তো আমরা ঈশ্বরকে ডাক দি।

আবার হার হল আমার।

ঝিন্নি এবার আমার কোমর জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে তার ছবির কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, দেখ, যত খুশি চেয়ে চেয়ে দেখ।

আমি ওর ছবির সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে ও বলল, কি, কেমন দেখলে?

মনে হল, আশ্চর্য এক অন্ধকার জগৎ পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

ও আমার কথার ধরণ দেখে অবাক হয়ে আমার দিকে ফিরল।

তারপরই আমাকে ঠায় চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠেলা দিয়ে বলল, যাও তোমাকে আর আমার ছবি দেখতে হবে না।

আমি ঝিন্নির অসমাপ্ত ছবি না দেখেই বেরিয়ে এসেছিলাম। অবশ্য সেই দিনই বাইরে এসে ঝিন্নি আর আমার ভেতর একটা বোঝাপড়া হয়েছিল। আমি খোলা মনেই বলেছিলাম,

তোমার সবকটা ছবিই আমি দেখব, তবে শেষ তুলির টান পড়ে যাবার পর। আর এটাই ঠিক ঠিক দেখার নিয়ম।

সত্যি, রাগ করে বলছ না তো?

একটুও না।

ঝিন্নি আমাদের কোয়ার্টার অব্দি সঙ্গে সঙ্গে এল। পথে একটি সুন্দর কথা ও বলল।

কোনদিন ছোটেসাহেব আমাকে দেখেছ, নিজেকে যেমন তেমন করে সাজিয়ে তোমার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি? না, মনে হয় তুমি চেষ্টা করলেও তেমন একটা দিনের কথা স্মরণ করতে পারবে না। যাকে ভালবাসি তার কাছে নিজেকে সবচেয়ে সুন্দর করে নিবেদন করতে হয়।

ক্ষণস্থায়ী বসন্ত, তবু কি মহিমা তার। একেবারে যেন নয়নভোলান রূপে এল। ডালে ডালে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় কি শোভা! মখমল সবুজ পাতার ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা আর হালকা পিঙ্ক ফুলের অজস্র সমারোহ। বাতাসে ঠাণ্ডাব উপভোগ্য আমেজ। নীচের ভ্যালিতে শুরু হয়েছে গম তোলা।

সন্ধ্যা সকাল, বিকেল দুপুরে কোন সময়েই গানের বিরতি নেই। ফসল কাটতে কাটতে গান করছে কুলু রমণী। ফুলে ভরা আপেলের বাগানে, সিডার বনের আড়ালে, কোন সঙ্গীতমুখর কুহলের ধারে বসে গান গাইছে প্রেমিক-প্রেমিকা।

বিকেলে অথবা সন্ধ্যায় দলে দলে মেয়ে পুরুষ নাচে গানে কোন গৃহস্থের প্রাঙ্গণ মাৎ করে দিচ্ছে! এ সময়টা বসন্ত উৎসব সারা কুলু জুড়ে।

একটা এগ্‌জিবিশানের আয়োজন করা হল। ঝিন্নির বসন্ত-সমাগম সিরিজের প্রায় পঁচিশখানা ছবির প্রদর্শনী! বসন্ত আসার অনেক আগে থেকেই অবশ্য সে আসে, সে আসে, ভাবখানা গুঞ্জন করছিল ঝিন্নির মনে। আর তখন থেকেই ছবি আঁকার শুরু। শীতে স্টুডিওর ভেতর রুম হিটার জ্বালিয়ে কাজ করে গেছে ঝিন্নি। শীতের ভেতরেই দেখেছে বসন্তের স্বপ্ন। দিবসরজনী শিল্পী ঝিন্নি বসন্তের ভাবনায় ভরপুর।

আমি দুপুরে কাজ না থাকলে আমার দোতলার ঘরে ইজিচেয়ারে বসে জানালা খুলে দি। আমার কোয়ার্টারের ঠিক একধাপ নীচের পাহাড়ে রাস্তার ওপারে ঝিন্নির স্টুডিও। পাইন বনের ছায়ায় কাঠ আর মোটা গ্লাস দিয়ে তৈরি ঘর। ভেতরে কমলা রঙের স্ক্রীন টানা। কেবল ভ্যালির দিকটাই খোলা। ও বসে বসে কাজ করে, আমি ওকে দেখতে পাই না। দুজনের ভেতর কমলা রঙের ওই স্ক্রীনের আড়াল। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত কাজের ফাঁকে ঝিন্নি পর্দা সরিয়ে তাকালে আমি ওকে দেখতে পাই। ও ওর সুন্দর হাতখানা ভারী সুন্দব ভঙ্গীতে নাড়তে থাকে। আমি হয়ত পাশে পড়ে থাকা কাপখানা তুলে চুমুক দেবার ভঙ্গী করে ওর কাছে জানতে চাই, বিকেলের চায়ে ও কোয়ার্টারে আসছে কিনা।

ও হাতের পাতা দোলালে আমি বুঝে নি, চা যাবে শিল্পীর স্টুডিওতে। মুখখানা দ্রুত

ওপর নীচ করলে বুঝি, এখন কাজে ক্লান্ত, তাই কাজ ছেড়ে আসবে বিকেলের চায়ের আসরে যোগ দিতে।

আমার কোয়ার্টারে বিকেলের চা-পর্বে জোটে জুলিয়েন। কোন কোন দিন বালু আসে তার বাচ্চাটাকে কম্বলে জড়িয়ে নিয়ে। একটা দারুণ সুইট পুতুলের মত। আমার কোয়ার্টার সংলগ্ন ডিসপেনসারীতে বাচ্চাটা জন্ম নিয়েছে। জুলিয়েনের অনুরোধে আমি আর ঝিন্নি ওর ডেলিভারীর দায়িত্ব নিজেদের হাতে নিয়েছিলাম। দারুণ হেলদি বেবী হয়েছে। আমার তত্ত্বাবধানে ঝিন্নি এখন একজন ওস্তাদ ধাত্রী। কিন্তু ডিসপেনসারী থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে যেদিন বালু বাড়ি গেল সেদিন রাতে বিছানায় আমাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত ঝিন্নির সে কি কান্না!

আমি যত ওর মুখখানা বুকে চেপে ধরে বলি, কি হয়েছে সোনা, কি হয়েছে তোমার?

ও কতক্ষণ কথার কোন জবাব না দিয়ে মুখ গুঁজে শুধু কাঁদল।

একসময় আকুল হয়ে বলল, আমার কোলে কোন শিশু নেই কেন ছোটেসাহেব? পিন্‌ঝির বাচ্চাটাকে বুকে জড়ালাম কদিন, সে চলে গেল। বালুর বাচ্চাটাও ঠিক তেমনি করে চলে গেল। আমি কি নিয়ে থাকব?

আবার কান্না। আমার কেবল তাকে অনাগত শুভ আবির্ভাবের আশ্বাস দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

তারপরই স্টুডিও নিয়ে মাতল ঝিন্নি। চাকরী ছেড়ে হোলটাইম আঁকিয়ে। এখন স্টুডিওই ওর ধ্যান জ্ঞান। সারাদিন নিজের সৃষ্টি নিয়ে মেতে আছে।

ওর এগজিবিশানের ব্যাপারে পুরোপুরি মাথা গলিয়েছে জুলিয়েন। তার পরিকল্পনাতেই ঝিন্নির এগজিবিশানের স্থান নির্বাচন হয়েছে। বিরাট বাগানওয়ালা বেনন পরিবারের দু'নম্বর হোটেল-বাড়ি জুলিয়েন ছেড়ে দিয়েছে এগজিবিশানের জন্যে।

ঝিন্নি বলেছিল, পনের দিন এগজিবিশান চললে আপনার হোটেল ভাড়া দিতে আমি যে ফকির হয়ে যাব জুলিয়েন সাহেব।

জুলিয়েন তার স্বভাবসিদ্ধ মাথা নেড়ে বলেছিল, ডাক্তার দেবে।

ঝিন্নি হাত মুখ নেড়ে উত্তর করেছিল, তাহলেই হয়েছে। বউ যদি পনের দিনে এতগুলি মুদ্রা খরচ করে তাহলে ডিসপেনসারী ছেড়ে আপনার বন্ধু বনবাসে চলে যাবে।

আমি একান্তে পেয়ে জুলিয়েনকে বলেছিলাম, সবে সিজন শুরু হল আর তুমি এমন একটা বেহিসেবী কাণ্ড বাধালে! কতগুলো টাকা লোকসান দিতে হবে বল তো?

ও অমনি বলল, জুলিয়েন ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে ডাক্তার। সে লোকসান দিতে নামেনি। সারা দেশবিদেশ ঝেঁটিয়ে এখন ট্যুরিস্ট আসতে শুরু করবে। তাদের হাতে অঢেল টাকা। দশ টাকা করে প্রদর্শনী ফি ধার্য করলে অনেক টাকা উঠে আসবে।

একটু থেমে আবার বলল, আর এটা বুঝছ না কেন ডাক্তার, কত বড় একটা পাবলিসিটি হবে এতে। আমাদের হোটেলের তো বটেই, সারা কুলু ভ্যালির।

বললাম, তোমাদের দুজনের প্ল্যান প্রোগ্রাম আমার বোঝার অতীত।

জুলিয়েন অমনি বলল, বুঝে কাজ নেই তোমার, শুধু দেখে যাও।

ইতিমধ্যে জুলিয়েন আর ঝিন্নি ঘুরে এল সিমলা থেকে। ঝিন্নি তার আর্ট কলেজের দু'চারজন অধ্যাপককে এগজিবিশান দেখার নিমন্ত্রণ জানিয়ে এল।

ঝিন্নি ফিরে এলে ওর ভেতর বেশ একটা উত্তেজনা লক্ষ্য করলাম। ওদের সময়ের একজন খুব নামকরা অধ্যাপক, যিনি সম্প্রতি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছেন, তিনি নাকি উদ্বোধনের দিন আসতে রাজি হয়েছেন। শুধু তাই নয়, সে সময় দিল্লী থেকে তাঁর বিশেষ পরিচিত এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের এক সেক্রেটারী আসছেন ছুটি কাটাতে সিমলা। তিনি কথা দিয়েছেন, ঐ সময় তাঁকে নিয়ে এসে উদ্বোধন অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করাবেন।

ঝিন্নির উত্তেজনার কারণ আছে বই কি। সে এতটা প্রত্যাশা করে নি।

এক রাতে ঝিন্নি আমাকে হঠাৎ বলল, আচ্ছা ছোটেসাহেব, কি করা যায় বল তো? ভারী একটা ভাবনায় পড়ে গেছি।

কি এমন ভাবনা?

এই যে আমার প্রফেসার আর সেক্রেটারী সাহেব আসবেন, তাঁদের থাকার ব্যবস্থা কি করি। জুলিয়েনকে এ নিয়ে আবার বলতে ইচ্ছে করছে না। অথচ ওঁদের গভর্ণমেন্ট গেস্ট হাউসে সরাসরি তুলে দিতেও সংকোচ হচ্ছে। ওঁরা তো আমার জন্যেই আসছেন। আমি দুদিন ধরে এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, কিন্তু কূলকিনারা কিছুই পাচ্ছি না।

এই প্রথম আমি ঝিন্নিকে আমার অপরিচিত একটা রূপে দেখলাম। আঘাতটা অভাবিত ছিল, তাই বুকে এসে বাজল। ঝিন্নি তার নিমন্ত্রিত অতিথিদের কোথায় এনে তুলবে তাই নিয়ে দুদিন ভেবেছে। অথচ সে এর ভেতর একবারও আমাকে বলার সুযোগ পায়নি। ঠিক তাও নয়, আমাকে না বলে কোন কিছু করা যায় কিনা তাই হয়ত ভেবেছে। তার নিশ্চয় মনে হয়েছিল দু'চারজন ভি. আই. পি-র ঝামেলা আমি কিভাবে নেব। শেষে কোন কিছু উপায় দেখতে না পেয়ে আমার দ্বারস্থ হয়েছে।

আমি নিজের আঘাতটা ওকে বুঝতে না দিয়ে বললাম, এটা এমন কিছু একটা সমস্যা বলে আমার মনে হচ্ছে না। এ নিয়ে আপাতত মাথা না ঘামিয়ে তুমি এগজিবিশানের ছবিগুলো কিভাবে সাজাবে তাই ভাব।

ঝিন্নি আমার কথায় ভরসা পেল না।

কি বলছ তুমি, মাথা ঘামাব না। কারা আসছেন বুঝতে পারছ তো।

আমি আরও আঘাত পেলাম। ঝিন্নির এ ধরণের উত্তেজনার কারণ কি। যে সমৃদ্ধ মন নিয়ে এতকাল ওকে আমি মানুষের সঙ্গে ব্যবহার করতে দেখেছি হঠাৎ তার ব্যতিক্রম দেখে বিস্মিত হলাম। একি ঝিন্নির এক ধরণের হীনমন্যতা! ভাবতে গিয়েও মনে মনে বড় কষ্ট পেলাম!

তবু বললাম, হয়ত অনেক বড় মাপের মানুষ ওঁরা, কিন্তু আমাদের এই ছোট ঘরে তাঁদের যদি এনে তোল তাহলে যত্নের অভাব হবে না, এটুকু অন্তত বলতে পারি।

ও কোন কথা বলল না কিন্তু দারুণ রকম একটা ভাবনার হাত থেকে যে নিষ্কৃতি পেল তা বুঝলাম যখন ও অন্ধকার বিছানায় আমার হাতটাকে জোরে চেপে ধরে রইল।

ব্যবস্থা হল ঝিন্নির স্টুডিওতেই। সিমলা থেকে ওর অধ্যাপকের শেষ চিঠিতে জানা গেল, ওঁরা সপরিবারে আসছেন না। কেবলমাত্র দুই পরিচিত বন্ধুতেই আসছেন।

আমি আমাদের কোয়ার্টারের দোতলার হলঘরে ওদের কয়েক জনের জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম কিন্তু চিঠিটা পাবার পর প্ল্যানটা বদলে গেল। স্টুডিও সংলগ্ন রুমে দুজনের থাকবার খুব ভাল ব্যবস্থা হতে পারে। তাছাড়া ওখানকার বাড়তি আকর্ষণ, জানালার পর্দা সরালেই বহুদূর বিস্তৃত উপত্যকা ও পীরপাঞ্জালের তুষারচূড়ার চোখ জুড়ানো শোভা।

অবশ্য খাবার দাবার সরবরাহের ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের কোয়ার্টার থেকেই। বালুকে জুলিয়েন পুরোপুরি এই খাবারের চার্জেই রেখেছে।

ঝিন্নিকে বললাম, নতুন ব্যবস্থাটা তোমার মনঃপুত হয়েছে তো?

দারুণ। এ সব পরিকল্পনাতে তুমি দেখছি মাস্টার।

ঝিন্নি হয়ত সহজভাবেই কথাগুলো আমাকে বলল, কিন্তু আমার কানে ওর কথাগুলো শোনাল পিঠ চাপড়ানোর মত।

একটা বিষয়ে দেখলাম, ঝিন্নি আমার প্ল্যানকে মর্যাদা দিয়েছে। অবশ্য না দিলেও আমার কিছু বলার ছিল না।

ও ছবি সাজানোর ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, প্রদর্শনীটার নাম দাও 'বসন্ত-সমাগম'। প্রবেশ দ্বারের ওপরে বড় ক্যানভাসে আঁকা ছবিখানা প্লেস কর। সাদা আর পিঙ্ক রঙ ছড়ানো ছবিতে বসন্তের পুষ্পিত ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেয়েছে। ঐ ছবির নামকরণটাও আমি করে দিয়েছিলাম, 'পুষ্পিত ব্যাকুলতা'।

তারপর ডাইনে বাঁয়ে দুখানা করে চারখানা ঘর। বাকী চব্বিশখানা ছবির বারখানা গেল একদিকে আর বারখানা অন্যদিকে। এ ছবিগুলোর নির্বাচনেও আমি কিছুটা মাথা ঘামিয়েছিলাম।

একদিকে বসন্ত-প্রকৃতির ছবি, অন্যদিকে বসন্তের মানুষ।

যেমন, প্রকৃতি পর্যায়ে রয়েছে একটা ছবি, ভাসমান সাদা একখণ্ড মেঘ নীলাকাশের বুকে। ঐ সাদা মেঘের কোথাও কোথাও লেগেছে গোলাপী রঙের আভা। মেঘটি উড়ে আসছে উপত্যকার দিকে। ঠিক যেন প্রেমের দেবতা মদন বসন্তের বার্তা নিয়ে নেমে আসছে ধরাতলে। ছবিটির নাম 'বসন্তের দূত'। অন্য একটি ছবি কুলুর আপেল-বাগিচা। সাদা আর পিঙ্ক ফুলের ডালগুলো প্রসারিত-বাহু নর্তকীর মত আশ্চর্য নৃত্য ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে। এটির নামকরণ করা হয়েছে, 'বসন্ত-রাস'।

এমনি বসন্তের নানা ফুল, পাখি নিয়ে সাজান হয়েছে প্রকৃতি-পর্বের বারখানা ছবি।

অন্যদিকে বসন্তের নরনারী পর্বে বারখানা নির্বাচিত ছবি। বসন্তের ক্ষেতে প্রথম গম কাটছে মেয়েরা। একহাতে কাস্তে, অন্যহাতে গমের আঁটি। মুখে ছড়িয়ে পড়েছে খুশির হাসি। ছবিটির নাম, 'বসন্তের দান'। মেষচারক গাদ্দীরা শীতের শেষে ভেড়ার পাল নিয়ে চলেছে উঁচু তুষার-পর্বতের দিকে। নামকরণ করা হয়েছে, 'বসন্ত-উৎসবের যাত্রী'। একটি ছবির নাম 'মধু মিলন'। নির্জন পাহাড়ের কোলে একটি পুষ্পিত গাছের তলায় প্রেম

নিবেদন করছে পাহাড়িয়া তরুণ-তরুণী। এমনি বসন্ত উৎসবের নৃত্যমত্ত তরুণ-তরুণীর নাম রাখা হয়েছে 'ব্যাকুল বসন্ত'।

যদিও সব কটি ছবি বসন্তকে ঘিরে তবুও ছবিগুলিতে কোন একঘেয়েমি নেই। ঝিন্নি বিভিন্ন মিডিয়ামে ছবি এঁকে দর্শকের দৃষ্টিকে শেষ পর্যন্ত পিপাসার্ত করে রেখে দিতে পেরেছে।

নির্দিষ্ট দিনে ছোট্ট মানালী শহরটিতে জনসমাবেশ কম হল না। জুলিয়েন বিভিন্ন হোটেল এবং গভর্ণমেন্ট রেস্টহাউসে সুন্দর চিত্রিত কার্ড বিলি করেছিল। দলে দলে ট্যুরিস্ট আসতে লাগল এগজিবিশানে।

সন্ধ্যায় 'হোটেল পীরপাঞ্জাল'-এ উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলেন এডুকেশান সেক্রেটারী মিঃ সাকসেনা। তাঁর ছোট্ট ভাষণে তিনি এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানালেন।

তাঁর ভাষণ শেষ হলে উৎসবের আমন্ত্রিত অতিথি আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ আর. কে. শর্মা দর্শকদের সঙ্গে শিল্পীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আপনারা আজ যে শিল্পীর ছবি দেখার জন্য এখানে সমবেত হয়েছেন, তিনি একসময় আমার ছাত্রী ছিলেন। আমি এমন একটি প্রতিভাময়ী ছাত্রী পেয়েছিলাম বলে আজও গর্ববোধ করি। নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন এবং নব নব ভাবনার বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপায়ণের পথেই আসে প্রতিটি শিল্পীর সার্থকতা। তারপর চিন্তার সর্বকালব্যাপী বিস্তারের সূত্র ধরেই আসে একজন রূপদক্ষের কালজয়ী প্রতিষ্ঠা। আমার বিশেষ প্রিয় ছাত্রীটি বয়সে তরুণ। তাঁর সামনে এখনও পথ দিগন্তের দিকে প্রসারিত। লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য এখনও তাঁকে বহু পথ অতিক্রম করতে হবে। আমি তাঁর মধ্যে যে নিষ্ঠা, ধৈর্য ও ভাবসম্পদের পরিচয় পেয়েছি তাতে আমি তাঁর সিদ্ধি সম্বন্ধে আশাবাদী।

আজ যে ছবিগুলি তিনি আমাদের দৃষ্টির উৎসবে পরিবেশন করতে চলেছেন, সেগুলি কাব্যধর্মী। ঋতুরাজ বসন্তের বিজয় বৈভবই এই ছবিগুলির বিষয়বস্তু।

আমি আমার পরম প্রিয় ছাত্রীটিকে তাঁর কাজের মাধ্যমে চিনে নেবার জন্য সম্মানীয় দর্শকদের আহ্বান জানাচ্ছি।

দীর্ঘদেহী সুপুরুষ মিঃ শর্মা অনুর্ধ্ব পঁয়তাল্লিশটি বসন্ত হয়ত পার করেছেন। সুপ্রশস্ত ললাটের দুদিকের চুলে সামান্য পাক ধরেছে। শিল্পীর চেহারা, শিল্পীর ভাব, আর আচরণ। দেখে মনে হবে, তিনি একজন আকর্ষণীয় পুরুষ।

বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে দর্শকরা ঘরে ঢুকে ছবি দেখতে লাগলেন। সামনে জুলিয়েন আর ঝিন্নি। মিঃ সাকসেনা ঝিন্নিকে ছবি সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কিছু প্রশ্ন করছেন। ঝিন্নি তাঁকে সব কিছু সুন্দর করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। মিঃ শর্মা আপন মনে ছবি দেখে চলেছেন।

বিশিষ্ট অতিথিদের ছবি দেখা শেষ হলে জুলিয়েন ওঁদের পাশের ছোট্ট একটি ঘরে নিয়ে ঢুকল। ঐখানেই ওঁদের সান্ধ্য চায়ে আপ্যায়িত করবে জুলিয়েন। প্রদর্শনীর ঘর আর ঐ ছোট্ট ঘরখানার মাঝে একটি দরজা। সুদৃশ্য পর্দা ঝুলছে দরজায়।

ঝিন্নি পেছন ফিরে হঠাৎ আমার মুখোমুখি হয়ে চাপা গলায় বলল, তুমি রইলে ছোটেসাহেব, আমি ওঁদের দেখছি।

মাথা নেড়ে বললাম, নিশ্চয়। দেখব বই কি। তুমি নিশ্চিন্তে যাও, আমি আছি।

ঝিন্নি চলে গেল। আমি দর্শকদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তাদের মন্তব্যগুলো শুনতে লাগলাম। তারা ঝিন্নির রঙের ব্যবহার, রেখার বলিষ্ঠতা, বিভিন্ন মিডিয়ামে ছবি আঁকার দক্ষতা সম্বন্ধে আলোচনা করছিল। আমি দর্শকদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে একসময় ঐ ছোট্ট ঘরখানার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। অতিথিরা ভেতরে চা খেতে খেতে গল্প করছিলেন। আমার কানে এল মিঃ সাকসেনার একটি মন্তব্য, আপনার ছবির নামকরণ আমার খুবই ভাল লেগেছে।

আমি সেই মুহূর্তে ঝিন্নির একটি উত্তর আশা করেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মন্তব্য শুনলাম মিঃ শর্মার, তোমার এই ছবি সাজানোর পরিকল্পনাটা আমার খুবই ভাল লেগেছে।

এবারও ঝিন্নি নীরব।

সামান্য সময় বিরতি। হঠাৎ জুলিয়েনের গলা শোনা গেল, এই মুহূর্তে একজন আমাদের ভেতরে নেই, তার ভূমিকা এ ব্যাপারে কম নয়।

এবার কিন্তু ঝিন্নি জুলিয়েনকে কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে বলল, হ্যাঁ, আমার স্বামী ডাক্তার মুখার্জী এ ব্যাপারে খুব উৎসাহী এবং দক্ষ। সাজানোর সমস্ত পরিকল্পনাটা তাঁর।

মিঃ শর্মা বললেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং। ডাক্তার মানুষের এসব খেয়াল প্রশংসনীয়। তিনি কোথায়? একসঙ্গে এগজিবিশান হলে ঢুকলাম বলে মনে হল।

ঝিন্নি বলল, এক্সকিউজ মি, আমি এখুনি আসছি।

ঝিন্নির চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ানোর শব্দ পেলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে সরে এসে পাশের ঘরে দর্শকদের সঙ্গে মিশে গেলাম।

ঝিন্নি একসময় আমার পাশে এসে বলল, তোমার সঙ্গে ওঁরা কথা বলতে চাইছেন। তোমার নামকরণ ওঁদের দারুণ ভাল লেগেছে।

বললাম, আমাকে আবার ওর ভেতর টানাটানি কেন? তোমাদের ছবির রহস্য আমি কিছুই বুঝি না।

ঝিন্নি আমার হাতের আঙুলে চাপ দিয়ে বলল, দুষ্টুমি করতে নেই ছোটেসাহেব। প্লিজ চল একবারটি।

এইখানেই আমি ঝিন্নির আন্তরিকতার কাছে হেরে গেলাম। এতক্ষণ আমার মনে যে মেঘ জমে উঠেছিল তা একটা 'হঠাৎ হাওয়া'র ধাক্কায় ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি চায়ের আসরে ঢুকতেই মিঃ শর্মা হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করে বললেন, আপনি তো দারুণরকম প্রতিভাবান মশাই। লুকিয়ে থেকে কি গুণ লুকোতে পারবেন?

হেসে বললাম, আপনাদের শিল্পের প্রথম পাঠটিও আমার পড়া নেই। বিলিভ মি অর নট।

মিঃ শর্মা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আপনার নামকরণ আর ছবি সাজানোর পরিকল্পনা কিন্তু অন্য সাক্ষ্য দিচ্ছে ডাক্তার মুখার্জী।

আমি এবার বললাম, এটা আপনার ছাত্রীরই ভাবনা। স্বামী হিসেবে যতটুকু না করলে নয় ততটুকুই করেছি মাত্র।

ঝিন্নি আমাকে কাপে চা ঢেলে দিতে দিতে বলল, ও কথা বল না, এর পুরোপুরি কৃতিত্বটাই তোমার।

একটু আগে ওদের প্রশংসার উত্তরে ঝিন্নি তাহলে নিরুত্তর ছিল কেন? এখন ঝিন্নির এই সহজ সত্য প্রকাশের স্বাভাবিক ভঙ্গীটা আমাকে স্পর্শ করল।

বললাম, ছবি আপনাদের কেমন লাগল বলুন?

মিঃ শর্মা ঝিন্নির দিকে চোখ টিপে চেয়ে হাসলেন। বললেন, কবার প্রশংসা শুনতে চাও মিসেস মুখার্জী?

ঝিন্নি বলল, আপনি ছাত্রছাত্রীদের সব সময়েই উৎসাহ দিতেন। তাই আপনার প্রশংসাটা আমাদের প্রাপ্য বলেই মনে করে এসেছি। এবার আমি কিন্তু আপনার কাছ থেকে সত্যিকারের সমালোচনা শুনতে চাই।

মিঃ শর্মা হেসে বললেন, ওটা একান্তে হবে তোমার আমার ভেতর। সব ভদ্রলোকের সামনে কি একজন শিল্পীর বিরূপ সমালোচনা করা উচিত?

ঝিন্নি আনুনাসিক সুরে বলতে লাগল, নিশ্চয়ই ছবিগুলো আপনার তেমন পছন্দ হয় নি।

মিঃ শর্মা অমনি বললেন, তোমার পরম নিন্দুক সমালোচকও একথা বলবে না। সামান্য যেটুকু ত্রুটি আমার চোখে পড়েছে তা আমি এক সময় আলোচনা করব।

ঝিন্নি বলল, নিশ্চয়ই স্যার। মানালী ছেড়ে যাবার আগে কিন্তু করে যেতে হবে।

মিঃ সাকসেনা এতক্ষণ সকৌতুকে গুরু শিষ্যার বাক্যালাপ শুনছিলেন। তিনি বললেন, আমার কিন্তু ছবিগুলো ভীষণ ভাল লেগেছে। ছবি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল, আমি যেন ফেয়ারী ল্যাণ্ডে ঘুরছি।

ঝিন্নি বলল, দারুণ সার্টিফিকেট! দয়া করে মন্তব্যের খাতায় কথাটা লিখে দেবেন স্যার।

মিঃ সাকসেনা এবার যে প্রস্তাবটি করলেন তার জন্যে কেউই প্রায় প্রস্তুত ছিলেন না। আমার মনে হল, কথাটা শুনে ঝিন্নি রীতিমত উত্তেজনায় কাঁপছে।

মিঃ সাকসেনার প্রস্তাব হল গভর্নমেন্টের পর্যটন বিভাগের ব্যবস্থাপনায় কুলু ভ্যালির ওপর দিল্লীতে এই ছবির একটি প্রদর্শনী হোক। তাতে গভর্নমেন্টের দারুণ একটা পাবলিসিটি হবে। মে-তে ভেকেসান। তখন তাঁর পক্ষে ভাল একটা স্কুল বা কলেজে প্রদর্শনীর স্থান করে দেওয়া অসম্ভব হবে না। তিনি এ সম্বন্ধে পর্যটন বিভাগের সঙ্গে কথা বলে জানাবেন।

মিঃ সাকসেনার কথার পরে কথা বললেন মিঃ শর্মা, তোমাকে কুলুর জনজীবনের ওপর আরও কিছু ছবি এঁকে ফেলতে হবে মুখার্জী। বাঘের গায়ের ডোরার মত কুলুর আশ্চর্য সব পাহাড়ী ক্ষেত, সেখানকার কর্মরত সব নরনারী। তাছাড়া ভেড়াচারকদের আরও কিছু ছবি

চাই পাহাড়ের নানা পটভূমিতে। এখানকার তুষার, নদী, অরণ্যেরও ছবি থাকা দরকার। পাহাড়ী ফুল, পাখি, এরাও বা অনুপস্থিত থাকবে কেন। সব মিলিয়ে তোমার ছবিতে রূপবতী কুলুর সামগ্রিক চেহারাটা ফুটে উঠুক। অবশ্য সব কিছু ছবি হবে, বিজ্ঞাপন নয়।

একটু থেমে বললেন, তোমার কাজের স্পীড দারুণ। তুমি চেষ্টা করলে মে-র এণ্ড নাগাদ এমনি আরও কিছু ছবি যোগ করতে পারবে।

মিঃ সাকসেনা বললেন, আমি দিল্লী পৌঁছে ব্যবস্থা পাকা হলে চিঠি দিচ্ছি।

সত্যি অসাধারণ ক্ষমতা ঝিন্নির। দিল্লী এগজিবিশানে ও আরও কয়েকখানা উৎকৃষ্ট জাতের ছবি যোগ করল।

আমি দিল্লী এগজিবিশানের উদ্বোধন-দিনে ঝিন্নির একান্ত পীড়াপীড়িতে হাজির ছিলাম। আমার কয়েকটি সিরিয়াস রোগীকে ছেড়ে যাবার কোন উপায় ছিল না। তবু যা হোক কিছু ব্যবস্থা করে ঝিন্নির অভিমানকে শান্ত রাখার জন্য আমাকে ঐ বিশেষ দিনটিতে থাকতে হয়েছিল। জুলিয়েন এ যাত্রায় আমাদের সঙ্গী হতে পারে নি। সে মধ্যপ্রদেশে গিয়েছিল তার জরুরী ব্যবসায়ের ব্যাপারে। তবে কথা দিয়েছিল, এগজিবিশানের শেষ দু'তিনটে দিন সে দিল্লীতে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

একটি সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছিল উদ্বোধনের দিনে। মিঃ সাকসেনার স্ত্রী টি-পার্টির ব্যবস্থা করেছিলেন। পারস্পরিক পরিচয়ের সময় মিসেস সাকসেনা হঠাৎ আমার সঙ্গে অন্যদের পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, আমাদের আজকের প্রদর্শনীর প্রতিভাবান শিল্পী শ্রীমতী মুখার্জীর অত্যন্ত সৌভাগ্যবান স্বামী।

মিসেস সাকসেনার কথায় সবাই হাততালি দিয়ে হেসে উঠলেন। তাঁরা এইভাবে আমাকে সংবর্ধিত করলেও আমার মনে হল এক ঝাঁক বিষাক্ত তীর আমার আত্মসম্মানের কোমল জায়গাটায় এসে আঘাত করল।

আমি ঠিক এ ধরণের তথাকথিত উঁচু সমাজটাকে চিনি না। শুনেছি, এ সব সমাজে মানুষের সম্মানের মূল্য নির্ধারিত হয় টাকার মূল্যে। মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব এবং গুণাগুণের ভিত্তিতে সাধারণত সেটা নির্ধারিত হয় না। এ সমাজের আচার আচরণ আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

করতালির পর অনেক ক'টি হাত এগিয়ে এসেছিল আমার হাতের সঙ্গে মিলিত হতে, কিন্তু আমি ওদের হাত স্পর্শ না করে করজোড়ে আমার ভদ্রতা রক্ষা করেছিলাম। ওঁরা হয়তো সেই মুহূর্তে আমাকে একজন বিশিষ্ট গাঁইয়া বলে ভেবে নিতে পারেন, কিন্তু তাতে আমার দিক থেকে অন্তত বিন্দুমাত্র অনুশোচনার কারণ ঘটে নি।

সাংবাদিকেরা নানা ধরণের প্রশ্ন করতে লাগলেন ঝিন্নিকে।

ঝিন্নি সব সময়েই অত্যন্ত গুছিয়ে সুন্দর করে কথা বলতে পারে। কথা বলার সময় ওর একটা বাড়তি আকর্ষণ আছে, সেটা ওর সামান্য অসংবদ্ধ দাঁতের ভারী সুন্দর একটা হাসি।

উপস্থিত সকলেই ঝিন্নির মুখের লাবণ্য ও চোখের দীপ্তিতে যে দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

কলাসমালোচকদের কাছে তার শিল্প সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নের জবাব দিল ঝিন্নি। এরপর জনৈক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, মিসেস মুখার্জী, ছবি আঁকার ব্যাপারে আপনি কার কার কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন?

আমার প্রথম প্রেরণা এসেছে আমার জন্মস্থান অপরূপা কুলুর কাছ থেকে। তারপর আমার শিল্পশিক্ষা শুরু হয়েছে পিতাজীর উৎসাহে। এখন আমি উৎসাহ বলুন, প্রেরণা বলুন, সবকিছু পাচ্ছি আমার স্বামীর কাছ থেকে।

আবার প্রশ্ন, আপনার স্বামী কোথায় যুক্ত আছেন?

উনি ডাক্তার। নিজের চেম্বার রয়েছে।

ওঁর আর আপনার কাজ সম্পূর্ণ আলাদা, অসুবিধে হয় না? মানে ডাক্তার মুখার্জী কোনরকম অসুবিধে বোধ করেন না?

এবার ঝিন্নি হেসে আমার দিকে হাত দেখিয়ে বলল, দয়া করে এ প্রশ্নটা ওঁকে করুন।

ঝিন্নির কথায় সকলে হেসে উঠলেন।

আর একজন বললেন, যদি কিছু মনে না করেন একটা প্রশ্ন করব।

স্বচ্ছন্দে।

আপনাদের বিয়েটা কি ভালবাসার?

কি মনে হয়?

ঐ ভেবেই তো প্রশ্নটা করলাম।

আপনার অনুমান মিথ্যে নয়।

অন্য একজন প্রশ্ন করলেন, ছবি আঁকা ছাড়া আপনার আর কি হবি আছে?

সঙ্গে সঙ্গে ঝিন্নির উত্তর, সময় খুঁজে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে গল্প করা।

আবার হাসির রোল উঠল।

এবার প্রশ্ন, বিয়ে আপনাদের ক'বছর হল?

ফোর্থ ইয়ারে পড়ল।

আপনাদের কোন ইস্যু?

আমি লক্ষ্য করলাম, ঝিন্নি মুখে কিছু না বলে শুধু মাথাটা ঝাঁকাল। তার দারুণ খুশি খুশি মুখের ওপর সেই মুহূর্তে একটা ছায়া নেমে এল। অন্য কেউ না বুঝলেও আমার দৃষ্টি এড়াল না।

দুদিন মানালীতে ফিরে এসেছি, কিন্তু মন বসছে না কাজে। ঝিন্নির স্টুডিওর দিকে তাকিয়ে থাকি কিন্তু হঠাৎ কেউ পর্দাটা সরিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাত নাড়ে না। ভাগ্‌তু সারাদিন ওটার পাহারায় থাকে। রাতে কাজকর্ম শেষ করে আমি ওখানে ঘুমুতে যাই। আমি ঝিন্নির ছবি আঁকার ঘরখানাতে চুপচাপ বসে থাকি। রঙ তুলির বাক্সগুলো অকারণে নাড়াচাড়া করি। মনে হয়, ঝিন্নির হাতের ছোঁয়া পেলাম। একসময় আলোটা নিভিয়ে দি। অমনি সারা উপত্যকাটা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গত রাত আর আজকের রাতে জ্যোৎস্নার ফিনিক ফুটেছে। ভ্যালিটা তরল জ্যোৎস্নার জলে একটা হ্রদ বলে মনে হচ্ছে।

কতদিন এই ভ্যালি পার হয়ে আমি আমার টাট্টু নিয়ে ওপারে গেছি। গম পেষা কলের এক ধাপ নীচে একটা পাঙাড় গাছে টাট্টুটাকে বেঁধে রেখে মসৃণ বড় একটা পাথরের ওপরে বসে প্রকৃতির কত ছবি, কত খেলা দেখেছি। আমার বাঁ দিকে উপত্যকা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে দেখেছি ক্ষেত থেকে গম কেটে মানুষ মাথায় নিয়ে ধীরে ধীরে পাহাড় ভেঙে উঠে চলেছে। কত শক্তসমর্থ ওরা। কি নিশ্চিত ওদের পদপাত। একটি মেয়ে গমের কল চালায়। গম ভাঙাতে দূর দূর থেকে লোক আসে। তারা চলে গেলে মেয়েটি কল বন্ধ করে কলঘরে চাবি লাগিয়ে পাশের পাহাড়ে নিজের কোঠির দিকে চলে যায়।

একদিন বেশ মজা হয়েছিল। আমি ভ্যালি পেরিয়ে সূর্যাস্তটা দেখব বলে টাট্টুতে করে এসে পৌঁছলাম। যথাস্থানে ঘোড়াটাকে গাছে বেঁধে রেখে আমার নির্দিষ্ট আসনে বসার জন্যে এসে দেখি, একটি থালায় কয়েকটি আস্ত ফল ও দুটো বেশ বড় আকারের মেঠাই রয়েছে। থালার সামনে মাজা ঝকঝকে গেলাস ভর্তি জল।

আমি তো দৃশ্য দেখে তাজ্জব। এ আবার কোন ব্যক্তি আমার জায়গাটি দখল করে ফলারের আয়োজনে ব্যস্ত।

আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। গেল কোথায় মানুষটা। নিশ্চয়ই পাহাড়ের ধারে কোন ঝর্ণায় হাত মুখ ধুতে গেছে। এসেই সূর্যাস্তের আগে ফলারে বসবে।

কিন্তু আশ্চর্য, সূর্য প্রায় পাহাড়ের আড়ালে আত্মগোপন করতে চলল তবু মানুষটার দেখা নেই।

হঠাৎ মাথার ওপরে গম পেষাই কলটা বন্ধ হয়ে গেল। এতক্ষণ পেষাই কলের কোঁক কোঁক আওয়াজটা পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে স্থানটাকে সরগরম করে রেখেছিল, কিন্তু হঠাৎ কলটা বন্ধ হয়ে যেতেই চরাচর একেবারে চুপ হয়ে গেল।

আমি সেই রহস্যের উপচার সামনে রেখে উপকথার নায়কের মত কোন দত্যিদানার আগমন প্রতীক্ষা করছি এমন সময় পেছনে মৃদু পায়ের সাড়া পেলাম। ফিরে দেখি, গম কলের সেই মেয়েটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে।

আমাকে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে ও বলল, বাবুজী আপনার ভোগের জন্যে ওটুকু রেখে গেছিলাম, দেখছি আপনি এখনও মুখে তোলেন নি।

আমি সবিস্ময়ে বললাম, এ খাবার আমার জন্যে?

হ্যাঁ, বাবুজী।

কিন্তু কেন? মানে উপলক্ষটা কি?

আজ আমার গম পেষা কলের প্রতিষ্ঠার দিন, তাই আপনার জন্যে সামান্য কিছু এনেছি।

হেসে বললাম, তাহলে তো নিশ্চয়ই খেতে হয়।

ও বলল, আজ কম পয়সায় গম পিষে দি' বলে অনেক দূর দূর থেকে সব খদ্দের এসেছিল, তাই আপনার কাছে আর আসতে পারিনি।

বললাম, কিন্তু আমি তো রোজ আসি না। তুমি কেমন করে জানলে যে আমি আজ আসব, আর আমার জন্যে খাবার রেখে গেলে?

আমি কল ঘরে বসে আপনাকে টাট্টুতে করে ওপারের পাহাড় থেকে নেমে আসতে দেখলাম। তাই এক ফাঁকে খাবারটা রেখে গেছি। কাজের চাপে বলতে আসতে পারিনি।

আমি ওর থালা থেকে একটা আপেল আর একটা মেঠাই তুলে নিয়ে বললাম, ব্যবসায়ে অনেক উন্নতি হোক, আজ এই প্রার্থনা জানাই ঈশ্বরের কাছে।

মেয়েটি অমনি বলে উঠল, ওটুকু সব এখানে আমার সামনে বসেই খেতে হবে বাবুজী।

ওর কথায় এতখানি জোর ছিল যে আমি না বলে ওকে দুঃখ দিতে পারলাম না। ওর সামনে বসেই ফল আর মিষ্টি ফলার করে ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল পেটে চালান করে দিলাম।

আমার খাওয়া হয়ে গেলে ও থালা আর গ্লাস তুলে নিল। আমাকে বলল, বড় শান্তি পেলাম ডাক্তার সাবকে ফলার করিয়ে।

আমি যে ডাক্তারী করি তা তুমি জানলে কি করে?

বালু আমার বন্ধু ছিল বাবুজী। ওর কোঠী তো ঐ নজদিগ। ওর বাবার কাছে মাঝে মাঝে আমরা তুলসীদাসজীর রামায়ণ শুনতে যেতাম। ওখানে আপনার কথা বহুৎ শুনেছি।

বললাম, বালুর যখন বিয়ে হয়নি তখন ওর ঐ বাড়িতে আমি কয়েক বারই গেছি। বালু তখন আমার ডিসপেনসারীতে কাজ করত।

আপনার দয়ার কথা বালু আমাকে সব বলেছে বাবুজী। জুলিয়েন সাহেবের সঙ্গে ওর সাদিটাও তো আপনি ঘটিয়ে দিয়েছেন।

বললাম, তুমি যার কাছ থেকেই শোন না কেন, কথাটা ঠিক নয়। জুলিয়েন নিজের ইচ্ছাতেই ওকে বিয়ে করেছে। আমি কেবল জুলিয়েনের ইচ্ছার কথাটাই ওদের জানিয়েছিলাম।

মেয়েটি বলল, বাবুজী, মাপ করেন তো একটা কথা জানতে চাইব।

বল।

জুলিয়েন সাহেব কি বালুর সব কথা জেনে ওকে সাদি করেছিলেন?

সব জেনে। কিন্তু বালু সে কথা আজও জানে না। জুলিয়েন যে সব জেনেশুনে ওকে বিয়ে করেছে তা কখনও বালুর কাছে প্রকাশ করেনি।

মেয়েটি বলল, সত্যি অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ জুলিয়েন সাহেব।

আমি বললাম, তুমি যখন সবই জান তখন এ কথাটাও জান যে আমার সঙ্গে বালুকে জড়িয়ে একটা কথা উঠেছিল?

আশেপাশের কয়েকখানা টিকায় ছড়িয়েছিল ডাক্তার সাব। কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিল, তবে বেশির ভাগ লোকই করেনি।

বললাম, যারা বিশ্বাস করেছিল, ব্যাপারটা মিথ্যে হলেও তাদের দোষ দেওয়া যায় না।

এ কথা কেন বলছেন বাবুজী?

বলছি এইজন্যে যে সন্ধ্যে সকাল যেখানেই আমি ডেলিভারী কেসে গেছি সেখানেই বালু আমার সঙ্গী হয়েছে। তাতে লোকের মনে আমাদের সম্বন্ধে যদি একটা ভুল ধারণা জন্মায় তাহলে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না।

মেয়েটি এবার একটু উত্তেজিত হয়েই কথা বলল, কিন্তু আমি তো জানি বাবুজী, বালু যে মা হতে চলেছিল সেটার জন্যে দায়ী বিদেশী একজন ট্যুরিস্ট।

তুমি জানলে কি করে কথাটা?

বালু আমাকে কোন কিছু বলতে বাকী রাখেনি। আপনার কাছ থেকে কাজ ছেড়ে চলে আসার পর তার মাথাটা প্রায় বেঠিক হয়ে যায়। তখন সে জীবনটাকে নিয়ে সাধারণ মেয়ের মত খেলা করে বেড়াতে চেয়েছিল। তার ফলে ঐ বিদেশী লোকটা সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল।

বললাম, কাজ করতে করতে আপেল বাগানে পড়ে যাবার ফলে ওর গর্ভের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। আমি সে সময় সেবা করে ওর প্রাণ রক্ষা করেছিলাম মাত্র। আর তাইতেই আমার নামে বদনামটা রটে যায়।

পরে আমি বালুর মুখে এ সব কথাই শুনেছি বাবুজী। ও আক্ষেপ করে বলেছিল, আমার দোষে দেবতার মত মানুষটাকে কলঙ্কের ভাগী হতে হল।

ও সব পুরোনো কথায় ছেদ টেনে দিয়ে বললাম, তুমি থাক কোথায়?

পাহাড়টার ওধারে।

অনেকখানি পথ তোমাকে যেতে হবে।

ও কিছু না বাবুজী, অভ্যেস হয়ে গেছে।

কে আছে তোমার বাড়িতে?

খালি আমার মা।

এ গমের কলটা কি তোমাদের?

হাঁ বাবুজী। ওটা আমার পিতাজীর ছিল। এখন আমি চালাই।

বললাম, এখন আমি যদি তোমাকে কোন একটা প্রশ্ন করি তাহলে কিছু মনে করবে না তো?

না, না বাবুজী। আপনি যে কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন।

তুমি বিয়ে করনি কেন?

আমি তো বিবাহিতা বাবুজী।

তবে যে তুমি বললে, খালি তোমার মা আছেন সংসারে।

সে কথাও ঠিক বাবুজী। বিয়ের এক বরষ যেতে না যেতেই আমার স্বামী মারা গেছে।

খুব দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু ... কিন্তু ...।

ও সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কথাটা জেনে নিয়ে বলল, আমি আবার সাদি করিনি কেন তাই তো জানতে চাইছেন? আমি ব্রাহ্মণ নই, দাঘী সম্প্রদায়ের মেয়ে। আমার বিধবা বিয়েতে কোন বারণ নেই।

ও একটু থামল। অমনি বললাম, তবে? এক বছরের ভেতর যে বিয়ে শেষ হয়ে গেল তাকে মুছে ফেলে নতুন সংসার করতে বাধা কি?

বাধা আর কেউ নয় বাবুজী, আমার মন।

তুমি কি একটা বিয়ের পরিণতি দেখে ভয় পেয়ে গেছ?

হাসল মেয়েটি। বলল, না বাবুজী, কথাটা আদপেই তা না। ও আমাকে ঐ এক বছরে এমন করে ভালবেসেছিল যে সারা মনটা আমার ভরে আছে।

কথাটা শুনে খুবই ভাল লাগল, কিন্তু তুমি কি সারা জীবন এই স্মৃতিটুকু নিয়ে কাটিয়ে দিতে পারবে?

চেষ্টা করব বাবুজী।

শেষে যখন বয়েস বাড়বে, শক্তিতেও টান পড়বে, কোন মানুষকে সাহায্যের জন্যে তেমন করে কাছে পাওয়া যাবে না, তখন কি ঠিক সময়ে আর একটা সংসার না পাতার জন্যে অনুশোচনা আসবে না?

যখন আসবে বাবুজী, তখন নিজের মনের সঙ্গে একটা মোকাবিলায় বসা যাবে। এখন আমি একটা সুন্দর স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলতে চাই না।

বললাম, বড় ভাল লাগল তোমার কথা শুনে। কি করতেন তোমার স্বামী?

বালবাচ্চাদের ইস্কুলে মাস্টার ছিল।

কি অসুখে মারা গেলেন?

ওর কোন অসুখ ছিল না ডাক্তারসাব।

তবে?

একটা দুষ্টু ছেলেকে খাদে পড়ার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে যায়। তারপর খাদ থেকে তুলে ওর দেহখানাকে যখন ঘরে আনা হল তখন পাঠশালা ভেঙে ছেলের পাল ছুটে এল। মানুষটার জন্যে বাচ্চাগুলোর সে কি কান্না বাবুজী!

একটু থেমে মেয়েটি আবার বলল, একটা মানুষকে ভালবেসে দুধের বাচ্চাগুলো যদি এমন করে কাঁদতে পারে তাহলে আমি তার স্ত্রী হয়ে সারাটা জীবন তার জন্যে একটু ভালবাসার কান্না কাঁদতে পারব না? আর জীবন কতটুকু কাল বাবুজী, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে।

মেয়েটির কাছে হার মেনে নিয়ে বললাম, তোমার স্বামীর স্মৃতি তোমার মনে উজ্জ্বল হয়ে থাক, এই কামনা করি।

সূর্যাস্ত হয়ে সন্ধ্যা নেমেছিল। বললাম, যাবে কি করে?

ও বলল, ফিরে দেখুন, চাঁদ উঠেছে।

আমি পুব দিকে ফিরে দেখলাম, বড়সড় চাঁদটা সিডার বনের মাথা ছাড়িয়ে নীল আকাশের দিকে যাত্রা শুরু করেছে।

আজও তেমনি জ্যোৎস্নায় রহস্যময় মানালীর উপত্যকা। ওপরের গম পেষাই-এর ঘরখানা ছায়া ছায়া আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ মেয়েটির সঙ্গে আর দেখা হয়নি। ও কি এখনও ওর স্বামীর স্মৃতিটুকু বুকে আগলে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। জানতে ভারী ইচ্ছে করে।

পরক্ষণেই মনে এল, কেন মনে এল জানি না, আমি যখন থাকব না তখন আমার ঝিন্নি কি আমার জন্যে এমন করে ভাববে।

চারদিন পরে জুলিয়েন আমার কোয়ার্টারে হাজির। ঝিন্নির খান তিনেক ছবি ও ওপরের ঘরে তুলে নিয়ে এসে যত্ন করে রেখে দিল। আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখে গেলেও কোন কথা উৎসুক হয়ে জানতে চাইলাম না। কারণ জুলিয়েনের মেজাজ মর্জির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। ও নিজের থেকে কোন কিছু বলতে শুরু করলে তবেই কথাবার্তা চালান যায়।

ছবিগুলো যথাস্থানে রেখে দিয়ে আমার ইজিচেয়ারখানায় গা এলিয়ে বসে ও একটা সিগারেট বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও, বস।

আমরা দুজনে সিগারেট ধরিয়ে পাশাপাশি বসলাম।

দু'একটা টান মেরে ও বলল, এই তিনটে ছাড়া ঝিন্নির সব কটা ছবিই বিক্রি হয়ে গেছে। না, না, ভুল বললাম, একখানা ছবি ঝিন্নি মিসেস সাকসেনাকে প্রেজেন্ট করেছে।

খুব ভাল, কিন্তু তোমাদের সেই উপহারদাতা শিল্পীটি কোথায়, তাকে তো দেখছি না।

জুলিয়েন বুক পকেট থেকে খামে বন্দী একখানা চিঠি টেনে বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

বললাম, খুব জরুরী? এখুনি পড়তে হবে?

পড়ই না।

আমি চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলাম।

ঝিন্নি লিখেছে—আমার অনেক অনেক আদরের ছোটেসাহেব।

তুমি দিল্লী থেকে চলে যাবার পর আমার খুব খারাপ লেগেছিল। আমি জানি, তুমি কতকগুলি অসহায় মানুষকে ফেলে রেখে এসেছ, তোমাকে বেশিদিন আটকে রাখা চলে না।

ইতিমধ্যে ছবিগুলো দারুণভাবে প্রশংসা পেয়েছে কাগজে কাগজে। শেষের দুদিন দর্শকদের ভীড় ঠেকান দায় ছিল। ভাগ্যিস জুলিয়েন সাহেব এসে পড়েছিলেন, তাই রক্ষে। ইতিমধ্যে বেশ দামেই বলব, ছবিগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। মিসেস সাকসেনার একটা ছবি খুব চোখে লেগেছিল, সেটা ওঁকেই প্রেজেন্ট করেছি। ওঁরা আমার জন্যে যা করেছেন তার ঋণ শোধ করা যায় না।

আজ একটা বিশেষ দাবী জানিয়ে তোমার কাছে এ চিঠি লিখছি। জানি না তুমি আমাকে কতদূর খেয়ালী ভাববে। মিসেস সাকসেনার ভাই গভর্ণমেন্টের পর্যটন বিভাগের উঁচু পদে কাজ করেন। তিনি মিসেস সাকসেনাকে নিয়ে কাশ্মীরে যাচ্ছেন। আমাকে ওঁরা নিয়ে যেতে চান। কাশ্মীরের ওপর যদি আমি এমন ধরণের কিছু কাজ করতে পারি তাহলে ওঁরা পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে এমনি আর একটা প্রদর্শনী অবশ্যই করবেন। সেটা পরে দিল্লী অথবা কাশ্মীর, যে কোন জায়গাতেই হতে পারে।

মিসেস সাকসেনার ভাই খুব নামকরা ফটোগ্রাফার। ওঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আমি স্কেচ নেব, সঙ্গে সঙ্গে উনি কালার ফটোও নেবেন, পরে বড় করে ছবি আঁকার বেলায় আমার একটুও অসুবিধে হবে না।

এখন সব কিছু নির্ভর করছে তোমার অনুমতির ওপর। তুমি কুলু ফিরে যেতে বললে আমি তাই যাব। মনে কর না তাতে আমি দুঃখ পাব। তবে এত বড় একটা সুযোগ এসেছে বলেই তোমাকে সব কথা জানালাম। তুমি একখানা টেলিগ্রামে শুধু ইয়েস অর নো, লিখে জানাও।

কাশ্মীর গেলে প্রায় তিন সপ্তাহ লেগে যাবে ফিরতে। টেলিগ্রামের প্রতীক্ষায় রইলাম।

—তোমার ঝিন্নি।

পুনশ্চঃ আমার তৈরি করা চার্ট অনুযায়ী ভাগ্তুর কাছে থেকে খাবার নিয়ে খাচ্ছ তো? আমি কাছে নেই বলে দুষ্টুমি কর না লক্ষ্মীটি।

চিঠিখানা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকটা যেন খালি হয়ে গেল। বিয়ের পর এ কটা বছর আমরা প্রায় কাছাকাছিই থেকেছি। দু'ঘণ্টার দূরত্ব এমন কিছু ছিল না আমাদের কাছে। হঠাৎ করে আমি নাগ্গরে চলে গিয়ে ওকে অবাক করে দিতাম অথবা ও এসে আমাকে। এটা যেন আমাদের লুকোচুরি খেলার মত ছিল। কাছে পিঠে লুকিয়ে আছি, হঠাৎ এসে বুড়ি ছুঁয়ে দেব। কিন্তু কাশ্মীর যে অনেকখানি দূর। হঠাৎ একটা ঝড়ো হাওয়ায় মন কেমন করে উঠলে তো ওকে কাছে পাব না। তাছাড়া কতটুকু পরিচয় মিঃ সাকসেনাদের ফ্যামিলির সঙ্গে। এর ভেতর ঝিন্নির এতখানি ঘনিষ্ঠতা কি খুব শোভন হচ্ছে?

হয়ত ঝিন্নি জীবনে এই প্রথম একটা নামের স্বাদ পেয়েছে। যাঁরা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ওর অন্তর ভরে আছে। তাই হয়ত আহ্বানটা কোনরকমে উপেক্ষা করতে পারছে না। অথবা নামের ওপর একটা মোহের টানে ঝিন্নি খাল থেকে নদী, নদী থেকে সাগরে ভেসে যেতে চাইছে।

কথাগুলো ভাবতে গিয়ে আমার মাথাটা যেন গুলিয়ে উঠল। এবার আমি আর কিছু না ভেবে চুপচাপ বসে রইলাম।

কিছু পরে জুলিয়েনের দিকে চেয়ে দেখলাম, ও নিশ্চিন্তে ওপরের দিকে তাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

বললাম, ছবিগুলো আনতে পথে কোন ট্রাবলে পড়নি তো?

জুলিয়েন তেমনি শূন্যের দিকে চেয়ে বলল, না। কিন্তু তোমার উত্তরটা কি হবে, ইয়েস্ অর নো?

তুমি হলে উত্তরটা কি হত?

জুলিয়েন এবার আমার দিকে ফিরল, বুঝতে পারছ না ডাক্তার, কেন মেয়েটা এমন করে নিজের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? কেন সে হঠাৎ ছবি আঁকার ব্যাপার নিয়ে এমন মেতে উঠল?

আমি জানি জুলিয়েন, কিন্তু যা সম্পূর্ণ আমাদের হাতের বাইরে তার জন্যে সারাক্ষণ হাহাকার করলে কি সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে? আমি সবরকম ডাক্তারী পরীক্ষার পর বুঝেছি, সন্তানের পিতামাতা না হবার কোন বিশেষ কারণই আমাদের ভেতর নেই। তবে প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর কি করণীয় আছে বল?

জুলিয়েন বলল, ঝিন্নি কাশ্মীর ট্যুরে যাওয়া সম্বন্ধে আমার অভিমত জানতে চেয়েছিল।

তুমি নিশ্চয়ই মত দিয়ে এসেছ।

আজকাল ডাক্তারী ছেড়ে ভূত ভবিষ্যৎ গণনার কারবার শুরু করেছ মনে হচ্ছে।

আমার অনুমানের একটিমাত্র কারণ ছিল জুলিয়েন, তা হল তোমার চিরকেলে ভ্রাম্যমান স্বভাব।

তোমার অনুমান ভুল। আমি ওকে শুধু বললাম, এ বিষয়ে ডাক্তারের অনুমতি চূড়ান্ত হোক। ঝিন্নি সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে লেখা ওর চিঠিখানা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে, আমি এ চিঠিতে ওর মতামতই জানতে চেয়েছি। ও শুধু আমাকে টেলিগ্রাম করে জানাবে, ইয়েস অর নো।

বললাম, কফি না চা খাবে?

কফি।

বললাম, আজকাল পাহাড়ের মাথাগুলো কেমন অস্বচ্ছ আবরণে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

ওটা তো গ্রীষ্মের ধর্ম ডাক্তার।

আমি ভাগ্‌তুকে দু'কাপ কফি পাঠিয়ে দিতে বললাম।

এবার মে-তে কিন্তু বেশ গরম পড়েছে জুলিয়েন।

দারুণ। আমি তো একখানা শার্ট পরে সারাদিনটা কাটিয়ে দিচ্ছি। মাঝে মাঝে ভ্যালিতে হাওয়ার ঝলক দেয় তাই রক্ষে, নইলে দস্তুরমত ঘামতে হত।

বললাম, এখন সবচেয়ে আরামে রয়েছে কারা বল তো?

দেখলাম, অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সব কিছু ভেবে নিতে পারে জুলিয়েন।

খানিক সময় থেমে ও বলল, আরামে থাকার কথা যদি বল তাহলে গাদ্দীরা। এখন ওরা বার্চ, পপলার, রোডোডেনড্রনের সীমা রেখা ছাড়িয়ে স্নো লাইনে ঢুকেছে। বার হাজার ফিট ক্রস করে গেছে।

জুলিয়েন আর একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল। ও আমাকে আর অফার করল না। ও জানে আমি একসঙ্গে বেশি সিগারেট খাই না।

আমি ঝিন্নির প্রসঙ্গটাকে একটুখানি চাপা দিতে চেয়েছিলাম। একান্তে ভাবনার একটা সুযোগ আমার দরকার ছিল। তাই কথান্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম জুলিয়েনকে। একটা গুণ আছে জুলিয়েনের, সে নিজের থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বেশি কথা জানতে চায় না। তার অকারণ কোন কৌতূহল নেই।

কফি দিয়ে গেল রান্নার মেয়েটি। আমরা কফি খেলাম। জুলিয়েন হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, যাচ্ছি ডাক্তার। মায়ের সঙ্গে এখনও দেখা করে উঠতে পারি নি।

কি ব্যাপার, তোমার মা বড়িতে নেই?

এতক্ষণে হয়তো এসে গেছে। কুলুতে 'লী' সাহেবের বাংলোতে গিয়েছিল।

জুলিয়েন হেসে হাত তুলে বেরিয়ে গেল। আমি ঘরের ভেতর চুপচাপ বসে রইলাম।

ঝিন্নি বাইরে যেতে চাইছে। সে আমার অনুমতি চেয়েছে। সে কি জানে না, আমি তাকে

কখনো কোন কাজে বাধা দিইনি, আজও দেব না। তবু চেয়েছে আমার মত, এটা তার নিশ্চিত কর্তব্য বলে মনে করেছে, এতেই আমার সান্ত্বনা।

ঝিন্নির স্টুডিওর দিকে চোখ পড়ল। পাইনগাছের তলায় ইতিমধ্যে ভাগ্‌তু গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি জানি ও নীচে নিশ্চয় জুলিয়েনের জন্যে অপেক্ষা করেছিল। ঝিন্নি কেন ফেরে নি, জুলিয়েনের কাছ থেকে সেটা জানবার জন্যে তার ভেতর একটা অদম্য কৌতূহল আসা স্বাভাবিক। ভাগ্‌তু ঝিন্নিকে ছাড়া তার অবস্থিতির কথা ভাবতেই পারে না। তাই তাকে কিছুটা বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। ও চলে গেছে ঝিন্নির স্টুডিওতে। তাকিয়ে আছে উত্তরে তুষার পর্বতের দিকে।

কি ভাবছে ভাগ্‌তু। ঝিন্নির না আসার জন্যে নিশ্চয় গভীর একটা অভিমানে তার কিশোর মনটা ভরে উঠেছে। ও এখুনি হয়তো ভাবছে, ঝিন্নি যদি তাদের ফেলে কাশ্মীরে চলে যেতে পারে তাহলে সেও তার মা বাবা এবার শীতে ভ্যালিতে এলে তাদের সঙ্গে অনেক ওপরের পাহাড়ে উঠে চলে যাবে। যদি তার খোঁড়া পা নিয়ে উঠতে মর্মান্তিক কষ্টও হয় তবুও সে থাকবে না ঝিন্নি আর ডাক্তারসাবের কোঠীতে।

ভাগ্‌তুর চোখে হয়তো একটা ছবি ফুটে উঠেছে, তার মা বাবা আরও অনেক জাতভাই গাদ্দীদের সঙ্গে মিলেমিশে চলেছে হাজার হাজার ভেড়ার পাল নিয়ে। ভেড়াগুলো নীচের পাহাড়ে চরতে চরতে ক্রমে ওপরে উঠছে। তারা রোডোডেনড্রন গাছের তলা দিয়ে চলেছে। শেষ গ্রীষ্মে আগুন লেগেছে রোডোডেনড্রনের বনে। ডালে ডালে টকটকে লাল ফুলের সে কি সমারোহ!

ভেড়ার পাল ধীরে ধীরে বনরেখা ছাড়িয়ে গেল। তারা এখন চলেছে স্নো লাইন ধরে। গাছপালার চিহ্নহীন তুষার রাজ্য। শ্বেতবর্ণের মেষপাল ঠিক যেন তরঙ্গিত এক তুষার নদী। তারা চলেছে রোটাং গিরিপাশ পেরিয়ে লাহুল, স্পিতি অভিমুখে। ক্রমে তারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

ভাগ্‌তু তার বালককালে এসব ছবি দেখেছে। সে কাংড়া থেকে কুলুতে এসেছে ভুবুজোত পেরিয়ে। গাদ্দীদের মেষ নিয়ে আসার সোজাসুজি পাহাড়ী পথ এই ভুবুজোত। তারপর শীতের সময় কুলু উপত্যকার 'ব্যান' অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ওরা ধীরে ধীরে উঠেছে ওপরে। যত শীত কমবে তত উঠবে তারা ওপরে। তারপর একেবারে স্নো-লাইন ধরে দূরে বহূ দূরে, যাত্রা। এ স্মৃতি কি ভোলার। খোঁড়া ভাগ্‌তুর এসব কথা ভাবতে ভাবতে নিশ্চয়ই চোখ দুটো জলে ভরে আসছে।

পরের দিন আমার কনসেন্ট জানিয়ে ঝিন্নির কাছে টেলিগ্রাম পাঠালাম।

সাতদিন পর ঝিন্নির কাছ থেকে পিকচার পোস্টকার্ড এল। ঝিন্নি নিজের হাতে ছবি এঁকে পাঠিয়েছে। কাশ্মীরে ডাল লেকের ওপর দিয়ে নৌকোতে ফুল নিয়ে চলেছে ফুলওয়ালী।

নীচে দুষ্টুমি করে লিখেছে, 'তোমার জন্যে'।

এখন ফুলওয়ালী ফুলগুলো আনছে আমার জন্যে, না ফুলওয়ালীকেই নির্বাচন করেছে ঝিন্নি আমার জন্যে, ঠিক বোঝা গেল না।

আবার এমনও হতে পারে ওসবের কোন কিছুই সে ভেবে লেখেনি। শুধু ছবিখানা এঁকে আমাকে উপহার পাঠিয়ে লিখে দিয়েছে, 'তোমার জন্যে'।

ছোট্ট একটা চিঠিও লিখেছে ঝিন্নি।

আমার ছোটেসাহেব,

কী ভীষণ কান্না পাচ্ছে তোমাকে কি বোঝাব। আমি যখনই সুন্দর কিছু একটা দেখছি তখনই তুমি পাশে নেই ভেবে কান্না পাচ্ছে। মনে হচ্ছে, কেন আমি একা এলাম। তোমার সঙ্গে কিছুকাল পরে এলেই তো পারতাম। একটা খেয়ালের বশে চলে এসে না পারছি পুরোপুরি ভোগ করতে, না পারছি চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকতে।

এঁরা চমৎকার মানুষ। ট্যুরিস্ট হাউসেই আমাদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। মিসেস সাকসেনা এখানে এসে কবি হয়ে গেছেন। হাফেজ, সাদি, ওমরখৈয়ামের কবিতা থেকে অনর্গল আবৃত্তি করে চলেছেন। কখনো বা উর্দূ সায়ের থেকে লাগসই উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। ওঁর অফিসার ভ্রাতা আমার জন্যে কয়েক ডজন রঙীন ছবি তুলেছেন।

তোমার আদরের ঝিন্নি

চিঠিটা পেয়ে কয়েকদিনের বিষণ্ণ মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। ঝিন্নি আমার জন্যে চোখের জল ফেলেছে, একথাটুকু পড়ার পরই আমার এতদিনের রুদ্ধ অভিমান বিপাশার স্রোতে ভেসে চলে গেল। মনে মনে ওকে প্রবোধ দিয়ে বলতে লাগলাম, তুমি কেন অধীর হয়ে পড়লে ঝিন্নি? এসময় মাথা ঠাণ্ডা, মন প্রসন্ন না রাখলে কি তোমার ছবি আঁকার কাজ সুন্দর করে সম্পন্ন করতে পারবে? যে কাজে গেছ, সেটা নিয়েই তোমার মেতে থাকা উচিত।

ওকে সঙ্গে সঙ্গে একখানা চিঠি লিখে দুপুরের ডাকে পোস্ট করে দিয়ে এলাম। এখন নিজেকে বেশ একজন উদারচেতা পুরুষ বলে ভাবতে ভাল লাগছে।

ভাগ্‌তু বেচারা ক'দিন দারুণ রকম মনমরা হয়েছিল। ওকে কাছে ডাকলাম। ছবিখানা দেখিয়ে ঝিন্নির খবর দিলাম। ও যে এখানে ফিরে আসার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে এ-কথা জানাতেই ওর চোখদুটো ছলছলিয়ে উঠল। আমি ইচ্ছে করেই ওকে তুষ্ট করার জন্যে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিলাম।

এরপর আরও দু'তিনখানা কার্ড ঝিন্নির কাছ থেকে এসে পড়ল।

শেষ চিঠিতে কিন্তু ওর ফেরার খবর আমাকে যতখানি আশ্বস্ত করল, তার চেয়ে অনেক বেশি দমে গেলাম আর একটি খবর পেয়ে।

ও লিখেছে, ফেদ্রিক নামের একজন অসাধারণ শিল্পীর সঙ্গে নাগিন লেকে পরিচয় হল। ফ্রান্স থেকে এসেছেন। আর্ট কলেজের তরুণ অধ্যাপক। তিনি একটি পপলার গাছের তলায় ছোট্ট সুন্দর হাউসবোট ভাড়া করে আছেন।

আরও লিখেছে, ভোরবেলা নাস্তা খেয়ে আমি একটি শিকারাতে বেরিয়ে পড়ি। নাগিন লেকের ঐ হাউসবোটে যেতে আমার মিনিট পনের সময় লাগে। ফেদ্রিক তৈরি হয়ে

থাকেন। আমরা শিকারা নিয়ে জল কেটে কেটে চলে যাই বিভিন্ন আঁকার স্পটে। আমরা যখন হ্রদের ওপর দিয়ে যাই তখন কাশ্মীরের আশ্চর্য সব পদ্ম হাত দিয়ে ছুঁতে ছুঁতে চলি। লাঞ্চের আগে পর্যন্ত আমাদের একটানা ছবি আঁকা চলে। ওঁর সঙ্গে দেখা না হলে ছবির জগৎ সম্বন্ধে আমার অনেক কিছুই অজানা থেকে যেত।

আর কিছু লেখেনি ঝিন্নি শিল্পী ফেড্রিক সম্বন্ধে, কিন্তু ঐটুকুতেই আমি রাতের ঘুম হারালাম।

একটি তরুণ অধ্যাপক এবং এক তরুণী শিল্পীর সান্নিধ্য যে কোন মুহূর্তে শিল্পের জগৎ থেকে অন্তরঙ্গতার জগতে প্রবেশ করতে পারে।

একটা যন্ত্রণা সারা বুকে মোচড় তুলে আমাকে অসহায় করে ফেলল। মনকে কি বলে বোঝাব তা ভেবে পেলাম না। সারারাত কখনো ঘরে পায়চারি করছি, কখনো বা ইজিচেয়ারে বসছি, আবার কখনো বিছানায় পড়ে চেষ্টা করছি ঘুমোবার। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মাথাটা এমন তপ্ত হয়ে উঠছে যে বেসিনের একেবারে ঠাণ্ডা জল মাঝরাতে মাথায় ঢেলেও তাকে শান্ত করতে পারলাম না।

একটা কিছু ঘুমের ওষুধের সন্ধানে নীচে নেমে গেলাম। হাতে নিয়ে কাচের গ্লাসে জল গড়ালাম। কিন্তু মুখে তুলতে গিয়েও পারলাম না। হয়ত আমি ওটা খেলে গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে যাব, সাময়িকভাবে ভুলে যাব আমার মানসিক যন্ত্রণা, তবু শেষ মুহূর্তে খেতে চাইল না আমার মন। যত কষ্টই হোক ঝিন্নিকে আমার চোখের সামনে আমি সারাক্ষণ রেখে দিতে চাইলাম।

ভোরবেলা ভাগ্তু এসে জানাল, একটি লোক আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

নীচে নামলাম। ভ্যালির ওপারের টিকা থেকে একটি লোক এসেছে। সে আমাকে জানাল, একটি মেয়ের ভারী অসুখ, আমাকে দেখতে যেতে হবে। মেয়েটি নাকি আমার নাম করেছে।

বললাম, আমাকে চিনল কি করে?

লোকটি বলল, ঠিক জানিনা বাবুজী, সারাদিন তো ও গম কল চালায়, কোথাও যাওয়া আসা করে না, মনে হয় কারো কাছে শুনে থাকবে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম। হাত দেখিয়ে বললাম, ঐ ভ্যালির ওপারের পাহাড়ে যে মেয়েটি গম কল চালায়?

হাঁ, ডাক্তার সাব।

আমি আর কোন কথা জানতে চাইলাম না। ব্যাগটা লোকটির হাতে ধরিয়ে দিয়ে টাট্টুতে চেপে বসলাম।

ওপারের পাহাড়ে যখন ওদের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম তখন প্রায় আটটা বাজে। সাধারণ কাঠের তৈরি বাড়ি যেমন হয় ঠিক তেমনি।

ঢুকেই দেখলাম, মা বসে আছে মেয়েটির মাথার পাশে।

আমাকে তার সামনে দাঁড়াতে দেখে মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল। ক্লান্ত মুখে সামান্য একটু হাসির উদ্ভাস।

আমি পরীক্ষা করলাম। নিউমোনিয়ার কেস। হাই টেম্পারেচার আছে।

বললাম, ভয় নেই, ভাল হয়ে যাবে।

আবার মেয়েটি আমার দিকে চেয়ে একটু বিষণ্ণ হাসি হাসল।

বললাম, এখুনি একজনকে পাঠাতে হবে আমার সঙ্গে। আমি ডিসপেনসারী থেকে ওষুধ দিয়ে দেব। আর আমার কম্পাউণ্ডার এসে ইঞ্জেকশান দিয়ে যাবে।

বাইরে বেরিয়ে আসছি, মেয়েটির মা উঠে এলেন। আঁচল থেকে কয়েকটা টাকা বের করে আমার হাতে দিতে আসতেই আমি বললাম, আপনার মেয়ে গমকলের প্রতিষ্ঠার দিনে আমাকে ব্রাহ্মণ পেয়ে অনেককিছু খাইয়েছে। আমি ঋণী হয়ে আছি। এখন ঋণ শোধের সুযোগ এসে গেছে। আমাকে টাকা দিয়ে আর ঋণী করে রাখবেন না।

একটুখানি থেমে হেসে বললাম, ভাল হয়ে যখন আপনার মেয়ে আবার কল চালাবে, তখন না হয় দু'চারবার বিনি পয়সায় আমার গম ভাঙিয়ে দেবে।

চলে আসব হঠাৎ নজরে পড়ল, ওদের কোঠির পাশ দিয়ে একটা কুহল ছুটে চলেছে। আর ঠিক কুহলটার ধারেই ফুটে উঠেছে নীল রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ ফরগেট-মি-নট ফুল। বড় বড় পাতার ফাঁকে ছোট ছোট ফুল। অযত্নে বেড়ে ওঠা ফুলগুলো যেন বার বার পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছে, ফরগেট-মি-নট।

আমি সারা পথ গমকলের সেই মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে এলাম।

ঝিন্নি ফিরে আসার পর মিসেস সাকসেনার চিঠি এল। প্রীতির ছোঁয়া সে চিঠির সর্বাঙ্গে। লিখেছেন, ঝিন্নির মত সুন্দর মিষ্টি একটি মেয়ে তাঁর থাকলে তিনি জীবনে খুবই সুখী হতেন। তা যখন বিধাতা দেননি তখন ঝিন্নিকেই নিজের মেয়ে বলে ভেবে নিতে ক্ষতি কি।

একগোছা কাশ্মীরের রঙীন ছবি এসেছে মিঃ সাকসেনার শালার কাছ থেকে। ঝিন্নি বার বার ছবিগুলো দেখছে আর তার নিজের কম্পোজ করা ছবিগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে।

চিঠি এল ফ্রান্সের আর্ট কলেজের অধ্যাপক ফেদ্রিকের কাছ থেকে। আমার হাতেই চিঠিখানা এসে পড়েছিল। এয়ারমেলের একপাশে ফেদ্রিকের নাম লেখা। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠিখানা পাঠিয়ে দিলাম স্টুডিওতে ঝিন্নির কাছে।

কয়েকদিন পার হয়ে গেল, ঝিন্নি কিন্তু আমাকে ফেদ্রিকের চিঠিখানা পড়াল না, কিংবা সে কি লিখেছে তারও কোন উল্লেখ করল না। হয়ত অনাবশ্যক বলে দেখানোর দরকার মনে করেনি ঝিন্নি।

ইদানিং আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, আমি ঝিন্নির কাছ থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছি। আমাদের ভেতর প্রায় দুজনেরই অজ্ঞাতে একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে। আমি ডাক্তার, ও শিল্পী। দুজনের চিন্তা, বৃত্তি, কর্মক্ষেত্র, সবই আলাদা। কিন্তু এই ব্যবধানটা মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিতেই কেবলমাত্র ধরা পড়ে। দৈনন্দিন জীবনের কোন আচার আচরণ কিংবা ব্যবহারে নয়। আমরা যেন আমাদের পারস্পরিক আচরণের ক্ষেত্রে বেশি সচেতন হয়ে উঠেছি। আগের স্বাভাবিক আচরণগুলো যেন ভুলতে বসেছি।

এবার প্রবল বর্ষণ শুরু হল জুলাই-এর প্রায় গোড়া থেকেই। সমস্ত দৃশ্যপটটাই একেবারে বদলে গেল। যেসব স্রোতধারা বিপাশাতে এসে পড়েছে সেগুলো জলসম্ভারে স্ফীত হয়ে বিপাশাকে উন্মাদিনী করে তুলল। বন্যায় ভেঙে গেল পথঘাট, ভেসে গেল ছোট ছোট কাঠের সেতু। ধ্বস নামল পাহাড়ে। বহু স্থানে চলাচলের পথ প্রায় অবরুদ্ধ।

মেঘের ডাক, বিদ্যুতের ঝিলিক, বর্ষার হাওয়াই নৃত্য, সব মিলিয়ে দস্তুর মত সমারোহপূর্ণ এক অভিযান। কুলু উপত্যকা জুলাই আগস্টে যথার্থই এক রণক্ষেত্র।

এর মাঝে অক্লান্ত পরিশ্রমে ডুবে থাকতে হয় আমাকে। শুধু ডিসপেনসারীতে বসেই ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা নয়, দূরে দূরেও ধ্বসনামা পাহাড়ী পথের ওপর দিয়ে টাট্টুতে চড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হয়। আমার যে ব্রত তাতে নিজের বিপদের চেয়ে অন্যের বিপদকেই বড় করে দেখার অলিখিত প্রতিশ্রুতি আমাকে দিতে হয়েছে।

এর ভেতর ছোট্ট একটি ঘটনা ঘটল। সেই ছোট্ট ঘটনাটুকু অসামান্য হয়ে দেখা দিল আমার আর ঝিন্নির জীবনে। কুলুর বর্ষাঋতুর দিকজোড়া ভাঙন যেন শুরু হয়ে গেল আমাদের দুজনের সংসারে।

সেদিন সন্ধ্যার একটু আগে আমার দোতলার শোবার ঘরের জানালা খুলে আমি তাকিয়েছিলাম ভ্যালির দিকে। ঠিক ভ্যালি নয়, দিগন্তের দিকে। আকাশ জুড়ে বর্ষা-মেঘের বিপুল আয়োজন থাকলেও দিগন্তের একটি কোণায় শেষ সূর্যের রঙের আশ্চর্য খেলা চলছিল। বর্ষাধৌত অরণ্য, আকাশের কাল মেঘ, পীরপাঞ্জালের তুষার-শিখর স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়েছিল সেই সূর্যাস্তের দিকে। প্রকৃতির সমস্ত উদ্দাম উন্মাদনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল কয়েক মুহূর্তের জন্য।

আমি ওদিক থেকে পলকের জন্য চোখ ফিরিয়ে তাকালাম ঝিন্নির স্টুডিওর দিকে। ওকে দেখা গেল না বাইরে। হয়ত ঝিন্নিও ভেতরে বসে এই অসাধারণ মুহূর্তটিকে লক্ষ্য করছে। সত্যি, যে কোন শিল্পীর কাছে এই মুহূর্তের দিগন্তচিত্রটি স্মরণীয় হয়ে থাকবার মত।

পেছন থেকে আমার কাঁধে দুটি হাত রেখে থুত্নিটা মাথায় ঠেকিয়ে দাঁড়াল ঝিন্নি। অনেকদিন পরে ওর সেই স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতার উত্তাপ আমাকে স্পর্শ করল। ওর নিশ্বাসের শব্দ আমার কানে এসে পৌঁছচ্ছিল। আমার কাঁধের ওপর পড়ে থাকা ওর চুলগুলো সারা দেহে এক ধরণের শিহরণ সৃষ্টি করছিল।

আমি আমার দুটো হাত তুলে ওর হাতের আঙুলগুলো ধরে বললাম, এখুনি বড় বেশি করে তোমার কথা মনে হচ্ছিল ঝিন্নি। দেখেছ দিগন্তের ঐ সূর্যাস্ত?

দেখেছি।

ঝিন্নির এই 'দেখেছি' শব্দটা এমন নিরুত্তাপ সাধারণ এক কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল যে আমি মনে মনে আহত হলাম। ঝিন্নি তার শিল্পীর চোখ দিয়ে হয়ত এত বেশি দেখেছে যে, এই সূর্যাস্ত তার দৃষ্টির কাছে অনন্য কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নয়। তা হোক, তবু দুটি হৃদয়ের অনুভূতির যদি মিলন ঘটে তাহলে অনেক অকিঞ্চিৎকরও যে পরম অভাবনীয়ের মূল্য পায়।

ঝিন্নি এবার আমার মাথা থেকে ওর মুখখানা তুলে নিল। তারপর আমার হাত ধরে তার দিকে আকর্ষণ করে বলল, ছোটেসাহেব, তুমি আমার দিকে ফিরে দেখবে না?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে ঝিন্নির দিকে ফিরে ওকে বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরলাম। অনেক দিনের অশান্ত বুভুক্ষু মন ওকে একান্ত কাছে পেয়ে কিছুটা শান্ত হল।

সেই মুহূর্তে সূর্যাস্তের খেলা শেষ হয়ে নামল অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকাকে বর্ষার শরে বিদ্ধ করে শুরু হল তাল তাল মেঘের রণযাত্রা। যুদ্ধের দামামা উপত্যকার চারদিকের পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। বিদ্যুতের কষাঘাতে রাতের অন্ধকার ফেঁড়ে চৌচির হয়ে গেল।

কাচের শার্সিটা বন্ধ করে দিয়ে এল ঝিন্নি। অনেকদিন পরে একই শয্যায় ওকে বুকের মাঝে নিয়ে শার্সির ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের আলোয় উপত্যকা, পাহাড় আর বনবনান্ত জুড়ে প্রকৃতির উন্মাদ রূপ দেখতে লাগলাম। অঝোরে বর্ষার ধারা কখন আমাদের রক্তের মাঝেও প্লাবন এনে দিল। আমি ঝিন্নিকে সোহাগে আদরে বুকের মাঝে ভরে নিয়ে পূর্ণ করে দিলাম। ডিনারের টেবিলের ডাক না আসা পর্যন্ত আমরা বিছানায় শুয়ে টুকরো টুকরো কথার এমব্রয়ডারি বুনে চললাম।

খাওয়া শেষ করে এলাম শোবার ঘরে। আমার সঙ্গে আজ ঝিন্নিও এল। আজকাল বড় একটা ও আসে না। ছবির এগজিবিশান অক্টোবরে হবার কথা, তাই স্টুডিওতেই ও প্রায় সারাক্ষণ থাকে। অনেক রাত অব্দি ছবি এঁকে ওখানেই শুয়ে পড়ে। ভাগ্তু ওখানকার পাহারাদার।

ঝিন্নি এসে বসল কুশন মোড়া চেয়ারে, আমি ঠিক তার পাশেই বিছানায় বসলাম।

ঝিন্নি এবার কোন ভূমিকা না করেই বলল, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে ছোটেসাহেব।

কি বিষয়ে ঝিন্নি?

বলছি—বলে ওর ব্যাগ থেকে এক তাড়া চিঠি বের করল। সবকটিই ছোট্ট ফাইলে সাজানো।

চিঠিগুলো হাতে রেখে বলল, এগুলো পড়ানোর আগে ছোট্ট করে বিষয়টা একটু বলে নিই, তোমার বোঝার পক্ষে সুবিধে হবে।

আমি ঝিন্নির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কি বলবে ঝিন্নি? হাতের কাগজগুলোই বা কিসের?

ঝিন্নি বলল, আমি আমার প্রফেসার শর্মার পরামর্শে আর মিঃ সাকসেনার সহযোগিতায় একটা ফরেন স্কলারশিপের জন্যে চেষ্টা করছিলাম। সেটা আমার হাতে এসে গেছে। বিদেশে যাবার খুঁটিনাটি সব ব্যবস্থাই ওঁরা আমার জন্যে করে দিচ্ছেন। অক্টোবরে কাশ্মীরের ওপর এগজিবিশানটা শেষ করেই ডিসেম্বরে যাতে আমি বেরিয়ে পড়তে পারি সেই ব্যবস্থাই ওঁরা করছেন। আমি ফ্রান্সেই যাব, কারণ ফ্রান্সই এখন শিল্পীকুলের পীঠস্থান।

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, তোমার আঁকার কাজ নিশ্চয় মিঃ ফেড্রিকের অধীনেই চলবে?

ঝিন্নি যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, আশ্চর্য, একেবারে সত্য অনুমান করেছ তুমি। এই দেখ সব করেসপন্ডেন্স। তোমাকে সারপ্রাইজ দেব বলে কিছু বলিনি।

সত্যি এমন সারপ্রাইজ আমার জীবনে এই আমি প্রথম পেলাম। মুখে ঝিন্নিকে কিছু বললাম না।

ঝিন্নি সাগ্রহে কাগজগুলো আমার দিকে এগিয়ে ধরতে অত্যন্ত শান্ত গলায় আমি বললাম, তুমি তো মুখেই সব বললে, ওগুলো দেখার আর কি দরকার।

বেশ বুঝলাম, ঝিন্নি সঙ্কুচিত হয়ে ওর হাতখানা সরিয়ে নিল। একটা পাতলা ছায়া ঘনিয়ে উঠতে দেখলাম ওর মুখের ওপর।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে ও একসময় আমাব চোখে চোখ ফেলে বলল, তোমাকে কোন কিছু আগেভাগে বলিনি বলে কি তুমি রাগ করলে?

বললাম, দেখ ঝিন্নি, আমি শিল্পী নই, তোমার ঐ জগৎ সম্বন্ধেও আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই, আমার পরিচিতিও তোমার মত এতখানি ব্যাপ্ত নয়, তাই বলছিলাম, এসব ব্যাপারে তোমরা যা ভাল বোঝ তাই কর!

ঝিন্নির মুখখানা মনে হল ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ছোটেসাহেব, আমি কি এতই বোকা যে তোমার মনের ভাবটুকু বুঝতে পারব না। আমার মনে কাল থেকেই এ সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছিল।

বললাম, উত্তেজিত হোয়োনা ঝিন্নি। স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝখানে একটা সুন্দর বোঝাপড়া থাকবে। সেখানে লুকোচুরি থাকবে কেন।

ঝিন্নি তখন রাগে ফুঁসছে, থাম, আমি সবই বুঝি। তুমি চাও না যে আমি আঁকি। আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসাটা তোমার ভান ছাড়া কিছু নয়। সেবার দিল্লী এগ্‌জিবিশান থেকে তুমি কাজের অছিলায় চলে এলে, এগুলো কারো চোখে পড়ে না? কুলুর এগ্‌জিবিশানে তুমি আমার আমন্ত্রিত অতিথিদের আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়েছিলে? বুকে হাত রেখে বল তো দেখি।

আবারও ঠাণ্ডা গলায় বললাম, উত্তেজিত হোয়ো না ঝিন্নি, শান্ত হও। আমাদের সম্পর্কটা এমন, যে কোন কঠিন জিনিসের সহজ একটা সমাধান করে ফেলতে পারি।

ঝিন্নি আরও ক্রুদ্ধ অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলল, বল কি দিয়েছ, কি দিয়েছ তুমি আমাকে? থাক, আর করুণায় কাজ নেই। আমার কাজ, আমার পথ আমি নিজেই ঠিক করে নিতে পারব।

উত্তেজিত ঝিন্নি ওর চিঠির ফাইলটা চেয়ারের ওপর ফেলে রেখেই চলে গেল।

আমি জানি এই প্রবল বৃষ্টিতে ও ওর স্টুডিওতেই ফিরে যাবে। পথ ভাসিয়ে এখন বৃষ্টির প্রবাহ চলেছে, এ অবস্থায় অন্ধকার পথে চলা খুবই বিপজ্জনক। কিন্তু এসময় ঝিন্নিকে বাধা দিতে যাবার অর্থই হল আরও বিপদের ভেতর ওকে ঠেলে দেওয়া।

আমি কোন কিছু উপায়ান্তর না পেয়ে স্তব্ধ হয়ে বিছানার ওপর বসে রইলাম।

মনে হল, ঝিন্নি কোনদিনই আমার দিকটা ভেবে দেখেনি। এই যে আমি কলকাতায় আমার বন্ধুবান্ধব, আমার স্নেহময়ী মাসীমাকে ফেলে রেখে এসেছি, এতগুলি বছরের

ভেতর একটিবারও যাইনি, সে কার টানে? নিশ্চয়ই বাবার ফলের বাগানের কতকগুলো টাকার লোভে নয়। যে মেয়েটিকে কুলুর বাগানে বেলা শেষের কোমল সোনালী আলো গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতিটুকুই তো আমাকে বেঁধে রেখে দিয়েছে এই পাহাড় ঘেরা উপত্যকায়। থাক, নিজের সুখ দুঃখের কথা ভেবে এখন আর কোন কাজ নেই। আজ ঝিন্নি আমাকে যথার্থই তার অভিযোগটা জানিয়ে গেছে, আমি কি দিয়েছি তাকে? সত্যিই তো তাকে আমি কিছু দিতে পারিনি। না দিতে পেরেছি তার শিল্পী মনের খোরাক, না পেরেছি তার কোলে এনে দিতে একটি সন্তান। যাকে নিয়ে সে করতে পারত তার মাতৃস্বর্গ রচনা।

অনেক মনোকষ্ট নিয়ে রাত কাটিয়েছি, কিন্তু ভোরে উঠে অবাক হয়ে শুনতে পেলাম, ঝিন্নি নীচে কার সঙ্গে যেন কথা বলছে।

আমি নীচে নেমে গিয়ে ওদের দেখতে পেলাম। ভাগ্‌তু আর ঝিন্নি।

আমাকে মুখোমুখি দেখতে পেয়ে ঝিন্নি বলল, আমি চাচাজীর কাছে কুলুতে যাচ্ছি। তোমার স্টুডিওর চাবি ভাগ্‌তুর কাছে রেখে গেলাম। গাড়ি এখুনি ছাড়বে, আমি চলে যাচ্ছি।

বললাম, তোমার দরকারী ফাইলটা কিন্তু ওপরে কাল ভুলে ফেলে গেছ। দাঁড়াও, এনে দিচ্ছি।

ঝিন্নি বলল, ওর আর কোন দরকার নেই। ওর কাজ ফুরিয়ে গেছে।

ভাগ্‌তুর দিকে ফিরে বলল, ওপরের চেয়ারে এক বাণ্ডিল কাগজ পড়ে আছে, ওটা ডাস্টবিনে ফেলে দিস।

হাতের কাছে রাখা কাপড়ের ব্যাগখানা তুলে নিয়ে ঝিন্নি তর তর করে নীচে নেমে গেল। আকাশ ভারাক্রান্ত হলেও বৃষ্টি নেই।

বাস কি করে মানালী থেকে কুলু যাবে আমি ভাবতেই পারছি না। পথঘাট অতি দুর্গম আর ভাঙা। ক'দিন তো পরিবহন ব্যবস্থা তচনচ হয়ে গিয়েছিল।

ঝিন্নির বেরিয়ে যাবার কিছু পরে বাস স্ট্যান্ডে গেলাম। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। বাস বন্ধ, ভাঙা পথ এখনও পুরোপুরি সারাই হয়নি। কিন্তু ঝিন্নি কোথাও নেই। দারুণ জেদী সে। ঐ দুর্গম চব্বিশ মাইল পথ সে পাহাড়ের বিপদসঙ্কুল ধ্বস পেরিয়ে, নদীনালা সাঁতরে যাবে, তবু ফিরবে না।

উদ্বেগে মনটা অস্থির হয়ে উঠল। আমি দ্রুত হেঁটে কোয়ার্টারে ফিরে এলাম। ওপরে উঠে যত্ন করে ওর চিঠির বাণ্ডিলটা ড্রয়ারে চাবি দিয়ে রেখে দিলাম। আলনা থেকে ওয়াটারপ্রুফখানা টেনে নিয়ে ভাগ্‌তুকে হাঁক দিয়ে বললাম, আমি কুলু যাচ্ছি। দু'চারদিন পরে ফিরব। তুই কম্পাউণ্ডার বাবুকে বলিস, এ ক'দিন ডিসপেনসারীর কাজটা চলিয়ে নিতে।

ভাগ্‌তু তার বগলের ক্র্যাচটা ধরে বড় বড় চোখে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। সকাল থেকে ঝিন্নি আর আমার আচরণটা তার বুদ্ধির অগম্য থেকে গেল।

মানালী থেকে কুলুর সরকারী রাস্তাটা বাস চলার পক্ষে অযোগ্য হয়ে উঠলেও পায়ে চলার পক্ষে অগম্য হয়ে দাঁড়ায়নি। কয়েক মাইল পথ ভাঙাচোরা রাস্তার ওপর দিয়ে দ্রুত চলে আসার পর একটা বড় রকমের ধ্বসের মুখোমুখি হতে হল। অতি কষ্টে বড় বড় পাথরের চাঁই, মাটি, গাছপালার ওপর পা রেখে রেখে ওপারে পৌঁছলাম। পথ চলতে গিয়ে ভাবলাম, এই পিছল ধ্বসটা পেরিয়ে আসতে ঝিন্নির কত কষ্টই না হয়েছে। ওর কথা যত ভাবছি ততই ওর ওপর থেকে আমার সব ক্ষোভ, অভিমান ধুয়ে মুছে যাচ্ছে।

অনেক পথ পেরিয়ে এলাম, কিন্তু ঝিন্নি কই! ওকি আমার চেয়েও দ্রুত হেঁটে চলে যাচ্ছে। হয়ত তা হতে পারে। যারা পাহাড়ে কাটায় আশৈশব তারা অনেক দ্রুত পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে পারে।

অনেক বেগবতী স্রোতধারা পেরিয়ে, প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ করে, ক্ষত-বিক্ষত পা টানতে টানতে প্রায় অপরাহ্নকালে এসে পৌঁছলাম কুলুর বাংলোর কাছাকাছি। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, বহু বর্ষণের পর ক্লান্ত মেঘ পশ্চিমাকাশ থেকে সরে গেছে। সেখানে সেই প্রথম কুলুতে আসার দিনটির মত লাবণ্যেভরা অপরাহ্ন-সূর্যের দীপ্তি। আমি আরও দেখলাম, তেমনি বাংলোর বেড়ার ধারে ঝিন্নি দাঁড়িয়ে। আজ সে একা নয়। ঝিন্নির সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন তার বাবা বৃদ্ধ নরসিংলালজী। তাদের দৃষ্টি কিন্তু নিবদ্ধ ছিল পূর্বাকাশের দিকে।

আকাশের ওপর চোখ পড়তেই পথের ক্লান্তি ভুলে গেলাম। রামধনু উঠেছে। অশ্রুভারাক্রান্ত মেঘের বুকে অনেক আশার স্বপ্ন জড়ানো রামধনু। পাঁচটি কুরুল পাখি (সারস) সারি দিয়ে আকাশে ডানা ছড়িয়ে উড়ে চলেছে।

কতক্ষণ চেয়েছিলাম মনে নেই। হঠাৎ একটা ডাকে চমকে তাকালাম।

ছোটেসাহেব, ছোটেসাহেব, ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে ঝিন্নি। আমার কাছে এসে রক্তাক্ত পায়ের দিকে তাকিয়ে ও কেঁদে ফেলল।

কে, কে তোমাকে এই ভাঙা পথের ওপর দিয়ে এত কষ্ট সহ্য করে আসতে বলেছিল ছোটেসাহেব। তুমি কি আমাকে পাগল করে দেবে?

ম্লান হেসে বললাম, তোমার কষ্ট না হলে আমার কেন কষ্ট হবে ঝিন্নি।

ও আমার হাত ধরে বলল, তুমি এস ছোটেসাহেব, আমার অনেক কসুর হয়ে গেছে।

ওকে বললাম, ঝিন্নি, সেই প্রথম দিনটির কথা মনে আছে, যেদিন এমনি এক বেলাশেষের আলোয় আমার ঝিন্নিকে ঐ বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম।

সেদিনটির কথা মনে করে ঝিন্নির সেকি আকুল কান্না।

ছোটেসাহেব, ছোটেসাহেব, সত্যিই তুমি তোমার ঝিন্নির সব কসুর মাপ করতে এলে, ছোটেসাহেব!

রাতে খাবার পর চাচা নরসিংলালজী আউট হাউসে আগের মত শুতে গেলেন। আমাকে ঝিন্নি একেবারে নীচে নামতেই দেয়নি। আমার ছেঁড়া কাটা পা গরম জলে ধুইয়ে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে ও আমাকে একেবারে বিছানায় এনে তুলেছে। খাওয়া-দাওয়ার পাট বিছানায় বসেই চুকেছে আমার।

নীচের কাজ সেরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ঝিন্নি এল। ঠিক প্রথমদিন চাচাজী আউটহাউসে শুতে গেলে ও রুম হিটার জ্বালাবার অছিলায় যেমন করে আমার ঘরে এসে ঢুকেছিল।

দরজাটা বন্ধ করে ও সুইচ অফ করতে হাত বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে কি মনে করে ও ওর সুন্দর কাঁধের ওপর দিয়ে দৃষ্টি হেনে বলল, এবার দি' নিভিয়ে আলোটা?

ওর কানের ঝুমকো জোড়ার ঝুরিগুলো টুলটুল্ করে নড়ে উঠল। আমি অবিকল সেই প্রথমদিনের ঘটনাটি অভিনীত হতে দেখলাম।

বললাম, আলো নিভিয়ে দিলেও অন্ধকারে আমি আমার ঝিন্নিকে ঠিক চিনে নিতে পারব।

ও আলো নিভিয়ে আমার বিছানায় এসে বসল। আমার মাথার চুলে বিলি কেটে দিতে দিতে বলল, খুব কষ্ট দিলাম তোমাকে আজ।

তুমিও তো কম কষ্ট পাওনি ঝিন্নি।

ও আবার বলল, তুমি কিন্তু এতটা পথ চলে আসবে তা আমি ভাবিনি।

তোমার ভাবা উচিত ছিল ঝিন্নি। আমাদের মনের বাঁধনটা যদি শিথিল হত তাহলে দুজনে দু-জায়গায় থেকে যেতে পারতাম। কিন্তু বাঁধনটা কঠিন বলে তোমার ঠিক পেছনেই আমাকে চলে আসতে হয়েছে।

আমি আর কোনদিন ছবি আঁকব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি ছোটেসাহেব।

আমি ওর একথার কোন উত্তর না দিয়ে বললাম, তুমি আমাকে আজ অনেক কষ্ট দিয়েছ বলে বলেছিলে না?

দিয়েছিই তো।

ওর হাতটা আমার বুকে চেপে ধরে বললাম, কষ্ট যখন দিয়েছ বলে স্বীকার করে নিচ্ছ তখন শাস্তি পাবার জন্যে তোমাকে তৈরী থাকতে হবে।

দাও শাস্তি। আমার ছোটেসাহেবের কাছ থেকে শাস্তি পাওয়াটাও তো একটা ভাগ্যের কথা।

ঝিন্নি হঠাৎ আমার একখানা হাত টেনে নিয়ে ওর মাথায় রাখল।

উঠে বসে বললাম, ঝিন্নিকে তার প্রতিজ্ঞা ভেঙে আবার ছবি আঁকতে হবে, এই তার শাস্তি।

তুমি কেন আমাকে আবার ছবির জগতে যেতে বলছ ছোটেসাহেব? আমি বরং আমার পুরোনো জীবনে ফিরে যাই, সেখানেই তো শান্তি। তুমি ফিরবে রোগী দেখে, আমি জানালা দিয়ে চেয়ে দেখব পাকদণ্ডীর পথ বেয়ে তোমার টাট্টু তোমাকে নিয়ে ফিরে আসছে। আমি তোমার জন্যে খাবার তৈরি করব। দুজনে একসঙ্গে বসে খাব। অবসর সময়ে একসঙ্গে

বেড়াতে বেড়াতে কুলুর জলেস্থলে আকাশে বাতাসে বিভিন্ন ঋতুর ছবি আঁকা দেখব। এর চেয়ে বড় কাজ আমার কি হতে পারে।

এসব করেও তুমি তোমার ছবি আঁকার অফুরন্ত সময় পাবে ঝিন্নি। আমি চাই না, তোমার মত একজন শিল্পী নিঃশেষে মুছে যাক্। তুমি সামনের অক্টোবরে এগজিবিশানের জন্যে তৈরি হবে, আর ডিসেম্বরে আরও আরও সুন্দর ছবি আঁকা শেখার জন্যে চলে যাবে ফ্রান্স। আমি অন্তর থেকে এসব কথা তোমাকে বলছি ঝিন্নি। আমার কথার আর প্রতিবাদ কর না লক্ষ্মীটি। তাহলে আজ যে কষ্ট দিয়েছ, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি কষ্ট পাব।

ঝিন্নি আর কোন কথা না বলে চুপ করে রইল। আমি ঝিন্নিকে আমার কম্বলের ভেতর টেনে নিয়ে বললাম, এই তো আমি আমার ঝিন্নিকে পেয়েছি। তোমার বিকাশের পথে বাধা হলে আমার পাওয়াটাই যে অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে সোনা।

আমরা একই উত্তপ্ত কম্বলের ভেতর শুয়ে বৃষ্টির গান শুনতে শুনতে কখন উদ্বেগহীন ঘুমের ভেতর হারিয়ে গেলাম।

শরৎ এসেছে। তরঙ্গিত ভেড়ার পাল নিয়ে উঁচু পর্বত থেকে ভ্যালি লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে নেমে আসছে গাদ্দীরা। নির্মল নীল আকাশখানা ঝক্ঝক্ করছে। চারদিকের পর্বতদেহের বক্ষ পর্যন্ত আবৃত সাদা চাদর। পীরপাঞ্জালের তুষারচূড়ায় সংলগ্ন হয়ে আছে একখণ্ড শুভ্র মেঘ। ফলের বাগানে কুলুর সুন্দরী মেয়েরা সারি বেঁধে ঢুকছে ফল তুলতে। লাল, সোনালী ফলভারে অবনত আপেল বৃক্ষ। সামনে গাছের ডালে বসে শিস দিয়ে চলেছে ঝুঁটি বাঁধা চটিপিন্ঝা পাখি।

সকাল থেকে রোগী দেখায় ব্যস্ত। আজ কোন্ ফাঁকে যে একটুখানি জলখাবার খেয়ে নিয়েছি তা আমিই জানি। এক একদিন বহু দূর দূর থেকে রোগীরা এসে ভীড় জমায়। তখন নাওয়াখাওয়ার আর অবসর থাকে না।

একটুখানি চোখ তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল ঝিন্নির সঙ্গে। ও ওপরে ওঠার সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে পত্পত্ করে হাত নেড়ে ডাকছে।

আমি যে রোগীটিকে দেখে প্রেসক্রিপশান লিখতে যাচ্ছিলাম, তার ওষুধগুলো লিখে কম্পাউণ্ডারবাবুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে এলাম বাইরে। ঝিন্নি তখনও আমার জন্যে সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে। আমি কাছে যেতেই ও চাপা গলায় বলল, একবার আমার সঙ্গে চলে এস ওপরে, কথা আছে।

আমি ঝিন্নির সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শোবার ঘরে গিয়ে থামলাম। ও দরজাটা ভেজিয়ে দিল। কি একটা যেন উত্তেজনায় রীতিমত কাঁপছে ঝিন্নি।

বললাম, কি হয়েছে তোমার, এমন করছ কেন?

ও আমার কাছে এসে প্রায় বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জলভরা দুটো চোখ আমার চোখের ওপর রেখে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, সে আসছে ছোটেসাহেব। আমি নিশ্চিত জানতে পেরেছি, সে আসছে।

আমি ঝিন্নিকে নিবিড় করে বুকের মাঝে চেপে ধরে বললাম, সত্যি! সত্যি বলছ ঝিন্নি?

সত্যি বলছি ছোটেসাহেব।

বলতে বলতেই আনন্দে, অশ্রুতে, উত্তেজনায় ঝিন্নি একাকার। টপটপ করে ক'ফোঁটা আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ল মেঝেতে।

আমি পাগলের মত ওকে জড়িয়ে ধরে সোহাগে আদরে চুম্বনে ভরে দিলাম। আমার ঝিন্নি দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মা হতে চলেছে। সকালের সোনালী আলোর জলে লেখা চিঠিতে সে খবর যেন দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। বিপাশার নীল জলধ্বনিতে যেন সেই আনন্দেরই সংবাদ।

সেই মুহূর্তে কেন জানি না আমার মনে হল, ঝিন্নি আর এতদিনের বহুচেনা ঝিন্নি নেই, সে এই মুহূর্ত থেকে পরিপূর্ণ আর এক নারীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

পাঁচটি বছর পরে এক বিহ্বল বসন্তের দিন। উৎসবের সাজে সেজেছে সারা কুলু উপত্যকা। গাছের ডাল ভরে শুধু সাদা আর পিঙ্ক ফুলের সমারোহ।

ভোরবেলা বাগানের দিকের শার্সিটা খুলে দিতেই এক ঝলক সোনালী আলো চোখে এসে পড়ল। আপেলের ডাল ভরে শুধু ফুলের নিমন্ত্রণ। অজস্র রঙীন প্রজাপতি হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া রঙীন কাগজের টুকরোর মত উড়ছে। গাছের তলায় মা আর মেয়ে। রঙীন রিবন দিয়ে বো বাঁধা কালো চুল। পিঙ্ক ফুল ছড়ানো সাদা ফ্রক পরে দেবকন্যার মত নাচতে নাচতে প্রজাপতির পেছনে ছুটছে পাঁচ বছরের তিন্নি। রোদ্দুরের ওড়না গায়ে জড়িয়ে বাগানে বসে মেয়ের জন্যে হলুদ রঙের পুলওভার বুনছে ঝিন্নি। উলের গোলাটাও ঝিন্নির হাতের টানে চারদিকে গড়িয়ে গড়িয়ে খেলা করছে।

আমার সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, পৃথিবীর সংগ্রহশালার একটি শ্রেষ্ঠ ছবি যেন আমি চোখের সামনে দেখছি। আর আশ্চর্য হয়ে ভাবছি, চিত্রকর না হয়েও আজ একটিমাত্র শ্রেষ্ঠ চিত্রের অন্যতম স্রষ্টা আমি নিজে।

●

তিন্‌নির রোদ আর বৃষ্টি

শেষ পর্ব

কয়েকটা দিন ভারি উত্তেজনায় কাটছে তিন্‌নির। চণ্ডিগড় থেকে জুলিয়েন আঙ্কেলের ছেলে তার দু'একটি মেডিক্যাল কলেজের বন্ধু নিয়ে মানালী আসছে। তাদেরই আপ্যায়নের পরিকল্পনায় কাটছে তিন্‌নির মুহূর্তগুলো।

মানালীতে ছুটি কাটানোর জন্যে ভাল হোটেলের অভাব নেই। জুলিয়েন বেননেরই তো দু'খানা ফার্স্ট ক্লাস হোটেল আছে। তারই তো একমাত্র ছেলে ক্যারল আসছে তার দু'তিনজন বন্ধু নিয়ে। দিব্যি কেটে যেত তাদের অ্যাপেল অর্চার্ডের ভেতর নিজেদের পেল্লাই বাড়িতে। সেখানে থাকতে না চাইলে হোটেলের স্যুইট আছে। কিন্তু জুলিয়েন আঙ্কেল সেদিক দিয়ে গেলেন না। তিনি তিন্‌নিকে ইশারায় কাছে ডেকে বললেন, মম্‌, পুরো একটা বছর পরে ক্যারল আসছে তার কয়েকজন বন্ধু নিয়ে। ওরা তোমার অতিথি হয়ে থাকুক, এটাই আমাদের ইচ্ছে। চিঠিতে যা জানিয়েছে তাতে মনে হয়, দিন দশেকের প্রোগ্রাম ওদের।

জুলিয়েন আঙ্কেলের পাশে তখন বসেছিলেন বালু আন্টি আর তিন্‌নির মা স্বয়ং।

তিন্‌নি বুঝে নিল এই তিনজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর ভেতর ব্যাপারটা নিয়ে আগাম আলোচনা হয়ে গেছে।

তিন্‌নি স্বভাবে শান্ত গভীর। তার আবেগ কিংবা আনন্দ মনের ভেতরেই খেলা করে, উচ্ছ্বসিত হয়ে তা বাইরে ভেঙে পড়ে না।

আঙ্কেলের কথায় সে মিষ্টি হেসে মাথা নাড়ল।

প্ল্যান প্রোগ্রাম সবই কিন্তু তোমার।

তিন্‌নি বলল, আমি প্রোগ্রাম ছকে ওদের কাছে ফেলে দেব। তারপর সবাই মিলে আলোচনার পর ফাইন্যাল করা যাবে।

বেশ। টুয়েন্টি থার্ড এপ্রিল কিন্তু ওরা আসছে।

তিন্‌নি আবার মাথা নাড়ল।

তুমি, তোমার আন্টি কিংবা আমার সব রকম সাহায্যই পাবে। তোমার মা তো সব সময়েই তোমার সঙ্গে আছেন।

জুলিয়েন উঠে দাঁড়িয়ে অর্চার্ডের দিকে চলে গেলেন।

তিন্‌নি আর দাঁড়াল না। একটা অদ্ভুত উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ ততক্ষণে ছড়িয়ে পড়েছে তার মনে।

সে দ্রুত চলে গেল তার নিজস্ব কোঠির দিকে।

ভ্যালির গা ঘেঁষে রাস্তার ওপর তিন্‌নির বাবা ডাক্তার পুষ্কর মুখার্জী বিশাল বাড়ি তৈরী করেছিলেন। অবশ্য বাড়ির প্রায় তিনভাগই ছিল একটা নার্সিং হোম। গোটা বারো বেড,

ডিসপেনসারী, অপারেশন থিয়েটার। দুটি নার্স, চারটি আয়ার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। দারোয়ানের কোয়ার্টার বাগানের এক কোণে। সে তার ফ্যামিলি নিয়ে থাকে। একটু দূরের থেকে রোজ আসেন কম্পাউণ্ডারবাবু তাঁর লালচে রঙের টাট্টুতে চড়ে।

মুখার্জী সাহেব মারা যাবার পর অপারেশান থিয়েটারের দরজা বন্ধ। কম্পাউণ্ডারবাবু কোনরকমে আউটডোরের কাজগুলো সামলে যাচ্ছেন।

জুলিয়েন বেনন ছিলেন ডাক্তার মুখার্জীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। ডাক্তারী ডিগ্রি পাওয়ার পর পুষ্কর মুখার্জীর সুদূর হিমাচলপ্রদেশে এসে ডাক্তারী ব্যবসা শুরু করার বিন্দুমাত্র কোন পরিকল্পনাই ছিল না। কিন্তু হিমাচলবাসী এক সৎ মানুষের চিঠি পেয়ে তাঁকে কলকাতা থেকে কুলুতে চলে আসতে হয়েছিল। এই সৎ ও সুভদ্র মানুষটি ছিলেন অর্ণব মুখার্জীর ভবঘুরে ও খেয়ালী পিতৃদেবের অ্যাপেল অর্চার্ডের ম্যানেজার।

ছোটবেলায় মা মারা যান ডাক্তার মুখার্জীর। স্ত্রীর শোকে ডাক্তার মুখার্জীর বাবা এমনি উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েন যে তিনি শিশু-পুত্রটিকে তার মাসীর কাছে রেখে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। জীবিত থাকতে তিনি আর কখনো ছেলের কাছে ফিরে আসেননি।

জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি কুলু আর মানালীতে দুটি অ্যাপেল অর্চার্ড করেছিলেন। নরসিংলালজী ছিলেন সেই অর্চার্ড দুটির ম্যানেজার।

মালিক মুখার্জী সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি নিজে অর্চার্ড দুটি আত্মসাৎ না করে কলকাতায় মুখার্জী সাহেবের সদ্য ডাক্তারী পাশ করা ছেলেটিকে ডেকে আনেন। তার হাতেই তুলে দেন অর্চার্ড দুটির ভার।

নরসিংলালজীর একটিমাত্র মেয়ে, ঝিন্নি। সে আর্টকলেজ থেকে সদ্য পাশ করে কুলু উপত্যকার নাগ্‌গরে রোয়েরিক আর্ট গ্যালারীতে একটা কাজ পেয়েছিল। আশ্চর্য কান্তিময়ী সেই কন্যাটির আকর্ষণে তরুণ ডাক্তার মুখার্জী মানালীতেই তার সাধনার আসন পাতল।

ডাক্তার মুখার্জী আর ঝিন্নির ভালবাসা একদিন বিপাশার স্রোতকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। পাইন অরণ্যে বাতাসের কানাকানিতে শোনা যেত দুটি প্রেমিকের প্রায়-অস্ফুট প্রেমগুঞ্জন। ভোরের ছোঁয়ায় তুষার চূড়ায় লাগত তাদেরই হৃদয় থেকে ঝরে পড়া অনুরাগের রঙীন ফাগ। ওদের হাসি গানের সোনালী আলোয় ভরে গিয়েছিল কুলুর পথ প্রান্তর।

এই সময়গুলোতে ডাক্তার মুখার্জীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এক বলিষ্ঠ মনের মানুষ। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি ও ধর্মের এই যুবকটি যেমন হৃদয়বান, বন্ধুবৎসল তেমনি বোহেমিয়ান প্রকৃতির। এই জুলিয়েন বেননদের তিন পুরুষ কুলু ভ্যালিতে অ্যাপেল অর্চার্ডের সঙ্গে যুক্ত। কেবল ফল ব্যবসা নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁদের হোটেল ব্যবসাও।

জুলিয়েনের দাদু এবং জুলিয়েন এ দেশের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের মুক্ত মনে সংস্কারের লেশমাত্র ছিল না। জুলিয়েনের স্ত্রী বালু, কুলুবাসিনী এক রাজপুত কন্যা। তাঁদেরই একটি মাত্র সন্তান ক্যারল।

ডাক্তার মুখার্জী অকালে চলে যাওয়ায় মানবদরদী এই মানুষটির জন্য আজও মানালীর সমস্ত অধিবাসী শোক প্রকাশ করে। পাহাড়ীদের জীবনে এই শূন্যতা কে পূর্ণ করবে, সে নিয়ে আজও ঘরে ঘরে আলোচনার শেষ নেই।

আসলে অসহায় পাহাড়ীরা চায় অসুখের সময় একজন নিশ্চিন্ত অভযদাতা। ডাক্তার মুখার্জী ছিলেন সে রকম একজন দেবদূত যিনি কাতর মানুষের ব্যথার তরঙ্গ দূর থেকেই অনুভব করতে পারতেন। কখনো সখনো দেখা যেত একটি টাট্টু ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তিনি চলেছেন পাহাড়ী পথে। মানুষজন ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁকে নত হয়ে নমস্কার করছে। তিনিও তাদের রোগ ব্যাধির খোঁজ খবর নিচ্ছেন। দরকারে তাঁর প্রায়-দাতব্য চিকিৎসালয়ে গিয়ে ওষুধ আনতে বলছেন।

বছর দুয়েক আগে ওপারের পাহাড়ী টিলা থেকে একটা অ্যাবনর্মাল ক্রিটিক্যাল ডেলিভারী কেস অ্যাটেন্ড করে ফিরছিলেন। রাত একটা, চাঁদের দুধসাদা জলে ধোয়া ভ্যালি। ফিরছিলেন একাই। যত রাতই হোক, সঙ্গে কাউকে নিতে চাইতেন না। হঠাৎ টাট্টু থেকে কি করে যেন নিচে পড়ে গেলেন।

ভোর হয়ে গেল তবু ডাক্তার মুখার্জী বাড়ি ফিরছেন না দেখে উদ্বিগ্ন ঝিন্নি দেবী স্বামীর অভিন্নহৃদয় বন্ধু জুলিয়েন সাহেবের কাছে খবর পাঠালেন।

জুলিয়েন অমনি ছুটলেন বন্ধুর খোঁজে। যখন ফিরলেন তখন দেখা গেল, ডাক্তার মুখার্জীর প্রাণশূন্য দেহখানা লুটিয়ে পড়ে আছে বন্ধুর কাঁধের ওপর।

খবরটা কয়েক মুহূর্তের ভেতরেই ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। কাতারে কাতারে মানুষ তাদের প্রিয় ডাক্তার সাহেবকে দেখার জন্য বন্যার মত আছড়ে পড়তে লাগল হসপিটাল চত্বরে।

সেই বেদনার দিনগুলো আজও বড় ভারাক্রান্ত করে রেখেছে ডাক্তার মুখার্জীর প্রিয়জনদের স্মৃতি।

সেদিনের ছোট্ট অথচ বড় উজ্জ্বল একটুকরো ঘটনা আজও গাঁথা হয়ে আছে তিন্নির মনের গভীরে।

বাবার সুন্দর দেহখানা শোয়ানো আছে বাড়ির সামনে বিশাল লনে। ফুলেফুলে ছেয়ে গেছে দেহ। সারি দিয়ে পাহাড়ী স্ত্রী-পুরুষ চোখেব জলে তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছে।

মা আর বালু আন্টি শবদেহের শিয়রে বসে আছে দুটি পাথরের পলকহীন স্থির মূর্তির মত। জুলিয়েন আঙ্কেল সমারোহপূর্ণ শেষযাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত।

একটা পিলারের আড়ালে একা দাঁড়িয়েছিল তিন্নি। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল তার জলের ফোঁটাগুলো। ভিড়ের ভেতর থেকে সে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল একান্ত নির্জন এই জায়গাটিতে।

হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন এসে তার একটা হাত ধরল।

পেছনে ফিরে দাঁড়াল তিন্নি।

ক্যারল!

ভারী গলায় ক্যারল জানাল, আমি ডাক্তারী পড়ব স্থির করে ফেলেছি তিন্‌নি।

অবাক হয়ে তিন্‌নি বলল, তুমি না বিজনেস ম্যানেজমেন্টে ঢুকবে বলে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছ।

এই মুহূর্তে সব বাতিল করে দিলাম। চণ্ডিগড়েও আমি সিলেক্‌টেড হয়ে আছি।

কিন্তু কেন?

দেখছ না আঙ্কেলের জন্য মানুষগুলোর কি শোক। আঙ্কেল চলে গেলেন, ওদের দেখবে কে?

তিন্‌নি সেদিন এতবড় শোক ভুলে উচ্ছ্বাসে বলে উঠেছিল, সত্যি ক্যারল, তুমি আমার ড্যাডির মত ডাক্তার হবে!

ডাক্তার আঙ্কেলের সেরকম ইচ্ছে ছিল তিন্‌নি। তিনি আমাকে বার বার বলতেন।

সেদিন এতখানি শোকের ভেতরেও উত্তেজনায় ক্যারলের হাতখানা চেপে ধরেছিল পঞ্চদশী তিন্‌নি।

সেদিনের সেই একান্ত নিভৃতে দেওয়া কথাটির মর্যাদা রেখেছে ক্যারল। সে আজ দুবছর হল ডাক্তারী পড়ছে চণ্ডিগড়ে। বাড়ি আসতে চায় না বড় একটা। তবে প্রতিমাসে নিয়ম করে একটি চিঠি পাঠায় তিন্‌নির নামে। এ দুবছরে নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয়নি।

কিন্তু আশ্চর্য, এই কয়েকদিনের ছুটির কথা তিন্‌নিকে আভাসেও জানায়নি ক্যারল। সম্ভবত হঠাৎ এসে দারুণ একটা সারপ্রাইজ দেবে এই ছিল তার উদ্দেশ্য।

তিন্‌নিদের বাড়ির সংলগ্ন পাহাড়ের একটা অংশ প্রকৃতির খেয়ালে অনেকখানি ঝুঁকে আছে গভীর একটা কড়ার মত ভ্যালির দিকে।

পাহাড়ে নিবিড় ঘন অরণ্য-বৃক্ষের সমাবেশ। সেখানে সরকারী অথবা বেসরকারী কোন বাড়ি নেই।

ঝিন্নিদেবীর আগ্রহে একসময় ডাক্তার মুখার্জী অনেক তদ্বির করে ভ্যালির দিকে ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের ঐ অংশটিতে একটি কুঠি তৈরীর অনুমতি পান।

অপূর্ব কাচের গোল একখানি বড় ঘর। সামনে ছোট্ট লন। ফুলের কেয়ারী। লনের মাঝখানে তিনটি ঘন পাতায় ছাওয়া পাইন গাছ দাঁড়িয়ে। ঘরের গা জুড়ে থোকায় থোকায় ঝুলে আছে লতানে গোলাপ। লালে সাদায় ভারি দৃষ্টি-নন্দন।

ঝিন্নিদেবী নামকরা শিল্পী। ঐ ঘরে বসে তিনি তাঁর শিল্প-সাধনা করতেন। এখন তিন্‌নির দখলে এসেছে ঐ ঘরখানা। কলেজে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মায়ের কাছ থেকে পাঠ নেয় ছবি আঁকার।

ঝিন্নিদেবী যৌবনে একবার ফ্রান্সে গিয়ে চিত্র-শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় তিন্‌নিকে বিদেশে পাঠিয়ে তাঁর অপূর্ণ ইচ্ছেটা পূর্ণ করেন।

তিন্‌নি পাহাড়ে উঠে এখন তার ছবিঘরে ঢুকেছে। গেস্টদের নিয়ে সে তার পরিকল্পনার ছক তৈরী করবে এখন। দায়িত্বটা কম নয়। এটা তার কাছে বিশেষ ধরনের একটা পরীক্ষা। সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে হবে এ পরীক্ষায়।

কোথায় অতিথিদের রাখা হবে, খাবার মেনু কি হবে, দর্শনীয় কোন্ কোন্ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে এই কদিনে, ছোটখাটো কি উপহার দেওয়া যায় তাদের, এইসব নানান ভাবনা মৌমাছির গুঞ্জনের মত বেজে চলেছে তার মাথায়।

সবকিছু ভাবনার ভেতরে সূক্ষ্ম অভিমানের একটা করুণ গন্ধ মাঝে মাঝে তাকে উদাস করে তুলছিল। ক্যারল তাকে একটি কথাও জানায়নি। চিঠি এসেছে বারো দিন আগে, তাতে অনেক কথা আছে, নেই কেবল তার আসার সামান্যতম খবর।

এটা কি শুধুই সারপ্রাইজ? ক্যারল কি জানে না, জুলিয়েন আঙ্কেলকে চিঠি দিলে তা গোপন থাকবে না। তা সে যত ছোট খবরই হোক। আঙ্কেল হা হা করে হেসে যেমন হাওয়ায় হাসি ছড়িয়ে দেন, তেমনি খবরগুলোকেও চেপে না রেখে উড়িয়ে দেন আকাশে। আসলে মানুষটির ভেতর গোপনতা বলে কিছু নেই।

বার বার সুষ্ঠু একটা প্ল্যান ছকতে বসছে তিন্‌নি, কিন্তু এই সব বুদবুদের মত জেগে ওঠা চিন্তায় তা ভেস্তে যাচ্ছে।

ভ্যালির ওপারে ঝলমল করছে তুষার চূড়াগুলো। নিচে বাঁকা তলোয়ারের মত ঝিলিক মেরে বইছে একটা পাহাড়ী নদী। মার্চের শেষ সপ্তাহ। চারদিকে পাহাড়ের গায়ে বরফের ধবধবে যে চাদর জড়ানো ছিল তা এখন ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। আপেল গাছে শুরু হয়েছে সাদা আর গোলাপী ফুলের মরসুম।

বন্ধুদের জন্য প্ল্যান তৈরী করতে গিয়ে বসন্তের ছবি দেখতে লাগল তিন্‌নি।

ঐ তো একপাল ভেড়া সবুজ বনের পথে আঁকাবাঁকা ঝর্ণার ঢেউ তুলে নিচের দিকে নেমে চলেছে। তাদের পেছনে একজোড়া গাদ্দী পহাল। মেষচারকদের টিপিক্যাল পোশাকে তাদের মানিয়েছে চমৎকার।

প্ল্যান তৈরী মাথায় উঠল তিন্‌নির। সে কার্ড নিয়ে অতিথিদের উপহার দেবার জন্য ছবি আঁকতে বসে গেল।

পাইন গাছের পাশ দিয়ে ভেড়ার পাল নিয়ে নামছে একটি গাদ্দী পহাল। তার পেছনে তার তরুণী বউ। সুন্দর কুলুর তৈরী টুপি মাথায়। কোলে দুধসাদা একটা ভেড়ার বাচ্চা।

ছবিখানা এঁকে ভারি খুশি হয়ে উঠল তিন্‌নি। নিজের হাতে আঁকা তরুণী বউটিকে বার বার দেখছে আর রোমাঞ্চ জাগছে সারা শরীরে। ষোলটি বসন্ত পার হয়ে এসে তিন্‌নি এখন সপ্তদশী।

আরও একখানা ছবি এঁকে ফেলল সে।

ফুলন্ত আপেলের ডাল। একটি ঝুটিওলা বাহারী রঙের পাখি বসে আছে সেই ডালে। নিচের সরু শাখাটিতে বসে আছে পক্ষিণী, তার দোসরটিকে দেখছে মুগ্ধ চোখে।

এবার তার মনে হল, এই দু'খানা ছবিতে মনের কথা খুব বেশী করে মেলে ধরা হয়েছে। গোপন মনের গভীরে যা থাকে তাকে দিনের আলোয় তুলে আনলে কি বড় বেশী প্রকাশ হয়ে পড়ে না? গোপন ভাবনার একটা আলাদা সুগন্ধ আছে।

এবার সে বিষয় বদল করল।

দুই তীরে ছোট বড় শিলাস্তূপ। তাদের ফাঁকে ফাঁকে উঠেছে সতেজ সবুজ পাইন গাছ। মাঝ দিয়ে বইছে নীলাম্বরী বিপাশা।

এখানেও মনে হল, অনেকগুলি পুরুষ আবেগে উচ্ছল একটি নারীকে দেখছে।

তার চতুর্থ চিত্রটি তুষার পাহাড়কে নিয়ে।

নীল আকাশের গায়ে বরফের মুকুট পরা পর্বত। চূড়ায় তার লেগেছে সকালবেলার সোনালী আলোর ছোঁয়া।

শেষ ছবিখানা আঁকতেই সন্ধ্যের ধূপছায়া দেখা দিল।

স্কেচ শেষ হয়ে গিয়েছিল, টুক্ করে আলোর সুইচ টিপল তিন্নি। অমনি ঝলমল করে উঠল কাচের ঘর। আলোয় রঙের কাজ শেষ করতে হবে।

ঝিন্নিদেবী নিচের ঘরের জানলা থেকে দেখলেন, ছবিঘর আলোর বন্যায় ভাসছে। শৌখীন বেলোয়ারী ঝাড় থেকে সাত রঙের স্রোত সৃষ্টি করছে অলৌকিক ইন্দ্রধনু। দূর থেকে দেখলে দৃশ্যটা ভারি চমকপ্রদ মনে হয়।

ঝিন্নিদেবী ভাগ্‌তু, ভাগ্‌তু বলে ডাক পাড়তে লাগলেন।

ক্রাচে ভর দিয়ে তিরিশ বছরের যুবক ভাগ্‌তু এসে দাঁড়াল।

ঝিন্নিদেবী কাতর গলায় বললেন, হাঁরে বাবা, তিন্নি তো এখনও নামল না। সেই কখন দুপুরের খাওয়া খেয়েছে, চায়ের টেবিলেও হাজির হল না।

ভাগ্‌তুরাম বলল, তাহলে আমাকে কি করতে হবে বলে ফেল।

ঝিন্নিদেবীর গলায় সংকোচের সুর, তুই আবার এই ভর সন্ধ্যেয় খাবার নিয়ে ছবিঘরে উঠবি?

তাই তো তোমার ইচ্ছে। আমি বুঝি না, তিন্নিকে তুমি সবচেয়ে বেশী ভালবাস।

তোকে বাসি না বুঝি?

ভাগ্‌তু এর কোন জবাব না দিয়ে বলল, কি দেবে, আমার ঝোলায় ভরে দাও। ঐ জঙ্গলের রাস্তায় একটা বালব আবার কদিন ধরে জ্বলছে না।

উদ্বিগ্ন ঝিন্নিদেবী বললেন, তাহলে তুই বাবা বুঝিয়ে সুঝিয়ে বোনকে সঙ্গে করে আনিস।

যদি এখুনি নামতে না চায়?

তুই একটু বসে থাকবি। মোট কথা, তোর সঙ্গে যেন ও নেমে আসে।

ভাগ্‌তুরাম কাঁধের ঝোলায় খাবারের প্যাকেট আর চা ভর্তি ফ্লাস্কখানা ভরে নিয়ে ক্রাচ বগলে বেরিয়ে গেল।

ঝিন্নিদেবী তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফেলে আসা অতীতে ডুবে গেলেন।

এই সেই ভাগ্‌তুরাম। গান্দী পহালদের দশ বার বছরের ছেলেটি। বাপ মায়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো ভেড় বক্‌রি চরিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে। ভারি মিষ্টি ছেলেটা। কিন্তু একটা পাথর ওপর থেকে গড়িয়ে পড়ল একদিন। আর সেই দুর্ঘটনায় ছেলেটাকে প্রাণে বাঁচাতে গিয়ে একখানা পা কেটে বাদ দিতে হল। ডাক্তার মুখার্জীকেই করতে হল এই দুঃখজনক কাজটি।

সেরে উঠল ভাগ্‌তুরাম। ওর বাপ এসে একদিন ডাক্তার মুখার্জীকে ধরে বলল, এ লেড়কাকে লিয়ে হামি কি করবে ডাগ্‌দর সাব? ও বেটা তো কুছ কাম মে আসবে নাই। কে জীবনভর দেখভাল করবে ওর?

ডাক্তার মুখার্জী বললেন, তবে আমাকে দিয়ে দাও, ওর ভার আমিই বইব।

সেই থেকে ভাগ্‌তুরাম ডাক্তার মুখার্জীর কাছেই থেকে গেল। অসীম প্রাণশক্তি নিয়ে জন্মায় এক একটা ছেলে। তারা ভাগ্যের হাতে মার খেলেও কিছুতেই হার মানতে চায় না। ভাগ্‌তুরাম সেই জাতের ছেলে।

সে ক্রাচ বগলে সারা পাহাড় চষে বেড়ায়।

তখনও বিয়ে হয়নি ঝিন্নিদেবীর। নাগ্‌গরের আর্ট গ্যালারিতে দিন কাটছে। ডাক্তার মুখার্জীর সঙ্গে চলছে অনুরাগ পর্ব। মানালী থেকে নাগ্‌গরে এই পঙ্গু ভাগ্‌তুই ছুটে ছুটে খবর লেনদেনের কাজ করেছে।

সে সব স্বপ্নের দিনগুলোর কথা ভুলতে পারে না ঝিন্নিদেবী। আজ ভাগ্‌তু ঝিন্নিদেবীর সংসারে অপরিহার্য। নির্লোভ, আনন্দময়, অভিমানী, শিশুর মত সরল একটি হৃদয়ের অধিকারী এই যুবক। এ বাড়ির প্রতিটি মানুষকে যেন বুক দিয়ে আগলে রেখেছে।

ঝিন্নিদেবীর মনে হয়, ভাগ্‌তু তাঁর নিজেরই ছেলে। তিন্‌নির সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন।

দশেরা উৎসবে কুলুর ঢোল ময়দানে রাতে যে নাচের আসর বসে, তারই একটা ছবি এঁকেছে ঝিন্নি।

কয়েকটি নর্তক নর্তকী নাচছে চক্রাকারে। বেশ মাতন লেগেছে নাচে। জোড়ায় জোড়ায় কোমর জড়িয়ে নাচছে।

পুরো রঙ দেওয়া তখনও শেষ হয়নি, হঠাৎ দরজার সামনে মনে হল কেউ এসে দাঁড়িয়েছে।

হাতে তুলি, তিন্‌নি চোখ তুলে তাকাল।

মুহূর্তে বিস্ময় ঘনীভূত হল চোখের দৃষ্টিতে।

দরজা ধরে যে বাইশ চব্বিশ বছরের যুবকটি দাঁড়িয়ে আছে সে সম্পূর্ণ অচেনা। সুদর্শন দীর্ঘদেহী যুবক। মেরুন রঙের ট্রাউজার্সের ওপর গাঢ় হলুদ রঙের টি-শার্ট পরেছে। বুকের মাঝখানে লেখা, 'উই আর ফ্রেণ্ডস্'।

তিন্‌নিকে তার পরিচয় দিতে গিয়ে ছেলেটি বলল, আমি বদরী-প্রসাদজীর নাতি। তাঁর মেয়ের ছেলে।

ভেতরে এসে বসুন মিঃ অর্কদীপ। কখন পৌঁছলেন?

ঘরের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে একমুখ হাসি ছড়িয়ে ছেলেটি বলল, আমাকে কেবল অর্ক বলে ডাকলেই খুশি হব।

অসংকোচে অর্ক বসে পড়ল তিন্‌নির মুখোমুখি একটা চেয়ারে।

তিন্‌নি বলল, অর্কের আবির্ভাবের ঘোষণা আমি ভোরবেলাতেই জজসাহেবের মুখ থেকে শুনেছি. তবে ঠিক কোন মুহূর্তে এত দূরের বিদেশী মানালীতে এসে পৌঁছবেন তা জানতে পারিনি।

দরজার সামনে আর একটি মুখ দেখা দিল। উত্তরটা সেই মুখ থেকেই শোনা গেল।

বেলা এগারোটায়। একখানা সাদা মারুতিতে সওয়ার হয়ে। আমিই তো ওঁকে জাস্টিস বদরীপ্রসাদের বাড়ির পথ দেখিয়ে দিলাম।

অর্ক ততক্ষণে পেছন ফিরে বলল, হ্যাঁ ইনিই আমাকে নানার বাড়ির নিশানা বলে দিয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিন্‌নি বলল, ইনি আমার দাদা ভাগ্‌তুরাম।

অর্ক হ্যাণ্ডশেক করতে গিয়েও হাতখানা টেনে নিয়ে নমস্কার করল। তখনও ভাগ্‌তুরাম হাতের ক্রাচ যথাস্থানে নামিয়ে রাখেনি।

এবার ক্রাচ দুখানা নামাতে নামাতে বলল, আপনারা জায়গামত বসে থাকুন আমি চায়ের ব্যবস্থা করছি।

অর্ক অমনি বলল, 'আপনারা' নয়, 'তোমরা' আর 'থাকুন' নয়, 'থাক'।

চায়ের আর একখানা কাপ পাওয়া গেল ছবিঘরে, কিন্তু ভাগ্‌তুর ঝোলায় খাবার প্লেট এসেছে একখানা মাত্র।

তাই সই। প্লেটে ঢালা হল সামোসা অরা কচুরি। বিকেলে চায়ের আসরের জন্য বাড়িতে তৈরী।

অর্ক বলল, দারুণ জিনিস।

তিন্‌নি বলল, প্রতি ছুটির দিনে মা এসব খাবার নিজের হাতে বানায়। বাবা বেঁচে থাকতে প্রতি রোববার অনেক আয়োজন হত। সেখানে মায়ের হাতের সামোসা ছিল মাস্ট। বাবার সব বন্ধুরা এসে খেয়ে যেতেন।

ওরা গল্প করতে করতে একই প্লেট থেকে তুলে খেতে লাগল।

তিন্‌নি প্লেট থেকে একটা কচুরি তুলে নিয়ে ভাগ্‌তুরামের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, নে খা লোভী। জান অর্ক, রোজ খাবার থালায় বেশী কম নিয়ে মায়ের সঙ্গে এই দাদাটা ঝগড়া করে। ফিফ্‌টি গ্রাম হলেও ভাগ্‌তুদার দিকেই মায়ের পাল্লা ভারি।

একটা নির্মল হাসি ওদের মুখ থেকে ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। সে হাসির ঢেউ লাগল পাহাড়ে। দুচারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে হতে সেই হাসির তরঙ্গ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে নেমে গেল ভ্যালির দিকে।

বদরীপ্রসাদ হাইকোর্ট জজ ছিলেন। তাঁর একটিমাত্র মেয়ে। ম্যাথমেটিক্‌সে ফার্স্ট ক্লাশ পাবার পর এক ক্লাশ ফ্রেণ্ডকে বিয়ে করে দুজনেই হায়ার স্টাডির জন্য ইউ. এস. এ চলে

যান। ডক্টরেট ডিগ্রি পাবার পর তাঁরা একটি ইউনিভারসিটিতে চাকরি করতে থাকেন। কয়েক বছর পরে অর্কদীপের বাবা প্রতিরক্ষা বিভাগে সাইনটিফিক্ রিসার্চ ইউনিটে কাজ পান।

দারুণ স্বাচ্ছন্দ্যের ভেতরে কাটছিল তাঁদের দিন। ইতিমধ্যে সংসারে তৃতীয় অতিথিরও আবির্ভাব হয়েছে। দুজনের আনন্দ আবর্তিত হচ্ছে শিশুটিকে ঘিরে। জীবনকে সুন্দরভাবে ভোগ করার পরিকল্পনায় মেতে উঠেছেন তাঁরা।

নাতিকে দেখার জন্য বদরীপ্রসাদ ও স্ত্রী সরযুদেবী আমেরিকাতে উড়ে গেলেন। সেখানে কয়েকমাস সবাই মিলে আনন্দ উৎসবে কাটালেন।

ফিরে আসার পর সরযুদেবীর মন বসে না সংসারের কাজে। নাতির মুখখানা বার বার ভেসে ওঠে চোখের ওপর। চার বছরের ছেলে সাইকেল চালাচ্ছে লনে। ক্যারাটের প্যাঁচ চালাচ্ছে নানার ওপর। ক্ষুদে ওস্তাদের মারে জব্দ হয়ে দুঁদে বিচারপতি লুটিয়ে পড়ছেন বিছানায়।

সাত বছরের অর্ককে নিয়ে তার বাবা মা আসবে মানালীতে একটা ছুটি কাটাতে।

নির্দিষ্ট দিনে এয়ারপোর্টে প্লেন ধরার জন্য আসছিলেন তাঁরা। সময় খুব কম ছিল হাতে। অর্কের বাবাই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। পাশে এক বন্ধু। দারুণ স্পীডে গাড়ি চলছিল। হঠাৎ ছিট্‌কে ডিগবাজি খেল গাড়ি। বন্ধুটি হাত ভেঙে রক্ষা পেল। অর্ককে জড়িয়ে ধরেছিলেন তার মা। দুজনেই আশ্চর্যভাবে অক্ষত। কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিলেন অর্কের বাবা। হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছানো তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি।

এই আঘাতে প্রায় মূক হয়ে গিয়েছিলেন অর্কের মা।

বদরীপ্রসাদ স্ত্রীকে নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন মেয়ের কাছে। অনেক শাস্ত্রীয় শ্লোক আউড়ে বিচারক বদরীপ্রসাদ মেয়েকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেছিলেন, প্রস্তাব দিয়েছিলেন পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে আসার, কিন্তু কোন দিক থেকেই তিনি সফল হতে পারেননি। মেয়ে স্বামীর স্মৃতি বুকে আঁকড়ে পড়ে রইল আমেরিকায়।

তারপর দীর্ঘ ষোল বছরে বদরীপ্রসাদ অন্তত বার ছয়েক স্ত্রীকে নিয়ে গেছেন মেয়ে আর নাতির কাছে।

এখন অতি বৃদ্ধ ও অশক্ত হয়ে পড়েছেন জজ সাহেব। তাই নাতিই ছুটি নিয়ে দেখতে এসেছে নানা নানিকে।

অর্ক হায়ার কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকারী কাজে নিযুক্ত। টেনিস খেলোয়াড় হিসেবে ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা নামও করেছে।

চিকিৎসক বলে জজসাহেবের বাড়িতে প্রায়ই ডাক পড়ত ডাক্তার মুখার্জীর। সেই সুবাদে দুবাড়ির ঘনিষ্ঠতা।

তিন্‌নি দিনে একটিবার অন্তত না গেলে বৃদ্ধবৃদ্ধা নিজেদের অসুখী মনে করেন। অস্থির হয়ে পথের দিকে চেয়ে থাকেন। তাঁদেরই মুখে তিন্‌নি কতবার শুনেছে অর্কের কাহিনী। কৃতি ছাত্র হিসেবে তার উত্থান, অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ অথচ স্নেহরসে মাখা তার ঘরোয়া

জীবনের ছবিগুলিও। সরযুদেবী যখন এসব গল্প করতেন তখন পাশে বসে থাকা বদরীপ্রসাদজীর মুখখানা নাতির কৃতিত্বের কাহিনীতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। তাঁর চোখের দিকে তাকালে মনে হত, এই প্রথম তিনি কোন তাজ্জব কাহিনী শুনছেন।

ভাগ্‌তুরাম বেরসিক নয়। চায়ের পাট চুকলে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নিচে অনেক কাজ পড়ে। তোরা আয় আমি এগোচ্ছি।

অর্ক উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এইতো দাদার মুখের কথা। তুই তুকারি না করলে কি দাদা মানায়।

তিন্‌নি অমনি বলল, এতকাল বিদেশে থেকে এসব অন্তরঙ্গ ঘরোয়া ডাকের কথা তুমি জানলে কি করে?

আমার মা আদ্যোপান্ত ভারতীয়। ছোটবেলা থেকে এদেশের কথাবার্তা, আচার-আচরণ সবই তার কাছ থেকে শিখেছি, জেনেছি। আমার কথাবার্তায় কোন জড়তা দেখছ কি ?

তিন্‌নি বলল, একটুও না, সত্যি অবাক লাগছে !

ভাগ্‌তুরাম পথের দিকে ক্রাচখানা বাড়িয়ে বলল, তোরা গল্প কর, আমি এগোচ্ছি।

ভাগ্‌তু চলে গেলে ওরা আবার মুখোমুখি বসল।

অর্ক বলল, তোমার নিজের কোন দাদা আছে বলে তো শুনিনি?

তিন্‌নির মুখখানা উত্তর দিতে গিয়ে উদ্ভাসিত হল, আমার নিজের আর কোন ভাইবোন নেই ঠিক, কিন্তু ভাগ্‌তুরাম আমার আপনার ভাইয়ের চেয়েও বড়। ও আমাকে কোলেপিঠে নিয়ে মানুষ করেছে। আমাকে ধমক দেয়, শাসন করে, কিন্তু দরকার হলে ও প্রাণ দিয়ে দিতে পারে আমার জন্যে। এটা কিন্তু কথার কথা নয়, খাঁটি সত্যি।

এরপর ভাগ্‌তুরামকে নিয়ে কিছুক্ষণ কথা চলল দুজনের ভেতর।

অর্ক এক সময় বলল, তুমি কি মায়ের মত শিল্পী হবে ভেবেছ?

এই কয়েক ঘন্টা আগে মানালীতে পৌঁছে, আমার মায়ের সম্বন্ধে এত কথা জানলে কি করে?

আমার মায়ের মুখে তোমাদের পরিবারের সব কথাই শুনেছি। তাছাড়া প্রায় প্রতি ডাকে নানির চিঠিতে তোমাদের খবর থাকবেই।

ও তাই।

তোমার বাবা হঠাৎ করে চলে যাওয়ায় আমাদের পরিবারেও শোকের ছায়া ফেলেছিল। মা আক্ষেপ করে বলেছিল, আমি মা বাবার জন্যে কিছুই করতে পারিনি, যা করেছেন, ডাক্তার মুখার্জী। তাঁর সামান্য ঋণশোধেব সুযোগ না দিয়েই তিনি চলে গেলেন।

তিন্‌নির গলায় কষ্টের সুর ফুটে উঠল, বাবার প্রসঙ্গ এখন থাক অর্ক, এসো, আমরা বরং অন্য কথা বলি। হাঁ, তোমার প্রশ্নের উত্তর এখনও দেওয়া হয়নি। মায়ের ইচ্ছে গ্র্যাজুয়েট হবার পরে পুরোপুরি ছবি নিয়েই থাকি।

অর্ক মন্তব্য করল, আন্টি ঠিকই বলেছেন।

তিন্নি মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, তুমি কি মুখ দেখে জাতকের সবকিছু জানতে পার নাকি? ছবি যে আমার হাতে আসবে এ কথা তুমি জানলে কি করে?

অর্ক বলল, মৌমাছি, প্রজাপতিকে দেখলেই বলে দেওয়া যায়, তাদের সবথেকে আকর্ষণের বস্তুটি কি, অথবা কোথায় তাদের মানায়।

মিষ্টি হাসির ঢেউ তুলে তিন্নি বলল, কম্পিউটারে তুমি ছবি আঁক না কবিতা লেখ? তিন্নির হাসিতে যোগ দিয়ে অর্কও হেসে উঠল।

হাসি থামলে অর্ক বলল, তিন্নি, আজ কিন্তু তোমার কাছে অর্কদীপ নামে কালিফোর্ণিয়াবাসী কোন যুবক আসেনি। যে এসেছে সে এক জাঁদরেল জজ গৃহিণীর দূত মাত্র। নিছক একটি সমাচার পৌঁছে দিতে এসেছে।

তিন্নি ঘাড় কাৎ করে হাসি মুখে খবরটি শোনার জন্য চেয়ে রইল।

প্রভাতী চা ও নাস্তায় জজসাহেবের কোঠিতে তিন্নিদেবীর আমন্ত্রণ।

ঠিক আছে। কাল নাস্তার টেবিলে কালিফোর্ণিয়ার এক আগন্তুকের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হবে।

দুজনে নীচে নামবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

তিন্নি ভেতরের উজ্জ্বল আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বাইরের দরজা বন্ধ করল।

বনের সংকীর্ণ পথটা এখানে এসেই শেষ হয়েছে। লাইটপোস্ট থেকে ম্লান হলুদ বাল্‌বটা ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে বনের পথটাকে চেনাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এমনি দূরে দূরে কয়েকটা বাল্‌ব টিম্ টিম্ জ্বলছে।

বন রহস্যময়। আকাশে চাঁদ নেই। ঝিঁঝির ডাক একটানা বেজে চলেছে।

ওরা হাত ধরাধরি করে নামতে লাগল।

যেখানে একটা বাল্‌ব না থাকায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে অন্ধকার থমকে আছে সেখানে অনেক নীচের বাতিটার দিকে লক্ষ্য রেখে নামতে হচ্ছিল।

এখন তিন্নি শক্ত করে ধরেছে অর্কদীপের হাত।

তুমি আমার সঙ্গে নিশ্চিন্তে নেমে এসো। একটু আস্তে আর সাবধানে পা ফেলবে।

ওদের চলার গতি অনেকখানি কমে গেছে। এখানে শুধু চাপ চাপ অন্ধকার। ঝিঁঝিদের একটানা সানাই ঘন অন্ধকারে যেন মাতন তুলেছে। কয়েকটা জোনাকি উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে নাচতে নাচতে ওপরের দিকে উঠে গেল।

একবার থমকে দাঁড়াল অর্ক। হাতে টান পড়তেই থেমে গেল তিন্নিও। মুহূর্তে অজানা একটা আশঙ্কা তার সারা শরীরটাকে হিমেল ছোঁয়ায় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

পরমূহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে তিন্নি বলল, দাঁড়ালে যে?

অর্ক বলল, শোন, ঝিঁঝিরা কি অদ্ভুত ভাবে ডাকছে।

তিন্নি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে হল, অর্ক সত্যিই কবি। একটু অগে সে প্রজাপতি আর মৌমাছির কথা বলছিল। ফুল যে ওদের প্রিয় আর আকর্ষণের বস্তু তা যেমন

কাউকে বলে দিতে হয় না তেমনি তিন্‌নির যে শিল্পের ওপর আকর্ষণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অর্কের উত্তরটা ভারি ভাল লেগেছিল তখন। এই মুহূর্তে ওর ভেতরে একজন সত্যিকার কবিকে আবিষ্কার করল সে।

তিন্‌নি বলল, ওরা রাতের রাগিণী তুলেছে।

ভারি চমৎকার বললে তো।

দেখ অর্ক, দিনের মত রাত্রি নিজেকে আলোয়, উত্তাপে প্রকাশ করে না। তার প্রকাশ বড় স্নিগ্ধ। দিনের বেলা সবকিছু বড় বেশী লাউড। রাতে ঐ যে আকাশে কটি ঝিকিমিকি তারা, এই যে অন্ধকারের স্রোতে ভেসে গেল কটি জোনাকি, ঝিঁঝিদের করুণ সুরে একটানা ভায়োলিন বাজানো, এগুলোতেই ঘোমটা পরা রাতের হৃদয়টাকে চেনা যায়।

তুমি দার্শনিক তিন্‌নি।

আমাকে এতবড় কমপ্লিমেন্ট দিও না অর্ক। তবে আমি বলার চেয়ে ভাবতে বেশী ভালবাসি।

তোমার বলাও কিন্তু খুব সুন্দর।

আমি কথা কম বলি অর্ক। আজ হঠাৎ তোমার ভারি সুন্দর কয়েকটা অনুভূতি আমার মনকে ছুঁয়েছে, তাই এত কথা বলছি।

অর্ক বলল, আমার বুকের ওপর লেখাটা তোমার চোখে পড়েছে?

ওটা কেবল তোমার বুকের ভাষা নয় অর্ক, আমাদের মত আজকের সব তরুণ-তরুণীর হৃদয়ের ভাষা। 'উই আর ফ্রেণ্ডস'। কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনটা ভরে ওঠে অর্ক।

সামান্য সময়ে আর কোন কথা হল না। দুজনের হাতের স্পর্শ দুজনকে অনুভব করল।

চল নামি।

দুটি তরুণ তরুণী অল্প সময়ের ভেতরেই আলোর রাজ্যে এসে পড়ল।

তিন্‌নি বলল, চল তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

অর্ক বলল, আমি একবার যে পথে আসি সে পথ ভুলি না।

তিন্‌নি বলল, আমারও তোমার মত একটা গুণ আছে।

কি ?

আমি যাকে একবার দেখি এবং একটি কথা অন্তত বলি তাকে কোনদিন ভুলি না।

অর্ক বলল, তোমার কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম।

দুজনেই হেসে উঠল।

হাসি থামলে অর্ক বলল, আমি পথ চিনি কিন্তু পথের বন্ধুকে সহজে ছেড়ে দিই না।

আবার হাসি, দুজনে দুজনের হাত ধরল।

তিন্‌নি বলল, এবার তোমাকে আর একটা পথ চিনিয়ে নিয়ে যাব। এটা বাঁধানো পথ নয়, আপেল বাগিচার ভেতরের পথ।

ওটা তো অন্ধকারে ঢাকা।

আমি কি তোমাকে অনেকখানি অন্ধকারের পথ পার করে আনিনি? তাছাড়া আমার ছবিঘরে ওঠার সময় তুমি তো ঐ অন্ধকারের পথটুকু একাই পেরিয়ে গিয়েছিলে।

অর্ক বলল, আমার ওঠাব সময় কিন্তু তোমার ঘরের ঐ উজ্জ্বল আলোর কিছুটা রশ্মি ঐ পথে ছড়িয়ে পড়েছিল।

তিন্নি বলল, ভয় নেই। ঐ আপেল বাগিচা জুলিয়েন আঙ্কেলের। ওখানে সারারাত আলো জ্বলে। তিনটি মেয়ে বাগিচার ভেতর কুঠিতে থাকে।

বাগানের পথে চলতে চলতেই ওদের কথা হচ্ছিল।

ওদের কাজ কি ?

তদারকি করা। আপেল বাগানে জুলিয়েন আঙ্কেলের নার্সারি আছে। সেগুলোর পরিচর্যা করে ওরা। তাছাড়া 'এপ্রিল-মে'তে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হলে কিংবা হঠাৎ বরফ পড়তে শুরু করলে ওরা নানাভাবে ফলের গুটি রক্ষার চেষ্টা করে। ফলের মুরসুমে তৈরী ফল খাবার জন্য ফ্লাইং ফক্সের হামলা তো আছেই। এরা সেই সব ঠেকায় নানা কৌশলে।

একটা কুহলের শব্দ ওরা শুনতে পেল। বাগিচার ভেতর দিয়ে জলস্রোত বয়ে চলেছে। জলে উপলে মিলে জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে।

একটা অপরিসর কংক্রিটের সাঁকো পেরিয়ে কুহলটার ওপারে গেল ওরা। সাঁকোর পাশে আলোটা বেশ উজ্জ্বল। সেই আলোর টুকরো পড়ে কুহলের স্রোত ঝলকাচ্ছে। তারই ধারে বাগানের একমাত্র পাইন গাছটি দাঁড়িয়ে আছে। পাইনের তলায় একটি মসৃণ বাদামী পাথরের বেঞ্চ।

অর্ক বলল, যাঁর বাগান তিনি বেশ শৌখিন মানুষ।

তিন্নি বলল, জুলিয়েন আঙ্কেল যেমন শৌখিন তেমনি মেজাজী। আমার বাবার সঙ্গে ওঁর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। এখন আমাদের কুলু, মানালীর দুটো বাগানই উনি দেখেন।

একদিন ওঁর সঙ্গে আলাপ করব।

বেশ তো, আমি একদিন আঙ্কেলের কাছে তোমাকে নিয়ে যাব।

কি পরিচয় দেবে?

বলব, আমার এক বিদেশী বন্ধু। সানসাইন অর্চার্ডের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

অর্ক বলল, এই বাগিচার নাম বুঝি 'সানসাইন অর্চার্ড ?'

এসো, আঙ্কেলের বাগিচার ঐ বেঞ্চে দুদণ্ড বসি।

ওরা বেঞ্চের ওপর পাশাপাশি বসল।

তিন্নি বলল, হ্যাঁ বাগিচার ঐ নাম। এই অর্চার্ডের খ্যাতি আজও সব জায়গায়। জুলিয়েন আঙ্কেলের গ্রেট গ্র্যাণ্ড ফাদার এইটিন এইট্টি ফোরে মানালীতে আপেল বাগিচার পত্তন করেন। তাঁর নাম ছিল ক্যাপ্টেন এ. টি. বেনন।

কুলু ভ্যালিতে তিনিই তাহলে প্রথম আপেল বাগিচার পত্তন করেন?

না, প্রথম করেন ক্যাপ্টেন লী 'বান্দ্রোলে'। তাঁর প্রেরণায় ক্যাপ্টেন বেনন 'মানালীতে'।

অর্ক বলল, এখন কুলুতে খুব উৎকৃষ্ট আপেলের অনেক বাগিচা হয়েছে বলে শুনেছি।

তোমার নানা বদরীপ্রসাদজীরও একটি বাগিচা আছে। ছোট কিন্তু মূল্যবান। কুলুর বিখ্যাত গোল্ডেন অ্যাপেলের গার্ডেন।

আমি জানি উনি ঐ আপেল মার্কেটে পাঠান না। আত্মীয় বন্ধুদের পার্শেল করে উপহার পাঠান।

ঠিক। চাষবাসের দিকে ওঁর খুব নজর। উৎকৃষ্ট গমের একটি ক্ষেতও আছে। নানান ফুলের চাষ নিয়েও মেতে থাকেন।

হাঁ নানার এসব হবি আছে। শুনেছি তোমাদের উনি খুব ভালবাসেন। নানির মুখে প্রায়ই তোমাদের নাম শুনি।

তিন্‌নি বলল, তুমি হয়তো জান না, ওঁর গার্ডেনের প্রথম তোলা কয়েকটা আপেল উনি সবার আগে বাবার কাছে উপহার হিসেবে পাঠাতেন। বাবা মারা যাবার পর তোমার নানি নিজে এসে মাকে ঐ আপেল দিয়ে যান। তাছাড়া আমি নানার কাছ থেকে মাঝে মাঝে ফুল উপহার পাই।

অর্ক হেসে বলল, আমার নানা নানির কাছে কিন্তু তুমি আমার চেয়েও প্রিয়।

তিন্‌নি হেসে উঠে বলল, ঐ দেখ, তোমার কথা শুনে চাঁদটা পাহাড়ের মাথায় উঁকি দিয়ে হাসছে।

ধীরে ধীরে চাঁদটা পাহাড়ের মাথায় উঠে এল। কৃষ্ণা প্রতিপদের চাঁদ। ঝক্‌ঝক্ করছে। দুধ ঢেলে স্নান করিয়ে দিচ্ছে চরাচর। বনের মাথা থেকে সরে গেছে অন্ধকারের ঘোমটা।

একটি মেয়ে কুহলের ওপার থেকে অনুচ্চে ডাক দিয়ে বলল, তিন্‌নি দিদি?

তিন্‌নি এতক্ষণ কথায় মশগুল হয়ে কোনদিকে তাকায়নি। সে এখন শব্দের দিকে মুখ ফেরাল।

কে, পার্বতী?

কৌতূহলী মহিলাটি হাতছনি দিয়ে তিন্‌নিকে কাছে ডাকল। সে সংকোচে সাঁকো পেরিয়ে আসতে পারছিল না।

তিন্‌নি ওর কাছে এগিয়ে গেল।

ওরা হাত নেড়ে অনুচ্চে কথা বলছিল। অর্কের কানে এসে পৌঁছচ্ছিল না সে সব কথা।

তিন্‌নি দিদি, ঐ সুন্দর ছেলেটি কে? ওকে অগে তো কখনো মানালীতে দেখেছি বলে মন হয় না।

ছেলেটি আজই এসে পৌঁছেছে আমেরিকা থেকে। জর্জ সাহেবের নাতি। ওকে এই বাগানের ভেতর দিয়ে বদরীপ্রসাদজীর বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলাম।

তোমার কুঠিতে গিয়েছিল বুঝি?

তিন্‌নি পাহাড়ের ওপর ছবিঘরের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

আমি যাচ্ছি তিন্নি দিদি।

তিন্নি বলল, যাও, তোমাদের তো আবার খাবার সময় হয়ে গেছে। আমি এখুনি এই পথেই ফিরে আসব।

অর্ককে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল তিন্নি।

সানসাইন অর্চার্ড পেরিয়ে পথ। পথের ওপারে বদরীপ্রসাদের ছোট্ট বাগান। তারপরেই জজসাহেবের ছবির মত বাড়িখানা।

এবার নিশ্চয় যেতে পারবে?

পারব, কিন্তু তুমি আসবে না?

আসব, তবে আজ নয় কাল। নাস্তার নিমন্ত্রণে।

অর্ক হাত নেড়ে বিদায় নিয়ে পথ পার হয়ে বাগানে নেমে গেল। ওর চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইল তিন্নি।

দুই

মা বলল, এত দেরী কেন রে তিন্নি? সেই কত আগে ছবিঘরের আলো নিভতে দেখলাম, ছিলি কোথায়?

কেন, ভাগ্‌তুদা তোমাকে কিছু বলেনি?

বদরীপ্রসাদজীর নাতি এসেছে বলেছিল। সে নাকি ছবিঘরে গিয়েছিল তোর সঙ্গে দেখা করতে।

তিন্নি হঠাৎ মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, ভেরি ভেরি হ্যাণ্ডসাম ইয়ং ম্যান। ওকে তোমার সামোসা খাইয়ে দিয়েছি। বলল, দারুণ !

মোটে তিনটে তো পাঠিয়েছিলাম, একটা ভাগ্‌তুর, তোর দুটো।

ভাগ্‌তুদার একটা কেন?

ও তো এখানে খেয়ে গেছে। তবু তুই ওকে না দিয়ে খাবি না বলে একটা বেশী পাঠিয়েছিলাম।

তোমার লোভী পুত্রকে একটা খাইয়েছি। আমরা দুজনে বাকি দুটো খেয়েছি। তাই খেয়েই অর্কদীপ প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ছেলেটির নাম অর্কদীপ বুঝি?

হাঁ মা। নামটা কিন্তু বেশ।

অর্কদীপ মানে কি রে? তোর বাবা তো তোকে সংস্কৃত পড়িয়েছিল।

তিন্নি বলল, অর্ক মানে সূর্য। সূর্য তো বিশাল এক দীপ। সেই দীপ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে আলো।

তা ছেলেটি জজসাহেবের ওখানে চলে গেল?

আমি এগিয়ে দিয়ে এলাম।

তোর দেরী হচ্ছে দেখে আমি ভাগ্‌তুকে তোর খোঁজে পাঠিয়েছিলাম। ও সারা পথ ঢুঁড়ে এসেছে, তোদের কোথাও দেখতে পায়নি।

আমি ওকে জুলিয়েন আঙ্কেলের আপেল অর্চার্ডের ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। পথটা শর্টকাট, তাই।

ওখানে মেয়েরা ছিল না?

থাকলই বা, ওরা কি আমাকে বাধা দেবে নাকি? পার্বতীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, অর্কের পরিচয় জানতে চাইল, বলে দিলাম।

ব্যাপারটা ঠিক হল না।

কেন মা, অন্যায় তো কিছু করিনি। বরং জুলিয়েন আঙ্কেলের অর্চার্ডের ঐ বেঞ্চটায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করেছিলাম। চাঁদ উঠল আর আমরাও উঠলাম।

ঝিন্নিদেবী বললেন, আমি জানি, কোন রকম অবিবেচনার কাজই তুই করতে পারিস না। তবু সামান্য সূত্র ধরে জটিল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

পরিস্থিতি হঠাৎ জটিল হতে যাবে কেন মা? ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না।

রাতে শোবার সময় তোকে সব বুঝিয়ে বলব।

অতএব ডিনার পর্ব, তারপর শয়ন পর্ব পর্যন্ত তিন্‌নিকে একটা সাসপেন্সে থাকতে হল।

শোবার ঘরের লম্বা বড় জানালাটার ধারে দুটো চেয়ার পেতে বসেছে মা ও মেয়ে। নিচে গভীর ভ্যালিটার বুক চিরে এঁকে বেঁকে মানালসু নদীটা বয়ে চলেছে। চাঁদের আলো পড়ে ধবধব করছে উপবীতের মত। পাইন গাছের সারি, বড় ছোট শিলাখন্ড ডুবে আছে চাঁদের স্বচ্ছ জলে। অদ্ভুত মায়াময় সাগরতল বলে মনে হচ্ছে চাঁদের আলোয় ডোবা গভীর ভ্যালিটাকে। উপত্যকার চারদিক ঘিরে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা, তারই ফাঁকে ফাঁকে কোথাও কোথাও জনবসতির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

ঝিন্নিদেবী ভ্যালির ওপারে একটা পাহাড়ের দিকে আঙুল তুলে বললেন, ঐ পাহাড়টার কথা মনে পড়ে তিন্‌নি?

পড়ে বইকি মা। বার তের বছর বয়স পর্যন্ত বাবার টাট্টুর সামনে চড়ে এই ভ্যালি পেরিয়ে ওই পাহাড়ে উঠেছি।

ওখানে তোর বালু আন্টির বাবা পণ্ডিতজী বিকেলে সুর করে রামায়ণ পড়তেন, মনে পড়ে?

পাহাড়ী বস্তির মেয়েরা সারি সারি বসে ওঁর মুখ থেকে তুলসীদাসের রামায়ণ গান শুনত। আর বাবার টাট্টু উঠোনে পৌঁছলেই মেয়েরা নমস্কার করে সরে দাঁড়াত। পণ্ডিতজী পুঁথি রেখে উঠে আসতেন। বাবা পাশের ঘরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করত। আমি ততক্ষণ মেয়েদের দেওয়া তিলৌড়ি খেতাম। বাবা খেতে ভালবাসত বলে ওরা অনেক কটা ঠোঙায় পুরে আমারে হাতে দিয়ে দিত।

সবই দেখছি মনে আছে তোর।

এই তো সেদিনের কথা মা।

পণ্ডিতজীর সাংসারিক অবস্থা কিন্তু ভাল ছিল না। মা মরা ঐ বালু আন্টিকে নিয়ে খুব কষ্টেই তাঁর দিন কাটত। তিনি জাতিতে রাজপুত হয়েও কুলুতে এসে কৃষিজীবী কানেতের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, তাই পতিত হলেন নিজের সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে। দু'এক বিঘে ক্ষেতির ফসলে সংসার চলত টেনেটুনে। স্ত্রী মারা গেলেন। ছেলেটা মিলিটারীতে ঢুকল। একটি পয়সা পাঠাল না বাবাকে। ছোট মেয়েটাকে নিয়ে পণ্ডিতজী পড়ে রইলেন ঐ পাহাড়ী কুঠিতে।

তিন্নি বলল, বালু আন্টির যে একজন দাদা আছেন, তা তো জানতাম না।

থেকেও যে নেই তার কথা কে মনে রাখে মা।

তিন্নি বলল, বালু আন্টির সঙ্গে কি করে বিয়ে হল মা জুলিয়েন আঙ্কেলের? ধর্ম কিংবা পদমর্যাদা কোনটাতেই তো মেলে না। ওঁদেরও কি আমার মা বাবার মত ভালবাসার বিয়ে, না অন্য কিছু?

না মা, একটা পরিস্থিতির ভেতরে পড়ে ওদের বিয়েটা হয়ে যায়। এই পরিস্থিতির ভেতরে আমি, তোর বাবা সকলেই জড়িয়েছিলাম।

কি রকম মা?

সেটা বলব বলেই আজ তোকে এখানে ডেকে এনেছি।

খানিক সময় থামলেন ঝিন্নিদেবী। তিন্নি অজানা কিছু জানার জন্য মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

আমি তখন থাকি নাগ্‌গরে। রোয়েরিক আর্ট গ্যালারিতে কাজ নিয়ে আছি। তোর বাবা তখন একটা ডিস্‌পেনসারি খুলেছে মানালীতে। তোর নানা নরসিংলালজী কুলু মানালীর দুটো অর্চার্ডই তদারকি করছে।

তখন কি তোমাদের বিয়ে হয়ে গেছে?

না। তবে আমরা স্থির করে ফেলেছিলাম বিয়ে করব বলে। সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।

তোমরা দুজনেই তো ব্রাহ্মণ ছিলে মা, তবে বাধাটা কোথায়?

আমার বাবা খুবই সাচ্চা মানুষ ছিলেন। তিনি কুলু মানালীর বাগিচা নিজের নামেই করে নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি কলকাতা থেকে তোমার বাবাকে ডেকে এনে তার হাতেই বাগিচা দুটি তুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তোমার বাবা বলল, চাচাজী, আমি অতশত বুঝি না, আপনি যেমন বাগানের কাজ চালাচ্ছিলেন তেমনি চালাবেন। আমি মানালীতে ডাক্তারী করব।

সে না হয় হল, কিন্তু তোমাদের বিয়েতে বাধাটা এল কোন দিক থেকে?

আমার বাবার বড় লোক-নিন্দার ভয় ছিল। তাঁর মনে হয়েছিল আমাদের বিয়ে হলে লোকে ভাববে, নরসিংলালজী বড় চালাক লোক।

কেন, এতে চালাকির কি আছে?

ওরা ভাববে, নিজের মেয়েটিকে গছিয়ে দিয়ে দুটো বাগান নিজের কব্জায় রেখে দিলে। ডাক্তারের অন্য জায়গায় বিয়ে হলে নরসিংলালের আর এমন নবাবী থাকত না।

এর সমাধান হল কি করে?

আমরা স্থির করে ফেলেছিলাম, যত বাধাই আসুক ডিসেম্বরে কোলি-রি-দেওয়ালির মেলা বসবে নাগ্গরে, সারা রাত বাজি পুড়বে, সেই দিনই আমরা বিয়ে করব। কিন্তু একটা বাধা এল। সে বাধাটা আমিই সৃষ্টি করলাম। আমারই ভুলে বিপর্যয় ঘটল।

কি রকম?

পণ্ডিতজী অসুস্থ হয়ে পড়লে তোমার বাবা একবার তাঁকে দেখতে গিয়েছিল। সেখানেই বালুর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়। তোমার বাবার মনটি ছিল কোমল। পণ্ডিতজীর সংসারের চরম দুরবস্থা দেখে বালুকে তার ডাক্তারখানার কাজে বহাল করে। ডেলিভারি কেসে বালু তোমার বাবার সঙ্গে সব জায়গাতেই যেত। পাহাড়ী মেয়েদের সংকোচের জন্যেই এ ব্যবস্থাটা করতে হয়েছিল। কিন্তু খবরটা কানে আসতেই আমি ভুল বুঝলাম। নাগ্গর থেকে ছুটে গেলাম মানালী। বালুকে দেখলাম, পরিচয় হল। হঠাৎ তোমার বাবা সামান্য কারণে আমার সামনেই তিরস্কার করল বালুকে। অভিমানী বালু বিদায় নিল চোখের জল ফেলে। সে আর তোমার বাবার কাজে এল না। অমনি নাগ্গরে ফিরে এলাম।

তারপর?

ঘটনাচক্রে ভুল পথে পা বাড়াল বালু।

কি রকম!

সিজ্ন টাইমে পথের ধারে যে রেস্টুরেন্টগুলো গড়ে ওঠে তারই একটাতে রান্নার কাজ নিল ও। সে বছর পঙ্গপালের মত কুলু মানালীর পথঘাট ছেয়ে ফেলেছিল হিপিরা। কি করে যেন তাদেরই একজন মোহগ্রস্ত করে ফেলল বালুকে। সন্তানসম্ভবা হল ও।

বালু আন্টি !

দুঃখ পেও না মা, ঘৃণা কর না। অনেক সময় দারিদ্র্যের অসহ্য জ্বালা সইতে না পেরে মানুষকে অনেক অনেক নীচে নামতে হয়।

ঝিন্নিদেবী দেখলেন তিন্নি দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

কেঁদো না মা। মানুষই অবস্থার বিপাকে পাপের ভেতর জড়িয়ে পড়ে, আবার অবস্থার পরিবর্তনে নির্মল, শুদ্ধ হয়। তোমার বালু আন্টি এখন দুঃখের আগুন থেকে বেরিয়ে এসেছে নিষ্কলঙ্ক, উজ্জ্বল সোনার মত।

নিজেকে সামলে নিয়ে তিন্নি চোখ মুছে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি বলে যাও মা।

হিপিরা উড়ে চলে গেল বালুকে নিঃস্ব করে দিয়ে। অসহায় বালু পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এ সময় জুলিয়েনদের ফলের বাগানে একটা কাজ পেয়ে গেল বালু। পার্বতীরা এখন যে সব কাজ করছে, সেই কাজ।

তখন কি জুলিয়েন আঙ্কেলই বাগিচার কাজ দেখতেন?

দেখত, তবে জুলিয়েনের বাবা তখন বেঁচে। তিনিই ছিলেন সবকিছুর মালিক।

তিন্‌নি বলল, এখন তুমি বালু আন্টির কথা বল।

বালু বাগানের কাজে যোগ দেবার পর জুলিয়েন মাস তিনেকের জন্য ফলের বাজার স্টাডি করতে বাইরে বেরিয়ে গেল। তারই ভেতর বালু যোগ দিল আমাদের বাগানে। ঠিক তখনই ঘটল দুর্ঘটনা।

কি দুর্ঘটনা মা?

বাগিচায় কাজ করার সময় একদিন পা পিছলে পড়ে গেল বালু। আঘাত পেল প্রচণ্ড। অচৈতন্য অবস্থায় তাকে বাগিচার অন্যান্য মেয়েরা তুলে নিয়ে এসে বাবার ডিস্‌পেনসারিতে হাজির করল।

ঝিন্নিদেবী সামান্য সময় থামলেন।

তিন্‌নি তখন ঘটনাটা জানার আগ্রহে অধীর। সে বলে উঠল, মা তারপর?

কম্পাউণ্ডার বাবুকে সঙ্গে নিয়ে তোর বাবা বড় রকম একটা অপারেশন করল। গর্ভস্থ শিশুটি আগেই মারা গিয়েছিল, অনেক চেষ্টায় মা বেঁচে গেল। কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারল না একজন।

কে মা?

লোকনিন্দার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারল না তোমার বাবা।

ঐ কম্পাউণ্ডার রটিয়ে দিল বালুর ব্যাপারটা। কিছু আর গোপন রইল না। আশপাশের সমস্ত লোক ভেবে নিল তোর বাবাই এসব অবৈধ কাজ করেছে। আর তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য অপারেশান করে নষ্ট করে দিয়েছে শিশুটাকে।

আশ্চর্য! যারা আমার বাবাকে দেবতা বলে ভাবত তারাই এমন মিথ্যা অপবাদ ছড়ালে!

অন্য মানুষকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই মা, আমি নিজেই অপরাধী।

তুমিও!

তোর নানাকে বিষিয়ে দিয়েছিল ঐ কম্পাউণ্ডার। আমিও মা মানালী থেকে দূরে নাগ্‌গরে বসে চোখের জলে ভেসে ঐ কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম।

ঝিন্নিদেবী সেদিনের কথা ভেবে গড়িয়ে পড়া চোখের জল আঁচলে মুছতে লাগলেন।

তারপর বাবার কি হল মা?

বালু তার অপরাধের কথা তোর বাবার কাছে স্বীকার করল। এ নিয়ে তোর বাবা কোন লোকের কাছে সাফাই গাইতে গেল না।

উদ্দীপ্ত হয়ে তিন্‌নি বলল, কেন যাবে বাবা? আত্মসম্মান যাঁর আছে তিনি কখনও কৈফিয়ৎ দিতে যাবেন না।

এরপর একটি অবাক কাণ্ড ঘটল।

কি কাণ্ড মা?

তোর জুলিয়েন আঙ্কেল ট্যুর থেকে ফিরে এসে বাবার মুখ থেকে সব কথা শুনল। শুনেই ক্ষেপে উঠে বন্ধুর সম্মান রক্ষার জন্য একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে বসল।

কি রকম?

সে রটিয়ে দিল, বালুর গর্ভে তারই সন্তান ছিল। ট্যুর থেকে ফিরে এসে বালুকে সে বিয়ে করবে স্থির করে রেখেছিল। তার অনুপস্থিতিতে এই অঘটন ঘটে গেছে।

গ্রেট।

শুধু রটনা করে দিয়েই চুপচাপ বসে থাকেনি। নিজের মায়ের মতটুকুও আদায় করে নিল। তারপর রাজ্যসুদ্ধু লোককে চিঠি পাঠিয়ে বিয়ের নেমন্তন্ন করে বিরাট রিসেপশান দিল।

বালু আন্টির মনের অবস্থা তখন কি রকম?

মেয়েটি তো আসলে সরল প্রকৃতির। সে ভাবতেই পারেনি এত গভীর নরক থেকে সে কোনদিন স্বর্গের দরজায় এসে দাঁড়াতে পারবে। তাই ডাক্তার আর তার বন্ধু জুলিয়েনের কাছে কেঁদে কেটে সারা হল।

বিয়ের পরও কি জুলিয়েন আঙ্কেল সমান সমাদর করতেন বালু আন্টিকে?

ঐ বোহেমিয়ান মানুষটি আজ পর্যন্ত বালুকে তার নিজের মায়ের মত সমান মর্যাদার আসনে বসিয়ে রেখে দিয়েছে। ওর মত এতবড় হৃদয়ের মানুষ তোমার বাবা ছাড়া আর কেউ আছেন কি না আমার জানা নেই।

তিন্‌নি প্রাণখুলে হেসে উঠল।

হাস্‌লি যে?

তুমি বাবাকে এতবড় কমপ্লিমেন্ট দিলে, তাই হেসে অভিনন্দন জানালাম।

অনেক দুঃখ দিয়েছি আমি তোর বাবাকে, কিন্তু এতবড় ক্ষমার হাত বাড়িয়ে দিতে আমি কাউকে দেখিনি। সেবায়, সান্ত্বনায় ভরিয়ে দিত তার চারিদিকের মানুষদের, আর আপনজনদের ভরে রাখত তার বুকের পাঁজরে।

বাবার কথায় চোখ দুটো ছলছল করে উঠল তিন্‌নির।

ঝিন্নিদেবী মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, এখন শোন, কেন আমি জুলিয়েনের বাগান দিয়ে রাতে তোদের যাওয়াটা পছন্দ করিনি।

কেন মা?

এক সময় বদরীপ্রসাদজীর মেয়ে সিমলায় কনভেন্টে থেকে পড়াশোনা করত। তখন বেননদের সঙ্গে ওঁদের খুব ভাবসাব ছিল। বদরীপ্রসাদজী থাকতেন দিল্লীতে। সরযুদেবী কিন্তু এই মানালীর বাড়িখানি আগলে থাকতেন। আপদে বিপদে সাহায্য চাইতেন বেননদের।

এখন তো ওদের সঙ্গে খুব যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না মা।

ঠিকই বুঝেছিস, তবে আসল কারণটা জানিস না।

কি কারণ মা?

সরযুদেবীর ইচ্ছে ছিল নিজের একটি মাত্র মেয়েকে কাছে রেখে দেবার। সেজন্যে তিনি জাত খুইয়ে বেননদের ছেলে জুলিয়েনকেও জামাই করতে রাজি ছিলেন। স্বামী দূরে থাকত বলে জুলিয়েনকে কখনো সখনো সিমলা পাঠাতেন মেয়ের খোঁজখবর নিতে। অবশ্য সিমলায় জুলিয়েনদের প্রায়ই কাজ থাকত, সেজন্যে ওদের পক্ষে সিমলায় যাওয়া কোন ব্যাপারই ছিল না। একবার জজসাহেবের অসুস্থ মেয়ে সুমনাকে সিমলার কনভেন্ট থেকে নিয়েও এসেছিল জুলিয়েন। সুমনাকে বিয়ে করবে এমন মতলব তার আদপেই ছিল না। কেবল কাতর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সে মানবতার খাতিরে এসব কাজ করত। কিন্তু অপমানিত হল একদিন।

কি রকম?

বদরীপ্রসাদজী একবার বাড়ি এসেছেন। ছুটিতে সুমনাও এসেছে। সম্ভবত সেই প্রথম তিনি স্ত্রীর মুখ থেকে জুলিয়েনকে জামাই করার প্রস্তাবটি পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলেন জজসাহেব। আর ঠিক সেই সময়েই বাগান পেরিয়ে ওঁর বাড়ির দিকে আসছিল জুলিয়েন। জজসাহেব ঘরের ভেতর থেকে উত্তেজিত অবস্থায় স্ত্রীকে বললেন, ঐ যে লোফারটা আসছে। কথাটা সঙ্গে সঙ্গে কানে গিয়ে বিঁধে গেল জুলিয়েনের।

এরকম অসম্মানজনক একটা কথা বলে ফেললেন এত বড় একজন সম্মানীয় লোক!

তাই বলেছিলেন মা।

শুনে জুলিয়েন আঙ্কেল সহ্য করে গেলেন?

এক মুহূর্ত থেমে দাঁড়াল জুলিয়েন। তারপর সোজা এগিয়ে গিয়ে জজসাহেবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, বদরীপ্রসাদজী, এই প্রথম একজন অমানুষ, জুলিয়েন বেনন সম্বন্ধে ইতর কথা বলে পার পেয়ে গেল। আপনার জমির ওপর দিয়ে আমি এসেছি আবার জমিটা পেরিয়ে যেতে হবে, একথা ভেবে ঘৃণায় আমার সারা শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে। নিশ্চিন্ত থাকুন, এই অপবিত্র ভূমি জুলিয়েন বেনন আর কোনদিন মাড়াবে না।

তিন্‌নি বলল, এ কথা আমার জানা থাকলে আমি কিছুতেই অর্ককে জুলিয়েন আঙ্কেলের অর্চার্ডের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতাম না। কিন্তু মা ...।

বল?

আমাদের সঙ্গে বদরীপ্রসাদজীদের এত ভাব ভালবাসা হল কি করে?

ডাক্তারদের পরিবারের সঙ্গে কারু বিরোধ থাকে না মা। মানুষের সেবা করাই ডাক্তারদের কাজ। তাই মানুষও তাঁদের কৃতজ্ঞতা, ভালবাসা জনদরদী ডাক্তারদের উজাড় করে দেন।

এবার তিন্‌নি বলল, কাল জজসাহেবের বাড়িতে আমাকে নাস্তার নিমন্ত্রণ করে গেছে। আমি কি যাব মা?

অবশ্যই যাবে।

তুমি প্রাণখুলে বলছ মা?

নিশ্চয়ই।

জুলিয়েন আঙ্কেল জানতে পারলে কিছু ভাববেন না তো?

ঝিন্নিদেবী অবাক হয়ে বললেন, আমাদের সঙ্গে তো কারো বিরোধ নেই। তাছাড়া জুলিয়েন-বদরীপ্রসাদ বিরোধের চিরস্থায়ী না হলেও অস্থায়ী একটা সমাধান হয়ে গেছে। বলতে পারা যায় এখন ব্যাপারটা মন থেকে একেবারে মুছে না গেলেও মনের গভীরে চাপা পড়ে আছে।

এটা ঘটল কি করে মা?

জুলিয়েনের বিয়ের রিসেপশানে তোর বাবা জজসাহেবের বাড়িতেও চিঠি পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। জুলিয়েন এবং তার পরিবারের সবাই সেই আনন্দ উৎসবের দিনে তোর বাবার পরামর্শটি সানন্দে মেনে নিয়েছিল।

ওঁরা রিসেপশানে এসেছিলেন কি?

জজসাহেব আসেননি, কিন্তু সরযুদেবী এসেছিলেন। তিনি সোনার লকেট ঝোলানো আসল একটি মুক্তোর মালা বালুর গলায় পরিয়ে দেন। তারপর জুলিয়েনকে একান্তে ডেকে তার হাতে তুলে দেন একটি দামী ঘড়ি।

তিন্নি বলল, তাহলে তো মা, দুবাড়ির ভেতর আর মনোমালিন্য থাকার কথা নয়।

ঝিন্নিদেবী বললেন, ঐ একটা অনুষ্ঠান-বাড়িতে আসা-যাওয়া নিয়ে কিছু বোঝা যাবে না।

তুমি এ রকম কেন ভাবছ মা?

আসলে জুলিয়েন নিজে ওদের বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ করেনি, আর যাঁর সঙ্গে সংঘাত তিনি স্বয়ং আসেননি।

তিন্নি বলল, থাকগে মা, ওসব আমাদের ভেবে কাজ নেই।

বড়রা ওঁদের মান-মর্যাদা, হিংসা-বিবাদ নিয়ে থাকুন। আমরা নতুন জেনারেশানের সবাই বন্ধু।

পরের দিন মিষ্টি, নোন্তা, ফল ইত্যাদি নানা ধরনের খাবারে প্লেট সাজিয়ে সবাইকে পরিবেশন করলেন সরযুদেবী। সবাই বলতে অর্ক, তিন্নি আর ওঁরা দুজন।

খেতে খেতে ওঁরা নানা রকমের কথা বলছিলেন। হাল্কা হাসির কথায় হেসে উঠছিল সবাই। অর্ক তার বন্ধুদের বিষয়ে অনেক রকম মজার কাহিনী বলছিল।

চা পরিবেশনের সময় তিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে নিজেই ভারটা নিল।

ভারি খুশি হয়ে উঠলেন জজসাহেব। বললেন, তোমার মায়ের হাতে অনেকবার চা খেয়েছি, কিন্তু আমার বাড়িতে এসে তুমি নিজের হাতে চা পরিবেশন করছ, এর স্বাদ অন্য রকম।

অর্ক বলল, তবু কোন্ স্বাদটা একটু বেশী ভাল নানা?

দুটোই উত্তম তবে এর স্বাদটা একটু বেশী মিষ্টি।

সরযুদেবী বললেন, মাঝে মাঝে তিন্নির হাতের চা পেলে এ বয়সটা বড় সুখে কাটত।

হঠাৎ বদরীপ্রসাদজী একটা কথা বলে ফেললেন, তাহলে চল এই মিষ্টি মেয়েটাকে সঙ্গে

নিয়ে আমরা সবাই কালিফোর্ণিয়া চলে যাই। সেখানে রোজ ওর হাতের চাটা অন্তত পাওয়া যাবে।

সরযুদেবী বললেন, তা কি করে হয়।

জজসাহেব বলে উঠলেন, কেন, ঝিন্নি তো প্রায়ই বলে, চাচাজী ছবি আঁকা শিখতে আমার বিদেশ যাবার যোগ ছিল, হল না। মেয়েটাকে যদি পাঠাতে পারি তাহলে কিছুটা অন্তত ইচ্ছা পূরণ হয়।

তিন্‌নির চা পরিবেশন হয়ে গিয়েছিল। সে এখন নিজের জায়গায় বসে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিয়েছে। চুমুক দিচ্ছে কাপে।

সরযুদেবী বললেন, তোমার কি ইচ্ছে তিন্‌নি?

মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল তিন্‌নির মুখে। সে বলল, আগে তো ভারত-শিল্পটাকে বুঝি, তারপর বিদেশী আর্ট নিয়ে চর্চা করা যাবে।

অর্ক বলল, তুমি ভারত-শিল্প বলতে কি বোঝাতে চাইছ?

আমাদের এই হিমাচল প্রদেশেই রয়েছে কাংড়া।

এক সময় কাংড়ার পাহাড় এলাকার রাজারা শিল্পীদের উৎসাহ দিতেন। ওখানে শিল্পের একটা শৈলী গড়ে ওঠে। এখন ঐ কাংড়া পেইন্টিং ভারতবিখ্যাত হয়ে গেছে।

অর্ক জানতে চাইল, আর কিছু?

আরও অনেক কিছু আছে। অজন্তা গুহাচিত্র, মোগল আর রাজপুত পেইন্টিং। ভাস্কর্যের ব্যাপারটা এর ভেতর ধরছি না।

অর্ক বলল, আমি ছবি দেখতে ভালবাসি, তবে শিল্প নিয়ে বিশেষ কোন চর্চা আমার নেই। কোন ছবি ভাল লাগে, কোনটা লাগে না। নিছক চোখের ভাল লাগালাগি।

একটু থেমে গিয়ে অন্য একটা প্রশ্ন করল অর্ক, তোমাকে যদি ছবি আঁকা শেখার জন্য ভারত ছাড়া অন্য কোন একটা দেশ বেছে নিতে বলা হয়, তুমি কোনটা নেবে?

আমার ফার্স্ট চয়েস জাপান, তারপর ফ্রান্স।

অর্ক বলল, আমি ছবির কথা বলছি না, আমেরিকা সম্বন্ধে তোমার কোন ঔৎসুক্য নেই?

যাঁরা বিজ্ঞান চর্চা করছেন, তাঁদের কাছে ওটা প্যারাডাইস। আমি বিজ্ঞানের ছাত্রী নই। যতটুকু পড়েছি বা শুনেছি তাতে আমেরিকার সমাজ-ব্যবস্থা আমার চোখে ভাল লাগে না। বাবা মা, অথবা বুড়ো দাদা দাদি, নানা নানিকে নিঃসঙ্গ ফেলে আমরা চলে যাবার কথা ভাবতেও পারি না। তবে ঘুরে বেড়ানোর জন্য ওদেশে নিশ্চয়ই যেতে পারি।

জজসাহেব এবং সরযুদেবী একটা উদ্দেশ্য মনে রেখে তিন্‌নির কাছে আমেরিকা যাবার কথা উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তিন্‌নি আর অর্কের কথাবার্তা থেকে তাঁরা বুঝলেন, আমেরিকা যাবার ব্যাপারে তিন্‌নি আদপেই উৎসাহী নয়। তবে তিন্‌নির শেষ কথাটা তাঁদের প্রাণকে স্পর্শ করল। 'বুড়ো দাদা দাদি, নানা নানিকে নিঃসঙ্গ ফেলে আমরা চলে যাবার কথা ভাবতেও পারি না।'

অর্ক বলল, কোন দিন যদি তোমার দেশটাকে দেখার জন্যেও আমেরিকা যাবার ইচ্ছে হয় তাহলে জানবে আমাদের বাড়ির দরজায় তোমাকে স্বাগত জানানোর জন্য আমরা উপস্থিত আছি।

তিন্নি বলল, তার আগে আজকের ডিনারে তোমাকে স্বাগত জানাবার জন্য আমরা সপরিবারে সামনের দরজায় হাজির থাকব।

তিন্নির কথা বলার ধরনে জজসাহেব, অর্কদীপ আর সরযূদেবী প্রাণখুলে হেসে উঠলেন।

টেবিল ছেড়ে ওঠার সময় তিন্নি বলল, আমি দুপুর থেকে ছবিঘরে বসে কাজ করব। তুমি যখন হোক চলে আসবে। একেবারে ডিনারের পর আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।

তিন

দর্শনীয় স্পটগুলো ছবিঘরে বসে দুতিন দিনের ভেতরেই মোটামুটি স্থির করে ফেলেছে তিন্নি। দারুণ রকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অর্ক। থাকার জায়গার ব্যবস্থাগুলো দুজনে মিলে পাকা করে এসেছে ট্যুরিস্ট অফিস থেকে।

ভাগ্তুরাম ইতিমধ্যেই ইলেক্ট্রিক অফিসে গিয়ে ছবিঘরে যাবার রাস্তায় খারাপ বাল্বটা বদলানোর ব্যবস্থা করেছে। এখন রাতে ঐ পথে যাওয়া আসার কোন অসুবিধে নেই।

তিন্নি দরজার সামনে একটা ধবধবে সাদা, ঝালর দোলানো ঝাড়লণ্ঠন ঝুলিয়েছে। তার তিনকোণা কাচে আলো পড়ে রামধনু ঝলকায়। বনের পথে সে আলো ভারি মায়াময় মনে হয়। ওদের নীচের বাংলোর জানালা দিয়ে মাঝরাতে ছবিঘরের দিকে তাকালে মনে হয়, শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র বনের মাথায় জেগে উঠেছে।

অর্ক পুরো একটি দিন ঐ ছবিঘরে কাটানোর পরিকল্পনা করে তিন্নিকে বলল, তিন্নি, ছবিঘরে পুরো একটা দিন কাটালে কেমন হয়?

তিন্নি বলল, দারুণ পরিকল্পনা, তবে রাত কাটাতে হলে এতগুলো মানুষকে জায়গা দেওয়া যাবে না।

অর্ক বলল, কেন নয়? আমরা মেঝেতে ঢালা একটা ফরাস পেতে তার ওপর সবাই মিলে বারোয়ারি বিশ্রাম নেব। হোল্ নাইট হাসি গান গল্প হুর্‌রে। ঘুমকাতুরেদের জন্য খোলা থাকবে তোমার ছোট্ট ড্রেসিং রুমটা। নীচে পাতা মোটা কার্পেটখানাতে দিব্যি গড়িয়ে নিতে পারবে।

ও. কে.। তোমার পরিকল্পনার জন্যে ধন্যবাদ।

মুখে তর্জনী ঠেকিয়ে একটুখানি চিন্তা করে নিয়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তিন্নি অর্কদীপের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল ছবিঘরের পেছনে।

একটা ছোট্ট আয়তক্ষেত্রের ওপরে একটি টানা করোগেটের শেড। তার চারদিক কাচ দিয়ে ঘেরা। শেডটির রঙ ভারি সুদিং-সী-গ্রীন।

ওটা আসলে একটা নার্শারী। ভাগ্‌তুরামের তদারকিতে ক্রিসেনথিমাম, ডালিয়া, হলিহক ইত্যাদির চারা সংবর্ধিত হয়।

তিন্‌নি বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল, দারুণ তোমার পরিকল্পনা, আমার মাথাতেই আসেনি। আমি একটু যোগ করছি, সেদিন এখানেই আমাদের পিকনিক হবে। দশ পা গেলেই ডানদিকে ঝর্ণা, এন্‌তার ড্রিংকিং অ্যান্ড কুকিং ওয়াটার পাওয়া যাবে। একটা বড় স্টোভ, প্রেসার কুকার আর কিছু বাসন কোসন নীচ থেকে তুলতে হবে। তিনটে বড় বড় প্লাস্টিকের বালতি আর একটা মাঝারি ড্রাম এখানেই আছে।

অর্ক বলল, আমরা সকলে এক একটা করে পদ রান্না করব।

তিন্‌নি বলল, একটি কেরলের মেয়ে চণ্ডিগড়ে ক্যারলদের সঙ্গে ডাক্তারী পড়ছে। তার বাবা ওখানকার ডাক্তার। সেও নাকি আসছে।

অর্ক বলল, তবে ও ইড্‌লি, সম্বর ডাল অর চাট্‌নি বানাবে।

তুমি এসব খাবারের নাম জানলে কি করে আমেরিকাবাসী?

শুধু নাম জানা নয়, টেস্টও করেছি, দারুণ। ওখানে বাবার সঙ্গে কাজ করতেন এক কুট্টি। তাঁর বাড়িতে যাতায়াত আছে। ওখানে মাঝে মাঝে গেলে কুট্টি আন্টি খাওয়ান।

তুমি সেদিন কি বানাবে?

ডিনারে চিকেন স্যুপ।

তিন্‌নি বলল, তাহলে ক্যারল বানাবে ফ্রুট কাস্টার্ড।

তুমি কি বানাবে?

আমি লাঞ্চে ফ্রায়েড রাইস, কাশ্মীরি মটনকারি, ডাল আর কিছু সব্‌জি বানাব।

অর্ক বলল, আঃ, এখুনি গন্ধ পাচ্ছি রান্নার।

তুমি দেখছি দারুণ জমাতে পার, আর পেটুক তো বটেই।

আমার মাও ঠিক এই কথা বলে।

তিন্‌নি হাসিতে ফেটে পড়ে বলল, দেখ আমি ঠিক ধরেছি।

অর্কও তিন্‌নির হাসিতে যোগ দিল। দুটি তরুণ তরুণীর নির্মল হাসিতে ভরে উঠল ছবিঘর।

ঝিন্নিদেবী বাগানে ফুলগাছের পরিচর্যা করছিলেন। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেয়ে মাথা ঈষৎ কাৎ করে দেখলেন। দেখেই উঠে দাঁড়ালেন।

দুটো টাট্টু যোগাড় করে তার ওপর সওয়ার হয়েছে তিন্‌নি আর অর্ক। তারা এগিয়ে আসছে এদিকে। বাগানের পাশ দিয়েই পাথর বাঁধানো পথটা নেমে গেছে ভ্যালির দিকে। সম্ভবত দুই তরুণ-তরুণীর গন্তব্য ঐ ভ্যালি পেরিয়ে কোথাও।

ঝিন্নিদেবীকে দেখেই ওরা টাট্টুর ওপরে বসে হাত নাড়তে লাগল।

কোথায় চলেছিস?

এই ভ্যালির দিকে মম্‌।

কখন ফিরবি তোরা? একটু পরেই তো বিকেলের চা রেডি হয়ে যাবে।

টাট্টুর পিঠে চাপড় মেরে তিন্নি এগিয়ে যেতে যেতে বলল, সময়ে ফিরতে না পারলে তোমরা কিন্তু আমাদের জন্য অপেক্ষা না করেই চা খেয়ে নিও।

অর্ক যেতে যেতে হাত নেড়ে বলল, কিছু ভাববেন না আন্টি, আমরা খুব সাবধানে ভ্যালিতে ওঠা নামা করব।

ওরা পাশাপাশি চলেছে। ঝিন্নিদেবী একটা পাইনগাছের কান্ডে হাত রেখে ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে রইলেন।

ধীরে ধীরে স্মৃতির কুয়াশা সরে গিয়ে একটা ছবি ফুটে উঠতে লাগল চোখের ওপর।

তখনও বিয়ে হয়নি। ডাক্তার মুখার্জীকে সঙ্গে নিয়ে সে গিয়েছিল নাগ্‌গরে কোলি-রি-দেয়ালির উৎসব দেখতে। ডিসেম্বরের প্রচণ্ড ঠান্ডায় বরফ পড়ে ঝক্‌ঝক্‌ করছিল চারদিক। নরসিংলালজী এই শীতে কাবু হয়ে পড়বেন বলে আসেননি মেলায়।

একটা পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে নিচে মেলার সমারোহ দেখছিল দুজনে। অপূর্ব একটা নাচ হচ্ছিল মেলা-প্রাঙ্গনে। একদল নর্তকী গোলাপী আভার পোশাক পরে পদ্মের পাপড়ির মত নিজেদের মেলে দিয়ে নাচছিল। তার চারদিকে সাদা পোশাকে তরঙ্গ তুলে বৃত্তাকারে নাচছিল একদল নর্তক। তারা পদ্মের দিকে একবার এগিয়ে যাচ্ছিল, পরক্ষণে পিছিয়ে আসছিল। ঠিক যেন সমুদ্র-তরঙ্গের এগিয়ে যাওয়া, পিছিয়ে আসার ছন্দ।

দেখতে দেখতে শেষ হল বেলা আর সাঙ্গ হল মেলা। তারা ফিরে এল তাদের রাতের আশ্রয়ে। রোয়েরিক আর্ট গ্যালারী তখন বন্ধ। সে তার কোয়ার্টারেই দুজনের থাকার ব্যবস্থা করেছিল। পর্বতের ওপর নির্জন নিবাস। চারদিকে পাইনের বন। নিচে বহুদূর ছড়ানো উপত্যকা। মাঝে মাঝে নীলাভ পাহাড়। দূরে ঝক্‌ঝকে তুষার পর্বত। উপত্যকার মাঝ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে উপবীতের মত বিপাশা।

আশ্চর্য এক স্বপ্নলোকে সেদিন নিবিড়ভাবে বসেছিল দুজনে। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলছিল। জানালা দিয়ে হঠাৎ দেখা গেল কেল্লা থেকে হাউই উঠছে আকাশে। একটা শব্দ করে একসময় ফেটে গেল হাউইটা। অমনি শূন্যে ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল তারার ফুল।

কত ফুল যে ফুটল ঝরল সেদিন তার লেখাজোখা নেই।

সে রাতে নির্জন কোয়ার্টারের নিভৃতে ফুটে উঠেছিল দুটি ফুল। তাদের সুবাস নেবার জন্য সেই অসম্ভব শীতের রাতে কেউ উপস্থিত ছিল না। দুজনেই দুজনের আঘ্রাণে সম্মোহিত হয়েছিল। আত্মনিবেদনের মুহূর্তগুলো যে কত সুষমায় ভরে উঠতে পারে তার সাক্ষী ছিল কেবল তারা দুজনেই।

পরদিন নীচের পাহাড়ী বস্তি থেকে টাট্টু যোগাড় করেছিল তারা। তারপর আনন্দ আর উত্তেজনায় ভরা মন নিয়ে টাট্টুতে চেপে তারা নদীর কূল ধরে এসেছিল নাগ্‌গর থেকে কুলুতে।

আজও কি তিন্নি তেমনি অর্কের সঙ্গে টাট্টুতে চেপে পাশাপাশি চলেছে খুশির ফুল ছড়াতে ছড়াতে? দুটি হৃদয় কি আজ উন্মুখ হয়ে উঠেছে দুজনকে সবকিছু বিলিয়ে দেবার জন্য?

এ কি ভেবে চলেছে সে। অর্ক তিন্নির বন্ধু। বন্ধুর কাছে হৃদয় উজাড় করে সবকিছু বলা যায়, কিন্তু সবকিছু বিলিয়ে দেওয়া যায় না। সেজন্যে প্রয়োজন, বিয়ের বাঁধনে আবদ্ধ দুটি হৃদয়।

তিন্নির সেই দোসর ক্যারল বেনন। অর্কদীপ নয়।

ও বহুদূর থেকে উড়ে আসা এক যাযাবর পাখি মাত্র। ওর সঙ্গে দুদিনের বন্ধুত্ব রচনা করা যায়, কিন্তু চিরস্থায়ী নীড় রচনা করা যায় না।

অবশ্য ঝিন্নিদেবী প্রতিটি মেয়ের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। মেয়ে উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিশেষভাবে তার মা তাকে শরীর, মন দুদিক থেকেই গড়ে তুলবেন। কঠিন শাসনের বদলে সহানুভূতি আর উপযুক্ত সহযোগিতাই হবে তাঁর কাজ। বড় কঠিন এ কাজ, তবু ধৈর্যহীন হলে চলবে না। মায়ের চরিত্রে দৃঢ়তার সঙ্গে থাকা চাই অফুরন্ত সহ্যশক্তি, স্নেহ আর বন্ধুত্বের ভাব। নতুন নতুন পরিকল্পনায় মেয়েকে উদ্দীপ্ত করার ক্ষমতা থাকা চাই তাঁর। মেয়ের সমস্যাগুলি বুঝতে হবে অনুত্তেজিত ভাবে। কতটা পরিমাণ সাহায্য করলে বিপদের ঝুঁকি এড়িয়ে তাকে সুখী করা যায় সে বিষয়ে সচেষ্ট ও সতর্ক থাকতে হবে।

ঝিন্নিদেবী কেবলমাত্র চিন্তার ক্ষেত্রে এগুলিকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি, তিন্নির ক্ষেত্রে প্রায় প্রতিদিন এগুলিকে প্রয়োগ করে চলেছেন।

তিন্নিকে নিয়ে তিনি ভারি সুখী। এ বয়সেই তার চরিত্রে এসেছে গভীরতা। তার সঙ্গে মিশেছে নম্রতা। উচ্ছ্বসিত হয়ে সে কখনো তার মনের ভাবকে ছড়িয়ে দেয় না। তার মনের ভাবগুলো ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলে ফুটে ওঠে। তাই সেগুলো সব সময়েই বোদ্ধার কাছে মধু গন্ধে ভরা।

স্বামীকে হারিয়ে ঝিন্নিদেবীর মনে যে শূন্যতা এসেছিল, সেটাকে অন্যভাবে পূর্ণ করে দিয়েছে তিন্নি। তাই ঝিন্নিদেবীর প্রায়ই মনে হয়, তিন্নি তাঁর চোখের আড়ালে চলে গেলে বুকের ভেতর অসহ্য একটা কষ্ট বাসা বাঁধবে। তবু পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে মেয়ের সুখকেই তিনি প্রাধান্য দেবেন।

ডাক্তার মুখার্জীর অকালে চলে যাবার পরে ঝিন্নিদেবী যখন নিজেকে অসহায় ভাবছেন, পনেরো বছরের মেয়েটিকে নিয়ে কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, তখন একদিন ঘরে এসে ঢুকলেন জুলিয়েন বেনন।

জুলিয়েন চিরদিনই কথা বলেন স্পষ্ট আর সোজাসুজি। ভারি মেজাজি মানুষ। দরিয়ার মত দিলখানা।

ঝিন্নি, তোমার সঙ্গে আমার একটা পরামর্শ আছে।

বলুন ভাই।

ছেলেটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে না গিয়ে ডাক্তারী পড়তে চলে গেল চণ্ডিগড়ে। তুমি জান, আমি চিরদিনই নিজের মতে চলি। আমার ছেলেকেও স্বাধীনতা দিয়েছি তার নিজের ইচ্ছামত চলতে।

ঠিক আপনার মত আমিও তিন্নিকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ দিয়েছি।

জুলিয়েন জোরের সঙ্গে বললেন, তাই আমাদের ছেলেমেয়েরা অসংকোচে তাদেব মত প্রকাশ করতে পারে। ক্যারলকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে ছিল, হঠাৎ ডাক্তারীতে মত বদল করলে কেন? অবশ্য যেটা খুশি তুমি পড়তে পার।

ক্যারল বলল, আসলে ডাক্তারী পড়ার কথাটা পরে মনে হল। ডাক্তার আঙ্কেল চলে গেলেন। তাঁর এত বড় অপারেশান থিয়েটার, ডিস্‌পেনসারী চালাবার মত লোক আর রইল না। বহু দূর-দূর অঞ্চলের মানুষ তাঁর হাতের ছোঁয়ায় রোগের যন্ত্রণা ভুলে যেত। তারা এখন অসহায় বোধ করছে। তাই ...।

তোমার এ ডিসিশানে আমি খুবই খুশি হয়েছি।

ক্যারল আবার বলল, তাছাড়া...।

ও চুপ করে গেল দেখে জিজ্ঞেস করলাম, তাছাড়া কি?

ক্যারল বলল কি জান, ড্যাডি, তুমি যখন আঙ্কেলের শবযাত্রার ব্যবস্থা করছিলে তখন একটা পিলারের ধারে দাঁড়িয়ে তিন্‌নি অঝোরে কাঁদছিল। আমি তার কাছে সেই মুহূর্তে কথা দিয়েছি, ডাক্তার আঙ্কেলের মত আমি ডাক্তার হব।

আমি ক্যারলকে বললাম, ঠিক পথই তুমি বেছে নিয়েছ।

আর সেই মুহূর্তে একটি সত্যকে আমি আবিষ্কার করলাম।

ঝিন্নিদেবী বললেন, কি সত্য ভাই?

ক্যারল তিন্‌নিকে ভালবাসে। তিন্‌নি দুঃখ পাক সে সেটা একেবারেই চায় না।

ঝিন্নিদেবী বললেন, ক্যারল আর তিন্‌নির ভেতর যে একটা আকর্ষণ আছে তা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। তবে এ নিয়ে তিন্‌নিকে আমি কখনও কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

জুলিয়েন বললেন, দরকারও নেই। ওরা ওদের মত ভাবুক, নিজেদের গড়ে তুলুক, ইচ্ছে করলে ওরা নীড় রচনার কথাও ভাবতে পারে। এ বিষয়ে তোমার কিছু আপত্তি থাকলে অসংকোচে বল।

আমি আর ডাক্তার মুখার্জী দুজনেই ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমাদের ভেতর কোন জাতি নিয়ে কোনরকম সংস্কার ছিল না। এসব বিষয়ে আমার মেয়ের মাথা একদম পরিষ্কার। সে জাতপাত বোঝে না। পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, শিক্ষিত, সুভদ্র একটি মানুষকে সে অনেক বেশী মর্যাদা দেয়।

জুলিয়েন বেনন বললেন, আমি তোমার কথা শুনে আশ্বস্ত হলাম ঝিন্নি। ভবিষ্যতে ওরা কি করবে না করবে সেটা ওদের ব্যাপার। কিন্তু ওদের মিলনকে কেন্দ্র করে জাতিগত বাধা যদি দুটো পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাহলে তা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

ঝিন্নিদেবী বললেন, আপনি কেবলমাত্র আমার স্বামীর বন্ধু নন, আমাদের পরিবারের একজন। সুতরাং এখানে জাতিগত প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। ওরা ওদের সঠিক পথটি খুঁজে নিক, আপনার মত আমারও এই কামনা।

সেদিন থেকে দুই পরিবারের মিলনের এক অলিখিত চুক্তিপত্র দুটি যুবক যুবতীর স্বাক্ষরের অপেক্ষায় পড়ে আছে।

তিন্‌নি তার টাট্টুতে চড়ে সামনে এগিয়ে চলেছে। সে পথপ্রদর্শিকা। পেছনে তাকে অনুসরণ করে আসছে অর্কদীপ।

শিক্ষিত ঘোড়া একসময় সঠিক পা ফেলতে ফেলতে নেমে গেল ভ্যালির নিচে। এখন চারদিকে পাহাড়, মাঝে কড়ার আকৃতি নিয়ে ভ্যালি।

ওপরের পাহাড় থেকে তিন্‌নি আর অর্কদীপকে দুটি বড় দম দেওয়া পুতুল বলে মনে হচ্ছে। আবার কখনো মনে হচ্ছে, ওরা আরব্য রজনীর কোন চরিত্র। দৈত্যপুরীর বন্দীদশা থেকে নিজেদের কোনরকমে মুক্ত করে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

ওরা অবশেষে এসে পৌঁছল ভ্যালির মাঝখানে। একটা ছোট্ট টিলাকে ঘিরে পাহাড়ী নদীটা বাঁক নিয়ে বয়ে চলে গেছে বিপাশার টানে। ঐ টিলার সঞ্চিত মাটি পাথর ভেদ করে উঠেছে তিনটে ছোট-বড় পাইন গাছ।

জলস্রোত ঠেলে টাট্টু দুটো এসে দাঁড়াল টিলার পাশে নুড়ি পাথর মাটি জমা এক টুকরো উঁচু জায়গায়। টাট্টু থেকে নামল দুজনে। তিন্‌নি বলল, ঠিক আমার পেছন পেছন উঠে এস টিলার ওপর। আল্‌গা পাথরে পা পড়লে কিন্তু পাথর সমেত গড়িয়ে পড়তে পার নীচে।

অতএব একান্ত বাধ্য ছেলের মত তিন্‌নিকে অনুসরণ করে টিলার ওপর উঠে এল অর্কদীপ।

তিনটি পাইন টিলার গা ঘেঁষেই উঠেছে। ঐ পাইনের গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীলাভ একটি পাথর। পাইন গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে উত্তরে তাকালে অরণ্য-আচ্ছাদিত পর্বত দেখা যায়। তার পেছনে জেগে থাকে তুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ।

অর্কদীপ বলল, একটা চমৎকার ল্যান্ডস্কেপ!

তিন্‌নি বলল, এটি আমি রঙ তুলিতে ধরে রাখার চেষ্টা করছি।

সাগ্রহে অর্কদীপ বলল, আমাকে দেখাবে?

স্টুডিওতে যখন যাব তখন দেখতে পাবে। ইচ্ছে হলে নিতেও পার।

আমাকে ছবির লোভ দেখিও না। ছবি কালেকশানের বাতিক আছে আমার।

না না, কালেকশানে রাখার মত ছবি আমার নয়। মনের খুশিতে আঁকি।

তা হোক্, তোমার একটা ছবি অন্তত আমার কাছে থাক।

সে তোমার মর্জি। কতকগুলো ছবি তোমার সামনে রেখে দেব, যেটা খুশি নিও। আমি কিন্তু আঁকিয়ে হিসেবে আনাড়ি। মায়ের মত আর্ট কলেজের বড় বড় শিল্পীর কাছ থেকে ছবি আঁকা শিখিনি।

তোমার মায়ের হাতের একখানা ছবি আমাকে দেবে?

তুমি সোজাসুজি মায়ের কাছে তোমার প্রস্তাবটা রেখ।

অর্কদীপ দুষ্টুমিভরা মুখে তিন্‌নির দিকে তাকিয়ে বলল, এর চেয়ে বড় কোন প্রস্তাব হয়ত আন্টির কাছে রাখতে হতে পারে, তাই ভাবছি...।

তিন্‌নি প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে বলল, দেখ, কেমন সূর্য ডুবছে।

অর্কদীপ সহাস্যে বলল, আমার আশাও ডুবল। এরপর তো অন্ধকার।

তার মুখখানা পূর্ব দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তিন্‌নি বলল, দেখ দেখ কি সুন্দর পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে।

ওরা দুজনে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের মাথায় চন্দ্রোদয় দেখতে লাগল।

যখন খানিকটা ওপরে উঠে চাঁদ ঝক্‌ঝক্ করছে তখন তিন্‌নি বলল, এসো আমরা বসি।

দুজনে মসৃণ একটা জায়গা দেখে বসে পড়ল।

অর্ক বলল, এই নীল পাথরখানা এখানে এলো কি করে?

আসলে অনেকদিন আগে বাবাই এ পাথরখানা দূর থেকে আনিয়ে ছিলেন।

কিছু উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চয়।

আমার বাড়িতে দরজার মাথায়, দেওয়ালের গায়ে যেসব পাথরের মূর্তি আছে, সেগুলো কি তোমার চোখে পড়েছে?

অর্ক উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, শুধু চোখে পড়া নয়, আমি ওগুলো দেখে অবাক হয়ে গেছি। নৃত্যরত গনেশ, সরস্বতী, সূর্য ও লক্ষ্মীর মূর্তি দারুণ। অতি দক্ষ শিল্পীর হাতছাড়া ওরকম মূর্তি তৈরী করা সম্ভব নয়।

আমার বাবা ঐসব শিল্পীকে নিয়ে এসে বহু টাকা খরচ করে মূর্তিগুলি তৈরী করিয়েছিলেন।

এই নীল পাথরখানা দিয়ে কোন মূর্তি গড়াবার পরিকল্পনা নিশ্চয়ই তাঁর ছিল।

তিন্‌নি বলল তুমি ঠিকই ধরেছ। তবে খুব বেশী চেনাজানা কোন দেবদেবীর মূর্তি নয়।

তবে?

আমার বাবা তো ডাক্তার ছিলেন, তাই তিনি দেব-বৈদ্য অশ্বিনী কুমারের একটি মূর্তি গড়তে চেয়েছিলেন।

অশ্বিনীকুমারের নাম শুনিনি।

অনেক প্রাচীন দেবতা। ওষুধ প্রয়োগ থেকে অপারেশন, চিকিৎসাশাস্ত্রের সবকটি শাখাতেই তাঁরা দুভাই ছিলেন সিদ্ধ। বাবা বলতেন, আজকাল শল্য চিকিৎসা যুগান্তর এনেছে। কিন্তু বেদ পুরাণ পাঠ করলে জানা যায়, এত প্রাচীনকালেও অপারেশনের ক্ষেত্রে তাঁরা অসাধ্য সাধন করতেন।

অর্ক বলল, পরিকল্পনাটি অভিনব ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমরা তাঁর নীল পাথরটাকে এখানে এনেছ কেন?

আমার বাবা দূর পাহাড়ের বস্তি থেকে রোগী দেখে ফেরার সময় এই টিলার ওপর উঠে বসতেন। তিনি মনে করতেন, এই তিনটে পাইন গাছ আমাদের সংসারের সিম্বল। আমরা তাই পাইনের কান্ডে হেলান দিয়ে পাথরখানাকে রেখেছি। বাবাকে এখানকার মানুষ অশ্বিনীকুমারের মতই মনে করত। বাবা বলতেন, অশ্বিনীকুমারের মত সার্জেন ত্রিভুবনে কোথাও নেই, তোমরা কার সঙ্গে কার তুলনা করছ।

পথচারীরা যাবার সময় এই টিলার দিকে তাকিয়ে পাথরখানাকে নমস্কার করে যায়।

কথাগুলো বলেই তিন্নি পাথরখানার ওপর হাত বুলোতে লাগলো পরম আদরে। একসময় সে মুখ তুলে তাকাল অর্কের দিকে। এক টুকবো অপ্রস্তুত হাসির আভা-ফুটে উঠল তার মুখে। অর্ক চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় দেখল, তিন্নির দুটো চোখ অশ্রুতে চিক্‌চিক্ করছে।

ওরা দুজনে এবার বয়ে চলা ছোট্ট জলধারার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। চাঁদের আলোয় তখন রূপোলি পোশাক পরা জলপরী নাচছে।

অর্ক মৃদু গলায় ডাকল, তিন্নি ...।

মুগ্ধ হয়ে চাঁদ আর জলের নৃত্যলীলা দেখতে দেখতে তিন্নির মনে হল, বহু দূরে স্বপ্নের জগৎ থেকে কে যেন তাকে ডাকছে। সে ডাক পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলে, হাওয়ার তরঙ্গে ভেসে ঐ স্রোতস্বিনীর জল ছুঁয়ে কানে এসে বাজছে।

ও মুখ তুলতেই দেখতে পেল অর্ক তার দিকে দুচোখের দৃষ্টি মেলে রেখেছে।

তিন্নি এই প্রথম কোন পুরুষের দৃষ্টির সামনে লজ্জা পেল। সে তার দৃষ্টি সোজাসুজি অর্কের দৃষ্টির সঙ্গে মেলাতে পারল না।

অর্ক এবার অসংকোচে তিন্নির একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর ধরে নিয়ে বলল, আমি কি এই হাতখানা ধরে অনেক অনেক দূরের পথ এগিয়ে যেতে পারি না?

এবার তিন্নির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সজাগ করে তুলল। না, একবার আবেগের স্রোতে ভেসে গেলে আর কোনভাবেই বিপরীত স্রোত ঠেলে ফেরা সম্ভব হবে না।

তিন্নি বলল, বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়ে যে হাত, তার শক্তি অসীম। সে সীমাহীন দূরত্ব পাড়ি দিতে পারে। তুমি আমার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু অর্ক। তোমার সঙ্গে নির্দ্বিধায় এ দুনিয়ার যে কোন জায়গায় ঘুরে আসতে পারি।

অর্ক যে অর্থে তিন্নির হাত ধরে দূর পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিল তার সঠিক জবাব সে পেল না। কিন্তু নিরাশায় বিষণ্ণ হয়ে পড়ার মত উত্তরও যে সে পায়নি, একথা ভেবে সাময়িকভাবে আশ্বস্ত হল।

তিন্নি, তিন্নি,—কেউ ডাকছে বলে মনে হল।

তিন্নি শব্দের গতি লক্ষ্য করে উঠে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে অর্কদীপও।

মানুষটি ততক্ষণে টেনে টেনে নিজেকে এনে ফেলেছে নদীর ধারে।

তিন্নি 'যাই' বলে শব্দ করে তার অস্তিত্ব আর অবস্থানটা জানিয়ে দিল।

দুজনেই টিলা থেকে নেমে টাট্টুতে চড়ে নদী পার হল।

ভাগ্‌তুরাম এবার ঝংকার দিয়ে উঠল, তোর জ্বালায় দেখছি একদিন আমাকে পথে পড়ে মরতে হবে।

ততক্ষণে টাট্টু থেকে নেমে পড়েছে ওরা।

তিন্নি ছুটে গিয়ে ভাগ্‌তুরামের গলাটা জড়িয়ে ধরে আদরে সোহাগে ভরে দিতে লাগল।

অর্কদীপের সামনে তিন্নি উচ্ছ্বাসে সোহাগ জানাচ্ছে দেখে ভাগ্‌তুরাম যথেষ্ট লজ্জা পেল। তিন্নি যখন তিন বছরের তখন থেকেই সে ভাগ্‌তুদাদার কাঁধে চেপে বিশ্বভ্রমণ

করত। খোঁড়া মানুষের মাথাটি জড়িয়ে ধরে সে বসে থাকত কাঁধের ওপর। নামবার সময় মুখে মাথায় চুমু খেয়ে, অনেক আদর করে নামত। তাই আজও সপ্তদশী তিন্‌নি ভাগ্‌তুদাদার কাছে সেই তিন বছরেরটি থেকে গেছে। তবু লজ্জা পেল ভাগ্‌তুরাম। হাজার হোক্, জজসাহেবের নাতির সামনে দেখাবার মত দৃশ্য এটি নয়। একান্ত নিজস্ব আনন্দঘন মুহূর্ত এটি। শুধু দুজন অসম বয়সীর অনুভবের।

ভাগ্‌তুরাম গা ঝাড়া দিয়ে বলল, হয়েছে হয়েছে, চটপট বসে পড় দুজনে। খোঁড়া মানুষটাকে এ্যাদ্দূর ছুটিয়ে আনলি। নে, ব্যাগ খুলে খাবার বের করে খা। ফ্লাস্কে চা আছে।

তিন্‌নি ঝাঁঝিয়ে উঠল, কেন তুই কষ্ট করে আনতে গেলি? আমি তো মাকে বলেই এসেছিলাম, দেরী হলে চাটা খেয়ে নিতে।

আরে, তা কি হয়, মায়ের প্রাণ তো! তোদের জন্যে বিকেলের জলখাবার তৈরী করে সাজিয়ে বসে আছে।

তিন্‌নি বলল, জানো অর্ক, আমার মা রাজ্যের রান্না আর জলখাবারের বই কিনবে। সে সব কিচেনে তৈরীর পরে এক্সপেরিমেন্ট চলবে আমার ওপর দিয়ে। আর পারছি না মা, বললেও ছাড়ান নেই। আসলে খাবার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করলে আমি কেমন যেন অস্থির হয়ে পড়ি।

অর্ক বলে উঠল, আরে আমার মাও ঠিক তাই। ছুটির দিনগুলোতে অবধারিত এ দেশীয় রান্না থাকবেই থাকবে। আর আমাকে তার বেশীর ভাগই খেয়ে তুলতে হবে। অবশ্য আমি হরেক রকম খাবার খেতেও ভালবাসি।

তিন্‌নি কিছু মন্তব্য করতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে ভাগ্‌তুরাম বলল, তোরা খাবি না বক্‌বক্ করবি? গরম খাবারগুলো জুড়িয়ে যে একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যাবে।

চাঁদের আলোয় ভাগ্‌তুর আনা একখানা কাগজ পেতে ওরা চায়ের আসর বসাল।

দুটো করে প্যাটিজ আর একটা করে কাজু দেওয়া বরফি।

তিন্‌নি ভাগ্‌তুর দিকে তাকিয়ে বলল, তোর ভাগ কই ভাগ্‌তুদাদা?

থলের ভেতর থেকে আর একখানা প্যাকেট বের করে ভাগ্‌তু বলল, আছে, আছে। মা কি কখনো আমাকে না দিয়ে পারে।

কই দেখি?

ভাগতু প্যাকেট খুলবে না, তিন্‌নিও ছাড়বে না। শেষে তিন্‌নির জয় হল। সে ভাগ্‌তুর হাত থেকে প্যাকেটটা ছিনিয়ে নিয়ে খুলে ফেলল।

ভাগ্‌তুর প্যাকেটে দেওয়া হয়েছে দুটো মেঠাই আর একটা প্যাটিজ।

তিন্‌নি আনুনাসিক সুরে বলল, তোর ভাগে দুটো মেঠাই কেন?

তেমন দুটোর জায়গায় একটা প্যাটিজ।

আমার ভাগটা বদলে নিতে চাইলে তুই দিবি তো?

ভাগতু তার দাবি ছাড়তে নারাজ। সে বলল, মা যেমন বুঝেছে তেমনি দিয়েছে, আমি কোনকিছু চেয়ে নিইনি।

শেষে সবাই মিলেমিশে হাসি ঠাট্টার ভেতরে ভাগাভাগি করে খেল।

অর্ক লক্ষ্য করেছে ভাগ্তুরাম ডাক্তার মুখার্জীর বাড়ির একটি অ্যাসেট বিশেষ। মুখার্জী বাড়ির ভালমন্দের সঙ্গে সে জড়িয়ে আছে অচ্ছেদ্য বাঁধনে। ও বাড়ির পরিজনদের সে মনে করে তার রক্ত সম্পর্কের মানুষ। ঝিন্নিদেবী কিংবা তিন্নিও ভাগ্তুরামকে একান্ত আপনার জন বলেই ভেবে থাকেন। ঝিন্নিদেবী ভাগ্তুর অভিমানকে পুরো মর্যাদা দেন। তার বক্তব্যকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করে দেখেন।

বছরে কেবল একটি দিন, কয়েক ঘন্টার জন্য ভাগ্তু অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

ডাক্তার মুখার্জী যখন ছিলেন তখন তিনি ভাগ্তুর মা বাবাকে ভেড় বকরী কেনার জন্য কিছু অর্থ দিতেন। কেউ যদি বলত, আপনি ওদের খোঁড়া ছেলের ভার বইছেন, তার ওপর আবার এতগুলো করে টাকা দিচ্ছেন কেন?

হেসে বলতেন ডাক্তার মুখার্জী, আমার মেয়ে জন্মাবার অনেক আগেই ভাগ্তু আমার কাছে এসেছে। ও আমার একটা ছেলে। ভাগ্তু খোঁড়া হলে কি হবে, একাই একশো। এজন্যে আমি ভাগ্তুর মা বাবার কাছে কৃতজ্ঞ। তাই অল্প কিছু অর্থ আমি তুলে দি ওদের হাতে। বুড়ো বয়সে কে ওদের খাওয়াবে। টাকাটা থাকলে, ভেড় বক্রী থাকলে শেষের দিনগুলো হয়তো মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারবে।

ভাগ্তুর বাবা মা যেদিন আসে সেদিন ও কেমন যেন উদাসীন হয়ে যায়। চলে যাবার পরেও যেন ওর ঘোর কাটতে চায় না। বিপাশার কূলে কূলে, পথে প্রান্তরে, বনের গহনে ও আপন মনে অন্তত তিন চার দিন ঘুরে বেড়ায়।

ও যখন ছোট ছিল তখন বাবা মার সঙ্গে ঘুরে বেড়াত পাহাড় পর্বতে, বনে বনে, নতুন নতুন বুগিয়ালে (চারণভূমি)। পাহাড়ী ঝর্ণার কূলে বসে তার ছোট্ট বাঁশুরিতে ফুঁ দিত। পাশেই সবুজ ঘাসের চারণক্ষেত্রে ফোটানো দুধ রঙের ভেড়াগুলো চরে বেড়াত। রাতে ঐ বুগিয়ালের ওপর ভেড়াদের মাঝখানে চিৎ হয়ে শুয়ে ও তারা গুনতো।

আজ কত যুগ হল, সেই সব দুর্গম তুষার পাহাড়ের কোলে ঝর্ণার ছোঁয়া লাগা ঘাসের জমিনে পা ফেলে ফেলে সে ঘুরে বেড়ায়নি। তাই মা বাবাকে দেখলেই তার মনে পড়ে যায়, সেই সব স্বপ্নের দিনগুলোর কথা।

জলখাবার খেয়ে ওরা তৈরী হল বাড়ি ফেরার জন্য।

অর্ক বলল, এবার আমার টাট্টুতে চড়বে ভাগ্তুদাদা।

ভাগ্তুরাম চেঁচিয়ে উঠল, খোঁড়াকে ঘোড়ার লোভ দেখাচ্ছ? আমি দিব্যি হেঁটে যেতে পারব। খোঁড়া মানুষ ঘোড়ায় উঠলেই পড়ার ভয় থাকবে সব সময়।

আমি তোমার পাশে পাশে চলব। তোমাকে ধরে ধরেই নিয়ে যাব।

হা হা করে হাসি উড়িয়ে ভাগ্তুরাম বলল, তাহলেই হয়েছে আর কি। এখন ঘোড়ায় উঠলে পতন ঠেকাতে ঠেকাতে কাল সন্ধ্যে নাগাদ বাড়ি পৌঁছব।

তিন্নি বলল, আমার কাছে একটা সমাধান আছে।

ভাগ্তু বলল, কি রকম?

আগে বল, মেনে নেবে?

আচ্ছা বাবা মানব।

আমরা পাঁচজন হেঁটে যাব।

ভাগ্‌তু বলল, হেঁটে যাব বুঝলাম, কিন্তু তোর পাঁচজন কোথায়?

তিন্‌নি বলল, কেন, ঘোড়া দুটোকে ফেলে যাব নাকি? ওরাও হেঁটে হেঁটে যাবে আমাদের সঙ্গে।

রাত ন'টা নাগাদ অর্ককে জজসাহেবের জিম্মায় রেখে দিয়ে ওরা বাড়ি ফিরল। ঝিন্নিদেবী জানালা দিয়ে ওদের ফিরতে দেখে আশ্বস্ত হলেন।

ডাক্তার মুখার্জীর মৃত্যু হয়েছিল, ঐ ভ্যালির মধ্যে পড়ে। মুখার্জী সাহেব বড় ভালবাসতেন ঐ ভ্যালিটিকে। ঐ ভ্যালির ভেতর দিয়ে বয়ে চলা ছোট্ট নদী, তার চারদিকে সবুজ পাইন বনে ছাওয়া পাহাড়শ্রেণী, উত্তরে ঝকঝকে তুষার পর্বত তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলত। তিনি অনেক সময় জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রে টাট্টুতে চড়ে নিশি পাওয়ার মত ভ্যালির চারদিকে ঘুরে বেড়াতেন। কখনো বা টিলার ওপর বসে শত বার দেখা আকাশের নক্ষত্রগুলির দিকে তাকিয়ে আবার নতুন করে পরিচয় করতেন।

কোনদিন অধিক রাত্রি হলে উদ্বিগ্ন ঝিন্নিদেবী স্বামীর খোঁজে পাঠাতেন ভাগ্‌তুকে। ওঁরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি এমনি করে বসে থাকতেন জানালার ধারে।

ডাক্তার মুখার্জীর ভ্যালিতে পড়ে মৃত্যুর পর থেকে ঝিন্নিদেবী আপনজন কাউকে ভ্যালির ভেতর দিয়ে যাওয়া আসা করতে দেখলে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন।

আজও তিনি তিন্‌নিদের ফেরার পথের দিকে চেয়ে বসেছিলেন। এখন তাদের ফিরতে দেখে আশ্বস্ত হলেন।

পরের দিন সকাল থেকে বিকেল মায়ের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঘর গোছানোর কাজে কাটিয়ে দিলে তিন্‌নি। প্রথম মানালীতে পৌঁছেই ক্যারলদের দলটি উঠবে ডাক্তার মুখার্জীর বাড়ি-সংলগ্ন বাগানের প্রান্তে অতি সুন্দরভাবে সাজানো আউট হাউসটিতে। নিচে আর ওপরে দুখানা করে চারখানা রুম। নীচের দুটি রুমের মাঝে লম্বায় ও চওড়ায় বিশাল ডাইনিং কাম ড্রইং রুম। পেছনে কিচেন। প্রতি রুমের সঙ্গে অ্যাটাচড্ বাথ।

নীচের ড্রইং কাম ডাইনিং রুমের স্পেসটা ওপরে গিয়ে বেশ বড়সড় একখানা লাইব্রেরীতে রূপ নিয়েছে।

ওপরে কিংবা নীচে কোন মূর্তি নেই। সব কটা ঘর ঝিন্নিদেবীর পেইন্টিং দিয়ে সাজানো। নীচে বেশ বড় লন। সবুজ ঘাসের বেডের ওপর প্যাটার্ণ করা নানা রঙের ফুলের কেয়ারি। মাঝে মাঝে কাচের টপওয়ালা টেবিলের চারদিকে লাল গদী আঁটা সাদা রঙের বেতের চেয়ার পাতা। রোদ পোহানো, ম্যাগাজিন পড়া, চা-পান কিংবা বসে বসে তুষার-দৃশ্য দেখার উপযুক্ত বস্তু এগুলি। এদের নীরব আমন্ত্রণ অতিথিদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করে।

ঠিক সন্ধ্যায় ঝলমল করে উঠল ছবিঘরের ঝাড়লণ্ঠন। বর্ণালির ভেতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে সে আলো সৃষ্টি করল সাত রঙের ইন্দ্রধনু।

সেই আলো লক্ষ্য করে রহস্যঘন বনপথ ধরে উঠতে লাগল একটি যুবক। কস্তুরী গন্ধে বিহ্বল কোন একটি মৃগ যেমন করে কাঙ্ক্ষিত মৃগীর সন্ধানে বনপথ অতিক্রম করে।

নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দুটি বিশাল বাহু প্রসারিত করে খোলা দরজার পাল্লা ছুঁয়ে দাঁড়াল সে।

আজ ওর সী-গ্রীন টি-শার্টের বুকে গাঢ় হলুদে লেখা—'ফ্রেণ্ডশিপ ইজ দ্য ওয়াইন অব লাইফ'। বন্ধুত্ব জীবনের অমৃত রসায়ন।

ছবি থেকে মুখ তুলল তিন্‌নি। অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমায় ধরা তুলি সমেত হাতখানা গালে ঠেকিয়ে কিছু সময় তাকিয়ে রইল আগন্তুকের দিকে। বুকের লেখাটি পাঠ করার পর ওর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হল।

অর্ক, 'ফ্রেন্ডশিপ ইজ ওয়ান মাইনড ইন টু বডিজ।'

অর্কদীপ চমকে উঠে বলল, অসাধারণ।

'বন্ধুত্ব হল, দুটি দেহে একটি মাত্র মন।' যেন যৌবনের সোনার সুতোয় বাঁধা।

অর্কদীপ ঘরে ঢুকে এল। বলল, তোমার আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই ঢুকে পড়লাম তিন্‌নি।

বন্ধু কি আমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে অর্ক? তার জন্য প্রবেশের দ্বার চিরদিনই খোলা থাকে। গৃহে এবং মনে।

অর্ক বলল, আন্টির কাছে শুনেছিলাম তুমি খুব চুপচাপ থাকতে ভালবাস, কিন্তু আমার ধারণা সম্পূর্ণ বিপরীত।

তিন্‌নি বলল, অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া সবার কাছেই আমি চুপচাপ থাকতে ভালবাসি।

তুমি যখন কথা বল তখন সেটা কবিতা অথবা দর্শন হয়ে ওঠে।

অর্ক, আমাকে ওভাবে দেখো না, আমি অতি সাধারণ মেয়ে। কিছু লেখাপড়া করি, ছবি নিয়ে মেতে থাকি। এতেই আমার আনন্দ। এই যে তোমার সেই ছবি, যা আমি ঐ টিলার থেকে দেখে এঁকেছিলাম। এই সন্ধ্যায় ছবিটির তুষার-শৃঙ্গে ভোরের আলোর রঙ লাগিয়ে দিয়েছি। ইচ্ছে হলে তুমি এটি নিতে পার। বন্ধুর উপহার হিসেবে।

আজ সন্ধ্যায় আমার এই ছবিঘরে আসা সেই লোভেই তিন্‌নি।

এবার একমুখ হাসিতে ঘরখানা ভরিয়ে দিয়ে তিন্‌নি বলল, তুমি তাহলে শিল্পীর চেয়ে তার শিল্পকেই বেশী ভালবাস?

শিল্পের ভেতরেই তো শিল্পী থাকেন তিন্‌নি, তাঁকে আলাদা জায়গায় খুঁজতে গেলে কখনো কি পাওয়া যায়?

তুমি ঠিকই বলেছ অর্ক, আমাদের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে ভাস্কর্যের যে অপূর্ব সব নিদর্শন রয়েছে তার কোথাও শিল্পীর নাম নেই। তবু তাঁরা আছেন, এবং থাকবেনও বহুকাল, যতদিন না তাঁদের শিল্পকর্মগুলি মহাকাল গ্রাস করে ফেলে।

অর্ক বলল, আমার সামনেই কিন্তু শিল্পী তার অপূর্ব শিল্পকর্মটি নিয়ে বসে রয়েছে। আমি অভিন্ন দুটিকেই গভীর ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করতে চাই।

আবার হাসির তরঙ্গ তুলল তিন্‌নি। বলল, এক শিল্পব্যবসায়ী একদিন ঢুকেছিল এক শিল্পীর স্টুডিওতে। তাকে মহিলা শিল্পীটি যে ছবিই দেখান, সেটিই তার পছন্দ হয়ে যায়। কিন্তু ছবির দাম যে আকাশছোঁয়া। তাই ব্যবসায়ীটি ভাবল, শিল্পীটিকে কিনে নেওয়াই লাভজনক। একে দিয়ে আরও অনেক ছবি আঁকানো যাবে, লাভও হবে প্রচুর।

তার এই প্রস্তাবটি শুনেই পাগলা গারদের সুপারিনটেন্ডেন্টকে ফোন করেছিলেন শিল্পী।

অর্ক অমনি বলে উঠল, তোমার এখানে কোন ফোনটোন নেই তো?

এবার উচ্চ হাসির শব্দে খান খান হয়ে গেল অন্ধকার বনভূমির নীরবতা।

তিন্‌নি উপহার হিসেবে তার আঁকা ছবিটি তুলে দিল অর্কের হাতে।

সারি সারি পাইনে ছাওয়া পাহাড়। তার পেছনে উঁকি দিচ্ছে বরফের মুকুটপরা পর্বত। শ্বেত মুকুটের গায়ে সোনার কাজ। অনেক নীচে পাহাড়ের তলায় টাট্টুতে বসে একটি মানুষ। নির্নিমেষ চেয়ে আছে সোনার কাজ করা মুকুটটির দিকে।

অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকে অর্ক বলল, আমার সংগ্রহে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছবি হয়ে থাকবে।

তুমি তোমার বন্ধুকে ভালবাস, তাই এ মর্যাদা।

বিশ্বাস কর, ছবিটিও আমার চোখ আর মনকে টেনেছে। ভোরের আলোর ছোঁয়ায় রাতের জমে থাকা নীলাভ হিমেল কুয়াশার ওড়াউড়ি সমস্ত নিসর্গকে জীবন্ত করে তুলেছে।

তিন্‌নি বলল, তোমার যে ছবি দেখার আলাদা একটা চোখ আছে তাই জেনে আমি আজ বড় তৃপ্তি পেলাম। এটা আমার কাছে মস্ত বড় একটা পুরস্কার।

সামান্য ছোট্ট একটি পুরস্কার এরই সঙ্গে আমি তোমাকে দিতে চাই তিন্‌নি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তিন্‌নি অর্কের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অর্ক তার পকেট থেকে একটি চমৎকার লাল কাস্কেট বের করে তিন্‌নির হাতে তুলে দিল।

তিন্‌নি বলল, কি আছে এতে ?

খুলে দেখ।

বেশ কৌতূহল নিয়ে তিন্‌নি কাস্কেটটা খুলল। মেরুন রঙের একটা গোল্ডেন ক্যাপওয়ালা লেডিজ সেফার্স, তার সঙ্গে একই কালারের একটি ডট পেন।

এমব্রয়ডারির সুতোয় গাঁথা একটি ছোট্ট ফুলের স্তবক আঁকা কার্ডে লেখা আছে,— আমার প্রিয় বান্ধবীর জন্যে।

দারুণ খুশি হলাম তোমার এত সুন্দর একটা উপহার পেয়ে। আমার প্রিয় বস্তুগুলোর ভেতর পেন একটি। নানা রঙের পার্কার, সেফার্স রয়েছে আমার সংগ্রহে। তাছাড়া মন্ট ব্ল্যাঙ্ক, এভারসার্পও রয়েছে। উইংসাঙ্‌ দিয়ে আমি চিঠিপত্রের কাজ চালাই। মোটা নিবের

একটা সেফার্স আছে। ওটি আমার পয়া পেন। পরীক্ষায় প্রতিবারই ও আমাকে উদ্ধার করে দেয়।

অর্ক বলল, প্রেমপত্রগুলোও কি উইংসাঙে লেখ নাকি?

তিন্‌নি ঝট্ করে হাত বাড়িয়ে অর্কের চুল ধরে নাড়া দিল।

অর্ক দারুণ মজা পেয়ে বলল, সত্যি করে বলই না?

তিন্‌নি আবার ঝাঁকুনি দিয়ে এলোমেলো করে দিল অর্কের একরাশ চুল।

অর্ক এবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমার পকেটে কিন্তু চিরুনি নেই।

তিন্‌নি সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাগ থেকে একটা চিরুনি বের করে নিজেই অর্কের এলোমেলো চুলগুলো আঁচড়ে দিতে লাগল।

এবার চুল নিয়ে শুরু হল তিন্‌নির খেলা। সিধে সিঁথে, বাঁকা সিঁথে, ব্যাক ব্রাশ, সব রকম করে সে দেখতে লাগল অর্কদীপের মুখখানা। চুলের কোন্ ভঙ্গীতে মুখের শ্রী বেশী খোলে তারই পরীক্ষা চলল কতক্ষণ। বাঁ হাতে অর্কের থুতনি তুলে ধরে দেখল। বাঁদিকে, ডানদিকে মুখখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল।

অর্ক নীরব। সে ঠিক বুড়োবুড়ি পুতুলের মত ঘাড় থেকে মাথাটি নেড়ে চলেছে।

কতক্ষণ পরে অর্কের স্থির মুখখানা নিজেই ঘাড় ঘুরিয়ে এগিয়ে পিছিয়ে দেখল তিন্‌নি। তারপর সহাস্যে মন্তব্য করল, একেবারে ডেভিডের মুখখানা। তোমার দেহের গঠনটাও সেরকম। আর্টিস্টের দৃষ্টিতে তুমি অনেক দামী মডেল।

অর্ক বলল, এই প্রথম একজন মহিলা-শিল্পী আমাকে আবিষ্কার করল।

দুষ্টুমির হাসি হেসে তিন্‌নি বলল, এতদিন আমেরিকা মহাদেশে একজনও মহিলা তোমাকে আবিষ্কার করেননি, এ কথা তুমি বিশ্বাস করতে বল?

আমি তো মহিলার কথা বলিনি, মহিলা-শিল্পীর কথা বলেছি। দুজনের ভেতর অনেক পার্থক্য আছে তিন্‌নি।

বুঝেছি, তুমি আবিষ্কৃত হলেও কোন শিল্পীর দ্বারা নও।

এবার বিশ্বাসের প্রশ্ন এল তিন্‌নি। আমেরিকার মত দেশ, যেখানে ফ্রি-মিক্সিং রেওয়াজ, সেখানে একজন স্বাস্থ্যবান চাকুরীজীবি যুবক কোন যুবতীর সান্নিধ্যে আসেনি, এটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমার ক্ষেত্রে ঐ অবিশ্বাস্য ঘটনার্টিই ঘটেছে। আর এটি ঘটেছে আমার মায়ের জন্যে।

তোমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমার কৌতূহলী হয়ে ওঠাটা বোধ হয় সাজে না অর্ক।

শুনতে আপত্তি থাকলে অবশ্য অন্য কথা, কিন্তু আমার বলতে কোন বাধা নেই।

তোমার মায়ের প্রসঙ্গ তুলেছ তাই আগ্রহ বেড়েছে আমার।

শোন তাহলে। মা একদিন আমাকে কাছে ডেকে বলল, তুমি বড় হয়েছ, এখন জীবনটাকে নানাভাবে ভোগ করার সময় এসেছে তোমার।

আমি বললাম, তুমি কি আমার বিয়ের প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাইছ?

মা বলল, ঠিক তাই।

বল কি বলবে?

তুমি আমেরিকাবাসী কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চাইলে আমার কোন আপত্তি নেই। এখানকার সামাজিক জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে তোমাকে থাকতে হবে। আবার তুমি যদি ভারতীয় কোন মেয়েকে বিয়ে করতে চাও তাতেও আমি খুশি হব। এখন নির্বাচন তোমার।

আমি বললাম, মা, আমেরিকায় আমার জন্ম। শিক্ষাদীক্ষা চাকরি সবই এখানে। কিন্তু আমার পূর্বপুরুষরা ইন্ডিয়ান। আমার রক্তে তাঁদের সংস্কার মিশে আছে। আমি ভারতীয় কোন মেয়েকে সঙ্গী হিসেবে পেলে সবচেয়ে সুখী হব।

মা বলল কি জান?

কি ?

তাহলে কোন বান্ধবীর সঙ্গে উইক এন্ড কাটানোর পরিকল্পনা বাতিল কর।

বললাম, কথা দিচ্ছি মা।

তিন্‌নি হেসে বলল, তাই ইন্ডিয়াতে এসেছ বউ খুঁজতে ?

যেমন খুশি ভাবতে পার।

এবার সত্যি করে বলতো, আমেরিকা থেকে আসার সময় কার কথা মনে করে পেন-সেট্‌টা এনেছিলে?

তোমার মত কোন মেয়ের দেখা পেলে তার হাতে তুলে দেব ভেবেছিলাম।

সেন্ট পার্সেন্ট সত্যি?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের ভার তোমার ওপর।

তিন্‌নি অন্যদিকে কথা ঘোরাল, মাঝখানে সিঁথি করে দেওয়ায় তোমার বিপুল চুলের ঢাল দুদিকে ভাগ হয়ে গড়িয়ে পড়েছে। মনে হচ্ছে, কোথায় যেন কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের যৌবনের একটা ছবি দেখেছিলাম। সেখানেও বিপুল চুলের মাঝখানে এমনি সিঁথি কাটা ছিল।

অর্ক বলল, আমার চুলের ওপর তোমার এত নজর কেন?

এমন ঘন আর সুন্দর চুল সচরাচর দেখা যায় না বলে। একবার উঠে দাঁড়াও তো।

অর্ক হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল। তার মনে হল, নির্মল খুশির মেজাজে ঠাসা এই মেয়েটি। নিরীহ ফুলঝুরিটির মত চুপচাপ পড়ে থাকে, কিন্তু সামান্যতম আগুনের ছোঁয়া পেলেই চারদিকে আলোর তারাফুল ছড়ায়।

এবার তিন্‌নি অর্কদীপের হাত ধরে তার ছোট্ট ড্রেসিং রুমের ভেতর নিয়ে গেল। প্রমাণ সাইজ একখানা আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, এখন নিজের রূপটি চিনে নাও। সামনেই চিরুনি পাবে, হেয়ার স্টাইল পছন্দ না হলে চুল ভেঙে নিজের মত করে নেবে। আমি বাইরে অপেক্ষায় রইলাম, তোমাকে স্বাগত জানানোর জন্যে।

ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে নিজের আঁকার চেয়ারে বসে রইল তিন্‌নি।

কিছু পরে তিন্‌নির সামনে এসে দাঁড়াল অর্ক। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত মুখ।

তিন্‌নি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, পছন্দ?

খু-উ-ব।

ভয়ে তো সিঁটিয়েছিলে, কি জানি কি হয়ে গেল।

এবার থেকে অর্কদীপ চতুর্বেদীর এই হেয়ার স্টাইলই বজায় থাকবে।

তিন্নি সঙ্গে সঙ্গে হাত পাতল।

সে হাতখানা ধরে ফেলল অর্ক।

বল, আমি কি দিতে পারি তোমাকে ?

তিন্নি বলল, গোটা কয়েক সিটিং।

তুমি সত্যিই আমাকে মডেল করবে নাকি ?

তোমার ইচ্ছে।

আমি তো তাহলে অমর হয়ে যাই।

তিন্নি বলল, মডেল হবার আগে ভাববে, তুমি মিকেলাঞ্জেলো অথবা পিকাসোর মডেল নও, নিতান্ত একজন নবিসের খামখেয়ালীর খেলনা।

ওতেই আমার খুশির অন্ত নেই।

চার

প্রতিদিন ব্রেকফাস্টের পর ওরা দুজনে হাজির হয় ছবিঘরে। মহা উদ্যমে শুরু হয়ে যায় ছবি আঁকার কাজ। দুজনেরই উন্মাদনার শেষ নেই।

বড় নির্জনে নিভৃতে তাদের কাজ শুরু ও শেষ হয়।

একমাত্র ভাগ্‌তুরামই জানে তাদের এই নতুন পরিকল্পনার কথা। কারণ একাধারে ভাগ্‌তু তিন্নির ভাই, বন্ধু ও পরামর্শদাতা। সে তিন্নির প্রয়োজনের জিনিস ভূ-ভারত ঢুঁড়ে সংগ্রহ করে আনে।

তিন্নির অন্যায় ভাগ্‌তু বরদাস্ত করে না, তিন্নির চোখের জলও সে সইতে পারে না।

তিন্নি ভাগ্‌তুকে বলেছিল, আমি অর্ককে মডেল করে কয়েকটা ছবি আঁকতে চাই। আর সে ছবিগুলো যদি মনের মত হয় তাহলে তাই দিয়ে জুলিয়েন আঙ্কেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে একটা এগ্‌জিবিশান করব। তুই কি বলিস?

দারুন হবে। ক্যারলদের আসার আগে কাজ শেষ করতে পারবি?

চেষ্টা করব। আর ওদের থাকাকালীন এগ্‌জিবিশানটা করতে চাই।

মাকে বলেছিস?

তুই আমি আর অর্ক ছাড়া কেউ জানে না।

মিকেলাঞ্জেলোর ডেভিড, সে এক অবিস্মরণীয় ভাস্কর্য! বলিষ্ঠতার সঙ্গে কোমলতার এমন অভাবনীয় মিলন ভাস্কর্যের ইতিহাসে বিরল।

ডেভিড সম্পূর্ণ নগ্নমূর্তি। নগ্নতার মাধুর্য যে দর্শকের মন ও দৃষ্টিকে কতখানি একাগ্র করে তুলতে পারে তার প্রমাণ ডেভিড। মূর্তির পেশী, শিরা-উপশিরা, মণিবন্ধ থেকে

করতল, অঙ্গুলির অর্ধ আকুঞ্চিত বিন্যাস পুঞ্জীভূত শক্তিকেই যেন প্রকাশ করছে। চোখে মুখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ভাবটি পরিস্ফুট, কিন্তু মুখ ও ললাটের রেখায় কোন কঠিনতার কুঞ্চন নেই।

'ল্যান্ডমার্কস অব দ্য ওয়ার্লড্স্ আর্ট' সিরিজের 'দ্য ক্ল্যাসিকেল ওয়ার্লড্' বইখানা মায়ের শেল্ফ থেকে বের করে এনে অর্কের হাতে তুলে দিল তিন্নি।

ডেভিডের মূর্তিখানা দেখ। কিভাবে দাঁড়াবে, মনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাকে কিভাবে রূপ দেবে তা ঐ ভাস্কর্যের ভেতর থেকে বুঝে নাও।

আমাদের গেস্ট হাউসের লাইব্রেরীতে বাইবেল আছে। তার থেকে ইসরায়েল ও পলেস্তিয়দের যুদ্ধের ইতিহাস এবং তার ভেতর ডেভিডের ভূমিকাটা দেখে নিও। তরুণ মেষচারক ডেভিড কিভাবে একটামাত্র পাথর ছুঁড়ে দৈত্যের মত আকৃতিবিশিষ্ট গলিয়েতকে ধরাশায়ী করেছিল, সে বিবরণ পাবে। ভাগ্তু দাদার কাছে সব ঘরের চাবি আছে, চেয়ে নিও দরকার মত।

সেই সঙ্গে আর একখানা বই নিও, 'লিজেন্ডস্ অব গ্রীস অ্যান্ড রোম'। তার ভেতর থেকে 'ইকো-নার্সিসাস', 'অরফিউস-ইউরিডাইস,' 'দ্য কুইন হানট্রেস অ্যান্ড আ বোল্ড হানটার' গল্পগুলো পড়ে নিও। ওগুলোর প্রধান পুরুষ চরিত্রে তোমাকে অভিনয় করতে হবে। ঠিক অভিনয় নয়, জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমি তোমাকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আঁকব।

প্রথম দিন, মেষচর্মের আচ্ছাদনে কটিদেশ জড়িয়ে ডেভিডের ভূমিকায় দাঁড়াল অর্ক। একেবারে নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে তার সংস্কারে বাধলো। সেজন্যে ভাগ্তুরামকে বলে আগেভাগে তিন্নি তৈরী করিয়ে রেখেছিল এই পোশাকখানা। তাই পরে শিল্পীর সামনে ডেভিডের যথাযথ ভাবটি ফুটিয়ে তুলতে লাগল অর্ক।

তিন্নি এখন মগ্ন। সে স্কেচ করল দ্রুত হাতে। রঙ দেবার সময় দেখল, অর্ক সত্যিই ডেভিডে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ তাকে মুগ্ধ চোখে দেখল তিন্নি। তারপর বলল, তুমি এখন রিলাক্স্ কর চেয়ারে বসে। দরকার হলেই আমি তোমাকে আবার ডাকব।

দু'তিনবার সিটিং দিতে হল। পরের দিন অর্ককে ছুটি দিয়ে দিল তিন্নি।

বলল, কাল তুমি নানা নানির আদর খেও। আমি একা বসে রঙের কাজ সারব।

ঝিন্নিদেবী বলেন, তিন্নির নিবিষ্টতা তাঁর চেয়েও বেশী। আর মুড এলে অতি দ্রুততার সঙ্গে নিখুঁত নৈপুণ্যে কাজ সেরে ফেলতে পারে। ওর দোষ হল, নিরন্তর অনুশীলনের অভাব। উন্নতির মূলে ক্রমাগত অনুশীলন। ভাল না লাগলেও অনেক সময় নিজেকে শাসন করে কাজে বসতে হয়।

তৃতীয় দিনে ডেভিড তৈরী হয়ে গেল।

মিষ্টি একটা ব্লুইস গ্রীনের ব্যাক গ্রাউন্ড। সেই কালারের শেডে শ্বেতপাথরের তিন ফুট পরিমাণ একটা মূর্তি জেগে উঠেছে। পাথর নয়, যেন জীবন্ত ডেভিড নামের এক অপার

শক্তিশালী তরুণ হাতের নুড়িটি ছোঁড়ার জন্য উদ্যত। ডেভিডের মুখে অর্ক কিংবা মিকেলাঞ্জেলোর সৃষ্টির বিশেষ কোন ছাপ নেই। এ যেন চিরদিনের ভ্রাম্যমান কোন মেষচারক তরুণের মুখ, যে তার স্বাভাবিক শক্তি সঞ্চয় করেছে উন্মুক্ত প্রান্তরের রৌদ্র, জল, ঝঞ্ঝা থেকে। চারণভূমির সবুজ লাবণ্য তাকে বাঁচিয়েছে প্রকৃতির রূঢ়তা থেকে।

শক্তি আর লাবণ্যে পূর্ণ একটি প্রাণ যেন জেগে উঠেছে ঐ অবয়বে।

অদূরে অনেক ছোট আকারের কতকগুলো বর্শাধারী মূর্তি। তাদের সামনে আকারে ছোট হলেও ভীষণ আকৃতির গলিয়েতের কালারফুল ছবি।

শিল্পী বোঝাতে চেয়েছে, আকৃতি যত ভয়ংকরই হোক স্বাভাবিক শক্তিতে পূর্ণ একটি মানুষের কাছে সে একটি পিগ্‌মি বা বামন ছাড়া কিছু নয়।

ছবি দেখে অর্ক মুগ্ধ।

তিন্‌নি বলল, তোমার ঋজু বলিষ্ঠ অবয়ব ওতে ধরা পড়েছে, কিন্তু মুখে তোমার আদল নেই। ইচ্ছে করেই আমি তা রাখিনি। আমি ডেভিডের মুখখানা অনন্ত যৌবনের প্রতীক হিসেবে গড়তে চেয়েছি।

এরপর একটি একটি করে গড়ে উঠতে লাগল নার্সিসাস, অরফিউস, অ্যাক্টিয়নের ছবি।

ইকো অতি সুন্দর স্বভাবের একটি মেয়ে। সে গল্প করতে পারত ভারি চমৎকার। তার গল্প শোনার জন্য ভীড় জমে যেত। এই গুণটিই শেষ পর্যন্ত তার কাল হল। ইকো বা প্রতিধ্বনির কথা বলার শক্তি এমনি আকর্ষণীয় ছিল যে তার টানে স্বর্গের দেবতা জুপিটার পর্যন্ত তার আসরের শ্রোতা হয়ে গেলেন।

এসব দেখে শুনে জুপিটারের স্ত্রী জুনো এমনি ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন যে তিনি ইকোর কথা বলার শক্তিই হরণ করে নিলেন। অবশ্য কেউ কোন কথা বললে ইকো তার শেষ শব্দটি কেবল উচ্চারণ করতে পারত।

ইকো লজ্জায় দুঃখে লোকালয় ছেড়ে গভীর বনের ভেতর আত্মগোপন করল।

এদিকে নার্সিসাস অতি সুদর্শন এক যুবা পুরুষ। সে শিকার করতে ভালবাসত। কারু প্রতি কোন আকর্ষণ সে বোধ করত না।

একদিন নার্সিসাস বন্ধুদের সঙ্গে বনে শিকারে গিয়ে পথ হারিয়ে বিপথে চলে গেল। সে ক্রমাগত বন চিরে চিরে সঠিক পথের সন্ধান করতে লাগল।

ঐ বনেই থাকত ইকো। সে দূর থেকে নার্সিসাসকে দেখে তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। সে তাকে অনুসরণ করছিল, কিন্তু সাহস করে কাছে এগিয়ে যেতে পারছিল না।

এক সময় নার্সিসাস চিৎকার করে বন্ধুদের ডাক দিল, তোমরা কেউ আছ এখানে?

অমনি ইকো শেষ অক্ষরটি উচ্চারণ করল,—'এখানে'।

নার্সিসাস ভেবেছিল, সে বনে নিঃসঙ্গ ঘুরে মরছে। কিন্তু মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে সে অনেকটা আশ্বত হল। কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে বলল, এসো।

অমনি ইকো উচ্চারণ করল, 'এসো।'

নার্সিসাস আরও অধীর হয়ে ডাক দিল,—'এসো, আমরা এখানে মিলিত হই।'

ইকো এবার পত্রান্তরাল থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে উত্তর করল, 'মিলিত হই।'

সে এখন প্রবল আবেগে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল নার্সিসাসকে। এইভাবে সে তার মনের ইচ্ছাকে প্রকাশ করল।

কিন্তু নার্সিসাস কারু রূপের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না। সে ইকোকে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বন চিরে এগিয়ে গেল। ইকো দুঃখে, অপমানে, লজ্জায় ভেঙে পড়ল কান্নায়। কিন্তু সে ভুলতে পারল না নার্সিসাসকে।

এদিকে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে নার্সিসাস এলো একটি স্বচ্ছ জলাশয়ের ধারে। সে জলপানের জন্য শায়িত অবস্থায় মুখ নীচু করে হাত বাড়াল।

আশ্চর্য! একে ! এমন অপূর্ব সুন্দর মুখ সে অগে কোন দিনই দেখেনি। নার্সিসাস ভুলে গেল জলপানের কথা। সে নির্নিমেষ চেয়ে রইল ঐ মুখের দিকে। এমন প্রেমের স্বাদ সে আর কখনো পায়নি।

হাত দিয়ে ছুঁতে গেলেই জলে তরঙ্গ ওঠে। সুন্দর মুখ হারিয়ে যায়। আবার জল স্থির হলে মুখ জেগে ওঠে। নার্সিসাস হাসলে সেও হাসে। নার্সিসাসের বেদনার ছবি সে মুখেও ফোটে।

দিনের পর দিন নার্সিসাস তার দিকে চেয়ে থাকে, তাকে পেতে চায়, কিন্তু অধরা অধরাই থেকে যায়।

দূরে থেকে দুখিনী ইকো সব কিছুই লক্ষ্য করে। সে বেদনায় ধীরে ধীরে দেহহীন হয়ে যায়।

এমনি করে অনাহারে অনিদ্রায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় জীবনের দীপ নিভে গেল নার্সিসাসের।

একদিন দেখা গেল, যেখানে নার্সিসাসের মৃতদেহ পড়েছিল সেখানে একটি ফুল ফুটেছে। জলের দিকে তাকিয়ে সে দেখছে নিজেকে। সাদা নরম পাপড়িওলা ফুল, মাঝে উজ্জ্বল সোনালী রঙের প্রভা।

গল্প বলা শেষ হলে অর্কের মুখের দিকে তাকাল তিন্‌নি।

অর্ক বলল, বুঝেছি, আমাকে নার্সিসাসের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। কিন্তু আমি নার্সিসাস নই। আমি কখনো ইকোর মত কোমল মনের একটি নারীকে পরিত্যাগ করতাম না।

তিন্‌নি বলল, তোমার স্বভাবের ভেতর কোমলতা আছে আর দৃষ্টিতে আছে সহানুভূতির ছোঁয়া, কিন্তু বন্ধু খুব চিন্তা করে দেখো, আমাদের প্রত্যেকের ভেতরেই এক একজন নার্সিসাস ঘুমিয়ে আছে। গল্পের নার্সিসাসের মত হয়ত আমরা এমন উৎকটভাবে অন্যকে উপেক্ষা করে নিজেকে উন্মাদের মত ভালবাসি না, কিন্তু প্রায় প্রতিটি মানুষ নিজেকে সব থেকে বেশী ভালবাসে।

অর্ক বলল, তোমার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই তিন্‌নি।

তাহলে কাল থেকে তুমি নার্সিসাস।

তুমি নার্সিসাসের কোন্ অধ্যায়টি নিয়ে ছবি আঁকবে? ইকোকে প্রত্যাখ্যানের পর্ব না নিজেকে ভালবাসার পর্ব?

এ কি বলার অপেক্ষা রাখে অর্ক? নিঃসন্দেহে নার্সিসাসের নিজের প্রেমে মগ্ন হবার বিষয়টি নিয়েই ছবি আঁকব।

একটি বিশাল আয়না মেঝেতে পাতা হয়েছে। তার দিকে ঝুঁকে পড়ে নিজের প্রতিকৃতি প্রথম দেখছে নার্সিসাস। একটা বিস্ময় ছড়িয়ে পড়েছে তার চোখেমুখে। এত সুন্দরও কি ত্রিভুবনে কেউ হতে পারে।

এই প্রথম ভালবাসার আলোয় উদ্ভাসিত হচ্ছে একটি মুখ।

তিন্‌নি বলে উঠল, অসাধারণ! সে সঙ্গে সঙ্গে নার্সিসাসের এই জাগরণের মুহূর্তটিকে স্কেচে ধরে রাখার চেষ্টা করতে লাগল।

এ ছবিখানা শেষ করতে লাগল পুরো তিনটে দিন। এই দিনগুলোতে তিন্‌নির অনুরোধে অর্ক রইল অনুপস্থিত।

উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে নার্সিসাস অনন্য। একটি রোমান শিকারীর বেশে সজ্জিত তরুণ ঝুঁকে রয়েছে স্বচ্ছ জলের দিকে। তার অপূর্ব সন্দুর অবয়ব প্রতিবিম্বিত হচ্ছে জলে।

একটু দূরে হাল্‌কা কোমল রঙে আঁকা এক ছায়ামূর্তি। নতজানু হয়ে বসে তরুণীটি দুহাতের পাতায় ছুঁয়ে আছে একটি তরতাজা নার্সিসাস ফুল।

অরফিউস ছবিটিতে আলখাল্লা পরে দাঁড়িয়ে আছে এক বীণাবাদক। তার দুখানি হাত প্রসারিত। একহাতে ধরা রয়েছে বীণা জাতীয় একটি যন্ত্র। তার চোখে মুখে সব হারানোর বিহ্বলতা। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে এক নারীর ছায়ামূর্তি। তার হাত দুটিও প্রসারিত। সে যেন বলছে, বিদায় প্রিয় বিদায়।

দ্য কুইন হানট্রেস ছবিখানি আঁকা হয়েছে বনের পটভূমিতে। অর্ধনগ্ন দেবী ডায়ানার বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি। তিনি যেন বলতে চান, কে এই মনুষ্যলোকের দুঃসাহসী শিকারী, যে আমার নিভৃত বিশ্রাম কুঞ্জে ঢুকে পড়েছে।

ডায়ানার একটু দূরে নতজানু হয়ে বসে আছে শিকারী অ্যাক্‌টিয়ন, তার চোখে মুখে বিমূঢ় বিস্ময়! সারা অবয়বে অসহায়তার ছবি।

ছবির এককোণে হাল্‌কা এক রঙের একটি স্কেচ। ডায়ানার ক্রোধে অ্যাক্‌টিয়ন পরিণত হয়েছে একটি শৃঙ্গওয়ালা হরিণে। সে পালাচ্ছে বনের গভীরে। তার নিজেরই শিকারী কুকুরগুলো তাদের প্রভুকে চিনতে না পেরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপর।

ছবির পর্ব শেষ হলে একদিন সবকটি ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল দুজনে।

অর্ক বলল, তোমার মত সদ্য জেগে ওঠা এক তরুণীর ভেতর যে এতখানি প্রতিভা লুকিয়েছিল তা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

তিন্‌নির মুখে মৃদু হাসির আভাস। সে বলল, সংস্কৃতে একটি কথা আছে, সূর্য উদিত হলে পদ্ম প্রকাশিত হয়। তার অর্থ, সূর্যের ছোঁয়ায় পাপড়ি মেলে পদ্ম।

থামল তিন্‌নি। মুখে হাসিটি লেগে আছে।

অর্ক বলল, তুমি সূর্য আর পদ্মের উপমাটি কেন দিলে তিন্‌নি?

তোমার নামের অর্থই তো সূর্য। এর পরের অর্থটুকু বুঝতে আশা করি তোমার অসুবিধে হবে না।

ম্লান একটুকরো হাসির আভাস দেখা দিল অর্কের মুখে। সে বলল, তুমি তো আবার ছবি আঁকা শেখার জন্য আমেরিকাতে যেতে চাও না।

তিন্‌নি বলল, ও প্রসঙ্গ এখন থাক অর্ক। ইচ্ছা অনিচ্ছার বাইরেও ভাগ্য বলে একটা অদৃশ্য শক্তি আছে। তার ইচ্ছা না হলে বিফল হয়ে যাবে মানুষের সমস্ত চেষ্টা। আবার যার জন্য সামান্যতম চেষ্টাও করিনি, সেই অভাবিত তারই খেলায় এসে যাবে হাতের মুঠোয়।

এ দেশের মানুষ বড় বেশী ভাগ্যবিশ্বাসী, তাই না তিন্‌নি?

বাবা বলতেন, নিজের পুরুষকারের ওপর ভর রেখে এগোতে হয়। শেষ ছোঁয়াটা তোমাকে ভাগ্যই দিয়ে দেবে। তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, অভিযোগ জানিয়ে কিছু করা যাবে না। তার বিধান শেষ পর্যন্ত মেনে নিতেই হবে।

অর্ক বলল, এ আলোচনাটা এখন থাক। আমাদের ছবি নিয়ে কথা শুরু হয়েছিল।

তিন্‌নি উদ্ভাসিত মুখে বলল, তোমার আশ্চর্য অভিনয় আমার ছবি আঁকার পেছনে বিরাট প্রেরণার কাজ করেছে।

তা আমি জানি না, তবে তোমার নির্দেশ অনুযায়ী আমি কাজ করে গেছি। এর আগে কোনদিনই অভিনয়ের সুযোগ আমার আসেনি। দেখো, তোমার ছবিগুলো খুব প্রশংসা পাবে।

তিন্‌নি বলল, আমরা দুজনেই এ ছবিগুলো সৃষ্টি করেছি। তাই আমাদের ভাল লাগাটাই এ ছবির শেষ কথা।

তিন্‌নি কথা শেষ করে উচ্ছ্বাসে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিল। সে হাত হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ উজাড় করে ধরে ফেলল অর্ক।

কতকক্ষণ দুজনে হাতে হাত বেঁধে বসে রইল। কেউ একটি কথা উচ্চারণ করল না। নীরবতাই বুঝি যোগাযোগের শ্রেষ্ঠ ভাষা।

আজকাল অপরাহ্ণের দিকে ভ্যালিতে ঐ নির্দিষ্ট টিলাটির ওপর উঠে বসে থাকে দুজনে। পড়ন্ত বেলায় মায়াময় হয়ে ওঠে চরাচর। ছোট্ট নদীর স্রোতের দিকে তাকালে মনে হয় গলিত সোনার প্রবাহ। বড় কোমল লাগে চোখে।

উত্তরে তাকালে দেখা যায়, তুষার চূড়ায় শেষ সূর্যের খেলা। এখানে কথার চেয়ে নীরবে উপভোগ করাই বড় পাওয়া।

এক ঝাঁক পাখি কলরব করতে করতে উড়ে গেল পশ্চিমের পাহাড়ী জঙ্গলটা লক্ষ্য করে। এখন নিচের উপত্যকায় শুরু হয়েছে গম তোলা। সেখানে ভোজের নিমন্ত্রণ শেষ করে ওরা পরিতৃপ্তির আওয়াজ তুলতে তুলতে চলে গেল।

আপেল বাগিচা অথবা ফসল ক্ষেতের কাজ সেরে একদল মেয়ে ভ্যালি পেরিয়ে ঘরে ফিরছে। শেষ সূর্যের সোনায় স্নান করছে তারা। গোলাপী আভাযুক্ত আপেলের মত রঙের ওপর সোনালী প্রলেপ পড়ছে। নয়ন ভোলানো লাবণ্যে পূর্ণ হয়ে উঠছে ওরা।

ওদের গলায় বসন্ত-উৎসবের গান। সারা দেশটা উৎসবকে কেন্দ্র করে আনন্দে মেতে উঠেছে। গৃহজাত হয়েছে সোনালী ফসল। আপেল বাগিচায় ফুলের স্তবক ঘিরে মত্ত মধুপের গুঞ্জন।

পাইন, সিডারের বনে, অথবা আপেল অর্চার্ডের ভেতর হঠাৎ হঠাৎ দেখা যাচ্ছে এক এক পাল ভেড়া। তাদের দলটাকে সিধে রাখছে, দু'একটা লোমশ কুকুর। হাঁটু অব্দি ঝোলা ফ্রক, পাকে পাকে ছাগল লোমের মোটা দড়ি দিয়ে জড়ানো কোমর, পায়ে চম্বার মোটা নাগরা, আর মাথায় কুলুর টুপি পরে ভেড় বক্‌রির সঙ্গে চলেছে গাদ্দী পহাল। তাদের কোমর থেকে কুলহার (কুঠার) আর বজলু (থলে) ঝুলছে। তারা মুখে অদ্ভুত আওয়াজ তুলে, কখনো বা শিস্ দিতে দিতে ভেড়, বক্‌রি তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

কয়েক দিনের ভেতরেই ওরা উঠতে থাকবে উঁচু পাহাড়ের ওপর। গ্রীষ্ম বর্ষা তুষার পাহাড়েব কোলে কোলে নিরু ঘাসের বুগিয়ালগুলিতে ভেড় চরিয়ে কাটাবে ওরা। আবার শরৎ এলে ওরা নেমে আসবে ভ্যালিতে। রুবানায় সুর তুলবে পথ চলতে চলতে।

নদী, কুহল, ছই, ঝর্ণা, মেতে উঠবে আনন্দ গানে। ঝাঁক ঝাঁক ট্যুরিস্টদের আনাগোনা শুরু হয়ে যাবে।

এখন বসন্তের গান গলায় নিয়ে কাজের শেষে ফিরছে তরুণীরা। তারা পাশ দিয়ে যাবার সময় ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে হাসির হুল্লোড় তুলছে।

তিন্নি আর অর্কও উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে ওদের অভিনন্দন জানাল।

ওরা জ্যোৎস্না ধোয়া রাতে নাচ শুরু করবে। প্রেমিকের কোমর জড়িয়ে নাচবে নিদ্রাহারা রাতের নাচ।

এবার ফেরার পালা। টাট্টুতে চড়ে ফিরছে ওরা। ভ্যালি থেকে ওপরের বাঁধানো রাস্তায় উঠে এসেই মুখোমুখি হল আর এক অশ্বারোহীর।

তিনি হাত তুলে- চেঁচিয়ে উঠলেন, কিউপিডের মত সুদর্শন এই তরুণ যুবকটি কে তিন্নি?

টাট্টুর থেকে তিন্নি তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। তার দেখাদেখি অর্কও। অশ্বারোহী অগত্যা নেমে দাঁড়ালেন।

ইনি আমার আঙ্কেল, অর্ক।

অর্কদীপ নত হয়ে অভিবাদন জানিয়ে বলল, আপনার কথা তিন্নির মুখে বহুবার শুনেছি।

তিন্নি আমার মম্, তাই সব মায়ের মত নিজের ছেলের কথা একটু বাড়িয়েই বলে।

তিন্নি কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, একদম না।

জুলিয়েন অর্কের দিকে ফিরে বললেন, তোমাকে এই প্রথম দেখলাম মানালীতে। এও জানলাম, তোমার নাম অর্ক। কিন্তু সংক্ষেপে পুরো পরিচয়টি যে চাই।

বদরীপ্রসাদজী আমার নানা। আমি অর্কদীপ চতুর্বেদী। আমেরিকা গভর্ণমেন্টের একটি সংস্থায় কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজে যুক্ত আছি।

দারুণ খবর। এই বয়সে এতখানি ওপরে উঠেছ ইয়ং ম্যান।

তিন্‌নি বলল, ও ভাল টেনিসও খেলতে পারে।

ও, রিয়েলি!

এখনও আমি শিখছি আঙ্কেল।

একদিন এসো আমার বাড়ি, আলাপ করব।

অর্ক বলল, আপনি যখন বলবেন তখনই আসব।

কাল অর্ককে নিয়ে চলে এসো তিন্‌নি, ব্রেকফাস্ট ওখানেই সারবে।

অবশ্যই যাব আঙ্কেল।

পরের দিন চায়ের টেবিলে অনেক কথাবার্তা হল। ক্যারলের বন্ধু গোষ্ঠীর জন্য ওরা কি ধরনের ব্যবস্থা করে রেখেছে তার একটা বিস্তৃত ফিরিস্তি দিল তিন্‌নি। শেষে বলল, আঙ্কেল, আপনার ব্যাঙ্কোয়েট হলখানা তিন দিনের জন্য আমাদের চাই।

অবশ্যই পাবে, কিন্তু ওখানে তোমরা কি প্রোগ্রাম করতে চাও বল?

আমরা আমাদের বন্ধুদের অনারে ওখানে একটা ছবির এগ্‌জিবিশান করতে চাই। তার সঙ্গে রোজই কিছু নাচ্‌গানও থাকবে। ইচ্ছে করলে আপনার হোটেলের গেস্টরাও যোগ দিতে পারেন।

অবশ্যই। তাছাড়া মানালীর সরকারী অফিসার এবং বিশিষ্টজনদের আমি আমন্ত্রণ জানাব। কিন্তু মম্, কার ছবির এগ্‌জিবিশান হবে? মায়ের?

একজন আনাড়ী শিল্পীর হাতের কাজ নিয়ে যদি এগজিবিশান হয় তাহলে কি আপনার আপত্তি আছে?

আরে আপত্তির কথাই বা উঠছে কেন? ঝিন্নির মেয়ে তিন্‌নির রুচি আর শিল্পবোধের ওপর আমার পুরোপুরি আস্থা আছে।

তিন্‌নি বলল, তবু আমি ভয় পাচ্ছি আঙ্কেল। আমাদের ছবিঘরে পেইন্টিংগুলো মজুদ আছে, আপনি নিজের চোখে একবার দেখে নিলে আশ্বস্ত হই।

জুলিয়েন বেনন বললেন, আজ সন্ধ্যায় যেতে পারি।

সারা দুপুর ধরে দুবন্ধুতে মিলে ছবিঘর গোছালো। ঘরের চারদিকের দেওয়ালে সাজিয়ে রাখল ছবিগুলো। বিদেশীয় বিষয়বস্তু নিয়ে আঁকা সাম্প্রতিক ছবিগুলি রইল একদিকে। অন্যদিকে তিন্‌নিরই ভারতীয় পটভূমিতে আঁকা আগেকার ছবিগুলো রাখা হল।

ঝিলমের কূলে সন্তান কোলে নিয়ে কাশ্মীর কন্যা, কুলুতে উন্মুক্ত প্রান্তরে তরুণ তরুণীর দশেরা নাচ, একটি পাঞ্জাবী দলের ভাঙড়া, পুরীর সমুদ্রজলে ভোরবেলা নুলিয়াদের নৌকো ভাসানো,—এমনি আরও অনেকগুলি পেইন্টিং।

জুলিয়েন মেজাজী এবং খামখেয়ালী, কিন্তু কথার মান্ষ। তিনি সন্ধ্যায় এসে ঢুকলেন ছবিঘরে। তার আগে বাইরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলেন ঝুলন্ত ঝাড়লণ্ঠনটি। ঝকঝকে আলোর চারদিকে বর্ণালীর ঝালর। একটি ইন্দ্রধনুর সাতরঙা স্নিগ্ধ বলয় সৃষ্টি হয়েছে।

প্রায় পাঁচ বছর পরে জুলিয়েন এলেন ছবিঘরে। শেষবার এসেছিলেন ডাক্তার মুখার্জীর সঙ্গে। ছোট্ট ফুলের বাগানটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন দু'বন্ধুতে। তখন দরজার সামনে এই রমণীয় ঝাড়লণ্ঠনটিকে ঝুলতে দেখা যায়নি।

জুলিয়েন ছবিঘরে ঢুকেই বললেন, সেই ইয়ংম্যানটি কোথায়? তাকে তো দেখছি না?

আপনি অর্কের কথা বলছেন?

হাঁ, সেই সুভদ্র ছেলেটি।

তিন্নি হেসে বলল, ও এখন তার নানা নানির সঙ্গে পুজোয় বসেছে।

কিসের পুজো?

আমি ঠিক জানি না আঙ্কেল। পারিবারিক কোন পুজো-টুজো হবে।

এবার জুলিয়েনের দৃষ্টি পড়ল ছবিঘরের দেয়ালগুলোর ওপর।

ওয়ান্ডারফুল! শুধু ওয়ান্ডারফুল নয়, এ দেখছি এক ওয়ান্ডার ল্যান্ড।

জুলিয়েন বলে চললেন, ঐ তো বীণাবাদক অরফিউসের ছবি। প্রিয়তমা ইউরিডাইস অকালে চলে গেলেন মৃত্যুপুরীতে। অরফিউস তখন স্ত্রীর শোকে প্রায় উন্মাদ। তিনি অনেক কষ্টে মৃত্যুপুরীর সিংহদরজা পেরিয়ে এসে পৌঁছলেন স্বয়ং মৃত্যুর দেবতার সিংহাসনের সামনে। বিস্মিত দেবতাকে মুগ্ধ করলেন তাঁর বীণবাদনে।

আবেগে বিহ্বল দেবতা বললেন, মর্তবাসী মানব কি চাও তুমি আমার কাছে?

আমার প্রিয়তমা পত্নী অকালে এসেছে এই মৃত্যুপুরীতে, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

অসম্ভব হলেও তোমার এ প্রার্থনা আমি পূর্ণ করব, কিন্তু একটি শর্তে।

বলুন।

তোমাকে অনুসরণ করে চলবে তোমার স্ত্রী। তুমি কিন্তু মৃত্যুপুরীর সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত পেছনে ফিরে তাকাবে না।

অরফিউস মৃত্যুর দেবতার শর্ত মেনে আসছিলেন, কিন্তু সহসা জেগে উঠল তাঁর মনের সংশয়,—ইউরিডাইস আমাকে অনুসরণ করছে তো?

তিনি প্রায় সীমানার কাছে এসেই পেছন ফিরে তাকালেন।

বিদায়, প্রিয়তম বিদায়!—বলতে বলতে দু'হাত অরফিউসের দিকে প্রসারিত করে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেলেন ইউরিডাইস।

পুরোটাই যেন অভিনয় করে বলে গেলেন জুলিয়েন বেনন।

শেষে বললেন, অসাধারণ কাহিনী। কিন্তু মম, এই ছবিগুলির শিল্পী কে! আমি অবাক হচ্ছি তার হাতের কাজ দেখে। স্কেচে যেমন দক্ষতা, রঙের ব্যবহারেও তেমনি নিপুণতা। এই কি তোমার সেই শিল্পী?

মৃদু হেসে মাথা নাড়ল তিন্‌নি।

কোথায় সে? তোমার হাসি দেখে মনে হচ্ছে, সেই আমেরিকাবাসী ইয়ং ম্যানই এই ছবিগুলোর স্রষ্টা।

তিন্‌নি বলল, এই ছবি সৃষ্টির কাজে তার অনেকটাই দান আছে, কিন্তু সে নিজের হাতে এ ছবির একটি রেখাও টানেনি।

আমার কাছে তোমার কথাগুলো ধাঁধার মত লাগছে তিন্‌নি।

অর্ক কাহিনীগুলো পড়ে প্রধান পুরুষ-চরিত্রগুলোতে মূক অভিনয় করে গেছে। আর সেগুলো দেখে স্কেচ করে রঙ লাগিয়েছে ...।

এইটুকু বলে থামল তিন্‌নি।

সঙ্গে সঙ্গে জুলিয়েন বেনন প্রায় জড়িয়ে ধরলেন তাঁর আদরের মম্‌কে।

তুমি এসব ছবি এঁকেছ মম্‌! আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না! তোমার মা নিশ্চয় দেখেছে। মেয়ের কৃতিত্বে অবশ্যই গর্বিত স্বনামধন্য শিল্পী মিসেস ঝিন্নি মুখার্জী।

না আঙ্কেল, মাকে একটা সারপ্রাইজ দেব বলে এখনও এ ছবি সম্বন্ধে কিছু বলিনি।

কিচেন থেকে হাঁক পাড়ল ভাগ্‌তু, চা রেডি।

তিন্‌নি বলল, আসছি।

জুলিয়েন বললেন, এখানেও কি চায়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট রেখেছ নাকি?

আজই ভাগ্‌তুদাদা এখানে প্রথম চায়ের পাট বসাল।

তিন্‌নি ভেতর থেকে ট্রেতে করে দু'কাপ চা আর এক প্লেট পকৌড়া নিয়ে এসে দেখে খেয়ালী জুলিয়েন আঙ্কেল ইতিমধ্যেই উধাও হয়ে গেছেন।

অনেকক্ষণ ঠায় বসে রইল তিন্‌নি। নিজের ছবিগুলোকে দেখতে লাগল নিবিষ্ট হয়ে। দেখতে দেখতে মনে হল, এ ছবিগুলো কি তার নিজেরই আঁকা! বিশ্বাস করতেও যেন ভরসা পায় না।

কে তার হাত ধরে আঁকালেন এতগুলো ছবি! কে সেই অদৃশ্য শিল্পী, যিনি তার চোখে সাতরঙের মায়াতুলি বুলিয়ে দিলেন।

অর্ক, তুমি নিঃস্বার্থভাবে তোমার বন্ধুর হৃদয়ে প্রেরণার দীপটি জ্বালিয়ে দিয়েছ। যদি সবার দৃষ্টিতে সার্থক হয় আমার ছবি তাহলে সে সাফল্যের পেছনে তোমার অদৃশ্য ভূমিকার কথা আমি ভুলতে পারব না কোন দিনও।

পেছনে পায়ের সাড়া পেয়ে ফিরে দাঁড়াল তিন্‌নি। জুলিয়েন আঙ্কেল মাকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন দরজার সামনে।

ঝিন্নিদেবীর চোখে মুখে বিস্ময়।

জুলিয়েন বললেন, দেখ সিস্টার, ভাল করে দেখ, এ তোমার হাতের তৈরী না তোমার ঐ শিক্ষানবিস মেয়ের।

ঝিন্নিদেবী ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লেন। তাঁর মুখে কথা নেই। চোখের তারা দু'টি ছবিতে নিবদ্ধ। একটি ছবি শেষ হলেই অন্যটিতে চলে যাচ্ছে চোখের দৃষ্টি। এ যেন পদ্ম বনে উড়ে বেড়াচ্ছে দুটি ভ্রমর।

অনেক সময় ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তিন্নির নতুন আঁকা ছবিগুলো।

দেখা শেষ হলে ফিরে দাঁড়ালেন। মা মেয়ে এখন মুখোমুখি। একে অন্যের দর্পণে দেখছে নিজেকে। সৌন্দর্যে, লাবণ্যে, গড়নে দুজনেই তুল্যমূল্য।

হঠাৎ ঝিন্নিদেবীর চোখ উপচে জল নামল। তিনি মেয়েকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলেন।

কতকক্ষণ পরে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে তিন্নি মা আর জুলিয়েন আঙ্কেলকে প্রণাম করল। তাঁরা চুম্বন করে ভালবাসা আর আশীর্বাদ জানালেন।

শেষে ঝিন্নিদেবী বললেন, অভাবনীয় কিছু কাজ তুমি করেছ তিন্নি। মনে রেখ এই ছবি আঁকতে আঁকতেই তোমার সিদ্ধি আসবে। তুমি যখন ছোট, তখন তোমার বাবার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। আমি চেয়েছিলাম, তুমি বাবার মত ডাক্তার হবে। আর তোমার বাবা চেয়েছিল, মেয়ে মায়ের মত শিল্পী হবে।

আজ তারই ইচ্ছা পূর্ণ হতে চলেছে।

কিচেন ডোর থেকে উঁকি দিয়ে ভাগ্তু বলল, একবার চা নষ্ট হয়ে গেছে, ফিরে বানালাম। ঠান্ডা পকৌড়াগুলো গরম করেছি, এখন চটপট খেয়ে নেবে কি ?

তিন্নি কিচেনের দিকে এগিয়ে গিয়ে চা আর খাবার ভর্তি ট্রেখানা তুলে নিল।

ভাগ্তু চুপি চুপি বলল, একেবারে বেলুনের মত যে ফুলছিস রে।

তুই থাম হাঁদা।

পাঁচ

তেইশে এপ্রিল। বাতাসে তউন্দি বা গ্রীষ্মকালের ছোঁয়া লেগেছে। এদিক ওদিক ছড়ানো পাহাড়গুলোকে অনেক সময় অস্বচ্ছ মনে হয়। আসলে এ সময় এক ধরনের ধুলোর ঘূর্ণি ঘুরে ঘুরে ওপরের দিকে ওঠে। তাই পাহাড়ের গায়ের দৃশ্যাবলী অস্পষ্ট হয়ে চোখের আড়ালে চলে যায়। কিন্তু বাইরের গরম পাহাড় ঘেরা ভ্যালির ভেতর নামলে কিছু বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে একটা মিষ্টি ঠান্ডা হাওয়া সারা ভ্যালি জুড়ে খেলা করতে থাকে।

তেইশে এপ্রিল। তিন্নির ক্যালেন্ডারে একটি চিহ্নিত দিন। ঠিক নাস্তার সময় অর্ক তৈরী হয়ে এসে গেল। নাস্তা শেষ করে ওরা বেরিয়ে পড়বে কুলুর উদ্দেশ্যে।

ডাক্তার মুখার্জী মৃত্যুর কয়েক মাস আগে কিনেছিলেন একখানা সাদা মারুতি। তিনি সাধারণত টাট্টুতে চড়েই পাহাড়ী গাঁগুলোতে চিকিৎসা করে বেড়াতেন। ইদানিং মানালী থেকে কোথাও যেতে হলে বাসে করে যাতায়াতে তাঁর বেশ অসুবিধে হত। সময়েরও অনেকটা অপচয়। তাছাড়া নিজের ইচ্ছে মত বেরোনো যায় না, বাসের সময় ধরেই বেরোতে হয়।

এসব ভেবেই তিনি মারুতিখানা কিনেছিলেন। জুলিয়েন ওস্তাদ ড্রাইভার। তাঁর

গাড়িতেই হাত পাকিয়েছিলেন ডাক্তার মুখার্জী। মারুতি আসায় স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে প্রায়ই তিনি চলে যেতেন কুলু আর নাগ্‌গরে। কখনো সখনো দু'একদিন কাটিয়েও ফিরতেন।

তিন্‌নি অনেক সময় বাবা মার সঙ্গে যেত না। সে হয়তো মানালীতে নানা কাজে মেতে থাকতো। ঝিন্নিদেবীকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন ডাক্তার মুখার্জী। সে সময় প্রথম যৌবনের দিনগুলো ফিরে আসত তাঁদের জীবনে। তাঁরা অতীতের মত হাত ধরাধরি করে ঘুরতেন কুলুর আপেল বাগিচায়। কাঠবেড়ালির দুষ্টুমি দেখে হাততালি দিতেন। চিড়িপাখিদের লুটোপুটি দেখে ফেটে পড়তেন উল্লাসে।

সন্ধ্যা ঘনালে ঝিন্নিদেবী জিজ্ঞেস করতেন, আউট হাইসে থাকার ব্যবস্থা করি।

ডাক্তার মুখার্জী বলতেন, কেন, পুরানো কাঠের বাড়িতে থাকতে তোমার অসুবিধে আছে?

ঝিন্নিদেবী মনে মনে তাই চাইলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারতেন না। তিনিও তাঁর অতীত দিনগুলোকে গভীরভাবে পেতে চাইতেন।

তিনি উত্তর করতেন, আউট হাউসটাকে নতুন করে গড়ে তুলেছ, তাই বলছিলাম। পুরানো কাঠের বাড়ি, কাঠের সিঁড়িতে তোমার হয়ত অসুবিধে হবে।

কিছুমাত্র না। ঐ কাঠের সিঁড়ির ওপরের ঘরটিতে শুয়ে আমি প্রথম দিনের মত কান পেতে অপেক্ষা করব সিঁড়িতে তোমার পায়ের শব্দ শোনার জন্য। তোমার কানের সেই ছোট্ট দুলগুলো মুখ ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে টুলটুল করে দুলে উঠবে, সে দৃশ্য দেখার লোভ আমি আজও ছাড়তে পারিনি ঝিন্নি।

মৃত্যুর ছ'মাস আগে ডিসেম্বরে কোলি-রি-দেয়ালির মেলা দেখতে টাট্টুতে চড়ে বরফের ওপর দিয়ে গিয়েছিলেন নাগ্‌গরে। ঝিন্নিদেবী আগে থেকে গিয়ে ওপরে ফরেস্ট বাংলোর একখানা রুম বুক করেছিলেন।

বিয়ের আগে প্রেমপর্বের মত তাঁরা সেদিনও সন্ধ্যার মুখে মেলা দেখে ফিরে এসেছিলেন নির্জন বাংলোতে। হাউই উঠেছিল কেল্লা থেকে। এখন যেটি সরকারী বাংলো। সেই প্রথম মেলা দেখার দিনটির মত ওঁরা দুজনে একই কম্বলের উত্তাপে থেকে জানালার ফাঁকে দেখেছিলেন উজ্জ্বল হাউইয়ের আকাশপথে ওঠা নামা। আকাশ থেকে অজস্র তারাফুলের ঝরে ঝরে পড়া।

জীবনের উত্তাপ অনেকখানি স্তিমিত হয়ে এলেও তাঁরা নাগ্‌গরের উৎসবে প্রায় প্রথম দিনের মতই রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলেন। স্মৃতির সুরভি সম্ভবত সহজে মুছে যায় না।

নাস্তা শেষ হলে তিন্‌নি বলল, মা, আমি যদি বাবার গাড়িখানা চালিয়ে নিয়ে যাই তাহলে তোমার আপত্তি আছে?

ঝিন্নিদেবী বললেন, তোমার বাবাই তো হাতে ধরে তোমাকে গাড়ি চালানো শিখিয়েছে। তুমি নিশ্চয়ই বাবার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে। সাবধানতার কথা আমি কিছু বলব না। ওটা যে যার নিজের হুঁশিয়ারীর ব্যাপার। তুমি নিশ্চিন্তে যাও।

তিন্‌নি বলল, অর্ক কিন্তু ওস্তাদ ড্রাইভার মা।

দু বন্ধুতে আনন্দে চলে যাও। আশা করি রাত আটটার ভেতর ফিরে আসবে।

তুমি চিন্তা কর না মা, আমরা ঠিক সময়েই ফিরব।

অর্ক আর তিন্‌নির মারুতি উঁচু নিচু রাস্তায় ঢেউ তুলে বেরিয়ে গেল।

সারা মানালীর মানুষের কাছে তিন্‌নি কেবল পরিচিত নয় একান্ত প্রিয়, ঘরের মেয়েটির মত।

ডাক্তার মুখার্জীর মেয়ে হিসেবে তিন্‌নির ওপর শহর আর পাহাড়ী বস্তি এলাকার মানুষদের বাড়তি একটা আকর্ষণ থাকলেও তার ব্যক্তিগত চরিত্রের নম্রতা, সকলের প্রতি তার সুমিষ্ট ব্যবহার ও পরোপকারের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাকে সবার একান্ত প্রিয় ও আপনজন করে তুলেছিল।

শহর পেরিয়ে যাবার সময় অনেকেই হাত নাড়ল। গাড়ি চালাতে চালাতেই তিন্‌নি তার হাত নেড়ে নেড়ে ওদের প্রত্যভিবাদন জানিয়ে গেল।

এখানকার মানুষ তোমাকে খুব ভালবাসে তিন্‌নি।

তিন্‌নি মজা করে বলল, কেন, আমেরিকার মানুষ আমাকে ভালবাসে না?

অর্ক বলল, চুম্বক পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই থাক, লোহা তার দিকে ছুটে যাবেই। তোমার ভেতর সেই আকর্ষণী শক্তি আছে তিন্‌নি।

গাড়িতে ব্রেক কষে তিন্‌নি অর্কের হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় চেপে ধরে বলল, তুমি আমার সব সেরা বন্ধু অর্ক। একদিন কথা প্রসঙ্গে বাবা বলেছিলেন, জুলিয়েনের কাছে হৃদয় উজাড় করে আমি যে কথা বলতে পারি, তোমার মা আমার সব থেকে আপনজন হলেও তার কাছে সব সময় তা পারি না।

আবার গাড়ি চলল। কুলুতে পৌঁছে নিজেদের আউট হাউসে উঠল ওরা। ঢোল ময়দানের পেছনের দিকের পাহাড়ে আপেল বাগিচার এক প্রান্তে আউট হাউস। মূল বাড়িখানা পুরানো দিনের। কাঠ আর শ্লেট পাথর দিয়ে তৈরী। আউট হাউসটি পরে মজবুত করে গড়া হয়েছে। একেবারে আধুনিক সব ব্যবস্থা।

কেয়ারটেকার গোপীনাথজী ঘর খুলে দিলেন। ছোট মালিক আর তার সঙ্গে এক বন্ধু এসেছেন। তাই কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না তিনি। সদা তটস্থ হয়ে আছেন।

তিন্‌নি বলল, চাচাজী, বাড়িখানা বেশ ছিমছাম করে রেখেছেন। মা শুনলে ভারি খুশি হবেন।

মানালী থেকে কোন চিঠ্‌টি আসেনি মালিকের।

তাতে কি হয়েছে। আপনার ঘরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে ভারি আরাম বোধ করছি।

এ তো আপনার মোকাম আছে ছোট মালেক।

তিন্‌নি হেসে বলল, এ মোকাম কার সে ফয়সালা পরে হলেও চলবে, এখন একটুখানি গরম পানির ব্যবস্থা হলে স্নানটা সেরেনি।

কেন ছোট মালেক, স্নানঘরে তো গিজার রয়েছে। এখুনি কুন্তিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, গরম পানিতে বালতি ভরে দেবে।

তিন্নি প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, না না সে সব কিছু করতে হবে না। আমি ঠিক জানতাম না যে ওখানে গিজার রয়েছে।

ওপরের স্নান ঘরেও রয়েছে ছোট মালেক। দুটো বাথরুমেই নতুন সাবান আর তোয়ালে রয়েছে।

চাচাজী আমরা এ বেলা দুজনে লাঞ্চ করব। বিকেল পাঁচটা নাগাদ চার পাঁচজন বন্ধু এসে পড়বে। তাদের জন্য একটুখানি হাই-টির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ভেজ না ননভেজ মালেক?

ননভেজ।

কথা শেষ হতে না হতেই এসে গেল কুন্তি।

ট্রেতে এনেছে দুকাপ চা, কিছু সলটেড কাজু আর দুটো মেঠাই।

বছর তের বয়সের মেয়েটি। ভারি মিষ্টি দেখতে। কানে দুটি ছোট্ট ঝুমকো দুল। গলায় পুঁতি আর লাল ফলের বীজের মালা। বিনুনি করেছে জরির ফিতে দিয়ে। লাল ট্যাসেল ঝুলছে।

ট্রেটি টেবিলের ওপর বসিয়ে দিয়ে কুন্তি বলল, মেমসাব লাঞ্চে কি খানা পাকাব?

তিন্নি তার হাত ধরে নিজের কাছে টেনে এনে বলল, আমি মেমসাব নই কুন্তি, আমি তোমার বড় বহিন, তিন্নি দিদি।

কুন্তি উচ্চারণ করল, তিন্নি দিদি।

তার ছোট্ট মিষ্টি মুখখানা খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

বেলা তিনটে নাগাদ আউট হাউস থেকে বেরিয়ে পড়ল তিন্নি আর অর্ক। তারা কুলু-মানালী হাইওয়ের ওপর ক্যারল আর তার বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করবে। ঐ পথ দিয়েই যেতে হবে ক্যারলদের। জুলিয়েন আঙ্কেল বলেছিলেন, ওঁর অ্যামবাসেডারখানা চণ্ডিগড়ে ক্যারলের কাছেই রয়েছে। ওটা নিয়েই ও আসবে।

অর্ক আর তিন্নি রাস্তার ধারে পায়চারি করতে লেগে গেল।

এ সব অঞ্চল তিন্নির নখদর্পণে। অর্কের কাছে একেবারে অচেনা, তাই সবই শোভাময়। সে কুলুর নিসর্গ দৃশ্য দুচোখ ভরে দেখতে লাগল।

এখন আপেলের ডালে ডালে ফুলের বদলে ফল দেখা দিয়েছে। বড় বড় ডুমুরের আকারে ফলগুলো ডাল ছেয়ে ফেলেছে।

ওদিকে এপ্রিলে বরফ গলতে শুরু করায় হাজারো রঙ বাহারি ফুল উঁকি দিচ্ছে পাহাড়ে জঙ্গলে। পথের ধারে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে, ছই বা স্রোতধারার তীরে তীরে উঁকি দিচ্ছে, দুলছে, কত জাতি, কত বর্ণের ফুল। রোডোডেনড্রনেও লাল ফুল শাখায় শাখায় আগুনের শিখা তুলে ধরেছে।

অর্ক উত্তেজিত গলায় বলল, ঐ তো দূরে দেখা যাচ্ছে অলিভগ্রীন রঙের একখানা অ্যামব্যাসেডার।

তিন্নি হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।

আরে না না, ক্যারলের অ্যামব্যাসেডারের রঙ অফ্ হোয়াইট।

অর্কও তিন্নির হাসিতে যোগ দিয়ে বলল, আমি কি অতশত রঙের খবর রেখেছি নাকি। এবার অফ্ হোয়াইট দেখলেই ধরব।

আবার হাসি, ইতিমধ্যে ক্যারল যদি গাড়ির রঙটা বদলে ফেলে?

তাইতো আমি রঙের বাছবিচার না করে অ্যামব্যাসেডারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি।

তিন্নি বলল, তাই হোক্, তুমি অফ্ হোয়াইট বাদে সব রঙের গাড়ি লক্ষ্য কর, আমি শুধু অফ্ হোয়াইট দেখে যাই।

দুজনের জল্পনা কল্পনার ভেতরেই একখানা গাড়ি এসে দাঁড়াল ওদের গা ঘেঁষে। লাল রঙের মারুতি ভ্যান।

গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ক্যারল। ধীরে ধীরে অন্য সবাই।

পরিচয় পর্ব দ্রুত সারা হল হাত নাড়া আর হাই হাই আওয়াজ তোলার ভেতর দিয়ে।

ওরা সবাই মিলে এলো তিন্নিদের আউট হাউসে। আগন্তুকদের ভেতর তিনজন ছেলে আর একটি মাত্র মেয়ে।

তিন্নি মেয়েটির হাত ধরে নিয়ে গেল ওপরের ঘরে। বাকিরা নিচেই হাত মুখ ধুয়ে পোশাক ছেড়ে সারাদিনের গ্লানিমুক্ত হতে লাগল।

ফিটফাট হয়ে ওরা এলো খাবার টেবিলে। স্যালাড, মাংসের কাটলেট আর এক প্লেট করে ঘুগনি। সঙ্গে সফ্ট ড্রিংক্স্।

পরে চা আর কিছু স্ন্যাক্স্ এলো।

হেভি টির পরে বাগান থেকে সদ্য তোলা কিছু গোলাপ তিন্নির গোপন নির্দেশে কুন্তি এনে সবার হাতে একটি একটি করে ধরিয়ে দিল।

খুশির ঢেউ উঠল। সবাই আদর করল কুন্তিকে। অনেকগুলো টফি উপহার পেল সে।

এবার মানালীর পথে আগে পিছে দুটো গাড়িই চলবে।

ওদের ভেতর কপিল সাহানি বেশ জমাটি ছেলে। ধ্রুব পোড়েল কম কথা বলে কিন্তু আসরে বসে ঠিক জায়গায় হেসে উঠতে পারে। রত্নাবলী কুট্টি কেরলবাসিনী এবং মধুবহাসিনী। হরিহরন্ কুট্টি চণ্ডিগড়ের খ্যাতিমান নিউরোসার্জেন। তাঁর একমাত্র কন্যা রত্নাবলী। মেডিক্যাল স্টুডেন্ট। মোহিনী আট্টমে কেরল সরকারের পুরস্কারপ্রাপ্তা।

ধ্রুব আর কপিল ছুটি পড়লেই ট্রেকিংয়ের জন্য পাগল হয়ে ওঠে। পিন্ডারী গ্ল্যাসিয়ার, অমরনাথ, মণিমহেশ, এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ওরা ঘুরে এসেছে। এবার বাসে যাবে রোটাং হয়ে লে। ফিরবে ট্রেকিং করে মানালী। তারপর সবাই মিলে ফিরবে চন্ডিগড়।

কপিল এগিয়ে এসে অর্কের কোমর বেষ্টন করে বলল, বন্ধু তোমার সঙ্গে আমাদের নতুন পরিচয়, তুমি কি এ পথটুকু আমাদের সঙ্গ দেবে?

নিশ্চয়ই, তবে একটি শর্তে।

বল।

আমি আনাড়ী হাতে বাকি পথটুকু তোমাদের ড্রাইভ করে নিয়ে যাব।

কপিল বলল, আমরা সবাই ক্লান্ত, তোমার হাতেই নিজেদের সঁপে দিতে চাই।

সবাই হেসে উঠল। অর্ক স্টিয়ারিং ধরল। কপিল সাদা মারুতিখানার দিকে ক্যারলকে ঠেলে দিয়ে বলল, এ গাড়িতে আর ভিড় বাড়িও না গুরু।

ততক্ষণে সাদা মারুতির স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে তিন্নি। ক্যারল তার পাশে গিয়ে বসল। লাল মারুতি বেরিয়ে গেল আগে। অর্কের পাশে বসে রত্নাবলী। সে তিন্নির উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। তিন্নিও মাথাটা বের করে একমুখ হাসি উপহার দিল।

লাল মারুতির পেছনে চলেছে সাদা। তিন্নি নীরবে গাড়ি চালাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি সামনের দিকে। পাশে বসে তাকে লক্ষ্য করছে ক্যারল।

আজ দেখা হবার পর থেকে তিন্নি তার সঙ্গে মুখ তুলে একটিও কথা বলেনি। অতিথি আপ্যায়নে তার আন্তরিক উত্তাপের ঘাটতি ছিল না। পরিবেশনের সময় স্বাভাবিকভাবে সে সবাইকে খাবার এগিয়ে দিয়েছে। হাসি গল্পে যোগ দিয়েছে সবার সঙ্গে। কেউ বুঝতেই পারেনি তিন্নির মনের গভীরে কোন দুঃখ বাসা বেঁধেছে কিনা।

ক্যারলই প্রথম কথা বলল, আমার ওপর এত অভিমান তোমার?

এ কথা কেন?

দেখা হবার পর থেকে একটিও কথা বলনি। এক মাস পাঁচ দিন পার হয়ে গেল, তোমার কোন খবর নেই।

তিন্নি বলল, আমার একটা ভুল ধারণা ছিল, ক্যারল বেননের এমন কোন খবর নেই যা আমার অজানা। কিন্তু সে ভুলটা তুমি ভেঙে দিয়েছ।

বুঝেছি, তুমি কি বলতে চাইছ। আমি তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম তিন্নি। ড্যাডি যে আমার পাঠানো খবরটুকু হজম করতে পারবে না, তা আমি বুঝতে পারিনি।

তুমি কি মনে কর তোমার চেয়ে আঙ্কেল আমাকে কম ভালবাসেন? তিনি খবরটা পেয়ে আমার কাছে গোপন রাখবেন, এই কি তোমার ধারণা হল? চিঠি পেয়েই আমাকে ডেকে বললেন, মম, ক্যারল তার বন্ধুদের নিয়ে আসছে টুয়েন্টি থার্ড এপ্রিল। ওরা সকলেই তোমার গেস্ট হয়ে থাকবে কয়েক দিন। সব ব্যবস্থার ভার তোমার।

এবার অন্য প্রসঙ্গে এল ক্যারল, অর্ক ছেলেটির সঙ্গে ভাল করে আলাপ হল না।

তিন্নি বলল, সুযোগ চলে যায়নি।

তোমার সঙ্গে আলাপ হল কি করে?

যেমন করে একটি মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলের আলাপ হয়। কেন ঈর্ষা হচ্ছে নাকি?

ক্যারলের মুখে হাসি, তা একটু হচ্ছে বইকি।

আমার তো কই হচ্ছে না।

তোমার কেন হবে?

বাঃ, বার ঘন্টা সুন্দরী মধুরহাসিনীকে যে পাশে বসিয়ে আনলে।

এবার হো হো করে হেসে উঠে ক্যারল জড়িয়ে ধরতে গেল তিন্‌নিকে।

গাড়ি দু'একবার বাঁক নিল। শেষে জোর ব্রেক খেয়ে থেমে গেল।

এখুনি অ্যাকসিডেন্ট হত যে।

ক্যারল জড়িয়ে ধরে বলল, দুজনের মিলনটা গভীর হত।

ক্যারলের কাঁধে মাথা রেখে সুখের দু ফোঁটা অশ্রু ঝরালো তিন্‌নি।

ক্যারল বলল, এবার আমি চালাই।

না, আড়াইশো কিলোমিটাবেরও বেশী তুমি চালিয়ে এসেছ, এখন সীটে গা ঢেলে দিয়ে রিল্যাক্‌স্‌ কর।

আমি একা চালাইনি। কপিল, রত্নাবলীও বেশ কিছু পথ চালিয়ে এনেছে।

রত্নাবলী মেয়েটি কিন্তু বেশ। সারাক্ষণ মুখে হাসিটুকু লেগে আছে।

কপিলও দারুণ আমুদে, ধ্রুব একটু চাপা।

তোমার বেস্ট্‌ ফ্রেন্ড কপিল।

কি করে বুঝলে?

ওই তো অর্ককে ও গাড়িতে টেনে নিয়ে তোমাকে আমার দিকে ঠেলে দিলে।

দারুণ ধরেছ। এই এক বছরে তোমার বুদ্ধি দেখছি বেশ ঝকঝকে হয়েছে।

তিন্‌নি একটা বাঁক ঘুরতে ঘুরতে বলল, পড়াশোনা কেমন চলছে?

পরীক্ষকরা আমার পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট হলেও আমি নিজে নই।

কেন?

বেশীক্ষণ পড়তে পারছি না। রাত নটাতেই বিছানায় ঢুকছি। অন্য বন্ধুরা বারোটার আগে কেউ বিছানায় যায় না।

ওরা এতক্ষণ কি করে?

বেশীর ভাগ পড়াশোনা করে। বাকিরা টিভি খুলে গভীর রাতের সিনেমা দেখে।

তুমি এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় কেন?

একটি মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখব বলে।

গাড়ির ভারতীয় চালিকাটি ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে একমাত্র ইংরেজ আরোহীকে একটি ঘুষি মারল।

সে ঘুষি পরমানন্দে হজম করল ইংরাজ যুবা পুরুষটি।

তিন দিনের ভেতর ধ্রুব আর কপিল টেন্ট এবং পোর্টার যোগাড় করে ফেলেছে। ওরা আর একটি দিন মাত্র থাকবে মানালীতে। তারপর ওদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী শুরু হবে যাত্রা।

তাই আজ রাতেই সপ্তরথীর (ভাগ্‌তুরামও অন্যতম এক রথী) অনারে ডিনার পার্টির আয়োজন করেছেন জুলিয়েন বেনন।

ব্যাঙ্কোয়েট হলে তিন্‌নির চিত্র-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন জেলাশাসক মহোদয়।

তারপর দেড় ঘন্টার ঠাসা প্রোগ্রাম! সবশেষে নিমন্ত্রিত বিশিষ্ট অতিথিদের ডিনারে আপ্যায়ন।

তিনদিনে ওরা সাতজন মিলে দেড় ঘন্টার ভ্যারাইটি প্রোগ্রামের জন্য রিহার্সেলেব পর রিহার্সেল দিয়ে গেছে। ডাক্তার মুখার্জীর গেস্ট হাউসের প্রশস্ত লনে একক, দ্বৈত আর সমবেত নাচের রিহার্সেল হয়েছে। গানগুলিও শিল্পীরা প্র্যাকটিস করে নিয়েছে যে যার যন্ত্র সহযোগে।

ছবিঘরে সাতরঙা আলোর তলায় দাঁড়িয়ে ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হাসি ছড়িয়েছে। ফটোগ্রাফার মুভি ক্যামেরায় তুলে নিয়েছে সে সব আনন্দঘন মুহূর্তগুলো। তিন্‌নি তার আঁকা কার্ডগুলো বন্ধুদের উপহার দিয়েছে ঐ ছবিঘরের চা-চক্রে।

সর্বত্র খুশির জোয়ার। তিনদিন অতিথিরা চষে বেড়িয়েছে মানালী। কখনো পাহাড়চূড়ায়, কখনো ভ্যালির তলায়। আবার কখনো বা ঘন সবুজ পাইন বনের নীচে আলোছায়ার ফুলতোলা ঘাসের জাজিমে।

প্রথমে ছবির উদ্বোধন হল। তিন্‌নি প্রতিটি ছবির বিষয়বস্তুর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে দিল দর্শকের সামনে।

ছবি দেখার শেষে শুরু হল দর্শকের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন।

জেলাশাসক ছবির একজন রসিক সমঝদার। তিনি বললেন, এত অল্প বয়সে হাতের এমন বলিষ্ঠ টান অভাবনীয়। স্কেচের গুণে প্রতিটি ছবি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ছবির ভাবগুলো ক্যানভাসের বিশেষ একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত না করে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন ক্যানভাসের বিভিন্ন জায়গায়। তাতে ভাবটি বিস্তীর্ণ পটভূমিতে বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু মূল ভাবটি কি এবং ছবির কোন অংশে তা পরিস্ফুট, আঁকার গুণে দর্শকের বুঝে নিতে একটুও অসুবিধে হয় না। শিল্পীর জন্য রইল আমার অজস্র অভিনন্দন।

দর্শকের ভেতর থেকে উঠল করতালি ধ্বনি। জুলিয়েন বেনন আজকের বিশিষ্ট অতিথিব হাত দিয়ে ঝকঝকে রুপোর কাজ করা ফ্লাওয়ার ভাসে শিল্পীকে একগুচ্ছ গোলাপ উপহার দিলেন।

মঞ্চের স্ক্রীন উঠলে দেখা গেল ভাগ্‌তুরাম পুরোপুরি গাদ্দী পহালদের পোশাক পরে মঞ্চের মাঝখানে বসে আছে। মাথায় পহালদের টুপি। তার দুটো হাতে ধরা আছে বাঁশুরি। ঠোঁট দুটি ফুঁ দেবার জন্য প্রস্তুত।

উইংসের ভেতর থেকে প্রথমে ভেসে এল দুছত্র কথা ঃ মাসের পর মাস ঘর সংসার ছেড়ে গাদ্দী পহালরা তাদের ভেড়ার পাল নিয়ে বেরিয়ে যায় নতুন নতুন চারণভূমির সন্ধানে। ঘরের ভেতর বিরহিনী বধূরা চোখের জল ফেলে বলে, হে আমার প্রিয়, তোমার আমার মাঝে আজ দুস্তর ব্যবধান। মনে হচ্ছে আমার বুকের মাঝে কেউ যেন গেঁথে দিয়েছে তীক্ষ্মধার এক তলোয়ার।

কথা শেষ হলে নেপথ্যে শুরু হল নারীকণ্ঠের গান, তার সঙ্গে বাঁশুরির সুর লহরী। ভাগ্‌তুরাম বাঁশিতে সুর তুলেছে, নেপথ্যে গাইছে তিন্‌নি।

'আসা ওয়ারে ওয়ারে
তোঁসা পারে পারে
তেরি চলন্দি চাল বিছানি,
সজ্জন মিলন লাগে।
গুটকে যাফিয়াঁ পাইয়াঁ,
খিন্ডদে খিন্ডদে সজ্জন
খিন্ডন লাগে,
জিয়াঁ তলোয়ারি দে
ফাট্ সেইয়োঁ।'

গান থামলে ভাগতুরাম নতুন করে সুরের ঢেউ তুলল। সমস্ত গানের সুরটা সেধে নিল বাঁশিতে।

এবার শুরু হল কথা ঃ

নদীর ধারে থেকেও তিতির পাখি পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ে। বল, প্রিয়তমের কাছ থেকে যে নারী দূরে রয়েছে তার বুকের হাহাকার কতখানি।

আবার গান শুরু, কান্নাভরা গলার গান ঃ

নদীরে কট্‌লা মন্‌রো তত্‌রু চীষে
জীনা রে রুষো সজনো
তীনে গি জীব্‌না বোলো কিসে।

গান শেষ হল, কিন্তু বাঁশি ধরে রইল তার সুরের রেশ।

এখন সামান্য কদিনের জন্য ঘরে ফিরে এসেছে পহালরা। হোক্ সামান্য কটি দিন তবু খুলে গেছে আনন্দের ফোয়ারা। বাঁশিতে তাই ঢেউ তুলেছে মন মাতানো সুর।

সহসা বাঁশিওয়ালাকে ঘিরে শুরু হল উত্তাল খুশির নাচ। দুটি ছেলের মাঝে একটি করে মেয়ে। মন্ডলি রচনা করে নাচছে। ধীরে ধীরে মাতন উঠল নাচে। বাঁশুরির সুর তুফানের মত আকাশ ছুঁয়ে বাজছে। আনন্দে উত্তপ্ত হয়ে উঠল মঞ্চ। ঘন ঘন করতালির মধ্যে নেমে এল ড্রপসীন।

পর্দা উঠলে দেখা গেল ধবধবে সাদা পোশাক পরে জরির টুপি মাথায় দিয়ে ভায়োলিনে সুর তুলেছে ক্যারল। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন যুবক। প্রসিদ্ধ বেনন পরিবারের ছেলে। প্রিন্সের মহিমায় দাঁড়িয়ে বেহালায় সুর তুলছে।

সেই সুরের টানে নাচের ভঙ্গীতে মঞ্চে এসে ঢুকল একটি পুরুষ ও একটি নারী।

পুরুষের পরনে টাইট নেভি ব্লু পোশাক। মাথায় সাদা টুপি। টুপির সামনে একটি লাল পালক গোঁজা। মেয়েটির পরনে দক্ষিণী পোশাক। সুন্দর খোঁপা করে চুল বাঁধা। অনেকটা মোহিনী আট্টমের সাজে সজ্জিত।

ওরা মূক অভিনয় করে চলল কিছুক্ষণ।

বোঝা গেল, পুরুষটি সৈনিক। সে ছুটি কাটাতে এসেছিল ঘরে। কদিন আনন্দে কাটল।

এবার কাজের জগতে ফিরে যেতে হবে পুরুষটিকে। মেয়েটি তাকে যেতে দিতে চায় না। পুরুষটি আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইছে, সে সৈনিক। তার আছে দেশরক্ষার দায়িত্ব। বীরের মত লড়াই করতে হয় তাকে।

ভায়োলিনে গম্ভীর নাদে দ্রুত গৎ বাজতে লাগল। মাঝে মাঝে ঝঞ্ঝনা।

নাচছে অর্ক। সৈনিকের বিক্রম নিয়ে সে বিদ্যুৎগতিতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সারা মঞ্চ।

পাশ্চাত্য নৃত্যের গতিশীলতা অর্ককে যেন উড়িয়ে নিয়ে চলেছে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। সে মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাক খাচ্ছে তীব্র বেগে। একটা ঘূর্ণি যেন ঘুরে চলেছে প্রবল শক্তিতে। তার সঙ্গে সঙ্গে দমকে দমকে ঝড়ের ঢেউ উঠছে ভায়োলিনে।

হঠাৎ নাচের তান্ডব থেমে গেল। পুরুষ স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে নারীর দিকে।

নারীর শেষ অস্ত্র প্রয়োগের জন্য তৈরী হয়েছে রত্নাবলী। সে এখন মোহিনী আট্টম নৃত্যের মোহিনী।

ভায়োলিনের মধুর সুরে নাচছে মোহিনী। ওষ্ঠে হাসি, দৃষ্টিতে সম্মোহিনী যাদু। সারা অঙ্গে আমন্ত্রণের তরঙ্গ তুলে রত্নাবলী নাচছে। দক্ষিণভারতের শিক্ষিতা নর্তকীর পায়ের নূপুর যেন কথা বলছে। মোহিনীর দৃষ্টিতে আকর্ষণ, দেহে আমন্ত্রণ আর চরণের ঝঙ্কৃত নূপুর যেন তালে তালে বলছে, যেও না, যেও না, যেও না, প্রিয় যেও না।

রত্নাবলীর অপূর্ব নাচে মুগ্ধ দর্শককুল। একটু আগে অর্কের পাশ্চাত্য ভঙ্গিমায় নৃত্য পরিবেশনের সময় বিস্মিত হয়েছিল দর্শকেরা, এখন একেবারে বিমুগ্ধ।

তবু চলে যেতে হয়। সংসারের সমস্ত আকর্ষণের পাশ ছিন্ন করে দেশমাতৃকার আহ্বানে চলে যেতে হয় সৈনিককে।

যাবার আগে প্রিয়তমার জন্য রেখে যায় শেষ চুম্বন।

কোনারকের সূর্যমন্দিরে মুদিত আঁখি প্রেমিকার দেহ বামহস্তে বেষ্টন করে পুরুষ যেমন দক্ষিণ করে তার মুখমন্ডল তুলে ধরেছে চুম্বনের আশায়, ঠিক তেমনি রত্নাবলীর মুখখানি তুলে ধরল অর্ক গভীর আবেগে।

এরই ভেতর ভায়োলিনে বেজে উঠল বিদায়ের সুর। মুগ্ধ প্রেয়সীকে ছেড়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিল বেদনা-বিক্ষত পুরুষ।

যবনিকা নেমে এল দীর্ঘস্থায়ী করতালিধ্বনির ভেতর দিয়ে।

ছোট্ট অনুষ্ঠানের ভেতর প্রাণের যে ছোঁয়া আছে তা সমস্ত দর্শক-হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল।

অনুষ্ঠানের শেষে আবার মঞ্চে উঠলেন জেলাশাসক। তিনি নৃত্য, বাদ্য আর গীতের অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন।

এবার ঝিন্নিদেবী প্রদত্ত সাতখানি কুলুর শাল শিল্পীদের উপহার হিসাবে দেওয়া হল।

ধ্রুব আর কপিল রোটাং গিরিপথ পেরিয়ে কেলংয়ের দিকে যাত্রা করার পর ওরা মানালীর আশপাশের দ্রষ্টব্য জায়গাগুলো একটি একটি করে দেখে নিল। রোটাংয়ে গিয়ে দেখে এল কান্তিময়ী বিপাশার উৎসমুখ।

এসব অর্ক আর রত্নাবলীর কাছে প্রথম দেখার রোমাঞ্চ বয়ে আনলেও ক্যারল আর তিন্নির ভেতর সে রোমাঞ্চ জাগাতে পারল না। তবু স্থানগুলোর এমন মাহাত্ম্য যে বহু-দেখা হলেও তা পুরানো হয় না।

এবার চারমূর্তি এল শহরে। কুলুর বাংলোতে আগেভাগেই এসে হাজির ছিল ভাগ্‌তুরাম। ঝিন্নিদেবী তাকে ঐ চারজনের দেখভালের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি জানেন, ভাগতুর নয়নের মণি তিন্নি। তাই তাকে পাঠিয়ে ঝিন্নিদেবী নিশ্চিন্ত ছিলেন সবদিক থেকে।

ওরা ভোরে নাস্তা সেরে পায়ে হেঁটে ঘুরে এল রঘুনাথজীর মন্দির। কুলুর শত শত দেবতার ভেতর রঘুনাথজীই প্রধান দেবতা।

এর পরের দিনই ওরা খুব ভোরবেলা বেরিয়ে গেল বিজলী মহাদেও মন্দির দেখতে। গাড়িতে না গিয়ে পায়ে হেঁটেই গেল ওরা। কুন্তী আর ভাগ্‌তুরাম মিলে অনেক খাবার তৈরী করে ব্যাগে ভরে দিল ওদের। দশ কিঃ মিঃ রাস্তা পাড়ি দিতে হবে, আবার মন্দির দর্শন করে ফিরে আসতে হবে এতখানি পথ পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যার আগে।

তবু কারে যাবার থেকে পায়দলে যাবার মাদকতাই আলাদা।

আঁকা ছবির মত চাবদিকের দৃশ্যাবলী। ওরা গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে পাহাড়ী পথে সারি দিয়ে চলতে লাগল। চিত্রহার, রঙ্গোলী, কোন কিছুর গানই বাদ গেল না।

তিন্নি বলল, গানের সুরগুলো বেশ দোলা দেয় কিন্তু নাচেব দিকে তাকানো যায় না একেবারে।

রত্নাবলী বলল, আমি ঐ সুরের সঙ্গে অনেকগুলো নাচ কম্পোজ করেছি। বন্ধুরা দেখে বলেছে, ওগুলো যেমন গতিশীল তেমনি রুচিশীলও।

তোমার কম্পোজ করা নাচগুলো দেখতে ভারি ইচ্ছে করছে। সারা পৃথিবীর সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে গেলে আমাদেরও গতি বাড়াতে হবে কিন্তু সেজন্যে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের রিচ হেরিটেজকে বিসর্জন দেব না। অকারণ আড়ষ্ঠতা যেমন আজকের দুনিয়ায় অচল তেমনি গতির নামে উচ্ছৃঙ্খলতাকেও আমরা আঁকড়ে ধরব না।

ক্যারল বলল, তোমার কথাগুলোয় যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু আমার কি মনে হয় জান, এ ক্ষ্যাপামি একদিন বন্ধ হয়ে যাবে।

রত্নাবলী বলল, আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি ক্যারলকে। যার শেকড় নেই মাটির গভীরে সে গাছ কখনো বেশীদিন বাঁচতে পারে না। ফোক্ অথবা ক্ল্যাসিকেল, কোন নাচেরই সামান্যতম ছোঁয়া নেই ওসব নাচের ভেতর। টিন এজারদের দমিত যৌন ক্ষুধাকেই ওরা উদ্দাম নাচের ভেতর দিয়ে মুক্তি দিচ্ছে। ওরা চারটি তরুণ-তরুণী ওদের জীবনের নানা ধরনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করল। সিডার আর পাইন বনের ভেতর দিয়ে হাঁটল। কুন্তী আর ভাগ্‌তুরামের প্যাক করা খাবার পথের ধারে বসে মহা আনন্দে গল্প করতে করতে খেল।

প্রায় আড়াই হাজার মিটার উচ্চতায় বিজলী মহাদেও মন্দির। খাড়া পাহাড়ী চড়াই

ভাঙতে ভাঙতে ওপরে উঠতে হয়। বুক চড় চড় করে। ক্যারল আর অর্ক বেশ মজা করতে করতে ওদের কোথাও বা ঠেলে আবার কোথাও বা টেনে তুলল।

ওপরে উঠে রত্নাবলী বলল, বাব্‌বা চড়াই বটে।

ক্যারল বলল, এখানে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে যদি একটা ভরতনাট্যম্ মুখে বোল বলতে বলতে নেচে যেতে পার তাহলে ...।

রত্নাবলী তখনও হাঁপাচ্ছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, অ-স-ম্ভ-ব।

তিন্‌নিও হাঁপাচ্ছিল। সে রত্নাবলীকে ঠ্যালা দিয়ে বলল, বোকা, তাহলে ও কি দেবে বলছিল তা জেনে নাও।

ক্যারল বলল, ও যা চাইবে তাই দিয়ে দেব। অবশ্য যা আমার আয়ত্তের ভেতর আছে।

তিন্‌নি রত্নাবলীর কানে কানে কিছু বলে দিলে রত্নাবলী বেশ জোরের সঙ্গে বলল, তাহলে প্রতিজ্ঞা পূরণ কর যুবক।

ক্যারল বলল, আগে নাচ।

অবশ্যই নাচব। তবে সবার সামনে আমার প্রার্থিত বস্তুটি দিতে স্বীকার করলে আমি নাচ শুরু করব।

ক্যারলেরও জিদ চেপে গেছে। সে জোরের সঙ্গে বলল, বল কি চাও?

দুটো হাত বাড়িয়ে দিয়ে রত্নাবলী বলল, আমি তোমাকেই চাই মাই ডিয়ার।

ক্যারল প্রথমে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। অর্ক আর তিন্‌নি জোরে হেসে উঠল। শেষে ওদের হাসির সঙ্গে মিশে গেল ক্যারলের হা হা হাসির আওয়াজ।

একটুখানি বিশ্রামের পর চাঙ্গা হয়ে উঠল ওরা। উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল চারদিকের দৃশ্যাবলী।

অপূর্ব সুন্দর! পার্বতী আর কুলু উপত্যকাকে এখান থেকে স্পষ্ট চিনে নেওয়া যায়। মন্দিরের ওপর ষাট ফুট উঁচু একটি ধাতব দন্ড রয়েছে। প্রসিদ্ধি আছে বার বছরের ভেতর অন্তত একবার ঐ দন্ডের মাধ্যমে মন্দিরের ভেতর বিদ্যুৎ-সংযোগ ঘটে। তখনই চূর্ণ হয়ে যায় শিবলিঙ্গ। পুরোহিত বহু যত্নে সংগ্রহ করেন সেই ভগ্ন প্রস্তরগুলি। তারপর বিশুদ্ধ মাখনে জোড়া দিতে দিতে আবার গড়ে তোলেন সেই পূর্বের শিবলিঙ্গটি।

এর পরের যাত্রায় ওরা গেল কুলু-মানালী হাইওয়ের ওপর কাতরাইন আর নাগ্‌গরে।

কাতরাইন উপত্যকাটি বেশ চওড়া। হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গগুলি এখানে বহুবিস্তৃত।

গভর্ণমেন্ট ট্যুরিস্ট লজ ভাড়া করে রেখেছিল তিন্‌নি আর অর্ক। ওরা বিকেলে পৌঁছে বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘুরল হাতে হাত বেঁধে। হিমালয়ের চোখ জুড়ানো শোভা দেখল। পরের দিন কটেজের চৌকিদারকে ছুটি দিয়ে জলখাবার থেকে লাঞ্চ, সবই তৈরী করল নিজেরা।

জলখাবারে তৈরী হল, গরম গরম পরোটা আর ভিন্ডি ভাজি। ক্যারল বসে বসে এই মেনু বাতলালো। তৈরী করল তিন্‌নি।

এক একখানা করে প্লেট সাজাল রত্নাবলী। পরোটা, আচার আর ভিন্ডি ভাজি।

অকুস্থলে অর্ক গরহাজির। ক্যারল বলল, দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে, আমার প্লেট দাও।

ওকে খাবার দিয়ে রত্নাবলী কটেজের আশপাশ দেখে এল, অর্ক বেপাত্তা। ফিরে আসতেই তিন্নি রত্নাবলীর হাতে ধরিয়ে দিল তার প্লেট।

ক্যারল আর রত্নাবলী গল্প করতে করতে খেতে লাগল। সেই ফাঁকে নিজের প্লেটের খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে অর্কের প্লেট হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল তিন্নি।

অর্ক কিছুটা কবি স্বভাবের। তিন্নি লক্ষ্য করছে, ইদানিং অর্ক মাঝে মাঝে কেমন যেন অভিমানী হয়ে উঠছে। আজ সকালে তিন্নিকে দূরের আপেল বাগানে বেড়াতে যাবার জন্য ইশারায় ডাক দিয়েছিল অর্ক। আর ঠিক সেই সময় কটেজের ভেতর থেকে ভোরের নাস্তা তৈরীর জন্য হাঁক দিয়েছিল ক্যারল। ভারি অদ্ভুত স্বভাবের ছেলে ও। যেমন বাবার মত বিশাল হৃদয় ওর, তেমনি মেজাজী, গোঁয়ারগোবিন্দ।

তিন্নি ভাল করেই চেনে ক্যারলকে। তাই সেই মুহূর্তে তার ডাককে উপেক্ষা করে অনাসৃষ্টি বাধাতে চাইল না। সে হাত নেড়ে অর্কের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। এখন অভিমানী অর্কের মান ভাঙানোর পালা তার।

আপেল বাগানের ভেতরে ঢুকে তিন্নি দেখল, বাগানের শেষসীমায় কয়েকটা পাইন গাছের জটলার তলায় ঝকঝকে হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে বসে আছে অর্ক। তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটি ঝোরা।

কাছাকাছি পৌঁছে পা টিপে টিপে গিয়ে তিন্নি হাঁটুগেড়ে বসল অর্কের ঠিক পেছনে। খাবারের প্লেটটি নিচে রেখে একটুকরো পরোটা আর ভাজি হাতের আঙুলে মুড়ে নিয়ে বাঁ হাতে ওর গলাটা জড়িয়ে ধরে খাওয়াতে গেল।

চমকে উঠে ফিরে তাকাল অর্ক।

তিন্নি বলল, বাব্‌বা, সঙ্গে আসিনি বলে এত অভিমান। এই নাও খাও।

তিন্নির মুখেচোখে গভীর অনুরাগের ছবি ফুটে উঠেছে।

অর্ক হাঁ করল। তিন্নি ওর মুখের ভেতর ভরে দিল খাবার। অর্ক চোখ বন্ধ করে তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল।

এক গ্রাস শেষ হলে চোখ খুলল সে। সামনে তার খাবার ভর্তি প্লেট। অমনি মাথা নেড়ে জানাল, তাকে খাইয়ে না দিলে সে খাবে না।

তিন্নি আবারও এক গ্রাস তার মুখে ঢুকিয়ে দিতে দিতে বলল, আমার খিদে পায় না বুঝি ?

অর্ক খাবারটা কোন রকমে চিবিয়ে নিয়ে ঢোঁক গিলে বলল, সে কি ? তুমি এখনও খাওনি!

রত্নাবলী তোমাকে কটেজের আশপাশে খুঁজে পায়নি। আমি ওদের দুজনকে খেতে বসিয়ে দিয়ে তোমার খাবারটা নিয়ে চলে এসেছি।

তুমি জানলে কি করে, আমি এখানে আছি?

আমি একজন পামিস্ট তাই।

অর্ক অমনি তিন্নির চোখের সামনে হাতের পাতাটা তুলে ধরে বলল, বল তো আমার বিয়েটা গুরুজনদের যোগাযোগের, না ভালবাসার?

গম্ভীর মুখে অর্কের হাতের রেখাতে আঙুল চালিয়ে তিন্নি বলল, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভালবাসার বিয়ে।

নড়ে চড়ে বসল অর্ক। এবার বল, স্বদেশিনী বা বিদেশিনী?

বিদেশিনী।

সে কি!

তুমি তো আইনত আমেরিকার বাসিন্দে। তাই বলছিলাম তোমার ভাগ্যে ভারতীয়, উগান্ডা অথবা চীনে বউ ঝুলছে।

অর্ক জোরের সঙ্গে বলল, আমি মনে প্রাণে ভারতীয় তিন্নি। আমি যেখানেই থাকি না কেন আমার বউ হবে খাঁটি ভারতীয়।

তিন্নি বরদানের ভঙ্গীতে হাত তুলে বলল, তবে তাই হোক্। এখন দয়া করে খাবারটা শেষ কর।

খাব, একটি শর্তে।

এখানেও শর্ত?

মুখ টিপে বসে রইল অর্ক।

তিন্নি বলল, রাজি, এবার বলে ফেল।

তুমি আমাকে একগ্রাস খাইয়ে দেবে, তার পরের গ্রাসটা আমি তোমাকে খাইয়ে দেব।

কিন্তু আমার খাবার পড়ে রইল ওখানে।

অর্ক বলল, ওখানে গিয়ে এমনি করে তোমার প্লেটটাও সাবাড় করব।

চোপ্, বড় লোভী আর সাহসী হয়ে উঠেছ।

দুপুরে লাঞ্চের পরে ওরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল নাগ্গর। অতি অল্প সময়ের ভেতর পৌঁছে গেল রোয়েরিক আর্ট গ্যালারির সামনে।

ডান দিকে আর্ট গ্যালারির পর দশ-পা এগিয়ে গেলেই দুটি ফার গাছের মাঝখানে দু এক খন্ড পাথর পড়ে আছে। শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক ঐ পাথর কেটে কিছু কাজ করতে চেয়েছিলেন।

এই নাগ্গর উপত্যকার শোভা অসাধারণ। গভীর পাইন অরণ্যে ছাওয়া পর্বত। দূরে দূরে নীলাভ পাহাড়গুলির গায়ে মসলিনের মত হিমেল ওড়না উড়ছে। নিচে সবুজ হলুদ শস্যের ক্ষেত। উপত্যকার ওপর দিয়ে উপবীতের মত বয়ে চলেছে বিপাশা। ওপরে গভীর নীল আকাশ। ফারগাছ দুটির ফাঁক দিয়ে দেখলে সামনে দেখা যায় পীরপাঞ্জালের শুভ্র মহিমা। ডানদিকে চির তুষারাবৃত ধৌলাধার।

হাতে হাত বেঁধে চারজনে মূক বিস্ময়ে দেখতে লাগল প্রকৃতির মহিমা।

এই অপার বিস্ময়ে ভরা প্রকৃতির বুকেই রাশিয়ান শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক তাঁর সাধনার আসন পেতেছিলেন। তিনি ভারতবর্ষকে জানতেন তাঁর দ্বিতীয় জন্মভূমি বলে। এই পৃথিবী বিখ্যাত শিল্পীটি একাধারে কবি, দার্শনিক, পুরাতত্ত্ববিদ ও মানবপ্রেমিক।

তিন্নি বলল, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, অসুস্থ নিকোলাস সেখানেই তাঁর আর্মচেয়ারটি পেতে দিতে বলেছিলেন। ঐ চেয়ারেই অর্ধশায়িত অবস্থায় তিনি তাঁর রূপের জগতকে দেখতে দেখতে চির শান্তির আশ্রয়ে চলে যান।

ক্যারল বলল, আন্টি মানে তিন্নির মা এই আর্ট গ্যালারিতে কাজ করে গেছেন অনেক দিন। আমি ছোটবেলা প্রায়ই আসতাম এখানে।

তিন্নি বলল, শুনেছি ছেলেবেলা ভীষণ দুষ্টু ছিল ক্যারল। গ্যালারিতে ঢুকেই ও ছবি টানাটানি করত আর বলত, আমি এটা নেব আন্টি। মা ওর দাপাদাপি টানাটানিতে হিমসিম খেয়ে যেত। শেষে জুলিয়েন আঙ্কেল পাশে এসে দাঁড়ালেই চুপ।

ক্যারল বলল, বাবা কিন্তু একদিনের জন্যেও আমার গায়ে হাত তোলেনি। কিন্তু বাবার এমন একটা পার্সোনালিটি আছে যার সামনে দাঁড়িয়ে বেশীক্ষণ চোখ তুলে কথা বলা যায় না।

তিন্নি বলল, বাইরের আবরণটা শক্ত হলে কি হবে, আঙ্কেল ভীষণ স্নেহপ্রবণ।

রত্নাবলী বলল, এই কদিনের ভেতরেই আমি তা টের পেয়েছি।

অর্ক বলল, আমাদের ফাংশানের পরে আমাকে আলাদা ডেকে বললেন, আমি অবাক হয়েছি তোমার নাচের দ্রুতলয় আর স্বচ্ছন্দ ভঙ্গী দেখে।

রত্নাবলী হাসতে হাসতে বলল, আমাকেও আঙ্কেল একটি মজার কথা বলেছিলেন। আমি তা গোপন করে রেখেছি।

তিন্নি বলল, শিগ্গির বলে ফেল।

ফাংশান শেষ হবার পর আমাকেও আঙ্কেল বলেছিলেন, তুমি আর অর্ক আজ যে নাচ কম্পোজ করে দেখালে তাতে ইস্ট ওয়েস্টের অপূর্ব মিলন ঘটেছে। তোমরা দুজনে এরকম নাচ কম্পোজ করে, সর্বত্র দেখাও আর বিশ্বজয় কর।

তিন্নি আর ক্যারল প্রায় একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠল।

ক্যারল বলল, আমরাও তাই চাই।

তিন্নি বলল, অবশ্যই, অবশ্যই। আমরা জানি, আঙ্কেল যে কথাই বলেন, তা মনের গভীর থেকেই বলেন। তোমাদের ভেতর সে সম্ভাবনা তিনি নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছেন।

বসন্ত-পূর্ণিমার সন্ধ্যা। চাঁদের আলোর জোয়ার উঠেছে। চা পানের পর এক মজার কান্ড করে বসল ক্যারল।

সে বলল, এসো আমরা জ্যোৎস্না রাতে নিজেদের মনের মত একটি করে নারী অথবা পুরুষ বেছে নিয়ে ঘুরি। জোড়ায় জোড়ায় ঘুরব, চারজন একসঙ্গে নয়।

হাসির ঢেউ আছড়ে পড়ল চায়ের টেবিলে।

তিন্নি বলল, আমরা দুজন মেয়ে আর দুজন ছেলে আছি। এখন ঠিক করতে হবে ছেলেরা না মেয়েরা নির্বাচন করবে।

ক্যারল অর্কের সঙ্গে নিচুগলায় কিছু পরামর্শ করে নিয়ে বলল, তোমাদেরই নির্বাচনের সুযোগ দিলাম, তবে লটারির মাধ্যমে।

রত্নাবলী বলল, কি রকম?

দুটো কাগজে আমার আর অর্কের নাম লেখা থাকবে। একটা পাত্রে ফোল্ড করে রাখা হবে ও দুটো। তোমাদের ভেতর যে কেউ ওর থেকে একটা নাম তুলবে। বাকিটা অন্যজনের।

তিন্নি বলল, আমাদের ভেতর কে আগে তুলবে?

অর্ক বলল, সেটা খুবই সোজা, টস করে স্থির করব।

সমস্ত ব্যাপারটা পাঁচ মিনিটের ভেতর চুকে গেল।

ক্যারল লটারি শুরুর আগেই একটা ঘোষণা করে দিয়েছিল, আমরা আজ সঙ্গী হিসেবে যাদের পাব তারা কেবল আজ রাতটুকুর মত আমাদের হৃদয়ের সব থেকে কাছের মানুষ হবে। কাল ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে এ খেলা শেষ হয়ে যাবে।

অর্ক তিন্নির সঙ্গে বেরিয়ে গেল। তারা ফরেস্ট বাংলোর পেছনে একটা শিলাস্তূপের আড়ালে গিয়ে বসল। ভেসে যাওয়া চাঁদের আলোয় ঋতু বসন্তের রঙীন ফুলগুলি পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে উঁকি দিচ্ছিল। ওরা পাইন বনের ফাঁকে তুষার পর্বতের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। পাইনের পিচ্ছল পাতা থেকে চাঁদের আলো পিছলে পড়ছিল ওদের গায়ে। গরম পোশাকে গা ঢাকা থাকলেও বরফ-ছোঁয়া হাওয়ায় মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল সারা শরীর।

অর্ক শীতের দেশের বাসিন্দে, তাই শীতবোধ কম। কিন্তু আজ সন্ধ্যার বাতাসে শীতের তীক্ষ্ণতা ছিল।

তিন্নি গরম পোশাক পরলেও গায়ে চাপিয়ে এসেছিল একটি পশমিনা শাল। এটি তার মা একসময় ছবি আঁকার জন্য কাশ্মীরে গিয়ে বাবাকে জন্মদিনের উপহার দেবে বলে কিনে এনেছিল।

সেটি বাবার স্মৃতি হিসেবে দু'বছর ব্যবহার করছে তিন্নি।

নিজের গা থেকে শালটা খুলে নিয়ে তিন্নি অর্কের গায়ে চাপিয়ে দিল।

অর্ক চমকে উঠে বলল, সে কি? তুমি শীতে কাঁপবে আর আমি গায়ে শাল চড়াব।

আমার গায়ের পোশাক একটা সাদা দামী পাট্টু (কম্বল)। ব্রোচ দিয়ে টাইট করে আঁটা। এ পোশাকে শীত আটকায়। ডিসেম্বর জানোয়ারীতেও কুলু ভ্যালিতে মেয়েরা এই পোশাকই পরে থাকে। মানালীতে শীত একটু বেশী, তাই একটা কুলু-শাল জড়িয়ে নেয় গায়। আমি দরকার হলে বাবার পশমিনাটা গায়ে চাপাই।

অর্ক বলল, তুমি পশমিনাটা গায়ে দিয়ে বস আর আমি তোমাকে ছুঁয়ে থাকি, তাতেই গা গরম হয়ে যাবে।

ঝর্ণার মত শব্দ করে হেসে উঠল তিন্নি।

হাসি থামলে বলল, পশমিনাটা কেনার সময় মাকে দোকানদার বলেছিল, আপনি এর ভেতর আস্ত একটা আন্ডা রেখে দেবেন, দশ মিনিটে সেদ্ধ হয়ে যাবে।

অর্ক বলল, দারুণ কথা তো। তোমার মা কোনদিন পরীক্ষা কবে দেখেছেন?

পাছে পশমিনার মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হয় তাই মা পরীক্ষার ভেতর যেতে চায় না। বলে, বিশ্বাস করে নিলে একটা লাভ আছে। শীতকালে গায়ে জড়ালে প্রচণ্ড গরমবোধ হবে।

অর্ক বলল, এটা একটা সুন্দর অনুভূতি, যার জন্ম বিশ্বাস থেকে।

বাবা কিন্তু এ নিয়ে মাকে খুব ক্ষ্যাপাতো।

কি রকম?

পাঁচ মিনিটের ভেতর ডিমের একটা হাফ্ বয়েল করে দাও তো খেয়ে বেরিয়ে যাই।

মা বলতো, অত তাড়াতাড়ি কি করে সম্ভব হবে। স্টোভ ধরিয়ে কেট্‌লিতে ডিম ফেলে জল গরম করতে হবে তো। পনেরোটা মিনিট অন্তত সময় চাই হাতে।

বাবা বলতো, আরে সে পশমিনাটা কোথায় গেল, পাঁচ মিনিটেই ওর ভেতর থেকে হাফ্ বয়েল ডিম বেরিয়ে আসবে।

কথাটা শুনে অর্কের হাসি আর থামে না।

হাসি থামলে অর্ক বলল, আমরা কেউ একজন যখন এ শাল গায়ে দিতে পারব না, তখন এসো আমরা এটিকে ভাগাভাগি করেনি।

একই শাল গায়ে জড়িয়ে বসল দুজনে। একান্ত সান্নিধ্যে অথবা শালের গুণে ধীরে ধীরে তাপ ছড়িয়ে পড়ল দুজনের ভেতর।

হাতে হাত বেঁধে বসে রইল ওরা। কতক্ষণ কারু মুখে কোন কথা নেই।

প্রথম কথা বলল অর্ক, আমরা যদি এমনি করে অনন্ত সময় হাতে হাত বেঁধে বসে থাকতে পারতাম।

তিন্‌নি একথার উত্তর না দিয়ে বলল, জানো অর্ক, এই মুহূর্তে আমি রোমাঞ্চিত হচ্ছি একটি কথা ভেবে।

কি সে কথা তিন্‌নি?

বিয়ের আগে আমার মা আর বাবা এই ফরেস্ট বাংলোতে একরাত্রি কাটিয়ে গেছে। এই বনে ঘুরে বেড়িয়েছে আমাদেরই মত হাত ধরাধরি করে। একটু আগে বন-জ্যোৎস্নায় আমি যেন তাদেরই হাঁটতে দেখছিলাম। তাদের সেদিনকার রোমাঞ্চিত মনের সুরভি বনকুসুম আর বনজ্যোৎস্নায় মিশে আছে। আমি সেই গন্ধ জ্যোৎস্নার জলে স্নান করতে করতে প্রাণভরে টানছি অর্ক।

এ রাত, এই আবেগভরা মুহূর্ত কি চিরদিনের হতে পারে না তিন্‌নি?

এ জিজ্ঞাসা তোমার আমার মনের ভেতর যতদিন থাকবে ততদিনই আমরা বেঁচে থাকব দুজনের ভেতর। এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেলে আর এমন আকুলতা থাকবে না অর্ক। যে রাত আজ আমাদের এমন করে পাশাপাশি টেনে আনল তাকে হৃদয় ভরে উপভোগ করি এসো দুজনে।

একটি চুম্বনের স্বাদ থেকে এ রাতে কি আমি বঞ্চিত থাকব তিন্‌নি?

আমার সারা মন তোমার কথারই প্রতিধ্বনি তুলছে অর্ক। কিন্তু...।

আবার দ্বিধা কেন তিন্‌নি?

সেই পুরানো উপমা দিয়েই বলি, আগুনে একবার আহুতি দিলেই তার জিভ লক্‌লক্ করে উঠবে। সে তখন হয়ে উঠবে সর্বগ্রাসী। তুমি স্থির হও অর্ক। এর আগেও আমি তোমাকে সুস্থির হতে বলেছি। এ রাতটা নিবিড় উত্তাপে দুজনে উপভোগ করি এসো।

ক্যারল চলে গেছে অনেকটা নীচে। একটা মসৃণ, প্রশস্ত জায়গার একপ্রান্তে বসেছে ওরা। ঝর্ণাটা একটু দূর দিয়ে বইছে। পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে ধাপে ধাপে নেমে চলেছে ঝর্ণাটা। ঝিলমিল করছে জল। মনে হচ্ছে রূপার নূপুর পরে কোন জলকন্যা নাচতে নাচতে চলেছে।

ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ক্যারল হঠাৎ রত্নাবলীর দিকে ফিরে বলল, আজ রাতে ঐ ঝর্ণার মত তুমি নাচ আর আমি বসে বসে তোমার নাচ দেখি।

রত্নাবলী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমরা যে শিলাখন্ডের ওপর রয়েছি, এক সময় এর ওপর দিয়ে বইত ঐ ঝর্ণা, তাই এই শিলাটি এত মসৃণ।

ক্যারল বলল, তাহলে ঠিক জায়গাই নির্বাচন করেছি আমরা। তোমার ভেতর শুরু হোক ঐ নৃত্যপটিয়সী ঝর্ণারই লীলা।

ব্যাগ থেকে নূপুর বের করল রত্নাবলী।

সঙ্গে সঙ্গে ক্যারল বলল, তোমার পায়ের নূপুরটা আজ আমাকে বেঁধে দিতে দাও।

রত্নাবলী পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকাল ক্যারলের দিকে। অনুত্তেজিত গলায় বলল, তুমি কেন আমাকে চঞ্চল করে তুলতে চাও ক্যারল। তোমার বাগদত্তা আমারও প্রিয়।

রত্নাবলী, আমরা কি আজ স্থির করিনি এ রাত তোমার আমার? আমি অন্য কিছু তো চাইনি, আর চাইবওনা তোমার কাছে, শুধু নূপুরখানা পরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। তুমি জানো, আমি তোমার নাচের এক অন্ধ ভক্ত, তাই সংকোচ না করে বলতে পেরেছিলাম।

নর্তকী রত্নাবলী এবার অপূর্ব এক মুদ্রায় বাম পদের ওপর বসে দক্ষিণ চরণ সামনে প্রসারিত করল। অঞ্জলিতে নূপুর নিয়ে সে হাত দুটি তুলে ধরল ক্যারলের দিকে।

তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত ক্যারলের মুখ। সে দুহাতে ধরে নিল রত্নাবলীর নূপুর।

প্রথমে প্রসারিত ডান পায়ে, পরে একই ভঙ্গিতে প্রসারিত বাম পায়ে নূপুর দুটি বেঁধে দিল ক্যারল।

এবার নত হয়ে রত্নাবলী নাচের ভঙ্গীতে নমস্কার নিবেদন করল বন্ধুকে।

দীর্ঘ সময় ধরে চরণে তাল দিয়ে মুখে বোল তুলে নাচতে লাগল রত্নাবলী। তার নূপুরের ঝংকারে মনে হল ঝিনিঝিনি শব্দে বয়ে চলেছে ঝর্ণা। কখনো সাগর তরঙ্গের মত সারা দেহে ঢেউ তুলে নাচছে, আবার কখনো বা নিবেদনের ভঙ্গীতে আছড়ে পড়ছে বালুকা বেলায়।

আপন মনে তরঙ্গে দোল খাচ্ছে এক সুসজ্জিত তরণী। বায়ু বেগে সঞ্চরণ করছে

ইতস্তত। আবার কখনো প্রেমমত্ত কেকার মত থরথর কম্পনে বিস্তার করছে সম্পূর্ণ কলাপ।

নৃত্যের এত বিভঙ্গ, এত মহিমা যেন অমৃত ধারার মত গড়িয়ে পড়ছে মোহিনীর স্বর্ণকুম্ভ থেকে।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নর্তকীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্যারল। মনে মনে ভাবছে, এই নৃত্যপটিয়সীর একমাত্র সঙ্গী হতে পারে প্রতিভাধর নৃত্যশিল্পী অর্কদীপ।

নাচ থামল। অদূরে ঝর্ণা যেন কলকল শব্দে করতালি দিল। বায়ুর স্বননে পাইনের বনে উঠল আনন্দের উচ্ছ্বাস।

ক্যারল রত্নাবলীর হাত ধরে বলল, তোমার সঙ্গে পরিচয়ের পর যত অনুষ্ঠান তোমার দেখেছি, আজকের অনুষ্ঠান সে সবকে ছাপিয়ে গেছে রত্নাবলী।

ক্যারলের দুটি হাত ধরে রত্নাবলী বলল, প্রকৃতির এই অসাধারণ মঞ্চ আর বন্ধুর পলকহীন দুটি চোখের দৃষ্টি আমার নাচকে সারাক্ষণ প্রেরণা দিয়ে গেছে ক্যারল।

ড্যাডি তোমাদের পারফরমেন্স দেখে ঠিকই বলেছে, ইস্ট ওয়েস্টের মেলবন্ধ হয়েছে তোমাদের নাচে। তোমরা দুজনে নাচের ভেতর দিয়ে বিশ্ব ঘুরে মিলনের সেতু রচনা করতে পার।

রত্নাবলী অসংকোচে বলল, আঙ্কেলের আশীর্বাদকে আমি মাথায় ধরে রেখেছি, কিন্তু ক্যারল, অর্ক কি এ পরিকল্পনার সামিল হবে?

সে তোমার অত্যন্ত গুণগ্রাহী রত্নাবলী। আমি তার বন্ধু তিন্নির মুখ থেকে এ কথা শুনেছি। আর তাছাড়া...।

থামল ক্যারল।

রত্নাবলী সাগ্রহে জানতে চাইল, তা ছাড়া কি ক্যারল?

ও এখানে এসেছে মনোমত একটি সঙ্গিনী বেছে নিয়ে যাবার জন্য। তুমি কেবলমাত্র সুন্দরীই নও, ডাক্তার হতে চলেছ আর এই বয়সেই একজন গুণী শিল্পীর মর্যাদা পেয়েছ। তোমার বাবা সংস্কারমুক্ত মানুষ। তুমি তার একটিমাত্র মেয়ে। তোমার ইচ্ছাকে কখনই তিনি অপূর্ণ রাখবেন না।

রত্নাবলী বলল, তোমাকে আমি গভীরভাবে ভালবাসি ক্যারল। তুমি শুধু আমার বন্ধু নও প্রিয়ও। আমার পক্ষে যা কিছু শুভ তাই তুমি করবে, এ বিশ্বাস আমার রয়েছে।

ক্যারল বলল, জজসাহেবেরে বাড়ীতে যেদিন আমরা লাঞ্চের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, সেদিন অর্কের নানি তোমাকে কিভাবে আদর করে জড়িয়ে ধরেছিলেন দেখেছ?

আমি সেদিন নানির আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম ক্যারল।

অর্কের সঙ্গিনী হিসেবে তোমাকে বেছে নেবার প্রবল ইচ্ছাই ছিল সেদিনের ব্যবহারে।

তা হতে পারে, আমি ওদিক দিয়ে কিছু ভাবিনি তখন।

এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার ড্যাডি আর তিন্নির মমের ওপরেই ছেড়ে দাও।

হঠাৎ পেছন থেকে হাসির শব্দের সঙ্গে তিন্নির গলা ভেসে এল, বেশ জমিয়ে গল্প হচ্ছে দেখছি।

ক্যারল বলল, কেউ কাউকে আজ রাতে ডিসটার্ব করব না এমন একটা অলিখিত শর্ত ছিল।

তিন্নি বলল, আরও একটা শর্ত ছিল, বারটায় ডিনারে বসব, সে সময় এক ঘন্টার জন্য খাবার টেবিলে চারজনের মিলন হবে। এখন ঘড়ির দিকে তাকাও, জাস্ট বারোটা।

ক্যারল বলল, স্যরি তিন্নি।

শোবার সময় দুটি বেড ওরা জোড়া লাগিয়ে দিল। দুদিকে ক্যারল আর অর্ক, মাঝে দুই বান্ধবী, চারটি কম্বলে গা ঢাকা দিয়েছে চার জন।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডার প্রকোপও বাড়তে লাগল। নিশ্ছিদ্র ঘুমের জগতে ধীরে ধীরে ডুবে যেতে লাগল ওরা।

তিন্নি আপার বিয়াস ভ্যালির বাসিন্দা হলেও শীতকাতুরে। দামী দুটো কম্বল গায়ে না চাপালে তার রাত কাটে না। ফরেস্ট বাংলোতে সে ব্যবস্থা নেই। একটি করে কম্বল অতিথিদের জন্য বরাদ্দ। শীত ঋতুতে এখানে টুরিস্টের আসার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই অতিরিক্ত কম্বল রাখার দরকার বোধ করেন না কেয়ারটেকার।

ক্যারল কিংবা অর্কের শীতবোধ তুলনায় অনেক কম। রত্নাবলী কেরলের মেয়ে। নাতিশীতোষ্ণ জায়গায় তার বাস। নাগ্গরের শীতে তার কাবু হয়ে পড়ারই কথা। কিন্তু এমনিতে তার সহ্যশক্তি প্রবল। তাছাড়া সারা দেহ গরম পোশাকের বর্মে এঁটে সে শুয়েছে। এটি আবার তিন্নির পক্ষে অসহ্য। সে তার শরীরকে হাল্কা না রেখে শুতেই পারে না।

মাঝরাতে শীতের দাপটে ঘুমের ঘোরে সে অর্কের কম্বলের কিছুটা টেনে নিল নিজের গায়ে। অর্কও কিছুটা শীত বোধ করায় ঘুমের ঘোরে কম্বলের টানে জড়িয়ে ধরল তিন্নিকে।

এখন নিবিড় একটা উত্তাপে ভরে উঠছে তিন্নির সারা শরীর। সে বড় আরামে অর্কের বাহুর ভিতর নিজেকে সঁপে দিয়ে অঘোরে ঘুমুতে লাগল।

কখন ভোর হয়ে গেছে। সকালের আলো পীরপাঞ্জালের মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দিয়ে, পাহাড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে পাইন বনকে সোনার ঝরণার জলে স্নান করিয়ে, ফরেস্ট বাংলোর সবুজ ঘাসের লনে এসে সোনালী ওড়নার মত লুটিয়ে পড়েছে। তারই ওপর সাদা বেতের একটা চেয়ারে একা বসে আছে ক্যারল। অপূর্ব ভরাট মুখখানাতে ঘনিয়ে উঠেছে ব্যথার একটা ছায়া।

যে সোনালী মৌমাছি তাকে প্রতিদিন গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছে, সে হঠাৎ কখন অগোচরে তার বুকের ভেতর বিঁধে দিয়ে গেছে বিষে ভরা সূক্ষ্ম একটি হুল। সে ঐ ছোট্ট হুলটিকে কোন ভাবেই বুকের বাইরে বের করে আনতে পারছে না। এমন শক্তিমান দিলদার এক যুবক শিশুর মত অসহায় আর কাতর হয়ে পড়েছে যন্ত্রণায়।

প্রথম ঘুম ভেঙেছিল ক্যারলের। সে ছোটবেলা থেকেই আর্লি রাইজার। যদিও অনেক রাত করে শুয়েছিল তারা, তবু কারু ঘুম না ভাঙলেও ক্যারল বহুদিনের অভ্যাস বশে জেগে উঠেছিল।

কাচের জানালার ভারি একটা পর্দা সরিয়ে দিতেই ভোরের নীলাভ সাদা আলো ঢুকে পড়েছিল ঘরের ভেতর। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তার এতদিনের প্রিয় মৌমাছিটির তীব্র দংশনজ্বালা অনুভব করেছিল সে। এরপর ঐ যন্ত্রণা নিয়েই সে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে।

ক্যারলের ঠিক পরেই জেগেছিল অর্ক। সে অতি সন্তর্পণে মুক্ত করে নিয়েছিল তার বাঁধন। দুটি কম্বল ভাল করে জড়িয়ে দিয়েছিল তিন্‌নির গায়ে। তারপর পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গিয়েছিল পাইন বনে প্রাতর্ভ্রমণে। স্বপ্নের মত একটা স্মৃতির গন্ধ তার সমস্ত মনটাকে আবেশে ভরে রেখেছিল।

রত্নাবলী জেগে উঠেই দেখল দুটি বন্ধু ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেছে। সে সমস্ত আলস্য নিয়ে জড়িয়ে ধরল তিন্‌নিকে।

জাগো সখি জাগো, ভোরের সূর্য তোমাকে উত্তপ্ত চুম্বন দিতে চাইছে। অপূর্ব সুন্দর এক ভঙ্গীতে আলস্য ভাঙল তিন্‌নি। নির্মল মুখখানা আধফোটা বসন্ত-মঞ্জরীর মত হাসি ছড়াল।

সহসা লন থেকে শোনা গেল ক্যারলের গলা, তৈরী হয়ে নাও, গাড়ি এখুনি মণিকরণে যাবে।

ভীষণ জেদি আর খেয়ালী ও। সুতরাং ওরা তড়িঘড়ি গোছগাছ শেষ করে চায়ের টেবিলে হাজির হল। ওখান থেকে ওরা ডাকতে লাগল ক্যারলকে কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল না।

অর্ক ক্যারলকে ডেকে আনতে যাচ্ছিল, তিন্‌নি তাকে বসতে বলে নিজেই ক্যারলের চা বিস্কুট নিয়ে লনে চলে গেল।

লনে ক্যারল নেই। তখন ও চলল, আরও নিচে গাড়ির কাছে।

গাড়ির ভেতর চুপচাপ স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল ক্যারল।

সামনে গিয়ে তিন্‌নি বলল, কি হল তোমার, চায়ের টেবিলে এলে না? এই নাও তোমার চা।

ক্যারল বলল, কে তোমাকে এখানে আমার জন্যে চা বয়ে আনতে বলেছে? আমার চায়ের প্রয়োজন নেই। সবাই তাড়াতাড়ি নেমে এলে আমার সুবিধে হয়।

তিন্‌নি ক্যারলের মুখ থেকে এমন কঠিন শব্দ আশা করেনি। সে চোখ ভরা জল নিয়ে ওপরে উঠে গেল।

মণিকরণে উষ্ণ প্রস্রবণ দেখে ওরা চলে গেল জারি নামের একটি পাহাড়ী গ্রামে। অনন্য সৌন্দর্যে ভরা পার্বতী উপত্যকায় মণিকরণ আর জারি। এখানে প্রধান নদী পার্বতী। বইছে উপত্যকার ওপর দিয়ে, আবার কখনো গভীর গিরিখাতের অগম্য অন্ধকার পথে।

এ অঞ্চল দেবী পার্বতীর নামে নামাঙ্কিত। এখানে পাহাড়ী মানুষরা মনে করে স্বয়ং মহাদেব মণিকরণে দেবী পার্বতীর সঙ্গে বিহার করেন।

কাহিনী আছে, একসময় বিহার কালে দেবীর মণিকুন্ডলটি পড়ে যায়। দেবী সেটি খুঁজে না পেয়ে বড় কাতর হন। আসলে সেই মহামূল্য কুন্ডলটি পাতালে হরণ করে নিয়ে যায় শেষনাগ।

দেবীর কাতরতা দেখে মহাদেব তপস্যায় বসেন। তাঁর উগ্র তপস্যায় ভীত হয়ে শেষনাগ নতমস্তকে দেবীর মণিকুন্ডলটি ফিরিয়ে দিয়ে যায়। সেই থেকে স্থানটির নাম হয়েছে মণিকরণ।

এই মণিকরণ নামটির মাহাত্ম্য জানার পর রত্নাবলী তিন্নির কানে কানে একটি কথা বলেছিল, তুমি নিশ্চয়ই তোমার প্রেমরত্নটি কোথাও হারিয়েছ, তাই উগ্রতপস্যায় তোমার মহাদেবটি মৌন হয়ে আছেন। তোমার প্রেমরত্নটি স্বস্থানে ফিরে এলেই তাঁর মৌনব্রত ভঙ্গ হবে।

এই সামান্য একটুখানি কথায় যেন একটা আলোর ঝলক দেখতে পেল তিন্নি। একদিনের খেলার ছলে সে কি অর্কের হৃদয়কে অনুরাগের স্পর্শমণি দিয়ে ছুঁয়ে দেয়নি? অথবা তার অজ্ঞাতেই কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও কি তার ভালবাসার কোয়েল অন্য কারু হৃদয়-নন্দন বনে ডাক দিয়ে আসেনি?

দুজনে যখন পাইন বনের ভেতর জ্যোৎস্নাধারায় স্নান করতে করতে কখনো কথায়, কখনো গানে মত্ত হয়েছিল তখন কি তাদের সেই মন হারানোর ছবি ধরা পড়েছিল কারু চোখের আয়নায়? অথবা গভীর শীতের রাতে দুটি তরুণতরুণীর নিকট সান্নিধ্যে শুয়ে থাকার দৃশ্য কি কারু হৃদয়ে যন্ত্রণার ঢেউ তুলেছিল?

না, এসব নিয়ে আর কিছু ভাবতে পারছে না সে। একদিনের প্রেম প্রেম খেলা যদি তারা করে থাকে তাহলে সে খেলার পরিকল্পনা যে করেছিল, তার কোনভাবেই ক্ষুব্ধ হওয়া সাজে না।

ছোট্ট গ্রাম জারির দৃষ্টিনন্দন শোভা দেখে দুদিন পরে সবাই ফিরে এলো কুলুর আউট হাউসে।

একটি রাত কাটতে না কাটতেই খেয়ালী ক্যারল বলল, ভাগ্‌তুদাদা, দশ বারো বছর বয়সে আমি ড্যাডির সঙ্গে প্রথম যখন এ বাড়িতে আসি তখন ডাক্তার আঙ্কেল আর আন্টির সঙ্গে আমরা একদিন নদীর ধারে সুন্দর একটি টেন্ট টাঙিয়ে পিকনিক করেছিলাম। তুমিও সঙ্গে ছিলে। সন্ধ্যায় আমাদের সঙ্গে তাঁবুটাও এ বাড়িতে ফিরে এসেছিল। সেটা কি এখনও আছে?

নিশ্চয়ই। আমি এখানে এলেই ওটিকে রোদ্দুরে দিয়ে খুব যত্নে প্যাক করে তুলে রাখি।

আমরা যদি রাইসনে গিয়ে দুদিন বিপাশার কূলে তাঁবু ফেলে থাকি তাহলে তুমি কি তাঁবুটা দেবে?

ভাগতুরাম বলে উঠল, সে কিরে, ওটা তো মানুষের থাকার জন্যই তৈরী হয়েছে। মানুষ না থাকলে পোকায় থাকবে। তোরা নিয়ে গেলে তাঁবুটা তবু দুদিন হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

দারুণ খুশিতে হেসে উঠল অর্ক আর রত্নাবলী।

বাজার থেকে দুদিনের ফুল র্যাশন নেওয়া হল। তাঁবু বাঁধা হল গাড়ির ছাদে।

একটুও কথা না বলে তিন্নি পেছনের ক্যারিয়ারে ভাগ্তুদাদর তদারকিতে গুছিয়ে তুলল র্যাশন।

একেবারে একান্তে পেয়ে ভাগ্তুরাম জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে তিন্নি কাল থেকে তোকে এমন মনমরা দেখছি কেন? কি হয়েছে তোর? সোনাদিদি আমাকে খুলে বল।

তিন্নি শুধু তার একরাশ কোঁকড়া চুল ঝাঁকিয়ে তেমনি মুখ নীচু করে র্যাশন গোছাতে লাগল।

বলবি না আমাকে? জানিস, কাল সারাটা রাত তোর দুঃখী, দুঃখী মুখখানা আমার চোখের ওপর ভেসে উঠেছে। আমি এক দন্ডের জন্যেও চোখ বন্ধ করতে পারিনি।

তিন্নি উঠে দাঁড়িয়ে ভাগ্তুদাদার বুকে মুখ লুকিয়ে একরাশ চোখের জল ঝরিয়ে দিলে।

কে তোকে আঘাত দিয়েছে?

বুকের ভেতর থেকে মুখ তুলে তিন্নি বলল, তুই তাকে কিছু বলবি না বল?

কথা দিচ্ছি।

ক্যারল আমার সঙ্গে তিনদিন কোন কথা বলছে না। আলোচনা করতে হলে রত্নাবলীকে ডেকে ডেকে করছে।

ভাগ্তুরাম ব্যাপারটাকে অতি লঘু করে দিয়ে বলল, দূর পাগ্লি, আমি ভাবলাম আর কিছু। ক্যারলকে ছেড়ে অন্য কাউকে মনটন দিয়ে বসে আছিস।

অমনি গুম্গুম্ করে কয়েক ঘা কিল পড়ল ভাগ্তুরামের বুকে।

আরে ওটাও তো একটা পাগ্লা। ঠিক ওর বাবার মত। একটুতেই আগুন ঝরাবে, পরক্ষণেই বরফ। সামান্য তাপ লাগলেই ভালবাসার নদী বইয়ে দেবে। তুই ওর ওপর অভিমান করে বসে আছিস!

এই তিনদিন পরে ভাগ্তুরামের কথায় ভারি একটা শান্তি পেল তিন্নি। ক্যারলের চরিত্র যে তার অজানা তা নয়, তবু বাবার বড় আদরের মেয়ে তাই সামান্য অবহেলাও বুকে বড় বেশী করে বাজে।

রাইসনের এদিকে ওদিকে পাহাড়ের চূড়াগুলি তখনও ধবধবে তুষারে আবৃত। তউন্দি বা গরমকালে মধ্যাহ্নের পর সূর্যরশ্মি আর ধূলিকণায় এক ধরনের আবরণ তৈরী হয়। ওগুলি হাল্কা ওড়নার মত দুলতে থাকে। দূরের দৃশ্য এ সময় স্পষ্ট দেখা যায় না। তউন্দিতে সূর্যকিরণ বড়বেশী উত্তাপ ছড়ায়। দিনের কোন কোন সময়ে, বিশেষ করে সন্ধ্যায় সারা ভ্যালির ওপর দিয়ে বইতে থাকে ভারি মিষ্টি একটা হাওয়া। জল কিন্তু সব সময়ই ঠান্ডা থাকে।

রাইসনে ঢুকে গাড়ি থামাল ক্যারল। সবাই নেমে পড়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। ভারি শান্ত আর নির্জন এই উপত্যকা। এর উচ্চতা নাগ্গর থেকে বেশ কিছুটা কম। ক্যারল বলল, জায়গাটা খুবই নির্জন, তবু এখানে বাস, প্রাইভেট কারের যাতায়াত আছে। কম হলেও

সরকারি হাটে লোকজন এসে ওঠে। আমরা যদি নদী পেরিয়ে ওপারে যাই আর ঐ যে পাহাড়ী বন দেখা যাচ্ছে, তার তলায় নদীর গা ঘেঁষে তাঁবু ফেলি তাহলে কেমন হয়?

সবাই হৈ হৈ করে উঠল, দারুণ, দারুণ আইডিয়া।

অর্ক বলল, কিন্তু নদী পারাপার কিভাবে হবে?

কিছু দূরে একটা কাঠের পুল আছে পাহাড়ী মানুষজনের পারাপারের জন্য। ওরা মাঝে মধ্যে ওপারের বন থেকে কাঠ কেটে আনে। পুলটা একটু নড়বড়ে তবে পারাপারের অসুবিধে হবে না।

গাড়ির কি হবে?

ক্যারল হেসে বলল, ড্রাইভার, প্যাসেঞ্জার না থাকলে ও আর যাবে কোথায়, এখানেই পড়ে থাকবে।

অতএব মেয়েরা সবাই র‍্যাশনের ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। তাদের পেছনে তাঁবু বয়ে নিয়ে চলল অর্ক আর ক্যারল।

পুলটা সংকীর্ণ। কাঠগুলোও জীর্ণ, নড়বড়ে। অনেককাল মেরামতি হয়নি।

পুলের নীচে বড় বড় বোল্ডার পড়ে আছে। বিপাশার জল সেখানে ধাক্কা খেয়ে ফুঁসে উঠছে। পাক খেতে খেতে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে।

ওরা ঐ জীর্ণ পুলটার ওপরে দাঁড়িয়ে নীল জলস্রোতের খেলা দেখল। তারপর সাবধানে পা ফেলতে ফেলতে পেরিয়ে গেল ওপারে।

তাঁবু পড়ল গাছের তলায় সবুজ ঘাসের ওপর। ঘাসের বেডের তিন চার হাত দূর দিয়ে নদী বইছে।

খাবার দাবার তৈরী করে মেয়েরা চলল স্নানে। আজ মধ্যাহ্ন হতে না হতেই রোদ্দুরের তেজ প্রবল।

পুলের তলায় ছোটবড় পাথর জমে আছে। সেগুলোর গা ছুঁয়ে, কখনো বা পাথর উপচে জল ছুটে চলেছে।

ওরা পুলের তলায় পোশাক রেখে স্নান সারল। বাইরের গরমে গা জ্বলছিল, এখন ঠান্ডা জলের ছোঁয়ায় দেহ জুড়িয়ে হিম।

ওরা স্নান সেরে পোশাক পরে কলরব করতে করতে চলে গেল। ভেজা পোশাক গাছের ডালে, ঘাসের জমিনে শুকুতে লাগল।

অর্ক আর ক্যারল গেল স্নান করতে। একটা শিলার ওপর দাঁড়িয়ে জলে একখানা পা ডোবাল অর্ক। সে বুঝে নিল প্রবল স্রোত আর ঠান্ডায় জলে নেমে স্নান করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ঐ শিলার ওপর বসে কোনরকমে স্নান সারল সে।

কিন্তু আশ্চর্য দুঃসাহসী ছেলে এই ক্যারল। সে ব্রীজের কিনারার কাঠে ঝুলতে ঝুলতে মাঝ নদী অব্দি চলে গেল। তারপর ঝাঁপিয়ে নামল একটা উঁচু শিলাস্তূপের ওপর। এবার সেটার একটা খাঁজের পাথর এক হাতে ধরে নদীতে শরীর ভাসিয়ে স্নান করল। স্নান শেষে আবার লাফিয়ে ধরল কাঠের সেতুর কিনারা। তেমনি দুহাতের জোরে ঝুলন্ত শরীরটাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল কূলে।

ওর কীর্তি দেখে ঘন ঘন হাততালি দিতে লাগল অর্ক।

তালির শব্দ শুনে ওরা দুবান্ধবী ছুটে এল গাছতলা থেকে। ততক্ষণে চোস্ত পরে হল্‌দে একটা গেঞ্জি গায়ে জড়িয়ে সূর্যদেবতা অ্যাপোলোর মত নীলাকাশের তলায় দাঁড়িয়ে হাসছে ক্যারল।

উৎসুক শ্রোতাদের কাছে ক্যারলের কীর্তি বর্ণনা করে শোনাল অর্ক। এরপর জোর হাততালি আর বাহবা ধ্বনিতে অভিনন্দিত হতে লাগল ক্যারল।

প্রখর সূর্যালোকের ভেতর দিয়ে ওরা গিয়ে ঢুকে পড়ল তাঁবুতে। আজ তাপ কত সেলসিয়াসে উঠেছে কে জানে। বাতাসও যেন থমকে আছে।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকলে অর্ক আর ক্যারল তাঁবুর ভেতর শুয়ে শুয়ে গল্প করতে লাগল। রত্নাবলী আর তিন্‌নি গেল গাছতলায় তপ্ত দুপুরের বিশ্রাম আর আলাপের জন্য।

সন্ধ্যায় ওরা বিপাশার তীরে তীরে ঘুরে বেড়াল। গান গাইল, লোক-সংগীত। এ ব্যাপারে প্রধান শিল্পী তিন্‌নি। কুলু কাংড়ার অনেক লোক-সংগীত ওর জানা। দশেরা উৎসবে কুলুর ঢোল ময়দানে যে সব লোক-সংগীত শিল্পী অনুষ্ঠান করে তাদের গানের কথা আর সুর ওর কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। প্রতি বছর দশেরা উৎসবে ওরা চলে আসে মানালী থেকে কুলুর বাড়িতে। দশেরার আনন্দ অনুষ্ঠানে ওদের যোগ দেওয়া চাই-ই-চাই। লোক নৃত্যের ঢংগুলিও দীর্ঘদিন দেখার ফলে ওর আয়ত্তে এসে গেছে। এইসব নিয়ে তিন্‌নির ভেতর জেগে উঠেছে এক জাত শিল্পীর প্রতিভা।

এই সন্ধ্যায় তিন্‌নি আর রত্নাবলী নাচে আর গানে বিপাশার কূল মুখর করে তুলল।

তাঁবুতে ফেরার পথে ওরা অনুভব করল, হাওয়া যেন একটুও বইছে না। সন্ধ্যার স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

আর একটা দৃশ্য ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সন্ধ্যার আকাশ ছেয়ে শত শত পাখি উড়ে চলেছে।

ভ্যালির ওপরের আকাশ দিয়ে সন্ধ্যায় পাখি উড়ে যায়, এ দৃশ্য কোন নতুন নয়। কিন্তু এই ঝাঁক ঝাঁক পাখির দ্রুত পাখা টেনে চলার দৃশ্য আগে কখনো এদের চোখে পড়েনি।

অর্ক বলল, ফরেস্টে আগুন লাগলে পাখিরা এমনিভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখা টেনে উড়ে পালায়।

রত্নাবলী বলল, তোমার কথা হয়ত ঠিক। খুব কাছে কোন পাহাড়ী বনে আগুন লাগতে পারে।

তিন্‌নি বলল, নিচের ভ্যালিতে অনেক আগে ফসল তোলা হয়ে গেছে, কিন্তু আপার ভ্যালিতে কোন কোন জায়গায় দেরীতে ফসল ওঠে। হয়ত বাবেলি, রাইসন, নাগ্‌গর, কাতরাইন ভ্যালিগুলোতে ফসল উঠতে এ বছর দেরী হয়েছে। তাই ফসলের ক্ষেতগুলো থেকে শস্যদানা খেয়ে ওদের এমনি করে উড়ে আসতে দেখা যাচ্ছে।

ক্যারল শুধু একটি মন্তব্য করল, প্রকৃতির খেয়ালে কত কি যে ঘটে চলেছে, তার কতটুকুই বা আমরা বুঝি আর জানি।

শেষ পর্যন্ত ক্যারলের কথাই সত্যে পরিণত হল। রাত্রি প্রায় দুটোয় ওরা যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন তখন অন্ধবেগে ধেয়ে এল প্রচণ্ড একটা দানব।

হাল ভাঙা, পাল ছেঁড়া নৌকোর মত সমস্ত তাঁবুটা যেন খুঁটির বাঁধন ছিঁড়ে উড়ে যেতে চাইল।

রত্নাবলীর ঘুম আগে ভাঙল। সে পাশে শুয়ে থাকা অর্ককে ঝাঁকি দিয়ে বলল, শোন শোন, বাইরে কি যেন একটা দাপাদাপি করছে।

অর্ক উঠে পড়ে শোনার চেষ্টা করল। তাই তো।

সে ব্যাপারটা বোঝার জন্য বেরুবার চেষ্টা করতেই তার হাতখানা চেপে ধরল রত্নাবলী।

শুনতে পাচ্ছ না, ভয়ংকর গর্জন করছে।

ততক্ষণে ওরা বুঝতে পারল, কিছু একটা ঝাঁকি দিয়ে টেন্টটাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করছে।

তিন্‌নি জেগে উঠেই আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, বাইরে কারা শব্দ করছে। অনেকগুলোতে মিলে একটানা গোঁগানির শব্দ।

ক্যারল জেগে উঠে এক মুহূর্ত কান পেতে বলল, ঝড় ! প্রচণ্ড বেগে ঝড় বইছে।

ও সামান্য একটুখানি পর্দা খুলে বাইরে মুখ বাড়াতেই ঝড়ের ঝাপটায় তাঁবুর ভেতর ছিট্‌কে পড়ল। টুকিটাকি জিনিসপত্রগুলো হাওয়ার দাপটে আর্ত কোলাহল জুড়ে দিল।

ওরা দু'তিনজন মিলে চাপাচাপি করে বন্ধ করল পর্দার ফাঁকটুকু।

এবার মুষলধারে শিলাবৃষ্টি শুরু হল।

মনে হতে লাগল তাঁবুর পর্দা যে কোন মুহূর্তে ফেটে যাবে।

প্রাণফাটা কান্না শুরু হয়েছে পাইন বনে। কয়েকটা ছোটখাটো ডাল ঝড়ের ঝাপটায় ছিটকে এসে পড়ছে তাঁবুর ওপর।

মেঘ ডেকে উঠল। পাহাড়ে পাহাড়ে কি ভয়ংকর তার প্রতিধ্বনি। মেঘ ডাকছে তো প্রতিধ্বনি উঠছে। মনে হচ্ছে, এরিণার ভেতর দাঁড়িয়ে কাঁপছে নিরস্ত্র কয়েকটি মানুষ। চারদিকে লোহার খাঁচায় বন্দী অভুক্ত কটা সিংহ। তারা সামনে খাবার দেখে সমানে গর্জন করে চলেছে। ছেড়ে দিলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে অসহায় মানুষগুলোকে।

অর্ক বলল, এখন কি করব আমরা?

ক্যারল বলল, আপাততঃ চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া উপায় কি ? এখন বেরিয়ে পুল পার হয়ে সরকারি বাংলোর দিকে যেতে গেলেই সমূহ বিপদ। ঘূর্ণি ঝড়ের মুখে পড়ে বিপাশার স্রোতে ভেসে যেতে হবে।

কথা শেষ হতে না হতেই ছলাৎ ছলাৎ করে ঢেউ ভাঙার শব্দ হল। জলের ছিঁটে ঢুকে পড়ল তাঁবুর ভেতর।

টর্চ ফেলল ক্যারল। বিপাশার ছোবল তাঁবুর ভেতর অব্দি এসে পড়েছে। না জানি তাঁবুর মধ্যে বসে থাকলে কি বিপর্যয় ঘটে যায়।

ঘন ঘন কয়েকটা বাজ পড়ল। বিদ্যুতের ঝলকানি তাঁবুর ভেতর বসেও কিছুটা দেখতে পেল ওরা। মনে হল, বাজ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন হুড়মুড় করে পাহাড় ভেঙে পড়ল।

ক্যারল বলল, তোমরা বসে থাক আমি বাইরের অবস্থাটা একবার দেখে আসছি।

তিন্নি কান্নার গলায় চেঁচিয়ে উঠল, এ দুর্যোগে তুমি বাইরে একেবারেই যাবে না।

পাগলামি কর না তিন্নি। একটু পরেই মনে হচ্ছে বিপাশা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সরকারি বাংলোর দিকটা পাথর আর মাটি ফেলে উঁচু করা আছে। ওটাকে সহজে টপকে যেতে পারবে না বিপাশা। আমি টর্চ ফেলে দেখে আসছি, এ বিপদ থেকে বেরুনো যাবে কিনা।

তিন্নি জেদ ধরল, তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।

অর্ক বলল, তোমাকে যেতে হবে না, দরকার হলে আমিই যাব সঙ্গে।

তিন্নি বলল, তুমি কেন যাবে ভাই, রত্নাবলীর কাছে তাঁবুতে একজন ছেলের অন্তত থাকা দরকার।

ক্যারলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল তিন্নি। এই মুহূর্তে প্রবল দুর্যোগের ভেতরেও ক্যারল নিজেকে ভারি হালকা আর মুক্ত মনে করল। যে পাষাণভারটা এ ক'দিন সে বয়ে বেড়াচ্ছিল সেটা সহসা নেমে গেল তার মনের ওপর থেকে। সে অনুভব করল, তার বুকে বিঁধে থাকা তীক্ষ্ন কাঁটাটা এখন আর তাকে একটুও যন্ত্রণা দিচ্ছে না। সেটা আছে কি খসে পড়েছে তা সে একেবারেই বুঝতে পারল না।

আকাশ ভেঙে এখন ওদের মাথার ওপর বৃষ্টি পড়ছে। টর্চের আলা জ্বালার একটুও দরকার হল না। ঘন ঘন তীব্র বিদ্যুতের চমকে চরাচর দৃশ্যমান।

বিপাশার জল স্ফীত হয়ে ফুঁসে উঠেছে। ব্রীজের কাছে গিয়ে দেখল, পাটাতন ছুঁতে জলের আর খুব বেশী বাকী নেই।

স্রোতের মত জল গড়াচ্ছে ওদের গা বেয়ে।

ব্রীজের কাছে এসে ক্যারল বলল, তুমি এখানে একটুখানি দাঁড়াও, আমি ব্রীজের ওপর উঠে অবস্থাটা দেখে আসি।

ব্রীজের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ক্যারল ওপ্রান্তে টর্চ ফেলল।

সর্বনাশ! জীর্ণ কাঠের সেতুর ওদিককার খানিকটা অংশ জলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তীরের কাছাকাছি যে শিলাখন্ডটি মাথা উঁচু করে মৈনাকের মত দাঁড়িয়েছিল সেটি জলের তলায় মাথা ডুবিয়েছে।

এরপর বেশী দেরী হলে ব্রীজ পার হবার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ক্যারল চেঁচিয়ে বলল, ওদের নিয়ে তাড়াতাড়ি এখানে চলে এসো। সঙ্গে কিছ্ছু আনতে হবে না। নিজেরা প্রাণে বাঁচতে পারলেই যথেষ্ট।

বিদ্যুতের আলোয় পথ দেখতে দেখতে তিন্নি তাঁবুর কাছে গিয়ে পৌঁছল।

বাইরে বেরিয়ে এসো চটপট, কোন কিছু নিতে হবে না সঙ্গে।

ওরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে তিন্‌নির সঙ্গে ছুটতে লাগল ব্রীজের দিকে।

ততক্ষণে পুলের একটা প্রান্তের কাঠ ধরে কোমর জলে ডুবন্ত শিলার ওপর নেমে পড়েছে ক্যারল। নামার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, কোমর থেকে নিচের অংশটুকু হাঙরে কেটে নিল। চিমটি কাটলেও সাড়া পাওয়া যাবে না।

ওরা কাছে আসতেই ক্যারল চেঁচিয়ে বলল, ব্রীজের মুখটা জলে পড়ে গেছে, প্রবল স্রোত বইছে ওর ওপর দিয়ে, ওদিক থেকে পেরোবার চেষ্টা কর না। আমার কাঁধের ওপর পা রেখে লাফ দাও। তিন ফুটের বেশী হবে না। আগে অর্ক এসো। তিন্‌নি তোমাদের পায়ের কাছে টর্চ আছে, ডাঙায় আলো ফেল।

অর্ক ক্যারলের কাঁধে পা রেখে লাফ দিয়ে ডাঙায় চলে গেল।

রত্নাবলীও সজোরে লাফ দিল। অর্ক দুহাত বাড়িয়ে লুফে নিল তাকে।

ক্যারল বলল, তোমরা দুজনে ছুটে গিয়ে চৌকিদারকে জাগাও। আমি আজ সারাদিন ওখান থেকে কোন ট্যুরিস্টকে বেরোতে দেখিনি। অনুমান, কেউ আসেনি।

ওরা ছুটল বিদ্যুতের আলোয় পথ চিনে।

দাঁতে দাঁত চেপে কাঁপুনি বন্ধ করেছে ক্যারল। সে আর তিন্‌নিকে কারু বুকের ওপর আছড়ে পড়তে দেবে না।

আমাকে টর্চ দাও।

টর্চ হাতে নিয়ে জ্বলন্ত অবস্থায় রেখে তাকে ছুঁড়ে দিল ডাঙায়। টর্চটা তেমনি জ্বলতে লাগল।

এসো আমার কাঁধের ওপর।

তিন্‌নি কাঁধে উঠে দাঁড়াতেই ক্যারল বলল, কোন ভয় নেই, লাফ দাও।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্যারল দুহাতের প্রবল শক্তিতে তিন্‌নিকে যেন ঢেলার মত ছুঁড়ে দিল তীরে।

এতক্ষণ বাঁহাতে ব্রীজের একটা কাঠ ধরে ব্যালান্স রাখছিল ক্যারল, এবার দুহাতে তিন্‌নিকে ছুঁড়ে দিতে গিয়ে সে তার পায়ের ভারসাম্য হারাল। সঙ্গে সঙ্গে বিপাশার প্রবল স্রোত তাকে ব্রীজের তলায় টেনে নিল। বুকফাটা চিৎকার করে উঠল তিন্‌নি। সে টর্চের আলো ফেলে আকুল হয়ে ডাকতে লাগল ক্যারলকে। তার হাহাকার মেঘের গর্জনে, বৃষ্টির শব্দে মিশে গেল।

হঠাৎ তিন্‌নির টর্চের আলো এসে পড়ল ব্রীজের তলায়। ঐ তো ক্যারল!

সে স্লিপ্ করে স্রোতে পড়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ধরে ফেলেছিল ডুবে যাওয়া ব্রীজের একটা অংশ। তাই ধরে বরফ শীতল জল থেকে সে অনেক লড়াই করতে করতে তিন্‌নির ছুঁড়ে দেওয়া দোপাট্টার একটা প্রান্ত ধরে ডাঙায় উঠে এল।

ক্যারল একেবারে নিঃশেষিত। তিন্‌নির কাঁধে ভর রেখে সে দেহটাকে কোনরকমে টানতে টানতে এনে ফেলল সরকারী বাংলোতে।

ফাঁকা বাংলোর দুখানা ঘর চৌকিদার তাদের দিয়ে দিল।

বাথরুমে নতুন তোয়ালে, গীজারে গরম জল। দুখানা রুমে দুটি করে বেড আর একটি করে রুম হিটার।

রত্নাবলী ঠান্ডায় বড় বেশী কাবু হয়ে পড়েছিল। তিন্‌নি বলল, অর্ক তুমি ওকে একটু দেখো, আমি ক্যারলকে দেখছি।

ভেজা পোশাক ছেড়ে গরম জলে গা ধুয়ে তোয়ালেতে সারা দেহ মুছে নিল ওরা। তারপর বিছানা থেকে এক একখানা ধোয়া চাদর টেনে নিয়ে সর্বাঙ্গ জড়াল।

রুম হিটার জ্বেলে দিতেই উত্তাপে ভরে উঠল ঘর।

এখন ঘরের আলো নিভে গেছে। বাইরে বৃষ্টি পড়ার শব্দ মৃদু হয়ে গেছে।

রুম হিটারের লাল আলোয় দাঁড়িয়ে আছে এক রহস্যময়ী তরুণী।

ক্লান্ত ক্যারল তার বিছানা থেকে ডাক দিল, তুমি আজও কি আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে? মৃত্যুর মুখ থেকে তুমিই তো আমাকে কূলে টেনে তুললে।

পাগলের মত ছুটে গিয়ে ক্যারলের বুকে আছড়ে পড়ল তিন্‌নি। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তার অভিমানের অশ্রু ঝরাতে লাগল ক্যারলের প্রশস্ত বুকের ওপর।

ক্যারল তাকে জড়িয়ে ধরল অনুরাগে, আশ্লেষে।

ভোরবেলা দেখা গেল বন্ধ জানালার কোন্ রন্ধ্র পথে একটি প্রজাপতি ঢুকে পড়েছে। সে খেলা করছে এক ঘুমন্ত তরুণীর কপোলে।

মনে হচ্ছে সে তরুণী একটি আপেল বৃক্ষ। প্রথম দুটি সোনালী আপেল ফলেছে তার অঙ্গে। সেই দুটি গোল্ডেন অ্যাপ্‌ল স্পর্শ করে আছে এক ঘুমন্ত যুবরাজের দশটি শুভ্র সতেজ অঙ্গুলি।

●

বিজয়িনী



গাঢ় হয়ে উঠল নীলবর্ণা তটিনীর তরল তরঙ্গ।
তীর-তরুদের শাখা পল্লব সুপ্তির কোলে ঢলে পড়ল ছায়ার নিদালি ছোঁয়ায়।
সুউচ্চ শৈল সোপান বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে এল ছায়া কৈলাস শিখরে।
জৈষ্ঠ্যের দগ্ধ তাম্র দিনে অগ্নি-স্যন্দনে
আকাশ পরিক্রমা শেষ করে সবে এসে দাঁড়িয়েছেন
আদিত্যরূপী ইন্দ্র কৈলাসের তুষার চূড়ায়।
সহসা ছায়াকে সামনে দেখে অনুরাগের রক্ত আভায়
দীপ্ত হলেন ময়ূখমালী।
পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে চলল তাঁর উদ্ভাস কতক্ষণ!
শেষে ছায়ার সর্বগ্রাসী আলিঙ্গনে
নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করলেন সেই প্রেমিকপুরুষ।
শৈল সানুদেশে দাঁড়িয়ে
আলোছায়ার এই সুরতলীলা দেখছিল এক কিশোরী-কন্যা।
তার তদ্‌গত ভাবনার পথ ধরে
কিশোরীদেহকে স্পর্শ করল পুষ্পধনু মদন।
অমনি ধীরে ধীরে দল মেলে ফুটে উঠল কমলকলি।
বিকশিত যৌবনের মধুভাণ্ড বুকে নিয়ে
রোমাঞ্চিত হল কিশোরী।
অহল্যা?
চকিতে ধ্যানভঙ্গ হল উদ্ভিন্নযৌবনা অহল্যার।
ধৃতি ডাক দিয়েছেন অহল্যাকে,
মাতৃস্বসা ধৃতি। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর অমৃতলোক যাত্রার পরে
ভর্তৃহীনা ধৃতি এসেছেন ঋষি বৃদ্ধাশ্বের আশ্রমে।
ঋষি তাঁকে গ্রহণ করেছেন ভগিনীর স্নেহমর্যাদায়।
যমজ পুত্রকন্যা বৃদ্ধাশ্বের। গালভ, অহল্যা।
প্রভাতে অধ্যয়ন বেদিকায় বসে গালভ করে চলে
বৈদিক স্তোত্রপাঠ। পাঠান্তে যজ্ঞক্রিয়া।
ক্রিয়া সমাপ্ত হলে চলে যায় ব্রীহি,
গোধূমের ক্ষেত পরিদর্শনে।

প্রত্যাবর্তনের পথে তপোবন তরুশাখা থেকে
ফল আহরণ। কখনও বা স্কন্ধে বয়ে আনে
শুষ্ককাষ্ঠভার।
পুষ্পতরু পরিচর্যার ভার অহল্যার ওপর।
তরু আলবালে নিত্য জলসিঞ্চন, পুষ্পচয়ন
পরম আনন্দ-কর্ম অহল্যার।
আশ্রম কুটিরগুলিকে সম্মার্জিত
আর পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত করার সব দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সে।
আশ্রম কর্ম অন্তে তপোবনের তরুচ্ছায়া পেরিয়ে
সে চলে যায় দীর্ঘপথ, যেখানে গিরিবর্ত্মবিহারিনী হরিণীর লাস্যে
নেমে আসে নৃত্যরতা নীলবসনা নদীধারা।
ঝাঁপিয়ে পড়ে কন্যা সেই রঙ্গিনী-তটিনী-তরঙ্গে।
স্ফলিত কাঁচুলি, মেখলা, নীবিবন্ধ
পড়ে থাকে বালুকাবেলায়
আকণ্ঠ আবৃত তার প্রকৃতির সুনীল বসনে।
ঘূর্ণাবর্তে ঘুরে ঘুরে মরে জল।
সেই ঘূর্ণি তরুণীর নাভিকুণ্ড ঘিরে।
উপল গড়িয়ে যায় চরণছোঁয়ায়।
মীনকুল পঞ্চম ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ রেখে
স্রোতে ভেসে যায় রভসলীলায়।
আবক্ষ দাঁড়িয়ে জলে কেশসংস্কার চলে তরুণীর।
ঝরে ঝরে পড়ে মুক্তা শীতল সলিলে।
তীরে উঠে আঁটে বক্ষে কুঞ্চলিকাখানি
কোমরবন্ধেতে বাঁধে বল্কল মেখলা।
লীলাভরে কন্যা চলে কাঁকালে কলস।
ধুলিতে মলিন
জৈষ্ঠের তৃষাতপ্ত দিন।
কলসের জল চলকায় বসুধার উত্তপ্ত ধুলায়।

সন্ধ্যার আসরে—
কবরীবন্ধনে রত মাতৃস্বসা ধৃতি।
ময়ূর কলাপী কেশে নীল পুষ্পসাজ
কজ্জলে চর্চিত আঁখি, স্বপ্ন মধুরিমা।
আঁখিতারা কারে যেন খোঁজে কৈলাসের সুউচ্চ শিখরে।

ধৃতির অজ্ঞাত নয় কিছু,
অহল্যার অন্তরেতে ইন্দ্রের আরতি সারাক্ষণ।
বলেন তাপসী ধৃতি,--ইন্দ্র দেবরাজ,
সর্বত্র বিরাজমান, মহাশক্তিধর।
মেঘেদের করেন চালিত, তাই 'মেঘবাহন' নাম
সর্বত্র বিদিত। মেঘেদের নাড়া দিয়ে
ঝরান বৃষ্টির বিন্দু, তাই তিনি 'বৃষা'।
দ্বাদশটি মাসে দ্বাদশটি নাম আদিত্যের।
জ্যৈষ্ঠে তিনি 'ইন্দ্র' নামে খ্যাত।
নিদাঘের শেষমাসে দেখেছ ইন্দ্রকে তুমি
দীপ্তিমান আদিত্যের রথে।
তুমি ধন্য, দেবরাজ ইন্দ্রকে দেখেছ তুমি
হৃদয়ের নির্মল দর্পণে।
সেইক্ষণে বিদিশার দূত এল আশ্রম-ভবনে।
গালভ, ধৃতির কাছে নিয়ে এল তাকে।
প্রণামান্তে দূত দিল শুভ সমাচার ঃ
বিদিশার রাজকন্যা মুক্তামালা
আশ্রম দর্শনে অভিলাষী।
বিদিশার মহারাজ দিগন্তবিজয় আশ্রমের শুভাকাঙ্ক্ষী
ঋষি বৃদ্ধাশ্বের স্নেহধন্য তিনি।
অচলা ভক্তি তাঁর ঋষির চরণে।
বৃদ্ধাশ্ব তপস্যারত হিমগিরিলোকে।
আশ্রমের সর্বভার সমর্পিত ধৃতির ওপর।
তাই দূত উপস্থিত ধৃতির সমীপে অনুমতি প্রার্থনায়।
আশ্রম বেদিকায় মহা সমাদরে
রাজদূতে বসালেন আশ্রম জননী।
মধ্যাহ্নে ভোজের অন্তে
ভূর্জপত্রে লেখালিপি দিলেন তাহার হস্তে।
'মহামান্য মহারাজ,
আশ্রমনন্দিত হবে রাজনন্দিনীর আগমনে।
প্রতীক্ষায় সমস্ত আশ্রম।'
সন্ন্যাসিনী ধৃতি।
উল্লসিত অহল্যার অন্তর আকুল।

সমবয়সীর সঙ্গে কাটাবে সে ক'টি দিন
অন্তরঙ্গ মধুরালাপনে।
সুসংস্কৃত সুসজ্জিত হল তপোবন।
চম্পক তরুবীথি ছড়ায় সুবাস
রোমাঞ্চিত কদম্বের রেণু ঝরে পড়ে।
তপোবন প্রান্তে আছে অতিথি-নিবাস।
মালতিমাধবীলতা দোলে আহামরি!
আশ্রমের মৃগযূথ নির্ভয়ে তাকায়।
নাগকেশরের বৃক্ষ ছত্র ধরে কুটিরের 'পরে।
ফুলগুলি ফুটে আছে কাণ্ডে ও শাখায়।
একমাত্র গালভের শক্তি আছে
বিশাল বৃক্ষেতে উঠে পুষ্প আহরণে।
আশ্বিনের পৌর্ণমাসী রূপোলি সন্ধ্যায়
এল রথ বিদিশার রাজগৃহ থেকে।
নাই রাজ আড়ম্বর, নাই দাসদাসী,
একাকী এসেছে কন্যা আশ্রম দর্শনে,
রথ অশ্ব সারথি সম্বল।
মনে হল নীলাকাশ থেকে নেমে এল চন্দ্র বসুধায়।
মুক্তামালা চন্দ্রিমার দোসর মুরতি।
প্রণতি রাখেন কন্যা ধৃতির চরণে,
বক্ষে তারে বেঁধে নেন আশ্রমজননী।
কুশলাদি জিজ্ঞাসার পরে, অতিথিকে সমর্পণ অহল্যার করে।
দুই কন্যা দু'জনকে দেখে নেয় নয়ন-দর্পণে।
একই পদ্ম সরসীতে মুগ্ধ হয়ে দেখে যেন
আপন আনন।
চল সখি বিশ্রাম-কুটিরে, পথশ্রমে ক্লান্ত তুমি,—
অহল্যার কণ্ঠে বাজে আহ্বানের আন্তরিক ধ্বনি।
স্মিতহাস্যে রাজকন্যা জ্যোৎস্নাঝরা পথে
অহল্যার সঙ্গে চলে অতিথিনিবাসে।
উঠোনে শিউলিগাছ ছড়ায় সুবাস,
ঝরাফুলে ভরা অঙ্গন। দেহলিতে চারু আলিম্পন।
নম্রপদপাতে রাজকন্যা ঢুকে যায় গৃহের ভেতর।
গৃহকোণে নিষ্কম্প দীপের শিখা ছড়ায় আলোক।

প্রতিবিম্ব গৃহতলে। চারিকোণে আলিম্পন আঁকা।
শয্যাপাতা অজিন আসনে। শিয়রে প্রস্তরপাত্রে
রাখা আছে একমুঠো বকুলের ফুল।
সারা গৃহ সুগন্ধে আকুল।
অহল্যার অবস্থান সংলগ্ন কুটিরে।
মহানন্দে আলাপনে মাতে
রাজকন্যা, ঋষিকন্যা। দীর্ঘরজনী হয়ে আসে ভোর।
শুকতারা ভেসে যায় আলোর প্লাবনে।
অহল্যা শুধায়, তোমার স্নানের জল
কূপ থেকে তুলে দেব আমি,
নিভৃতে অসঙ্কোচে কর স্নান সমাপন।
তুমিও এসো না সখি, স্নান সারি দুই বান্ধবীতে।
আমার প্রভাতস্নান বনপ্রান্তে নদীধারা জলে।
উল্লসিত মুক্তামালা,—চল সখি নিয়ে চল সে আনন্দস্নানে,
বহতা নদীর জলে কখনও করিনি স্নান।

দুই সখি আনন্দ উল্লাসে
তরুবীথি পার হয়ে লীলাছন্দে চলে যায়
স্রোতস্বতী তীরে।
বহমূল্য অংশুকে রচিত অঙ্গবাস
খুলে ফেলে রাজকন্যা অহল্যার সপ্রেম ইঙ্গিতে।
লুটায় বল্কল সাথে পট্টবস্ত্র মহামূল্যবান।
বক্ষ জলে নেমে দুই সখি
দুই করে ঢেউ তোলে আনন্দ উচ্ছ্বাসে।
সলিলে সংগুপ্ত পদ্ম দোল খায় অনঙ্গলীলায়।
অবগাহন স্নানে বেণীবদ্ধ কেশ ভাসে জলের ওপর,
মনে হয় কৃষ্ণসর্প দুটি মুখোমুখি খেলা করে
ফণা মেলে জলের ওপর।
সন্তরণে পটু অতি ঋষিকন্যা, মীনের লীলায়
গভীর জলের তলে খেলা করে কতক্ষণ,
জলকন্যার মতো শুয়ে থাকে উপল শয্যায়,
নিশ্চিন্ত নির্ভয়।
আবক্ষ দাঁড়ায়ে জলে ভয়ে বাক্যহারা,
অহল্যারে খুঁজে ফেরে রাজার নন্দিনী।

দু'বাহুতে জল কেটে ক্ষিপ্রগতি হংসের লীলায়
কুলে এসে দম নেয় সাহসিকা অহল্যা, কুমারী।
স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ততক্ষণে সখি মুক্তামালা।
কনক চম্পক ফুলে দুই সখি সাজায় কবরী,
কণ্ঠে দোলে মাল্য আহা রক্তকরবীর।
কুর্চিফুলে গাঁথা দেখ সুচারু কঙ্কণ।
শিরিষের ফুল গাঁথা কর্ণে আহামরি।
গালভ দুঃখিত অতি সে পারেনি দিতে
নাগকেশরের ফুল অতিথির করে।
এ সময় শীর্ষ শাখে পুষ্পেরা বিরাজে,
দুঃসাধ্য বৃক্ষেতে উঠে পুষ্প আহরণ।
পরদিন দেখা গেল অপরাহ্নবেলা,
বাঁধানো বেদিতে বসে দুই সহচরী
আলাপনে মুগ্ধমগ্ন। সোনার কিরণ
ঝরে ঝরে পড়ে শিরে, বক্ষে ও চিবুকে,
জলস্থলে পত্রপুষ্পে স্তব্ধ চরাচরে।
সম্মুখে দাঁড়াল এসে রথের সারথি
ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তনু প্রস্তরে খোদিত।
সুদর্শন মূর্তি অভিরাম!
কি সংবাদ জয়কেতু, প্রশ্ন করে রাজার কুমারী।
সহাস্য সারথি বলে, সকলই কুশল।
কাল তবে যাবে রথ অচ্ছোদ সরসী? দু'টি দিন
কেটে যাবে স্নান তপস্যায় সে সুরম্য স্থানে।
প্রশ্ন করে মুক্তামালা, সেখানে সরসী তীরে
আশ্রয় কি আছে কোন কিছু?
শৈল দিয়ে ঘেরা সরোবর। উত্তরে সুউচ্চ শৃঙ্গ
তুষারে আবৃত। গলিত হিমানী নেমে
করে পূর্ণ সেই জলাধার।
মানসসরসীগামী হংস কারণ্ডব
লীলা করে সেই সরোবরে, নীহার গলিত নীরে,
নিদাঘের দীপ্ত কটি দিনে।
রয়েছে দুইটি গুহা পুবে ও পশ্চিমে,
অতি পরিচ্ছন্ন স্থান, ধুলিশূন্য শুদ্ধ সুমার্জিত।



আমি পারি ফুলগুলি ধরিত্রীর বুকে এনে দিতে।

মাতার মৃত্যুর পরে পিতৃদেব হাত ধরে
এই সরোবরতীরে নিয়ে এসেছেন।
স্নান তর্পণাদি আমি করে গেছি সেসময়।
আমরা দু'জনে যাব, ধৃতিমার অনুমতি
নেওয়া হয়ে গেছে। প্রভাতে প্রস্তুত রাখ রথ।
... অহল্যা চঞ্চল হল, সান্ধ্য কর্মগুলি
এখনও হয়নি সারা। তুমি যাও অতিথিনিবাসে,
যাই আমি আশ্রম-কুটিরে।

চাঁদ ওঠে সন্ধ্যার আকাশে
রজত থালিকা যেন। উদ্ভাসিত সকল জগৎ।
অশোক তরুর তলে বাঁধানো বেদিতে
বসে আছে রাজার দুলালী,
সম্মুখে দণ্ডায়মান রথের সারথি জয়কেতু।
কথা শুরু হল ঃ
বলে চলে জয়কেতু, শোন মুক্তামালা,
প্রভাতে ঋষির পুত্র ধীমান গালভ
নাগকেশরের ফুল চয়নের লাগি
করেছেন বহু ব্যর্থ শ্রম।
বিশাল বৃক্ষের শীর্ষে কিছু ফুল রয়েছে এখনও।
তাদের নাগাল পাওয়া ভার। শীর্ষডাল অতীব ভঙ্গুর,
পদপাতে শাখা ভেঙে নিশ্চিত পতন।
স্তব্ধ ক্ষণকাল,—
আমি পারি ফুলগুলি ধরিত্রীর বুকে এনে দিতে।
সবিস্ময়ে মুক্তামালা বলে,
এ অসাধ্য সাধন সম্ভব?
তুমি জান তীরন্দাজ আমি, কখনও হারিনি কোন কাজে।
সে কথা স্মরণ করে প্রেম ও প্রীতির দীপে
নিত্য করি তোমার আরতি জয়কেতু।
তুমি দেহরক্ষী আর চির সহচর
সারথি সচিব সখা, বিপদ-বান্ধব,
নবঘনশ্যামকান্তি প্রাণের দোসর।
আমি শুধু বন্ধু মুক্তামালা।
আজীবন তোমার স্মরণে উৎসর্গ করেছি এই প্রাণ।
বাসনার দৃষ্টি মেলে কলুষিত করিনি এ মন।
আমি ব্রত করেছি গ্রহণ চিরকুমারীর,
পিতার অবর্তমানে বিশাল বিদিশা রাজ্য
শাসনের দায়িত্ব আমার। তুমি সঙ্গে রবে বন্ধু
সেনাপতি পদে বৃত হয়ে।
চল মুক্তামালা,
তীর ছুঁড়ে পেড়ে দেব নাগকেশরের ফুল
তোমার আঁচলে। অক্ষত অম্লান।

কি নিপুণ শরের সন্ধান!
বৃন্ত থেকে ফুলগুলি তীক্ষ্ণধার তীরের ছোঁয়ায়
একে একে এসে পড়ে দুই হস্তে প্রসারিত
অঞ্চলের মাঝে।
ফুল নিয়ে মুক্তামালা চলে গেল আশ্রমকুটিরে,
বুকভরা আনন্দ উচ্ছ্বাস।
পুষ্পের দর্শনে বিস্ফারিত দৃষ্টি গালভের।
অহল্যা বিস্ময়মুগ্ধ!
অতিথিনিবাসে এসে দুই ভাইবোন
প্রাণভরে জয়ধ্বনি দিল সারথির।
সার্থকনামা তুমি জয়কেতু,
ভুবনবিখ্যাত তীরন্দাজ।
জীবনের সর্বক্ষেত্রে জয়ী হবে তুমি
সর্বকর্মে সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

পরদিন মধ্যাহ্নবেলায়
অচ্ছোদ সরসীকূলে রথ এসে থামে।
চেয়ে থাকে বান্ধবী দু'জন অপার বিস্ময়ে।
প্রসারিত নীল বারিধারা কিরণ সম্পাতে ঝলকায়।
স্নানাদি তর্পণকার্য সমাধার পর
গুহার আশ্রয়ে গেল বান্ধবী দুজন।
হাসিতে আনন্দে আলাপনে কেটে গেল দিনমান।
নিশীথে শয্যায় শুয়ে নিদ্রামগ্ন হল মুক্তামালা,
নয়নে এল না ঘুম ঋষিকন্যার।
চারিদিকে নূপুরের ধ্বনি শোনা যায়।
বাঁশিতে মোহনসুর, সঙ্গে তার মৃদঙ্গবাদন।
গুহার আঁধার থেকে স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে
অহল্যা বেরিয়ে এসে তাকায় বিস্ময়ে।
স্বপ্নময় চরাচর, নীলাকাশ, শুভ্র মেঘ, শান্ত সরোবর।
তুষারশৃঙ্গের দিকে দৃষ্টি চলে যায়,
সেখানে শুভ্রতা কাঁপে হিমের ছোঁয়ায়।
কে যেন আসছে নেমে অতিশুভ্র গিরিপথ বেয়ে।



স্বপ্নের সরণী বেয়ে এল সেই দিব্যকান্তি পুরুষপ্রধান

ইন্দ্রধনু রচিত তোরণ। শুভ্র গজরাজপৃষ্ঠে আসীন সে জন।
মুকুটের মণি ঝলকায়, আকাশের নীলকান্তমণির আভায়।
হিমের তন্তুতে বোনা শুভ্র উত্তরীয়
সংলগ্ন স্কন্ধেতে তার, উড্ডীন বাতাসে।
পরিধানে পীতবস্ত্র নয়ন সুভগ।
করধৃত পারিজাত সৌগন্ধ ছড়ায়।
প্রিয়ার বাহুর মতো বক্ষে তার দোলে মুক্তামালা।
স্বপ্নের সরণী বেয়ে এল সেই দিব্যকান্তি পুরুষপ্রধান
অহল্যার নয়ন সম্মুখে।

আমি ইন্দ্র, ত্রিদিব নিবাসী,
প্রেমিক কন্যার হৃদিরঞ্জন আমি।
আমাকে দেখেছ তুমি কিন্নর কৈলাসে,
দিনান্তের অনুরাগে দীপ্ত ছিল আমার অন্তর,
সেই ছোঁয়া দিয়েছি তোমাকে,
ফুটেছে তোমার বক্ষে প্রেমের রক্তিম শতদল।
গ্রহণ করুন নতি দেবরাজ প্রেমিক বাসব,
সাধারণ মর্ত্যকন্যা আমি, কি দেব চরণে উপহার?
তোমার ও বরতনুখানি জেনো তন্বী একান্ত আমার।
আজ নয়, কোনও এক আষাঢ় সন্ধ্যায়
বর্ষণমন্দ্রিত ঘন সান্ধ্য অন্ধকারে, যাব আমি তোমার কুটিরে।
সর্বোত্তম আনন্দসম্ভোগ হবে সেথা পূর্ণ আলিঙ্গনে।

ঋতুচক্র দিয়ে গেছে পাঁচটি বসন্ত উপহার,
তবু গৌতমপত্নী অহল্যার বক্ষে হাহাকার।
স্বামী তপস্যায় মগ্ন নিশিদিন ইষ্টের চিন্তায়
মগ্ন তনু মন প্রাণ। দেবতাত্মা হিমালয়ে তাঁর
কেটে যায় সুদীর্ঘ সময়। অরণ্যের ফলাহার
গঙ্গার পূতবারি পান করে কাটে তাঁর দিন
তপোবনে ফেলে আসা যুবতী নারীর মুখ
কদাচিত মনে পড়ে তাঁর।
আশ্রমে ফেরেন তিনি ঋতুবর্ষায়। যাগযজ্ঞ পূজাপাঠ
চলে সে সময়। সঞ্চিত বিশুষ্ককাষ্ঠে যজ্ঞবহ্নি জ্বলে,
আশ্রমের পুষ্ট ধেণুগুলি যোগায় হোমের ঘৃত।
ফলপুষ্প দান করে তপোবন তরু।
নন্দন কানন যেন আশ্রমের ছবি। সবই পূর্ণ
শ্রীসম্পন্ন অহল্যার শ্রীহস্ত ছোঁয়ায়।
সর্বদা তটস্থ ঋষিজায়া, কোন ফাঁকে কোন ত্রুটি
ঘটে যায় স্বামীর সেবায়।
নিশাকালে শয্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর একান্তে শয়ন
দু'টি মধুবাক্য শোনার আশায় ঋষিজায়া থাকে প্রতীক্ষায়,
উপবাসক্লিষ্ট তনুমন চায় সুনিবিড় আলিঙ্গন।
ঋষিকণ্ঠে নামজপ ফুরায় না আর।
জপ শেষে অসীমকরুণাময় ঋষি

স্ত্রীহস্ত ধারণ করে শিক্ষা দেন করগণনার রীতি—
জপের প্রথম পাঠ।
হৃদয়ের ক্ষুধা আর দেহের আক্ষেপ,
যজ্ঞকুণ্ডে পড়ে থাকে দগ্ধদীর্ণ অরণীর ভস্ম অবশেষ।
নিশা অবসানে দৃষ্টি পড়ে উত্তরদিশিতে
ধূ ধূ এক বন্ধ্যাভূমি প্রসারিত দিগন্ত অবধি
নীল শৈল সানুদেশ দূরে দেখা যায়।
কবে এক উচ্ছল তটিনী প্রবাহিত হয়েছিল
ঊষর মরুর বুক চিরে। চিহ্ন তার পড়ে আছে
নেই জলবিন্দু এককণা।
সে দর্পণে ঋষিজায়া দেখে নেয়
প্রতিচ্ছবি, নিজ রিক্ত দগ্ধ জীবনের।
সেবার এলেন ঋষি নিদাঘের সমাপ্তি সন্ধ্যায়।
পথশ্রমে অতিক্লান্ত, তীক্ষ্ণ তপ্ত বায়ুর প্রহারে
মূর্চ্ছিত সকল অঙ্গ, বুকফাটা তৃষ্ণায় কাতর।
অহল্যার সেবাহস্ত দয়িতের ক্লান্তি দূর করে।
রাতে হল প্রাবৃটের প্রথম সঞ্চার।
প্রবল ঝঞ্ঝার ঘায়ে ওড়ে ধুলি শুষ্কপাতা, নীলাঞ্জন মেঘ
ঝড়ের কেশর ধরে দুরন্তগতিতে দিক্ থেকে দিগন্তরে
ছুটে চলে যায়।
ঘনঘন বজ্রের নিনাদ কাঁপায় বসুধা।
বিদ্যুতের কষাঘাতে দীর্ণ হয় কঠিন প্রস্তর।
এই খেলা সারা বিভাবরী,
প্রবল বর্ষণসঙ্গে তীব্র বজ্রনাদ
কাঁপায় ভুবন।
নিশিশেষে উন্মুক্ত আকাশ। উড়ে গেছে
পাংশুবর্ণ হাজার চুনুরি দিগন্তসীমায়।
শেষরাতে ভঙ্গ হল জপ, উচ্চকিত ঋষি গৌতম।
এ কি অভাবনীয় দৃশ্য সম্মুখে তাঁহার!
বন্ধ্যাভূমি ডুবে গেছে জলের প্লাবনে।
দূরে নীল অদ্রি থেকে তপোবন সীমা
হয়ে গেছে মানস-সরসী।
কোষাকুষি কমণ্ডলু শুষ্ক বস্ত্র নিয়ে
ঋষি যান সরসীর তীর বরাবর

শৈলমালা লক্ষ্য করে, প্রবাহের উৎসের সন্ধানে।
বিস্মিত অহল্যা ততোধিক। বন্ধ্যাভূমি
এতদিনে হয়েছে সরস। এরপর জাগবে এখানে চর,
কেউ বুনে দেবে বীজ চরমৃত্তিকায়।
সৃষ্টিসম্ভবা হবে এই বন্ধ্যাভূমি।
'এ সত্য শাশ্বত মানি, প্রকৃতির এই তো নিয়ম।'
কার কণ্ঠস্বর শুনি, সম্মুখে আসুন মহাত্মন।
'আমি ইন্দ্র, চিরসখা অহল্যা তোমার।'
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম একান্ত আমার
এসো কাছে আরও কাছে, এসো সখা নাও সুরপতি
আমার এ তনুমন প্রাণভরা আকুল আরতি।
ঊষর আমার বক্ষ আজ কাঁপে তোমার দর্শনে,
তৃষিতের শূন্য কুম্ভ, ঢালো সুধা আমার এ প্রাণে।
'কাল বজ্রাঘাতে আমি চূর্ণ করে উদ্ধত পাষাণ
গঙ্গাকে উন্মুক্ত করে প্লাবিত করেছি বন্ধ্যাভূমি।'
খরতাপে দগ্ধ আমি হে সখা হে বন্ধু হে প্রিয়
আমার ঊষরবক্ষে তোমার প্রাণের ছোঁয়া দিও।
'এসো কাছে আরও কাছে এসো রিক্ত বক্ষেতে আমার
এসো প্রিয়া রমণীয়া ভুলে যাও সকল সংসার।
তুমি আছ আমি আছি প্রেম আছে এই সারাৎসার'।
রভসলীলায় মত্ত দু'টি প্রাণ তনুতে তনুতে
স্পর্শ রেখে স্পন্দিত পুলকে। উড়ে চলে দু'টি প্রজাপতি
পাখায় পাখায় স্পর্শ, ফুলের অঙ্গনে
চলে রাগ অনুরাগ। যুক্ত হয়ে উড়ে চলে যায়—
যেখানে নদীর স্রোত উতরোল সাগর সঙ্গমে।
'আমি তৃপ্ত বিশ্বরমা, ত্রিলোকবাঞ্ছিতা,
ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়সুখ আজ পূর্ণ হল তিলোত্তমা।'

অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা।
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো।।

—রামায়ণ

(আপন অন্তরে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হয়ে অহল্যা সুরশ্রেষ্ঠ শচীপতিকে বললেন, হে সুরপতি, আমি আপনার সঙ্গে মিলনে কৃতার্থ হয়েছি। আপনি অতি সত্বর এ স্থান ত্যাগ করে চলে যান।)

প্রসঙ্গ কথা

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে অহল্যা-কাহিনীর একটি নতুন দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এক পরম রমণীয়া নারী সৃষ্টি করলেন। ইন্দ্র মোহিত হলেন সে নারীর যৌবন-সুষমায়। তিনি জানতে চাইলেন, সৃষ্টিকর্তা এই অনিন্দনীয়াকে কার হাতে অর্পণ করতে চান। ব্রহ্মা গৌতমকে জিতেন্দ্রিয় জেনে তাঁর করেই কন্যা সম্প্রদান করতে চাইলেন। আশাহত ইন্দ্র প্রস্থান করলেন সুরলোকে।

অহল্যার দ্বিতীয় কাহিনী সর্বজনবিদিত; যদিও বাল্মীকির রামায়ণে কোথাও অহল্যার পাষাণমূর্তি ধারণের কথা নেই।

স্ব-ইচ্ছায় অহল্যা ইন্দ্রকে গৌতমের আশ্রমে আকাঙ্ক্ষিত পুরুষ রূপে বরণ করলেন।

এরপর অভিশাপ পর্ব। বিশ্বামিত্র ও রামচন্দ্রের বহু বর্ষ পরে গৌতমের তপোবনে আগমন। অহল্যার শাপমোচন।

সামাজিক বিচারে অহল্যা অপরাধিনী নারীরূপে গৃহীতা। কিন্তু অহল্যাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে শুধুমাত্র ক্ষমতার বলে অভিশপ্ত করলে যথার্থ ন্যায়ানুমোদিত বিচার হয় না। অহল্যার এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। কে বলবে, ব্রহ্মার সান্নিধ্যে ইন্দ্রকে প্রথম দর্শন করে অহল্যার মনে আবেগমথিত পূর্বরাগের সূত্রপাত হয়নি।

সেই প্রথম দর্শনের স্মৃতিই হয়তো তাঁকে সজ্ঞানে সুরপতিকে গ্রহণ করার শক্তি জুগিয়েছে।

আমরা যুগ যুগ ধরে অহল্যা সম্বন্ধে রামায়ণের কবির সুরপতিকে গ্রহণ করার শক্তি জুগিয়েছে।

আমরা যুগ যুগ ধরে অহল্যা সম্বন্ধে রামায়ণের কবির বক্তব্যই শুধু শুনে এসেছি, কিন্তু তার বিপরীতে আত্মপক্ষ সমর্থনে অহল্যারও যে কিছু বক্তব্য থাকতে পারে তা একবারও ভেবে দেখিনি।

[সৃষ্টির দেবতা মন্ত্রোচ্চারণ করছেন, আর প্রণতা রক্তিমবসনা এক কন্যা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।]

ব্রহ্মা ঃ

সৃষ্টির আদিম উষা জাগো জাগো কায়া মূর্তিমতী
জাগো আজ নারীরূপা সুলক্ষণা পরম ভাস্বতী,
নিশীথের স্বপ্ন তন্তু ছিন্ন করে অনন্য বৈভবে
এসো তুমি জ্যোতির্ময়ী; ত্রিলোকের উচ্চারিত স্তবে
পূর্ণ হোক অভিষেক, তূর্ণ এসো ত্রিলোক-বাঞ্ছিতা

কামনার সরোবরে শতদল পদ্ম আকাঙ্ক্ষিতা,
বর্ণ গন্ধ মধুস্বাদ; অহল্যা তোমার শুভ নাম।

অহল্যা ঃ

কি আশ্চর্য অনুভব, আমি নারী! ললিত সুঠাম
অঙ্গে অঙ্গে যন্ত্রণার কি প্রার্থিত আবর্ত-বলয়
আমারে রেখেছে ঘিরে, আমি এক কলি কুবলয়
প্রার্থিতের করপুটে উৎসর্গের আছি অপেক্ষায়,
কম্পিত আনন্দ আজ তনুদেহে বেদনা বিছায়।

[ইন্দ্রের আগমন।]

ইন্দ্র ঃ

এ কি অপরূপ কান্তি, হৃদয়ের সমস্ত কামনা
কায়ারূপ ধরে ঐ নারীমূর্তি করেছে রচনা,
কি পরম আকাঙ্ক্ষিতা, সর্ব দেহ কাঁপে থরথর,
এ নারী পুরুষ দেহে নিক্ষেপিত তীক্ষ্ণ পুষ্পশর।

অহল্যা ঃ

কি অভিলষিত এই কান্তিমান পুরুষ প্রধান,
কেন কাঁপে দেহমন, কি আস্বাদ, কিসের আঘ্রাণ
আমারে পীড়িত করে, মনে হয় আমি সমর্পিতা

ইন্দ্র ঃ

পিতামহ, এই নারী ত্রিলোকের একান্ত বাঞ্ছিতা,
সৃষ্টির মন্থনসার, কামনার হোম বহ্নিশিখা
বল স্রষ্টা, কার ভালে এই কন্যা দেবে জয়টীকা?



কেন কাঁপে দেহমন, কি আস্বাদ, কিসের আঘ্রাণ

ব্রহ্মা ঃ

সংযমের বাঁধনে যে ইন্দ্রিয়ে বেঁধেছে দৃঢ় পাশে,
কামিনী কাঞ্চন যার চিত্তের প্রাকার থেকে আসে
বার বার ফিরে ফিরে, অনাদরে, কুণ্ঠিত লজ্জায়,
যাগ যজ্ঞ নিত্য জ্বালে দীপ্ত দীপ যার তপস্যায়,
সেই তপঃসিদ্ধ ঋষি গৌতমের সকল কর্মের
এ নারী সঙ্গিনী হবে, ধর্ম আর নিভৃত মর্মের।

[ইন্দ্র আশাহত দৃষ্টি মেলে তাকালেন অহল্যার দিকে। তারপর ব্রহ্মাকে নমস্কার করে ধীরে ধীরে অপসৃত হলেন।]

অহল্যা ঃ

কেন, কেন, কেন এই আশাহত রূঢ় নির্বাসন
কেন জাগে ভীরু চিত্তে বার বার তরঙ্গ-কম্পন,
মনে হয় ঐ মূর্তি একান্তই আমার আমার,
অন্য কারো নয় আমি; কিন্তু একি যন্ত্রণা দুর্বার
আমায় পীড়ন করে; হৃৎপিণ্ড ছিন্ন শতদল
পবিত্র পূজার অর্ঘ্যে এই পদ্ম একান্ত নিষ্ফল।
ঐ দৃষ্টি, ঐ বাণী আকাশের দিয়েছে ইসারা,
ইচ্ছার বিরুদ্ধে দুর্গে বন্দী পাখি কেঁদে হই সারা;
প্রথম প্রভাত লগ্নে পূর্বাশায় রক্তরাগ লেখা
যে শিল্পী দেখাল হায়, এ জীবনে শেষ হল দেখা
তার সঙ্গে; জানি জানি কোনদিন কোন সহবাস
এমন আলোর রঙে রাঙাবেনা আমার আকাশ।

[পট পরিবর্তিত হল। অহল্যা বধূবেশে তপোবনে পুষ্পচয়নের চেষ্টা করছেন। গৌতমবেশী ইন্দ্র এসে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে।]

ছদ্মবেশী ইন্দ্র ঃ

হেমন্তে শিশির স্পর্শে পুষ্পেরা খসেছে মৃত্তিকায়
ঊর্ধ্ব শাখে দু'চারিটি কোনমতে জাগে প্রতীক্ষায়,
শ্রমে সিক্ত তনুদেহ, সফল কি হবে ও প্রয়াস?
যদি অনুমতি কর সাজিখানি ভরে দেবে দাস।

অহল্যা ঃ

অপরাধ কি করেছি, প্রভু আজ একি আচরণ,
বিলম্ব হয়েছে বুঝি? প্রাতঃস্নান হল সমাপন?

ছদ্মবেশী ইন্দ্র ঃ

বিলম্ব হয়েছে কিনা, এ কথার কি দেব উত্তর,
কত পল অনুপল পার হল যুগ যুগান্তর!
প্রতীক্ষা প্রদীপ শিখা, উর্ধ্বমুখী নিত্য জাগরণ
আশার পতঙ্গগুলি তারে ঘিরে নাচে সারাক্ষণ;
কিন্তু হায় একে একে অনিবার্য মৃত্যুর বিধানে
ঢলে পড়ে শূন্যতায়, হতাশার রিক্ত শর হানে।
যন্ত্রণাবিক্ষত দেহ, আশাহীন দুর্ভর জীবন
তবু তার আশা-পথে প্রতীক্ষিত আমার নয়ন।

স্নান সমাপন কিনা, এ তোমার আর এক জিজ্ঞাসা,
প্রেমের অমৃত নীরে ঘোচে কভু স্নানের পিপাসা?
যেদিন প্রথম ঢেউ উঠেছিল ও আঁখি সাগরে
সেদিন করেছি স্নান পরিপূর্ণ তনু মন ভরে;
তারপর তপ্ত দেহে খুঁজেছি অমৃত সরোবর
কোথা চিহ্ন অমৃতের, জ্বালাময়ী বালুকা প্রান্তর,
আমার সর্বাঙ্গ ঘিরে কি দুঃসহ অগ্নির প্রবাহ
মেলেছে সহস্র জিহ্বা, সর্বভুক কামনার দাহ।
ভিক্ষা মাগে চিরদাস, প্রণয়ের অজস্র বর্ষণ
নামুক তৃষিত চিত্তে, কর দেবী অগ্নি নির্বাপণ।

অহল্যা ঃ

মেঘের সজল অঙ্গে কামনার প্রদীপ্ত অশনি
ঢাকা থাকে চিরদিন, মাঝে মাঝে গুরুগুরু ধ্বনি
জেগে ওঠে মর্মকোষে, তারপর বিদ্যুৎ দহনে
দীর্ণ হয় হৃৎপিণ্ড, অমনি সে গভীর নিঃস্বনে
নিজেকে প্রকাশ করে; সমুদ্যত সেই গুরুভার
কে আর বহন করে, বজ্রপাণি সে অস্ত্র তোমার।

ছদ্মবেশী ইন্দ্র ঃ

চিনেছ আমারে তুমি, হে আমার স্বপ্নের সঙ্গিনী!

অহল্যা ঃ

রক্তে যার লাগে দোলা, তারে আমি চিনি বন্ধু চিনি।
অরণ্যের পত্রবাসে নিজেকে গোপন করে ফুল
বায়ুর তরঙ্গে কিন্তু দোলে তার গন্ধের দু'কূল;

চিনি বন্ধু চিনি আমি তোমার ও দেহের আঘ্রাণ
চিরদিন জেনো সখা ঐ ঘ্রাণে সমর্পিত প্রাণ।

[একটি পুষ্প চয়ন করে ইন্দ্র অহল্যার কবরীতে পরিয়ে দিলেন।]

ইন্দ্র ঃ

এ পুষ্প পূজার নয়, এ কুসুম আর্তের কামনা
এর বর্ণ গন্ধ কায়া প্রণয়ের প্রমূর্ত এষণা,
এ আমার লিপি লেখা, বাণীমূর্তি গোপন মনের
একান্ত অর্পিত অর্ঘ্য অভিজ্ঞান প্রিয় স্মরণের।

অহল্যা ঃ

কি দেব তোমারে সখা বিনিময়ে কিছু নেই আর।

ইন্দ্র ঃ

আমার প্রার্থিত রত্ন পূর্ণ আছে হৃদয়ে তোমার;
যে স্মৃতি খোদিত ঐ বক্ষমাঝে রক্তিম ফলকে,
সেই শিলালেখ খানি আমি যে দেখেছি অপলকে;
সেখানে রৌদ্রের খেলা, কখনো বা মেঘের আঁধার
ঐ আলোছায়া লীলা, সে আমার একান্ত আমার।
বিরহ প্রেমের কন্যা, বিরহ সে বিচিত্র রূপিণী
বেদনার বন্ধনেতে জননী সে সুখ-প্রসবিনী;
সেই দুঃখজাত সুখে তুমি আমি এক অংশীদার,
কণ্টক সংলগ্ন পুষ্পে পান করি এসো সুধা সার।

অহল্যা ঃ

এসো তবে এসো বন্ধু, মুছে যাক মিথ্যা এ সংসার,
জয় হোক্ অন্তরের, প্রিয়তম একান্ত দুর্বার
শক্তিতে জাগ্রত হও, কর আজ সমস্ত লুণ্ঠন
দস্যুতার দুই করে আমার সর্বস্ব সমর্পণ।

[গৌতমের সহসা আগমন। ইন্দ্রকে কুটির থেকে নির্গত হতে দেখে প্রদীপ্ত হল ঋষির নয়ন।]

গৌতম ঃ

আশ্রমে অনার্য লীলা, সংযমের একি পরাভব!
পবিত্র সাধন ক্ষেত্রে মৃত্যুরূপী মোহের বৈভব;
তপস্যার পূত তীর্থে কামনার কলঙ্কিত ছায়া
ধরেছে আশ্চর্য মূর্তি; সঙ্গে তার সর্বগ্রাসী মায়া

লীলা-রস-মত্ততায় নরকের উৎসব সৃজন
করেছে বিপুল লাস্যে, কল্যাণের চির নির্বাসন।

দেবতার প্রতিনিধি, দেবত্বের স্বর্ণ ধ্বজাধারী
তোমার সকল শক্তি নিল কেড়ে ঐ ভ্রষ্টা নারী;
হলে তুমি শক্তিহীন, হীনবীর্য, আজ অভিশাপ
দিলাম তোমারে ইন্দ্র, পুরুষের সকল প্রতাপ
তোমাতে নিষ্ফল হবে, কামনার স্বভাব-প্রয়াস
হবে না সফল জেনো, আজ হতে পুরুষত্ব নাশ।

আর ঐ ধর্মভ্রষ্টা রমণীর রূপের গৌরব
চির অস্তমিত হবে, নারীত্বের সকল সৌরভ
লুপ্ত হবে ঐ অঙ্গে, সবার অলক্ষ্যলোকে ওর
হবে মৌন অবস্থান, রবে আত্ম চিন্তায় বিভোর।
[কিছুক্ষণ মৌনভাবে চিন্তা করে]
দীর্ঘকাল যাবে কেটে, তারপর দূর্বাদলশ্যাম
সর্ব পাপ তাপহারী কল্যাণের প্রতিমূর্তি রাম
আমার এ তপোবনে করে শুভ পুণ্য পদার্পণ
মুক্তি দেবে পাপ থেকে, এ নারীর আত্ম-উদ্বোধন
সেদিন সম্ভব হবে; ভ্রষ্ট আত্মা যাও ক্ষিপ্রগতি
দৃষ্টি থেকে বহুদূরে, সরে যাও স্খলিত দুর্মতি।

[বহু বর্ষ পরে বিশ্বামিত্রসহ শ্রীরামের গৌতম পরিত্যক্ত তপোবনে প্রবেশ। রামচন্দ্রের আগমনে জ্যোতির্ময়ী এক আলোকসত্তার কায়ারূপ ধারণ।]

রাম ঃ

কে ঐ আশ্চর্য নারী ছিল কোন্ অন্তরাল লোকে
এইমাত্র আবির্ভূত আমাদের দৃষ্টির আলোকে!

বিশ্বামিত্র ঃ

মহর্ষি গৌতম জায়া, ইন্দ্রে সমর্পিত তনুমন,
পতির জাগ্রত ক্রোধে শাপগ্রস্ত হল সেকারণ;
সবার অলক্ষ্যলোকে এতকাল আত্মমগ্ন থাকি
পাপের প্রহরগুলি পরিতাপে কাটাল একাকী;
তুমি এসে তপোবনে অহল্যার মুক্তি দিলে রাম।

অহল্যা ঃ

মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র নাও আজ আমার প্রণাম।
আত্মচিন্তা রত হয়ে কেটে গেল সুদীর্ঘ প্রহর
সত্যের যথার্থ স্পর্শে চেতনারা হয়েছে প্রখর,
সংস্কারের যুক্তিজালে সত্যের স্বরূপ আছে ঢাকা
চিন্তার বিশুদ্ধ পটে আছে তার স্পষ্ট চিত্র আঁকা,
মিথ্যার মোহন স্বর্গে সত্যের পেতেছে সিংহাসন
সমাজের কুলপতি; আজ আমি সেই মোহাঞ্জন
মুছে ফেলে অনাবৃত করেছি সত্যের উজ্জ্বলতা।

বিশ্বামিত্র ঃ

বল মহীয়সী নারী কি সে সত্য যার অভিজ্ঞতা
তোমার অন্তরলোক করেছে অপূর্ব উদ্ভাসিত?

অহল্যা ঃ

ইন্দ্র আজও প্রিয়তম, সেই সত্যে রয়েছি সংস্থিত;
দীর্ঘ আত্মবিশ্লেষণে পেয়েছি যে সত্যের আলোক
তারই দীপ্ত বিভাস্পর্শে দূর হয়ে গেছে মিথ্যা শোক;
আমার যৌবন পুষ্পে ইন্দ্র সে যথার্থ মধুকর।

বিশ্বামিত্র ঃ

স্তব্ধ হোক্ মূঢ় নারী তোমার ও অনৃত অধর।
অগ্নির সম্মুখে তুমি যেই হস্ত করেছ গ্রহণ
জন্ম জন্মান্তরে জেনো মিথ্যা নয় কভু সে বন্ধন;
উন্মাদ যৌবন শক্তি যদি করে বিরুদ্ধ আচার
সত্যের শাণিত খড়্গে হবে তার নির্মম বিচার;
কামনার ক্লেদপঙ্কে তুমি নারী পূর্ণ নিমজ্জিতা।

অহল্যা ঃ

তোমার ও রূঢ় বাক্যে নহি আমি সামান্য লজ্জিতা;
পঙ্ক থেকে জাগে পদ্ম, কখনো কি পদ্মের সুবাসে
বল প্রাজ্ঞ মুনিবর পঙ্কের ক্লেদাক্ত গন্ধ ভাসে?
তবু সত্য বলে জানি ঐ পঙ্ক পদ্মের জননী
কামনার স্তূপে জাগে পঙ্কজের শুভ আগমনী;
দেবতার চরণেতে পঙ্ক-কন্যা শ্রেষ্ঠ উপচার,
বল ঋষি সেই পদ্মে কোন্ জন দিয়েছে ধিক্কার?
আমার কামনা পঙ্কে জেগেছে সহস্রদল মন



আমার যৌবন পুষ্পে ইন্দ্র সে যথার্থ মধুকর

সেই বর্ণ গন্ধময় শতদল করেছি অর্পণ
একান্ত বাঞ্ছিত জনে, আমি তৃপ্ত এই আত্মদানে।

রাম ঃ

ব্যভিচারী চিত্ত ধায় চিরদিন নরকের টানে;
যে মন শতধা ভগ্ন, শতমুখে রাখে তার গতি
সেই নিষ্ঠাহীন মন কোন কালে পায়না সদগতি;
চিত্ত জেনো অবিভাজ্য, একনিষ্ঠ, একমুখী তীর।

অহল্যা ঃ

সত্য নয় রামচন্দ্র, চিরদিন হৃদয় অস্থির;
বহুরূপে এই মন নিত্য করে বিচিত্র বিলাস
কখনো সে জায়ারূপে পুরুষের মাগে সহবাস
কখনো বা সন্তানের শিরে ঢালে স্নেহের অমিয়,
কি বিচিত্র এই মন, অপরূপ, চারু রমণীয়।

রাম

কিন্তু এই ব্যভিচার, কি করে এড়াবে অপরাধ?

অহল্যা ঃ

অনভিজ্ঞ রামচন্দ্র প্রকৃতির রাখোনা সংবাদ!
পুষ্পে পুষ্পে মধুকর পরাগের করেছে মিশ্রণ
কিন্তু ব্যভিচারী বলে কে দিয়েছে পুষ্পে বিসর্জন?
একই পুষ্প দেবতার কখনো বা পূজা উপচার
সেই পুষ্প দয়িতার আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠলগ্ন হার

বিশ্বামিত্র ঃ

একান্তই দেহবাদী, তুমি নারী দেহের আশ্রয়ে
বেঁধেছ তোমার মন, কলুষিত কামনার দহে
আকণ্ঠ ডুবেছ আজ, এই দেহ জেনো সত্য নয়।

অহল্যা ঃ

শোন ঋষি, এই উক্তি জীবনের পরম বিস্ময়।
পাত্র ছাড়া পদার্থের আশ্রয় কে দেবে তুমি বল,
দেহের আধার ছাড়া প্রাণ মন সকলি বিফল;
এই দেহ জেনো ঋষি জীবনের পরমার্থ ধন,
কর্দমের পিণ্ড ছাড়া কখনো কি প্রতিমা গঠন
হয়েছে সম্ভব বলো? দেহ হল চিত্তের আধার
দেহকে বিযুক্ত করে সর্ব চিন্তা একান্ত অসার।
শোন ঋষি যেই স্তন সন্তানের অমূল্য-জীবন
সেই বস্তু দেখ চেয়ে পুরুষের কামনার ধন;
একই দেহে জননী যে, সেই দেহে জায়া ও দুহিতা
দেহবাদ সত্য জেনো, জীবনের অমূল্য সংহিতা।

রাম ঃ

যে মন চঞ্চল হয়, তার মাঝে কোন শান্তি নাই
অস্থির চিত্তের মাঝে স্থিতির আনন্দ কোথা পাই?
তাই চিন্তাবিদ করে চিত্তের বিক্ষোভে পরিহার
স্থিত-চিত্ত পায় জেনো জীবনের অমূল্য সম্ভার।

অহল্যা ঃ

স্থিতি আর গতিশক্তি একই বস্তুপিণ্ডে বর্তমান
বস্তুকে বিভক্ত করে পেতে হয় তাহার প্রমাণ;
রাত্রির প্রসন্ন শান্তি আমাদের চিত্তে করে স্থির,
প্রভাতের কর্মযজ্ঞে চিরদিন আমরা অস্থির;
দুই সত্য একই অঙ্গে, কর্মান্তরে ধরে ভিন্ন রূপ

সংস্কারে অজ্ঞান যারা অর্থ করে একান্ত বিরূপ;
স্থিতির মাঝেই গতি এই সত্য জানি মনে মনে
অগ্নি থাকে স্ব-স্বভাবে প্রবাহিত বায়ুর তাড়নে;
কামনার যে আক্ষেপ চিত্তে করে উদ্বেল আকুল
আছে তার সত্য মূল্য, জেনো তাহা স্থিতি অনুকূল।
আবদ্ধ যে সরোবর, নিস্তরঙ্গ তার স্থির নীরে
ক্লেদের মালিন্য জমে, স্রোতহীন জলের গভীরে
পঙ্কের সঞ্চয় বাড়ে; অন্যদিকে চঞ্চল তটিনী
অঞ্চল দুলায়ে তার ক্ষিপ্র গতি সহাস্য নটিনী
বয়ে চলে নৃত্য রসে, কোনদিন জেনো অঙ্গে তার
থাকেনা গ্লানির স্পর্শ, মালিন্যের হয় না সঞ্চার।

বিশ্বামিত্র ঃ

চিত্তের বিভ্রান্তি আসে ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র বিলাসে
সেই চিত্ত শান্ত হয় সংযমের দৃঢ় বল্গাপাশে,
ইন্দ্রিয়ের দ্বার পথে কামনার শতমুখী তীর
প্রশান্ত চিত্তেরে জেনো করে তোলে অশান্ত অস্থির।

অহল্যা ঃ

ইন্দ্রিয়কে নমস্কার, সে জীবের প্রাণের সরণী
সেই পথে শোনা যায় জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি;
আঁখির প্রসাদে পাই বিধাতার বর্ণের বৈভব,
সুরের তরঙ্গ রচে শ্রবণেতে মহা মহোৎসব,
আঘ্রাণের পথ বেয়ে আসে নিত্য আনন্দ কম্পন,
রসনায় কি বিচিত্র আকাঙ্ক্ষিত রস আস্বাদন,
স্পর্শ আনে সর্বদেহে রোমাঞ্চিত কদম্ব-বিকাশ,
ইন্দ্রিয়ে উপেক্ষা করে পূর্ণ হবে কোন্ অভিলাষ?
ঈশ্বর মহান শিল্পী রূপ রস গন্ধ স্পর্শ গানে
পূর্ণ করে এ পৃথিবী নিরন্তর আকুল আহ্বানে
ডাকেন রসিকজনে; সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের মুক্ত দ্বারে
রসমগ্ন যে মানুষ বিধাতার সৃষ্টির সম্ভারে
করে আনে আমন্ত্রণ, একমাত্র ঈশ্বরে সম্মান
দেখায় সে রসগ্রাহী, কিন্তু তাঁকে করে অপমান
ইন্দ্রিয় নিরোধকারী মুষ্টিমেয় তাপসবিগ্রহ,
আত্মার মুক্তির যজ্ঞে করে তারা আত্মার নিগ্রহ।

রামচন্দ্র ঃ

ক্ষুদ্র তুচ্ছ বস্তুপুঞ্জে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত করে মন
তাই এ বিশাল বিশ্বে না পাওয়ার আকুল ক্রন্দন,
সর্ব চিন্তা ঈশ্বরের অভিমুখে প্রদীপ্ত শিখায়
যে জন জাগ্রত রাখে, কোন ক্ষোভ কোন যন্ত্রণায়
পীড়িত হয় না তার বস্তু-সীমা-মুক্ত শুদ্ধ মন,
একক ঈশ্বর তার চিত্তে করে নিত্য আবর্তন।

অহল্যা ঃ

অতি ক্ষুদ্র পরমাণু তার মাঝে ঈশ্বর-প্রকাশ,
নিত্য শুদ্ধ মুক্ত আত্মা চেয়ে দেখ সেও করে বাস
সামান্য তৃণের ফুলে; এ বন্ধনে মুক্তির আস্বাদ
এখানে আনন্দ যজ্ঞে দূর হয় সর্ব নেতিবাদ।

ভূমি থেকে ভূমালোক, সর্বত্র যে বস্তুর বিস্তার
ইন্দ্রিয়ের সূত্র দিয়ে গাঁথা হয় তার মণিহার,
সে হারের দুই প্রান্তে আনন্দ ও বেদনা-কম্পন
সংযুক্ত সে মাল্যখানি চিত্তে আনে নিত্য শিহরণ;
এই বস্তুকণা-মুক্ত কোন্ নব কল্পিত ঈশ্বর
বল প্রিয় রামচন্দ্র, পূর্ণ করে দেবে এ অন্তর?

তুমি যে ঈশ্বর বল, আমি তাঁরে দেখেছি আলোকে
দেখেছি আঁধার রাতে, সুখে দুঃখে সান্ত্বনায় শোকে,
কখনো সন্তানমূর্তি, কখনো বা জননীর স্নেহ,
প্রগল্‌ভ প্রেমের স্বপ্নে নিত্য তাঁর মোহমগ্ন দেহ
পড়েছে আমার চোখে; আমি জানি তাঁর সর্ব ভাব
বৈচিত্র্যের আলোড়নে জড় থেকে বিমুক্ত স্বভাব।

রামচন্দ্র ঃ

মোহতে আনেনা মুক্তি, অতৃপ্তির জ্বলন্ত অঙ্গার
শান্ত শুদ্ধ স্বভাবেরে দগ্ধ করে বিকৃত সংহার
নিত্য করে অনুষ্ঠান; মোহগ্রস্ত মানুষের মন
মুগ্ধতার ছলনায়, করে মিথ্যালোকে সঞ্চরণ।

অহল্যা ঃ

পাখি ওড়ে ডানা মেলে নীলকান্ত আকাশের কোলে

সোনালী সূর্যের দীপ্ত উত্তরীয় অঙ্গে তার দোলে,
কি মোহন আলপনা বাতাসের বুকে এঁকে যায়,
তুমি কি দেখনি রাম, সেই চিত্র পরম তৃষ্ণায়?
কখনো কি ঐ মুখে বলনি, মধুর আহা, আহা,
হওনি কখনো মুগ্ধ তারে দেখে চারিদিকে যাহা
একান্ত আনন্দময়? এই বিশ্ব পূর্ণ মধুস্থলী
একথা স্মরণ করে দাওনি কি চিত্তের অঞ্জলি
পরম স্রষ্টার পায়ে? অন্যমনে পথে কোন দিন
মনে কি পড়েনি রাম অতীতের সুখ-স্বপ্নলীন
কোন স্মরণীয় কথা? যদি আসে সে মুহূর্ত ফিরে,
মনে কি জাগেনি ইচ্ছা সেই কাম্য ক্ষণটিরে ঘিরে
আবার প্রমত্ত হই? এ অতৃপ্তি, এ মোহ-বন্ধন
জেনো রাম, জীবনের মহাসত্য, পরমার্থ ধন।
এই মন-বিহঙ্গম, আকাশে মেলেছে তার পাখা
দুই পক্ষে মোহ আর অতৃপ্তির চিত্র আছে আঁকা
সে মোহন চিত্রে দেখ লেখা আছে বিশ্ব ইতিহাস
জড়ত্বের পিণ্ড থেকে জীবনের বিপুল বিকাশ।

বিশ্বামিত্র ঃ

শাণিত তোমার যুক্তি হে রমণী শোন তবু বলি,
প্রণয়ের যজ্ঞকুণ্ডে কারে দিলে প্রাণের অঞ্জলি!
ব্যভিচারী দেবরাজ, নিত্য সঙ্গী মেনকা উর্বশী,
স্বর্গের সুরার পাত্রে বিম্বিত সে আকাশের শশী;
ইন্দ্র করে নিত্য পান যৌবনের মদমত্ত সুধা
তবু তার তৃপ্তি কোথা, ইন্দ্রিয়ের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা
জ্বলন্ত অগ্নির মতো দাহ করে সর্ব চরাচর,
সেই জ্বালা অঙ্গে মেখে কামিনীর কম্পিত অধর
ইন্দ্র করে উপভোগ; তৃপ্তিহীন সেই ব্যভিচারী
বহুকান্তা সমাবৃত, তার করে হে বিদুষী নারী
নিজেকে অর্পণ করে প্রণয়ের কোন্ শুভ ফল
পেয়েছ আমারে বল? চিত্ত শুধু হয়েছে চঞ্চল;
সহস্র নায়িকা রঙ্গে বিক্ষত কি হয়নি হৃদয়,
ঈর্ষার সুতীক্ষ্ণ শর বেঁধেনি কি তীব্র জ্বালাময়
ইন্দ্রেব প্রণয়মুগ্ধ ঐ দুটি আঁখির তারায়?

অহল্যা ঃ

ঈর্ষাহীন ভালবাসা একদিন সকলি হারায়;
যে পাওয়া শুধুই পাওয়া, বেদনার স্পর্শ থেকে দূরে
আপনার সুখনীড় নিরুদ্বিগ্ন মিলনের সুরে
গেঁথে চলে, একদিন জেনো সেই সুখ-স্বর্গ হতে
ভ্রষ্ট হয় নরনারী; সীমাহীন অবসাদ স্রোতে
ভেসে চলে লক্ষ্যহারা; একোদর ভিন্নগ্রীবা পাখি
পরস্পর সংযোগের পরিণামে শুধু ডাকাডাকি,
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে নিরুপায়, বিষময় ফল
সর্বদেহে করে দেয় সঞ্চারিত তীব্র হলাহল।

অন্যদিকে প্রণয়ের পাত্র ভরে ঈর্ষারূপ সুধা
যে করে নিয়ত পান, বেদনা-সম্ভব এক ক্ষুধা
নিরন্তর তাড়নায় করে তার প্রেমে সঞ্জীবিত,
ঈর্ষা মন্থনের ফলে জন্ম নেয় অনাদি অমৃত।
প্রেমে ঈর্ষা সঞ্জীবনী, ঈর্ষা সেই আঁধার আকাশ
যাকে দীর্ণ করে সূর্য আপনার মহিমা প্রকাশ
নিত্য নিত্য করে চলে; নিশীথের বাধার আড়াল
আছে বলে সবিতার চিরদিন হিরণ্ময় ভাল
সবার লক্ষ্যের বস্তু; ঈর্ষা তাই জীবন প্রবাহ।

রাম ঃ

ঈর্ষা অনলের কণা, ঈর্ষা জেনো আগুনের দাহ।

অহল্যা ঃ

গৃহদাহ করে অগ্নি, তাই বলে বল কোন্ জন
নিত্য সংসারের সঙ্গী সে অগ্নিরে দেয় বিসর্জন?
যে ঝড় ডোবায় তরী, জলমগ্ন মানুষে আবার
এককণা বাতাসের প্রার্থনাই করে বারংবার।

বিশ্বামিত্র ঃ

বহু প্রযত্নের ফলে সামাজিক সত্য প্রতিষ্ঠিত
এই চিরন্তন সত্য মানুষের একান্ত ঈপ্সিত,
তপস্যা জীবন সত্য, কামনা তাহারে বার বার
ভ্রষ্ট করে সিংহাসন, চালায়েছে তীব্র ব্যভিচার;
তোমার যুক্তির ওই পঙ্গপাল জেনো দলে দলে

সমাজের ক্ষেত্রে নেমে সুসজ্জিত সত্যের ফসলে
গ্রাস করে আচম্বিতে করে দেবে শূন্য অন্তঃসার।

অহল্যা ঃ

বহু মিথ্যা পুঞ্জীভূত, বাড়ায়োনা আর তার ভার;
সত্য কভু এক নয়, অবস্থার বিচিত্র বিধানে
সমাজের পরিস্থিতি এই সত্যে রূপান্তর আনে,
আমাদের প্রয়োজনে আজ যাকে সত্য বলে মানি,
নবতর প্রয়োজনে পুরাতন সে সত্যেরে টানি
ফেলে দিই বিস্মরণে, নব সত্য সেই সিংহাসনে
ততদিন চলে জেনো, যতদিন মানুষের মনে
থাকে তার শক্তিক্রিয়া; তারপর আবার কখন
সমাজের চিন্তাক্ষেত্রে নব নব ওঠে আলোড়ন,
তখন আবার ত্যাগ; রাজ্য থাকে চিরদিন স্থির
রাজা হয় স্থানচ্যুত, শাসনের লীলাই অস্থির;
যতকাল প্রজা চায়, ততকাল রাজার শাসন
চলে তার স্ব-স্বভাবে, তারপর সেই সিংহাসন
ছেড়ে চলে যেতে হয়; সমাজের নব আন্দোলনে
নতুন সত্যের জন্ম, পুরাতন যায় নির্বাসনে;
মাঝে শুধু ক্ষণিকের তোলপাড়, সমাজ সংক্ষোভ,
আবার নতুন দিনে দূরে যায় সকল বিক্ষোভ।

তপস্যা যেমন সত্য, কামনাও তুল্যমূল্য জানি
ইন্দ্র আর গৌতমের দুই রূপ সত্য বলে মানি;
সমস্ত জীবন-ধর্মে দুই সত্য করে অধিবাস,
কখনো আত্মস্থ-মূর্তি, কখনো বা উদ্বেল প্রকাশ।

বিশ্বামিত্র মুনিবর, মনে কি পড়েনা সেই স্মৃতি
সহস্র বর্ষের তপ ভঙ্গ করে কি গভীর প্রীতি
দেখালে স্বর্গের সেই কলাবতী মেনকার পরে?
সেদিন বালার্ক-রাগ ফোটেনি কি মানস-অম্বরে?
বলনি কি যাক দূরে সকল তপস্যা পুণ্যফল,
হে নারী প্রসাদ দাও; তোমার ও স্খলিত অঞ্চল
ঢেকে দিক আমার এ রূঢ় রুক্ষ্ম তপস্যা-কঠিন

দেহখানি, এ মুহূর্তে করে দাও একান্তই লীন
তোমার উত্তপ্ত বক্ষে; মিথ্যা মিথ্যা তপস্যা, আচার,
তুমি আছ, আমি আছি, এই সত্য জীবনের সার।

সেদিনের সেই রূপ কেন আজ ভুলে গেলে সাধু,
সেই স্বর্ণনীরে ধোয়া উজ্জ্বল দিনের মুগ্ধ যাদু!
আজ তুমি ঋষিশ্রেষ্ঠ এ কথা করিনা অস্বীকার,
সেদিনের বিশ্বামিত্র সেও সত্য-মূর্তি কামনার;
দুই রূপই জেনো সত্য, একই দেহে জায়া ও জননী
পবিত্রতা সর্বদেহে, এই সত্য বেদমন্ত্র ধ্বনি।
[বৃক্ষের আড়াল থেকে গৌতমের আবির্ভাব]

গৌতম ঃ

এসো নারী শুচিস্নাতা, আমার ক্রোধান্ধ অভিশাপ
ক্ষমা কর মুক্তমনে, তোমার ও যুক্তির উত্তাপ
আমার দেহের জড় তুষারের পিণ্ডে দিল নাড়া,
পেয়েছি ঊষর বক্ষে তরঙ্গিত জীবনের সাড়া;
তুমি নারী সর্বজয়ী, সত্যে অবস্থিত তনুমন,
তোমার বোধের কাছে গৌতমের আত্ম সমর্পণ।

বিশ্বামিত্র ঃ

ঋষিশ্রেষ্ঠ আজ তুমি যথার্থই হলে ভাগ্যবান,
পরম ঐশ্বর্যময়ী এই নারী সর্ব অসম্মান
মুছে ফেলে, সংস্কারের চিররুগ্ন আঁধার-নির্মোকে
সবলে ফেলেছে টানি; সুমার্জিত বুদ্ধির আলোকে
সমাজে করেছে দীপ্ত; এ সত্যের সীমাহীন দাম।

রাম ঃ

ধন্য নারী মহীয়সী, শ্রীচরণে বিনীত প্রণাম।